বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধান

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ]

গবেষক: রিয়া মুখার্জি

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE1100418

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 19.09.2018

তত্ত্বাবধায়ক: ড. শম্পা চৌধুরী

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৫

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

'বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধান' submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Sampa Chaudhuri, Professor, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Sampa Chaudhuri.

Countersigned by the Supervisor:

Dated: 22.05.25

Professor (Retd)
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Riya Mukherjee

Candidate:

Dated: 22.05.25

গবেষণা পদ্ধতি

'বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধান'-শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুযায়ী আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, সহায়ক পত্র-পত্রিকা, আর্কাইভ্যাল ও বৈদ্যুতিন তথ্য (আন্তর্জালিক তথ্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই কারণে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, ওয়েবসাইট ও সংগৃহীত গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা, বিষয়ানুগ আটটি অধ্যায়, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি — এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অভ্র সফট্ওয়্যারের 'কালপুরুষ' ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫।

- উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করা হয়েছে। পরিবর্তে উদ্ধৃতাংশগুলি ১২ পয়েন্টে ইনডেন্ট করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

- গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যান্ডবুকের সপ্তম সংস্করণের মান্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রস্তাবনা

শুরুটা হয়েছিল কয়েকটি কবিতার হাত ধরে। কবির নাম ওয়াহারু সোনাওনে (জন্ম.১৯৫০)। দলিত আন্দোলনের প্রতিনিধি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ওয়াহারু সোনাওনে একজন আদিবাসী কবি। আদিবাসীদের আন্দোলনের তিনি পুরোধা ব্যক্তিও বটে, যিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই ব্যায় করেছেন আদিবাসীদের সংগঠিত করার কাজে। মার্কসীয় দর্শনের অধিকারী ওয়াহারু সোনওয়ানের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মিশ্রণে সৃষ্ট কবিতা পাঠককে একপ্রকারের ভাবতে বাধ্য করে, তিলমাত্র স্বস্তি দেয় না। কবিতাটির নাম 'স্টেজ' (১৯৮৭)।

আমরা তো স্টেজে উঠিনি
কেউ ডাকেওনি আমাদের
কেবল আঙুলের ইশারায়
আমাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল
ওখানেই বসলাম;
'সাবাশ' বলল সবাই
এবং 'ওরা' স্টেজে উঠে
আমাদের দুঃখের কথা আমাদেরই বলতে থাকল
'আমাদের দুঃখ আমাদেরই থাকল
কখনোই ওদের হল না...'
আমাদের সংশয় নিয়ে আমরাই ফিসফাস করলাম।
ওরা কান খাড়া করে শুনতে থাকল, এবং ছাড়ল দীর্ঘশ্বাস
এবং তারপর আমাদের কান ধরে
আমাদেরই ধমকাল
মাফ চাও, নয়তো...!

এরপর একটানা পড়ে যাই আন্না ভাউ সাঠে, নারায়ণ সুর্ভে, নামদেও ধাসাল, বাবুরাও বাগুল, ত্র্যম্বক সপ্‌কালে, দয়া পাওয়ার, অর্জুন ডাঙলে, মল্লিকা অমরশেখ, মীনা গজভিয়ে প্রমুখ কবিদের কবিতা। দেখি প্রায় প্রতিটি কবিতায় বঞ্চনা ও বেদনা এভাবেই ফিরে ফিরে আসে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে। কবিতাগুলির ভঙ্গি সেকারণে কখনও রূঢ়, কর্কশ, এমনকী বিধ্বংসী। কিন্তু প্রতিটি কবিতা তবুও বর্ণময় এবং নিখাদ বাস্তবেরই প্রতিরূপ, যা পাঠকের চিন্তায়-চেতনে আঘাত করে চাবুক হয়ে। দয়া পাওয়ার তাঁর 'হে মহাকবি' (১৯৭৪) কবিতায় বলেন—

> ... ...
> রামরাজ্যের স্তুতিগায়ক
> হে মহাকবি
> (আমাদের উপর) এই অন্যায় অত্যাচার সকলকে জানানোর জন্য
> একটি পঙ্‌ক্তিও যদি লিখতে...।
> তোমার নামও হৃদয়ে খোদাই হত।

এই সময় থেকেই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত সাহিত্যের বিপুল অথচ অনেকক্ষেত্রেই অবহেলিত লেখা-পত্র আগ্রহ নিয়ে খুঁজতে শুরু করেছিলাম। এই পথ ধরেই ফিরে আসি শিকড়ের কাছাকাছি। বাংলা ভাষায় লেখা দলিত সাহিত্য ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে যায় সেই বিকল্প পৃথিবীর দ্বারপ্রান্তে, যার নাম 'চতুর্থ দুনিয়া'। অনিল সরকার, পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো, শ্যামলকুমার প্রামাণিক, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, সুধীররঞ্জন হালদার, প্রদীপকুমার বর্মণের কবিতা যখন পড়ি তখন দেখি 'দলিত' এই আখ্যাটি অনেক বৃহত্তর আয়তন ধারণ করে বিশ্বব্যাপী সমস্ত শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে কখন যেন তার আওতায় বেঁধে ফেলেছে।

এদিকে ‘কবিতা’ নামক সংরূপটি তখন আর সব কৌতূহল মেটাতে পেরে উঠছে না। এমতাবস্থায় হাত বাড়াই ‘আত্মকথা’র দিকে। দলিত লেখকরা তাঁদের আত্মজীবনীতে ‘আত্মা’কেই ‘বস্তু’ করে তুলেছেন। তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠেছেন তাঁদের নিজেদের সাহিত্যে বিষয়। এযাবৎ পড়া আত্মকথা, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনীর মধ্যেকার যে স্মৃতিমেদুর অতীতচারণ ছিল, দলিত আত্মজীবনীগুলি দাঁড় করিয়ে দিল ক্ষমতাবান ও বর্ণবাদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের আগ্রাসন ও শতাব্দীব্যাপী নিপীড়নের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের ভয়ংকর বিপন্নতার দিনলিপির মুখোমুখি। বেশ কিছু আত্মজীবনী পড়ার পরে গবেষণার বিষয় হিসেবে বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী বেছে নেওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা।

… … … … …

ঐতিহ্য যেখানে মেয়েদের শুকিয়ে দেয়,
একটা খর্বুটে গাছের মত যেখানে তাকে
সারাজীবন কাটাতে হয়
অন্য কারো আলোর ছায়ার মত যেখানে
সে থাকে,
সে দেশে মেয়েরা এখনো দাসী।…
মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই এক দোষ
মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই এক দোষ।

— হীরা বানসোড়ে

কিংবা

আমরা মাদারচোদ বোবা পশুর মতো
আমাদের জীবন বন্ধক দিয়ে কাটাই।
আমরা জানি গোলমালটা কোথায়,
কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।
আমরা যা করেছি, আমাদের মা-ঠাকুমারাও তাই করেছেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরাও তাই করবে।

... ...

ওঃ, তোমাদের কাছে মিনতি করছি —
আমাদের জন্যে ঐ চোখের জল ফেলো না।
ওঃ, এই জোড়হাতে তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি—
আমাদের হয়ে তোমরা কণামাত্র দুঃখ পেয়ো না।
আমাদের জীবনের ছেঁড়া কাঁথাগুলো
সম্বৎসরে একবার ধোয়াধুয়ি কোর না।
আমরা এমনিতেই ন্যাংটো
দুনিয়ার সামনে আমাদের আর ন্যাংটো কোর না।

— অনুরাধা গুরব

প্রশ্ন জাগে এঁরা কারা?

দলিতদের মধ্যেও এই দলিত-তমরা যখন তাঁদের কথা নিজের ভাষায় বলতে চায় তখন তাঁদের 'দলিত' অস্তিত্বের যন্ত্রণার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে 'নারী' অস্তিত্বের যন্ত্রণা। তাঁদের আত্মজীবনীগুলি অনেকটা ঘুম উড়িয়ে দেওয়া বিস্ফোরকের দুঃস্বপ্ন বয়ে আনে। কেবলমাত্র তাঁদের আত্মজীবনীই আলাদা করে সাহিত্যে সমাজবিজ্ঞানের পরিসরে স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে সামগ্রিক দলিত সাহিত্যের পরিসরে। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, লিলি হালদার, লক্ষ্মী মাণ্ডি, স্মৃতিকণা হাওলাদার, চুনী কোটালদের লেখা বাংলা ভাষায় দলিত কবিতা আজ তার নিজস্ব স্বরে প্রতিবাদী।

গবেষণা-জীবনে যাঁদের সান্নিধ্য না পেলে কোনো ভাবেই আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে পারতাম না তাঁদের প্রতি জানাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার মা মালতী মুখার্জির কথা। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর

ভালোবাসা ও আশ্রয় না পেলে এই কাজ শেষ করা অনেকখানিই কঠিন হয়ে পড়ত। মায়ের কাছে আমি আজন্ম ঋণী।

আমার গবেষণা উপদেশক সমিতির সদস্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমার গবেষণার কাজে প্রভূত সহায়তা করেছে, তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়াও নানা সময় দলিত সাহিত্য সংক্রান্ত বইপত্রের হদিশ দিয়ে সাহায্য করেছেন বিভাগের অধ্যাপক ড. বরেন্দু মণ্ডল। তাঁর সহৃদয় সাহায্য ছাড়া প্রথাগত বিষয়ের বাইরে বেরিয়ে এমন একটি বিষয় নির্বাচন ও তাকে গবেষণা অভিসন্দর্ভের রূপ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা, অধ্যাপক ড. জয়দীপ ঘোষ, অধ্যাপক ড. সেলিম বক্স মণ্ডলের সঙ্গে অধীত বিষয়টি নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোনও চিন্তা, দর্শনই সমাজ বহির্ভূত, কোনো একক মানুষের করায়ত্ত নয়। যৌথতায় তার নির্মাণ হয়। দীর্ঘ এই সময় পর্বে আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিকে একটি সুনির্দিষ্ট আদল দিতে অসংখ্য মানুষ ও তাঁদের চিন্তা, যুক্তি-তর্কের যে গভীর প্রভাব রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

গবেষণার শুরুর একদম প্রথম দিকে কিছু শারীরিক সমস্যা আমাকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। প্রায় সব কিছুই যখন অসম্ভব কঠিন মনে হতে শুরু করেছিল

তখন ভালোবাসা আর ভরসার হাত যাঁরা বাড়িয়ে দিয়ে আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে একপ্রকার বাধ্য করেছিলেন তাঁদের জন্য কোনো শব্দই আজ যথেষ্ট নয়। অরিত্রি দে, পৌলমী সিনহা, অঙ্কিতা সিনহা, দেবলীনা দিক্ষিৎ, সবিতা বেরার কাছে ঋণ আমার আকাশছোঁয়া। এ ঋণ অপরিশোধ্য। সহপাঠী ও সহ-গবেষক সামসুর কখনো পরামর্শ, কখনো আলাপ-আলোচনা, নানা ভাবে জুড়ে থেকেছে এই পুরো সময়টাতে। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা জানাই। প্রযুক্তি কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শুভেন্দু তরফদার। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

আমার পরম বন্ধু সুনীল বসাককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা, তাঁর পাশে থাকা আমাকে প্রতি মুহূর্তে শক্তি দেয় স্বপ্ন দেখার, তা পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন।

সবশেষে যাঁর কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী। গবেষণাপর্বের এই দীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন, ভরসা জুগিয়েছেন, চিন্তার নানা আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন সহযাত্রী। গবেষণার শুরুর দিনগুলি থেকে তিনি একটি মুখচোরা মেয়েকে যে চিন্তার স্বাধীনতা ও উৎসাহ দিয়েছেন তা অকল্পনীয়। গবেষণা সংক্রান্ত লেখালেখির পাশাপাশি গবেষণা নির্মাণের পদ্ধতি তিনি হাত ধরে শিখিয়েছেন। যতটা তত্ত্বাবধায়ক, ততটাই অভিভাবক তিনি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক আইভি আদক ও হরিশ মন্ডল মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণার কাজে ব্যবহৃত নানান বইপত্র জোগান দিয়ে তাঁরা প্রভূত সহায়তা করেছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেকশন এবং পিএইচ.ডি. সেল-এর আধিকারিক ও কর্মচারীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই গবেষণার প্রযুক্তিগত দিকগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

গবেষণার অন্তর্গত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কিছু মুদ্রণ ও বানানাগত অসাবধানতা থেকে যায়, তার জন্য গবেষক আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

যাদবপুর
মে, ২০২৫

রিয়া মুখার্জি
(গবেষক)

সূচিপত্র

ভূমিকা **১-১৮**

প্রথম অধ্যায়: অতীত অনুসন্ধান: বিষয়ী সত্তার সংকট ও বিকল্প কৌশল **১৯-৯০**

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রান্তিকের আত্মপরিচিতির সন্ধান: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা **৯১-১৬২**

তৃতীয় অধ্যায়: সর্বভারতীয় দলিত আত্মজীবনী: বিদ্রোহের বর্ণমালা **১৬৩-২০৬**

চতুর্থ অধ্যায়: বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: সাহিত্য ও প্রতিরোধের রাজনীতি **২০৭-২৭১**

পঞ্চম অধ্যায়: নারী ও দলিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্বালোকন **২৭২-৩৫৪**

ষষ্ঠ অধ্যায়: দলিত নারীর আত্মজীবনী: অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো **৩৫৫-৪০৯**

সপ্তম অধ্যায়: উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী: একটি পর্যালোচনা **৪১০-৪৭৮**

অষ্টম অধ্যায়: স্মৃতি-সত্তা-স্বর: 'আত্মজীবনী'র নির্মাণ ও ইতিহাস চর্চায় দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক **৪৭৯-৫২৩**

উপসংহার **৫২৪-৫৩০**

গ্রন্থপঞ্জি **৫৩১-৫৪২**

ক. আকরগ্রন্থ
- বাংলা আকরগ্রন্থ
- ইংরেজি আকরগ্রন্থ
- হিন্দি আকরগ্রন্থ

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ
গ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি **৫৪৩-৫৪৪**

অভিধানপঞ্জি **৫৪৫**

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সুত্র) **৫৪৬**

ভূমিকা

'আত্মজীবনী' নামক সংরূপটির মধ্যে নির্মাণ ও সৃষ্টি একই সঙ্গে কাজ করে। এরই পাশাপাশি আমরা দেখি আত্মজীবনীর জন্মেরও আগে ভারতীয় সাহিত্যে চরিত বা জীবনীকাব্যের এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* (প্রথম শতক), বাণভট্টের *হর্ষচরিত* (অষ্টম শতক), বাদিরাজের *পার্শ্বনাথ চরিত্র* (একাদশ শতক), গুণচন্দ্রের *মহাবীরচরিত্র* (একাদশ শতক), পদ্মগুপ্তের *নবসাহসঙ্ক চরিত* (একাদশ শতক), হেমচন্দ্রের *এষষ্ঠিশলাকা পুরুষ চরিত্র* (দ্বাদশ শতক), সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* (দ্বাদশ শতক)-এ আছে সেই পরম্পরার অনুসৃতি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই ধারারই ঐতিহ্যানুসৃতি হিসাবে আমরা পাব চৈতন্য জীবনী সাহিত্যকে। শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে বাংলা চরিত সাহিত্যের সূচনা হয় – যার মধ্যে জীবনীসাহিত্যের তথ্যধর্মী, বস্তুনিষ্ঠার প্রথম স্পর্শ পাওয়া যায়। যদিও বাংলা জীবনী গ্রন্থের সূচনা লগ্নে চৈতন্য জীবনীকাররা সে সময় ধর্ম, ভক্তিবাদ বা অলৌকিকতার প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। আসলে ঐতিহাসিক সত্যটি হল — সাহিত্য রচনা নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও গৌরব প্রতিষ্ঠাই ছিল বৈষ্ণব জীবনীকারদের উদ্দেশ্য। সেদিন ধর্মপ্রচারের সচেতন অভিপ্রায়ের মাধ্যম হিসাবে এসেছিল চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলো। তাই শেষাবধি চৈতন্য জীবনীগ্রন্থসমূহ জীবনচরিত না হয়ে সন্তজীবনী বা অবতারচরিত (Hagio-graphy) হয়ে উঠেছিল। তবুও মধ্যযুগে সাহিত্য যখন ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তনের ভারবাহী – তখন একজন রক্তমাংসের মানুষকে সাহিত্যের বিষয়ভুক্ত করে চৈতন্য জীবনীকাররা সেদিন বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা

করেছিলেন। প্রকৃত জীবনী সাহিত্যের স্বাদ পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হল আরও কিছুদিন – যতদিন না এসে পৌঁছাল উনিশ শতকের রেনেসাঁসারের আরও অনেক কিছুর সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবনীগ্রন্থ।

ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীরামপুর মিশন (১৮৩০), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০১) এবং মিশনারি প্রেস। উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) এবং তাঁর বাংলা শিক্ষক রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)-র প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের প্রবর্তন ঘটে। এই সময় শ্রীরামপুর মিশনের বাংলা বিভাগের ভার দেওয়া হয় উইলিয়াম কেরির উপর (১মে, ১৮০১)। পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব বর্তায় এই দুজনের উপর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বের প্রথম চোদ্দ বছরে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বেই দুটি বাংলা জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়ে যাচ্ছে। রামরাম বসু মৌলিক গদ্য রচনা তো বটেই, একই সঙ্গে সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, বাংলা শব্দের মিশ্রণে বাঙালির প্রথম গদ্য জীবনীগ্রন্থ *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১)-এর জন্ম দিলেন। যেখানে ইতিবৃত্ত-মূলক উপাদান এবং তথ্যধর্মীতাকে গুরুত্ব দেওয়া হল পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা চরিত সাহিত্য* (১৯৮২) শীর্ষক অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থে এর মূলে রামরাম বসুর ফারসি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা জানিয়েছেন। তিনি তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন ফারসি সাহিত্যে ইতিবৃত্ত, জীবনী, আত্মজীবনী প্রচুর। এইসব রচনার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা চরিত সাহিত্যগুলি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দিকে এগিয়েছে, যেখানে তথ্যধর্মিতা বেড়েছে এবং অলৌকিকতা কমেছে ক্রমশ।

পরবর্তীকালে উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম দশকে আমরা বাংলা ও পাশ্চাত্য জীবনীসাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার হাতে পাই, জীবনী সাহিত্যের সেই ক্রমবিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রজীবনী সাহিত্য বাংলা জীবনী সাহিত্যের ধারাকে পূর্ণতা দিয়েছে। এর পাশাপাশি সমকালে জীবনী সাহিত্যের আলোচনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিস্তৃত ও বহুমুখী তাত্ত্বিক পরিসর।

উনিশ শতকে বাংলায় বহু চর্চিত ও বিতর্কিত নবজাগরণের স্বরূপ নিয়ে অনেক যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নকে সামনে রেখেও একটা কথা প্রায় অনস্বীকার্যই যে, পাশ্চাত্যের সংশ্রবে বাঙালি হিন্দু সমাজের নব্যশিক্ষিত অংশের মানস পরিমণ্ডলে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। সেই ধাক্কা এই শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণিকে নিজেদের 'আত্ম' সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই ভাবনার ফলেই 'ব্যক্তি-আমি'-কে অন্যদের থেকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতার জন্ম। 'আমি'র চেতনা দিয়েই তৈরি হতে থাকে এই নতুন 'পুরুষ-নির্মাণ' প্রক্রিয়া। পুরুষ-নির্মাণ, কেননা 'স্ত্রী-নির্মাণ'-এর প্রসঙ্গটি তখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র মনোযোগ পায়নি। 'আমি' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে সেই 'আমি'র ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইতিহাস নয়, ব্যক্তির আত্ম উপলব্ধি তো আত্ম উন্মোচনেরই প্রক্রিয়া। সেই প্রয়াসেই লেখা হয় আত্মজীবনী।

এইখানে এসে প্রশ্ন তৈরি হয়, আলাদা করে দলিত আত্মজীবনী নামক বর্গের জন্ম হল কেন? আদৌ কি এই পৃথকীকরণের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে?

আমরা যখনই দলিত ভাবনার কথা বলি বা দলিতের সমস্যার কথা বলি, তখন সাধারণত আমাদের চিন্তাগুলো সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সবের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। সাংস্কৃতিক দিকটা তুলনামূলক কম আলোচিত হয়। অথচ ভারববর্ষে দলিতের শোষনমুক্তির যে চিন্তা,তাতে একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল মহারাষ্ট্রের 'দলিত প্যান্থার' আন্দোলন, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির পরিসরে যা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছিল।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি দেখি, সাহিত্যের মূলধারায় মানবিক মূল্যবোধের দায় থেকে কবি ও সাহিত্যিকরা অনেকেই লিখেছেন দলিত জীবন নিয়ে। বিভিন্ন ভাষার বড়ো বড়ো প্রথিতযশা লেখকদের রচিত সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দলিত চরিত্র উঠে এসেছে। কালজয়ী সেইসব সৃষ্টিতে দলিত জীবনের যন্ত্রণার কথাও তাঁরা বলেছেন কিন্তু তাঁদের লেখার অন্তর্কাঠামো এই যন্ত্রণার উৎস কোথায় এবং এর অবসানই বা কীভাবে হবে, প্রায়শই তার উত্তর মেলে না।

এইখানেই পার্থক্য, এখানেই দলিত মতাদর্শের জরুরি প্রয়োজনীয়তা। এখানেই স্বাধীনতা পরবর্তী কালের দলিত সাহিত্যের নিজস্বতা, আপন চরিত্র চিহ্নে বিশিষ্ট হয়ে ওঠা। এখানেই দলিত মুক্তি আন্দোলন ও দলিত মতাদর্শের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেড়ে ওঠা দলিত সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা এবং ভারতীয় সাহিত্যের এক অভিনব ও পৃথক ধারা হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবির যৌক্তিকতা।

এই প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'আত্মনির্মাণ' শব্দটি দলিত সাহিত্য,সংস্কৃতি এবং দলিত সত্তার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একজন দলিতের আত্মমূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি সেই দলিত মানুষটি নিজে নির্ধারণ করে না। একজন দলিত কীভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করবেন সেই মাপকাঠি ঠিক করে দেওয়া হয় বাইরে থেকে। ফলস্বরূপ একজন দলিত মানুষ যখন নিজের কথা ভাববেন এবং নিজেকে নতুন করে নির্মাণ করতে চাইবেন, তখন পরিস্থিতি তাঁকে প্রতিবাদের রাজনীতির পথে এসে দাঁড় করিয়ে দেয়।এটাই আত্মপ্রতিনিধিত্বের রাজনীতি। সুতরাং এটা হঠাৎ কোনো ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়।

অমর্ত্য সেনের (জন্ম. ১৯৩৩) *ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম* (১৯৯৯) নামের বইটি (বাংলা তরজমায় বইটির নাম: *উন্নয়ন ও স্বক্ষমতা*), তার একটি অধ্যায়ের শিরোনাম 'সোশ্যাল কমিটমেন্ট টু ইন্ডিভিজ্যুয়াল ফ্রিডম'। অধ্যাপক সেন আমাদের শিখিয়েছেন 'ফ্রিডম' অর্থে 'স্বক্ষমতা' শব্দটি ব্যবহার করতে। পরিচিত বাংলা প্রতিশব্দ 'স্বাধীনতা'কে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার না করেই স্বক্ষমতা আমাদের ফ্রিডমকে এক প্রসারিত অর্থে চিনতে শেখায়, মানুষ যা হতে চায় এবং যা করতে চায়, আরও বিশদ করে বললে, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজে মানুষের যা হতে বা করতে চাওয়ার কথা, সেটা হওয়ার বা করার সে সুযোগ পাচ্ছে কিনা, সেটাই তার সক্ষমতার (capability) সূচক। অপর দিকে, নিজের সক্ষমতা অর্জন করার এবং সার্থক করার বাস্তব ও কার্যকর স্বাধীনতাই ব্যক্তির স্বক্ষমতা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এটাও লক্ষণীয় যে, এই স্বক্ষমতার বিকাশকেই অমর্ত্য সেন উন্নয়নের মৌলিক শর্ত তথা ধর্ম হিসাবে দেখেছেন। সব মানুষের স্বক্ষমতার বিকাশ হবে, এটাই

তাঁর কাছে উন্নয়নের প্রকৃত সংজ্ঞা, জিডিপি বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচলিত ব্যাপারগুলি উন্নয়নের সম্ভাব্য প্রকরণ মাত্র।

দলিত পরিচয়ের কারণে, দলিত গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার পরিণামে ব্যক্তি নাগরিক যে তাঁর স্বক্ষমতাগুলোকে পাচ্ছেন না বা তাকে সেগুলো পেতে দেওয়া হচ্ছে না, নানা ভাবে তার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে, এই সমস্যার মোকাবিলায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান যে প্রকরণগুলি ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল সংরক্ষণ। লক্ষ্যণীয়, এই সংরক্ষণ যিনি পাচ্ছেন তিনি একজন ব্যক্তি-নাগরিক, কিন্তু তিনি সেটা পাচ্ছেন এই কারণে যে তিনি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য। সুতরাং একটু ভেবে দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে যে, ব্যক্তির গোষ্ঠীর পরিচয়ের জন্য তাঁর যে সুযোগ-বঞ্চনা, তার প্রতিকার খুঁজতে রাষ্ট্র ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিটি তার গোষ্ঠী পরিচয়কে অস্বীকার করতে পারছে না। অস্বীকার করা কি আদৌ সম্ভব? আজকের উদার অর্থনীতিবাদের প্রেক্ষাপটে অতিকায় পুঁজির দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত বর্তমানে দাঁড়িয়ে দলিতের গোষ্ঠীপরিচয় ক্রমে ক্রমে রাজনীতির একটা প্রধান প্রকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও একটু ভেঙে বললে, পুরনো সমাজ এবং নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতি – এই তিনের টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে দলিত আত্মকথনকে ঘুরে ফিরে দেখার প্রয়াসই আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

শুধুমাত্র বাংলা দলিত আত্মজীবনীকে ঘিরেই বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বই অথবা গবেষণা অভিসন্দর্ভ এযাবৎ তেমন ভাবে না থাকলেও সামগ্রিক বাংলা দলিত সাহিত্যকে

নিয়ে লেখা একাধিক মূল্যবান বইয়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত আকারে দলিত লেখকের আত্মজীবনী সংক্রান্ত তথ্যসমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ইতিপূর্বেই।

বাংলা দলিত সাহিত্য চর্চার একদম শুরু শুরুর দিকে লেখক হরেন্দ্রনাথ ভক্তের লেখা একটি বই আমরা পাই। বইটির নাম *দলিতবাদের রূপ ও স্বরূপ* (প্রথম খণ্ড), যার প্রকাশকাল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুরের আম্বেদকর রিসার্চ সেন্টারের অন্তর্গত দলিত প্রকাশনী থেকে। সঙ্গত কারণেই বইটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বইয়ের নাম *জাতিভেদ*, লেখক শ্রী দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। বইটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ। দলিত প্যান্থার, দলিত সাহিত্য আন্দোলনের বহু আগে লিখিত আলোচ্য এই বইটির উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ—

> বহুশত বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে যাহারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে চিরবঞ্চিত, সমাজের সর্ব্বস্ব হইয়াও যারা হেয়, অবজ্ঞাত, নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত, ভগবানের দীন-প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ সেই কোটি কোটি ভ্রাতৃগণের শ্রীকরকমলে আমার বহু সাধনার “জাতিভেদ” অর্পিত হইল।

বইটির অধ্যায়গুলির কয়েকটি তুলে ধরলে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিসরে বইটির গুরুত্ব অনুধাবনে সুবিধা হবে। আর্য্য হিন্দুজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ, গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ, জাতিভেদোৎপত্তির কারণ, সঙ্করবর্ণ, শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার, সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন ইত্যাদি অধ্যায়ে তিনি নির্মোহভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কাটাছেঁড়া করে বর্ণভেদের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বইটির

গুরুত্ব আজকের সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* (১৯৮৯) নামক বইটি। দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) সম্পাদিত *দলিত* (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭) বইটি মহারাষ্ট্রের দলিত প্যান্থার আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও দলিত তাত্ত্বিক অর্জুন ডাঙলে সম্পাদিত *পয়জনড ব্রেড* (১৯৯২) নামক দলিত সাহিত্য সংকলনটির অনুবাদ। সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত এই *দলিত* বইটি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের আধারে দলিত সাহিত্যকে বোঝার জন্য একটি সংগ্রহ।

২০১১ সালে 'চতুর্থ দুনিয়া' প্রকাশনা থেকে মনোহর মৌলি বিশ্বাস, শ্যামল কুমার প্রামাণিক ও অসিত বিশ্বাসের সম্পাদনায় *শতবর্ষের বাংলা দলিত সাহিত্য* (২০১১) বইটিতে বাংলার দলিত লেখকদের রচিত দলিত কবিতা, প্রবন্ধ, আত্মকথন, নাটক, উপন্যাসের অংশবিশেষ, রম্যরচনা, ছোটগল্প প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তিনশত আশি পৃষ্ঠার এই বইটি আক্ষরিক অর্থেই বাংলা দলিত সাহিত্যের পরিসরে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন।

প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোহর মৌলি বিশ্বাসের (১৯৪৩-) একাধিক প্রবন্ধের বই, যথা – *দলিত সাহিত্যের দিগ্‌বলয়* (১৯৯২), *প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি* (২০১০), *দেশভাগ ও বিশ্বায়ন পরাজিত মানুষের গল্প* (২০১৮), *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা* (২০০৭) ইত্যাদি সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলা দলিত সাহিত্যের অবস্থান, প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ ও মননসমৃদ্ধ চিন্তার রসদ জোগাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাবন্ধিক ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায় মণ্ডলের সম্পাদনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই *দলিত সাহিত্য* (২০২৩) ও *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত* (২০০৩)। বইদুটি প্রকাশিত হয়েছে একুশ শতক থেকে। বাংলার নিম্নবর্গের দ্রোহ ও প্রতিরোধের সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল ইতিহাস আলোচ্য বই দুটির ভরকেন্দ্র।

বিখ্যাত দলিত সাহিত্যিক ও দলিত তাত্ত্বিক যতীন বালা (জন্ম. ১৯৪৯) তাঁর *দলিত রচনা সংগ্রহ* (১, ২) (২০২০ ও ২০২২) বইতে বাংলার দলিত মানুষদের জাগরণের ইতিহাসকে কালানুক্রমিক ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর যে কোনো লেখাই অবশ্যপাঠ্য দলিত চিন্তা-চর্চার বৃত্তে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (১৯৯৮), ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত *বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ* (১৯৯৮) এবং সন্তোষ রানা ও কুমার রানা সম্পাদিত *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী* (২০১৮) বইগুলি বাঙালি সমাজে জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তিনটি আকর গ্রন্থ।

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ-এর (১৯৭৫-) লেখা *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক* (২০১৯), *পরিবর্ত অনুসন্ধান : রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব, বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা* (২০২২) এবং *সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ : জাতপাত, জাতি, রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ* (২০২২) বইগুলি অত্যন্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজ দলিত সাহিত্য ও দলিত সমাজকে জানার প্রেক্ষিতে।

স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জীর (জন্ম. ১৯৫২) একাধিক প্রবন্ধ দলিত সাহিত্যের উপর করা অন্যতম প্রভাবশালী কাজগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে পড়ে। অতি সম্প্রতি তাঁর এই সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করে অনুষ্টুপ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে *সমাজ রাষ্ট্র ও প্রান্তিকতা* (২০২৫) বইটি।

দলিত জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত দলিত সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের (১৯৫৬-) সম্পাদনায় *বাংলার নমঃশূদ্র* (২০২১), মনোশান্ত বিশ্বাসের *বাংলার মতুয়া আন্দোলন* (২০১৬) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কিছু বই আছে। অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিক একাধারে দলিত সাহিত্য বিষয়ক প্রাবন্ধিক, অন্যদিকে দলিত সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুবাদক। একাধিক দলিত আত্মজীবনী অনুবাদের পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেছেন, *দলিত সাহিত্য চর্চা* (২০২২) নামক প্রবন্ধ সংকলনটি। অত্যন্ত উঁচুমানের প্রতিটি প্রবন্ধই গবেষককে নতুন চিন্তার দিশা দেখাবে।

বাংলা দলিত সাহিত্যের একটি শক্তিশালী অংশ উদ্বাস্তু দলিতদের সৃষ্ট সাহিত্য। দেশভাগ, উদ্বাসন ও সেই নিয়ে দলিত মানুষদের লেখা বাংলা সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাম্প্রতিক কাজ এই সাহিত্যের ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে দুটি পথপ্রদর্শক কাজ হল হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উদ্বাস্তু* (১৯৭০) ও প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর (১৯২২-২০০০) *প্রান্তিক মানব* (১৯৯৭)। এছাড়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যথা – আশিস হীরার লেখা *উদ্বাস্তু : ইতিহাসে ও আখ্যানে* (২০১৯), এছাড়া তাঁরই সম্পাদনায় আরও দুটি গ্রন্থ *দেশভাগ ও নারী; ভাঙা দেশ নতুন গড়ন* (২০২১) ও *দেশভাগে নিম্নবর্ণ* (২০২০)।

গাঙচিল পত্রিকার কর্ণধার ও দলিত সাহিত্যিক অধীর বিশ্বাসের সম্পাদনায় একাধিক গ্রন্থ যথা *বর্ডার; বাংলা ভাগের দেওয়াল* (২০১৬), *শরণার্থী সন্তান* (২০২০)। এছাড়াও এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু দলিতের ছন্নছাড়া ভবিষ্যতের মর্মান্তিক ইতিহাস জানতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল মধুময় পালের সম্পাদনায় *মরিচঝাপি; ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস* (২০১৬) ও অর্পিতা বসুর সম্পাদনায় *উদ্বাস্তু আন্দোলন ও পুনর্বসতি; সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়* (২০১৩)।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা *দলিতের পুরাণকথা* (২০০৫) কিংবা সমৃদ্ধ দত্তের লেখা *দলিত সভ্যতা ও গুপ্ত রূপকথা* বই দুটি দলিত মানুষদের বিকল্প অথচ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নিজস্ব সংস্কৃতির কথা বলে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন দলিত সাহিত্যের পাঠক ও গবেষকদের কাছে স্বর্ণখনির মতো। *গাঙচিল*-এর 'দলিত' সংখ্যা (২০১৯), *অন্তঃসার* পত্রিকার 'দলিত ক্রোড়পত্র', *নিম্পলক* পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে দলিত সমাজ ও দলিত সাহিত্যকে মূল কেন্দ্রে রেখে। অতি সম্প্রতি কুমার রাণার সম্পাদনায় *অনুষ্টুপ* প্রকাশনা থেকে দলিত বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা (*দলিত ভারত*) প্রকাশিত হয়েছে (২০২৪)।

এছাড়াও প্রতিনিয়ত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তা উদ্রেককারী লেখা দলিত সাহিত্যের পরিসরকে প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধ করে চলেছে, যা নিঃসন্দেহে দলিত সাহিত্যের পাঠক ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

'বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: স্বতন্ত্র স্বরের সন্ধান' – শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি বাদ দিলে প্রধানত আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে অধ্যায়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপন করে আমরা কোন অধ্যায়ে কী বিষয়ক আলোচনা করেছি তা বলার চেষ্টা করছি।

'অতীত অনুসন্ধান: বিষয়ী সত্তার সংকট ও বিকল্প কৌশল'-শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে 'দলিত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত এবং প্রয়োগগত আদি উৎসটিকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে 'দাস' ও 'দস্যু', পরবর্তীকালে আর্য জনগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বাইরের জনগোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীসমূহের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে কী করে জনগোষ্ঠীয় সমাজ ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণিগুলি গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে 'শূদ্র' শব্দের উৎপত্তি, বেদ পরবর্তী যুগে শূদ্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, মহাকাব্য, স্মৃতি-সূত্র শাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র, সর্বোপরি মনুস্মৃতির সমসময়ে শূদ্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম ও জাতকে শূদ্রের ভূমিকা, কৌলীন্য যুগে শূদ্রের অবস্থান, চর্যাপদে শূদ্রের কণ্ঠস্বর বিস্তারিত ভাবে উঠে এসেছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

'প্রান্তিকের আত্মপরিচিতির সন্ধান: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'-শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় অবধি, অর্থাৎ জাত-বর্ণ ব্যবস্থার সূচনাকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে যে অবিরাম প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, সেই প্রতিস্পর্ধার কালানুক্রমিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে চার্বাক, বৌদ্ধ-জৈন ধর্মমত, মহাকাব্যের প্রান্তিক চরিত্রদের ঘুরে দাঁড়ানো, সহজিয়া দর্শন, মধ্যযুগের ভক্তি

আন্দোলন, চৈতন্য প্রভাব, গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়দের সমান্তরাল ধর্মমত, নিম্নবর্গীয়দের দ্বারা সংগঠিত একাধিক গণবিদ্রোহের বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

'সর্বভারতীয় দলিত আত্মজীবনী: বিদ্রোহের বর্ণমেলা'-শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের দলিত আত্মজীবনীগুলির প্রবণতা, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, গঠনশৈলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় আকারে সর্বভারতীয় দলিত আত্মজীবনীকে আলোচনা করারবেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। দলিত সাহিত্য সম্ভব হয়ে ওঠে যে পটভূমিতে, তার সূচনা এক বৃহৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতক থেকেই মহারাষ্ট্রে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৮-১৮৯০), অধ্যাপক এস. এস. মাতে (১৮৮৬-১৯৫৬) এবং সর্বোপরি ড. ভীমরাও রামোজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬), এবং প্রায় সমসময়েই তামিলনাড়ুর দলিতরা পেয়েছেন দলিতের 'আত্মমর্যাদা আন্দোলন'-এর জনক পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামী নায়কার (১৮৭৯-১৯৭৩)-এর মতো প্রতিস্পর্ধী নেতৃত্ববর্গকে। এই প্রসঙ্গে মারাঠি ভাষায় বিশিষ্ট দলিত সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক অর্জুন ডাঙলের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> গৌতম বুদ্ধ ও মহাত্মা ফুলে – উভয়েই এই ন্যায় শ্রেণিকাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। এটাও ঠিক তাঁদের শিক্ষা ও ভাবনা আজও অনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু ঘটনার ঐতিহাসিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, ড. আম্বেদকরই দলিত সাহিত্যের মূল নিয়ামক ও কেন্দ্রীয় পুরুষ।

দলিত আন্দোলনের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল আম্বেদকরবাদ। বস্তুতপক্ষে দশম-একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দেশের পূর্ব প্রান্তে যা শুরু হয়েছিল,

সহস্রাব্দের শেষ দিনগুলিতে পৌঁছে তা আম্বেদকর-নায়েকারদের হাত ধরে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম – সমগ্র ভারতবর্ষে। আম্বেদকরের প্রায় একশো বছর আগে বাংলার দলিত মানুষের জীবনদর্শনের প্রবাদপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) জন্মেছিলেন। কিন্তু আম্বেদকরের অনন্য সাধারন তাঁর ধারণাকে কেবলমাত্র সর্বভারতীয় পরিমণ্ডলেই নয়, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও অনস্বীকার্য করে তুলেছিল। দলিত মুক্তি ও সংগ্রামের তত্ত্বগত ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য তিনি রচনা করেছিলেন একটির পর একটি গ্রন্থ। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি লিখেছেন *কাস্টস্ ইন ইণ্ডিয়া – দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট* (১৯১৬)। *অ্যানাইহিলেশন অফ কাস্ট* (১৯৩৬), *হু ওয়ার শুদ্রজ* (১৯৪৮) ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি একটি বিকল্প পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিলেন নিপীড়িত, অস্পৃশ্য মানুষদের। চাভহাদর লেকের জলপানের বিধিনিষেধকে সম্মিলিত প্রতিবাদে ভেঙে ফেলে, *মনুসংহিতা* পুড়িয়ে দিয়ে আম্বেদকর বৈদিক ঐতিহ্য বর্জনের যে সূচনা করেছিলেন ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর, কালক্রমে তা-ই বিদ্রোহ, ধ্বংস, বর্জন, পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে দলিতদের স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে আজও প্রাসঙ্গিক।

সাহিত্যের এই ধারাটির শক্তিবৃদ্ধিতে এইভাবেই কন্নড়, তেলেগু, মালয়ালি, গুজরাতি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় রচিত দলিত সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পৃথিবীর সব দেশে, সব ভাষাতেই সংখ্যালঘু, নিপীড়িতের সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে আত্মকথা। সেই সব অপমানিত ও লাঞ্ছিত শ্রেণির আত্মকথা সঙ্গত কারণেই প্রাদেশিকতার সীমানা অতিক্রম করে সমানুভূতির বাঁধনে জুড়ে গেছে আন্তর্জাতিকতায়। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বাংলা দলিত আত্মকথন, বলা

ভালো সামগ্রিক বাংলা দলিত সাহিত্যসম্ভারকে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রয়াস হিসাবে না দেখে, সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় ও বহুমুখী প্রেক্ষাপটে রেখেই পড়তে চাওয়া হয়েছে। সেই সূত্রেই এই অধ্যায়টির অবতারনা।

'বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: সাহিত্য ও প্রতিরোধের রাজনীতি'-শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে **১৯৯২** সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'র জন্ম ও তারও অনেক আগে আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ' সূচনাপর্বের দলিত সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে একাধিক দলিত পত্র-পত্রিকার উত্থান ইত্যাদি বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।মোট আঠারোটি আত্মজীবনী, যেখানে নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, কৈবর্ত ইত্যাদি তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে, তা-ই এই অধ্যায়টির মূল ভরকেন্দ্র।

'নারী এবং দলিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্বালোকন'-শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়টিতে আমরা সার্বিকভাবে দলিত নারীর আত্মকথনে প্রবেশ করার আগে হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান এবং সেই বৃত্তের মধ্যে দলিত নারীর অবস্থান সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বুঝে নিতে চেয়েছি বিস্তারিত ভাবে। এই ক্ষেত্রে অধ্যায়টিকে আমরা বৈদিক যুগে নারী, মহাকাব্যে নারী, বৌদ্ধধর্মে নারী, বেদ পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থান, কৌলীণ্য যুগে নারী, চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা পেরিয়ে উনিশ-বিশ শতকে নারী, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী, আত্মজীবনীর জন্মকথা, প্রান্তিক নারীর শিক্ষার অধিকারের দাবীতে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে।

‘দলিত নারীর আত্মজীবনী: অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো’-শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত নারীর আত্মজীবনীগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। উঠে এসেছে প্রান্তিক নারীর শিক্ষার অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কাণ্ডারী সাবিত্রীবাঈ ফুলের সুদূর প্রসারী অবদানের কথা। নয়টি সর্বভারতীয় ভাষায় আত্মজীবনী এবং সাতটি বাঙালি দলিত নারীর আত্মজীবনী এই অধ্যায়ের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

আমরা দলিত আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনায় দলিত নারীর আত্মজীবনীকে একটি পৃথক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। কারণ, দলিত নারীরা জাত, শ্রেণি, ক্ষমতার ত্রিস্তরীয় শোষণের পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য জনিত শোষণের শিকার। বিখ্যাত দলিত তাত্ত্বিক গোপাল গুরু তাঁর ‘Women Talk Differently’ প্রবন্ধে ‘নারী’র এই পৃথক বা স্বতন্ত্র ভাবে কথা বলার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চেয়েছেন।

‘দেশভাগ ও উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী: একটি পর্যালোচনা’-শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেশভাগের প্রেক্ষাপট, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে ‘উদ্বাস্তু চর্চা’র ইতিহাস, দেশভাগে প্রান্তিক নারীর ভয়াবহ পরিণতি, দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু দলিত সমাজের উদ্বাসনের আনুপর্বিক ইতিহাস ও এরই প্রেক্ষাপটে উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করেছি। দেশভাগের প্রেক্ষিতে যখন আমরা এই দলিত সমাজের ইতিহাস অনুসন্ধান করে থাকি, তখন বুঝতে পারি দেশভাগের মধ্য দিয়ে দলিত কীভাবে আরো দলিত হয়ে ওঠে। ওপার বাংলা থেকেউঠে আসা দলিত শ্রেণির ওপর এই শোষণ এক প্রকার নিয়তি হয়ে নেমে এসেছিল, বাসযোগ্য জমি, জীবিকা ও শিক্ষার সুযোগ নিয়ে এক-

দুই প্রজন্মের মরণান্তিক সংগ্রাম, এরই পাশাপাশি থেকে দেশ হারানো ও সমাজ-সংস্কৃতি হারানোর যন্ত্রণা, আলোচ্য আত্মজীবনীগুলিকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শেষ তথা অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম – 'স্মৃতি-সত্ত্বা-স্বর: আত্মজীবনীর নির্মাণ ও ইতিহাসচর্চার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক'। এই অধ্যায়টিতে আমরা প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময় থেকে উপনিবেশের অধীনস্থ পর্ব পেরিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্বে ইতিহাসচর্চার বিবর্তনকে কালানুক্রমে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছি এই সামগ্রিক পরিসরে প্রান্তিক মানুষের ইতিহাস ও তাঁদের আত্মকথন কীভাবে ও কোন সময় থেকে তার স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করে নিয়েছে। কীভাবে প্রায় মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ আকারে মৌখিক ইতিহাস, আত্মস্মৃতি প্রায় সমান্তরালে চলাচল করে এক বিকল্প ইতিহাসের নির্মাণ করেছে।

'উপসংহার'-শীর্ষক অংশটিতে আমরা বর্তমান সময়ের নয়া উদার নীতিবাদ অর্থনীতি ও দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদের মধ্যেকার উভয়সংকটের মধ্যে পড়ে যে প্রান্তিক শ্রেণি ক্রমশ প্রান্তিকতর হতে থাকল, আত্মকথনের মতো প্রতিরোধের অস্ত্র তাদের জন্য কী আদৌ কোনো নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে, জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার হারিয়ে আদিবাসীদের যে ক্রমবর্ধমান বিপন্নতা, তাকে কি কোনো শক্তি জোগাতে পারে, এইরকম বেশ কিছু প্রশ্নকে ঘুরে ফিরে দেখতে চেয়েছি।

উপসংহারের পর সংযুক্ত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি। সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে আকর গ্রন্থ, বাংলা সহায়ক গ্রন্থ, ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ, বাংলা পত্র-পত্রিকা, অভিধান গ্রন্থ, বৈদ্যুতিন তথ্য প্রভৃতি বিষয় এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

অতীত অনুসন্ধান: বিষয়ী সত্তার সংকট ও বিকল্প কৌশল

প্রথম অধ্যায়

অতীত অনুসন্ধান: বিষয়ী সত্তার সংকট ও বিকল্প কৌশল

'দলিত' শব্দটির বর্তমান ধারণা যা প্রধানত ১৯৭৩ সালে দলিত প্যান্থর্স-এর ইশতেহার থেকেই ব্যাপক অর্থে প্রচলিত হয়েছে, তা মূলত সাম্প্রতিক কালের ব্যবহার। সংস্কৃতে 'যাকে দলন করা যায়' এমন একটি সাধারণ অর্থ থেকে দলিত শব্দটির উৎপত্তি। এর সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে জাতপাতের আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক প্রতিবর্গীকরণের কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর মানে এই নয় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে নিম্নবর্গীয় সমাজ সম্পর্কিত কোনো ধারণা ছিল না। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আজকে যাকে 'দলিত' বলা হচ্ছে, তার মূল প্রোথিত আছে এ দেশে আর্য আগমণের সেই শুরুর সময় থেকে। সময়ের বিভিন্ন স্তরে পরিশীলিত হয়ে যা আজকেও এক সামাজিক দুরারোগ্য ব্যাধি হিসাবেই রয়ে গেছে। এই অধ্যায়ে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্ 'দলিত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত এবং সামাজিক প্রয়োগগত আদি উৎসটিকে খুঁজে দেখা। কারণ, সমাজজীবনে দুষ্ট ক্ষতের মতো থেকে যাওয়া এই রোগের আদিসূত্রেই রয়েছে সমগ্র বিষয়টির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা।

সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শতকে আর্যরা মধ্য প্রাচ্য থেকে বিভিন্ন সময়কালে বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। আর্যদের আদিগ্রন্থ বেদ, যা তারা এ দেশে নিয়ে এসেছিল। তারা হয়তো শেষমেশ খ্রিস্টপূর্ব বারো শতকের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে এখানে এসে পৌঁছায়। আর্যরা যখন মধ্য প্রাচ্য বা ইরান থেকে আসে, তখন চাষের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলেও ওই দীর্ঘ পথ তারা পশুচারী যাযাবর

হিসাবেই আসে; সেখানে শ্রমের কোনো বিভাজন সম্ভবত ছিল না। আর্যদের শুরুর সময় সম্পর্কে প্রধান এবং প্রায় একমাত্র সূত্র হল বেদ।[১]

বেদ চারটি (ঋক, সাম, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) প্রত্যেকটি আবার চারটি অংশে বিভক্ত: সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ অংশটি সম্পূর্ণ গদ্যে রচিত। যজ্ঞ কেন ও কীভাবে করতে হবে তাই এর মূল আলোচিত বিষয়। আরণ্যক আর উপনিষদের অনেকটা অংশই প্রশ্নোত্তর আকারে লিখিত। *অথর্বসংহিতায় ঋগ্বেদ* -এর কিছু সূক্ত ছাড়াও লোকায়ত বিশ্বাস এবং ধর্মচারণ নিয়ে অনেকটা প্রসঙ্গ আছে। যেমন কবচ, মাদুলি, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির প্রয়োগ এবং প্রতিবিধান। ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা *অথর্ববেদ* থেকেই। *অথর্ববেদ*-এর শেষ পর্যায়ের সূক্তগুলি যখন রচনা হচ্ছিল, তখন আর্যরা বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল পেরিয়ে বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পৌঁছেছিল। তাই, বাংলার জলা-জমিতে সহজেই হয় এমন সব রোগের নাম পাওয়া যায় *অথর্ববেদ*-এ। সেদিক থেকে *অথর্বসংহিতা* বৈদিক সাহিত্যের শেষতম অংশের ভূগোল, সমাজ, ধর্মবোধ ও আচরণের একটি সামাজিক দলিলও বটে।[২]

আর্যদের যজ্ঞ ছিল প্রধানত দু' ধরনের: নিত্য এবং নৈমিত্তিক। যেমন অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কয়েকটি ছোটোখাটো দৈনন্দিন যজ্ঞ, যা ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে, মূলত ছিল নিত্য পালনীয় কর্তব্য। আর বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিস্তৃত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, তা হল নৈমিত্তিক। প্রথমদিকের যজ্ঞে আড়ম্বর ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। কারণ পশুচারী আর্যরা পশুচারণের মধ্যেই একটা সময় বের করে সংক্ষেপে যজ্ঞ করে নিত। যজ্ঞের প্রার্থনার তালিকায় ছিল পশুপালের বৃদ্ধি, নিরপত্তা, মানুষের পরমায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং পশুপাল ও সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য একাধিক প্রার্থনা। এর থেকে বোঝা যায় যে,

পশুপালনই তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার একট বড়ো উপায় ছিল। বহু সন্তান থাকলে শত্রুর সামনে লোকবলের জোর হত, তাই পশুর বৃদ্ধি, সন্তানের জন্ম, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দেবতার দ্বারস্থ হত ভক্তরা। এছাড়া ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদিতে হঠাৎ করে পশুকুল কিংবা মানুষের বিপদ যাতে না আসে তার জন্যও বিস্তর প্রার্থনা আছে। সংহিতার মূল কথা হল নীরোগ, স্বাস্থ্যবান, ধনবান, বিজয়ী ও পশুমান হয়ে মানুষ যাতে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকে।[৩]

ভারতবর্ষে পৌঁছে প্রথমদিকে যুদ্ধ করে পায়ের নীচের মাটিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও তার পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বাস করে ক্রমে তাদের তরুণ, তরুণীদের বিয়ে করে মিশ্র একটি জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এসবে আর্যদের বিস্তর সময় লেগেছিল।

ঋগ্বেদ-এর ব্রাহ্মণে স্বর্গ, নরক, পরলোকের কথা নেই বললেই চলে। তখনকার সমাজ ছিল মূলত পুরুষতান্ত্রিক। পরবর্তীকালে যখন আর্যরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকল, সে সময় থেকে নতুন নতুন সমাজের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, সামাজিক রীতিনীতির বেশ কিছু গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। যজুর্বেদের যুগ থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজ ব্যবস্থা মাঝে মাঝেই মহামারী, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, বিদেশি শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হত। এরই ফলে দেবতার সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকল। দেবতার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেলে, সেই হারে দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল হতে থাকল যজ্ঞ। প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে যজ্ঞের দক্ষিণা।

ঋগ্বেদ থেকে *যজুর্বেদ*-এর যুগে সেনাপতি, দলপতি কিংবা গোষ্ঠীপতিরাই শাসনকাজ পরিচালনা করত। তখন গোষ্ঠীগুলি ছোটো ছোটো কৌমে বিভক্ত ছিল। শাসন কাজে সহায়তার জন্য ছিল সভা ও সমিতি। এগুলি কেবলমাত্র পুরুষের সমাবেশ, নারীর প্রবেশ সেখানে স্বভাবতই নিষিদ্ধ ছিল। গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ ছিল সমিতির সদস্য, আর সভা গঠিত হত গোষ্ঠীর মধ্যে বয়স্ক, অভিজাত এবং প্রতিষ্ঠিত পুরুষদের সমাবেশে। এই ছিল মোটের ওপর বৈদিক সংহিতার যুগে সমাজের ছবি। শীর্ষে ছিলেন দেবতারা, তার নীচে পিতরঃ। যারা মারা গেছেন সেই পিতৃপুরুষদের বলা হত পিতরঃ। পিতরঃ ক্রমে ক্রমে দেবতা হয়ে ওঠেন। একইভাবে পিতৃক্রিয়াও বেশ প্রয়োজনীয় একটি অনুষ্ঠান। পিতরঃ-এর নীচে উপদেবতা (যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরা), তার পরে মানুষ। তারও পরে রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, দৈত্য, দানব এইসব। মানুষের চেয়ে শক্তিমান, কিন্তু এরা ছিল মূলত অপশক্তি।[৪]

বৈদিক সাহিত্যে 'দাস' ও 'দস্যু'

ঋগ্বেদ -এ 'আর্য' শব্দটি এসেছে মোট ছত্রিশবার। এর মধ্যে গোড়াতে আবার আর্যদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতার উল্লেখও আছে। গোড়ার দিকে আর্যদের নিজেদের মধ্যে সংঘাতের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল দশরাজ যজ্ঞের বর্ণনা। *ঋগ্বেদ*-এ ৭। ৩৩ সূক্তে এই সংঘাতের কথা আছে। দশ রাজার যুদ্ধ মূলত ঋগ্বেদীয় আর্যদের দুটি প্রধান শাখা পুরু ও ভারতের মধ্যে সংঘাত। সম্ভবত অনার্যরাও এই যুদ্ধে সহযোগী ছিল। ভারতের নেতা ছিলেন *ঋগ্বেদে* বিখ্যাত নায়ক সুদাস আর তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ঋষি বশিষ্ঠ। তাঁদের শত্রুপক্ষে ছিলেন দশজন রাজা। এদের মধ্যে পাঁচজন হ্লেন অণু, দ্রুহ্য, মদু, তুর্বসু এবং পুরু। এই পাঁচজন পাঁচটি সুপরিচিত জনগোষ্ঠীর নেতা। বাকি পাঁচজন হলেন স্বল্প পরিচিত:

অলিন, পক্থ, ভলান, শিব এবং বিষাণী। বিরোধী গোষ্ঠীয় যোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র আর তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরুরা। সম্ভবত এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রতর আর্য জনগোষ্ঠীগুলির পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার এক স্মরণীয় প্রয়াস। কিন্তু সুদাসের নেতৃত্বে ভারতরা পরুষ্ণি নদীর তীরে পুরুদের চূড়ান্ত পর্যুদস্ত করে।[৫]

ঋগ্বেদ-এ 'দাস' এবং 'দস্যু' এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনটি কতবার এসেছে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী তাঁর *বৈদিক কোষ* গ্রন্থে জানিয়েছেন 'দস্যু' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় চুরাশি বার, এবং 'দাস' শব্দটি এসেছে একষট্টি বার। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, ঋগ্বেদীয় সমাজ শুরুর সময় কিন্তু শ্রমের সামাজিক বিভাজনের ওপর গঠিত হয়নি। এমনকি আর্থিক সামর্থ্যের ওপরেও নয়। সে সময় সমাজ গঠিত হয়েছিল জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, কুল এসবের ভিত্তিতে। সে সময় জ্ঞাতিভিত্তিক একক বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত নানা শব্দের হদিশ প্রায়ই পাওয়া যায়। 'জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় দু'শো পঁচাত্তর বার। আর 'বিশ্' প্রায় একশো সত্তর বার। একইভাবে 'গণ' এবং 'ব্রাত্য' শব্দ দুটিরও প্রায়ই প্রয়োগ দেখা যায়। ধারণা করা যায়, এইসব একক বেশ বড়োই ছিল। কারণ 'কুল' শব্দটি ঋগ্বেদে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একবারই, তাও 'কুলপা' শব্দের অংশ হিসাবে। আদিতে 'কুল' শব্দের অর্থ ছিল পরিবার, পরে পালটে হয় অভিজাত পরিবার।[৬]

এইভাবে দেখলে আর্য এবং দাসদের মধ্যেকার লড়াইকে মনে হবে মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবনযাপনকারী বৈদিক জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সংঘাত। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো *ঋগ্বেদ*-এর বহু সূক্ত অর্থর্ব্বেদেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এর আদিতে দেবতা ছিলেন মিত্র, বরুণ, ও সোম এই তিনজন। বরুণকে সামাজিক

বিধানের রচয়িতা বলা হয়েছে। সে সময় ইন্দ্রপ্রথার যুগ আসেনি। পরের দিকে যখন রাষ্ট্রনীতির ওপর ঝোঁক এল, তখন বৈদিক কবিরা আগে যে শ্লোক বরুণের উদ্দেশে রচিত হয়েছিল, হুবহু সেই শ্লোকে বরুণের জায়গায় ইন্দ্র কথাটা লিখে দিয়েছিলেন। এগুলি সে সময়ের রচনা যখন ইন্দ্র দাসেদের জয় করেছিলেন। এই দাসেদের বহুলাংশে মানুষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ইন্দ্র এই নীচ দাসবর্ণকে গুহায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ('যেনেমা বিশ্বা চব্যনা কৃতানি, যে দাসং বর্ণ্মধব; গুহকঃ।' *ঋগ্বেদ* (২।১২।৪)। এই প্রসঙ্গে খেয়াল করব— ইন্দ্রকে আহ্বান করে বলা হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হিসাবে তিনি যেন দাসেদের বশ্যতা স্বীকার করানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। *ঋগ্বেদ* -এর একাধিক সূক্তে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনায় দাস 'বিশ্'গুলিকে পরাস্ত করার জন্য বার বার তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে (২।১১।৪; ৬।২৫।২ এবং ১০।১৪৮।২)। এখানে আরও বলা যায় যে *ঋগ্বেদ* -এর ৪।২৮।৪ নম্বর সূক্তে ইন্দ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে এমনভাবে, যেন তিনি দস্যুদের সমস্ত গুণ কেড়ে নিয়েছেন আর দাসেদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন। দাসেদের চেয়ে দস্যুদেরই ইন্দ্র বেশি ধ্বংস করেছেন এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন। *ঋগ্বেদ* -এর ৩।৩৪।৯; *অথর্ববেদের* ২০।১১।৯ সূক্তে বলা হয়েছে ইন্দ্র দস্যুদের হত্যা করে আর্য বর্ণকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে (*ঋগ্বেদ* ১।১০৩।৩; *অথর্ববেদ* ২০।২০।৪) তিনি যেন আর্যদের শক্তি বাড়াবার জন্য দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কৌতুহলের বিষয় হল যে দস্যুদের হত্যার অন্তত বারোটি উল্লেখ আছে যার অধিকাংশই ইন্দ্রের কীর্তি। অন্যদিকে দু'-চারজন দাস হত্যার উল্লেখ থাকলেও 'দাসহত্যা' শব্দটির কোনো প্রয়োগ নেই। এইসব উল্লেখের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে দস্যুদের ক্ষেত্রে আর্যরা

নির্মমভাবে বিলুপ্ত করার নীতি গ্রহণ করলেও দাসেদের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত।

দস্যুদের জীবনযাত্রার ধরন আর্যদের আরও বিরূপ করে তুলেছিল। আর্যদের জীবনযাত্রার ধরন ছিল গোষ্ঠীগত। তারা ঠিক স্থায়ীভাবে বসবাস করত না। তাদের জীবনযাপনের নীতি ছিল গো-পালন। এর সঙ্গে দেশজ গ্রাম ও নগর জীবন একেবারেই খাপ খেত না। আর্যদের এই গোষ্ঠীগত জীবনের প্রকাশ দেখা যায় নানান সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেমন 'গণ', 'সভা', 'সমিতি' ইত্যাদিতে এবং 'বিদ্থ' যাতে যজ্ঞের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সেসবের মধ্যে। *ঋগ্বেদ* -এর সপ্তম মণ্ডলের একটি সম্পূর্ণ সূক্তে (৭।৬।৩) দস্যুদের সম্পর্কে অক্রতূন, অশ্রদ্ধাবান, অযজদান ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে দস্যুদের অ-যজ্ঞীয় চরিত্রই প্রকট হয়। যজ্ঞকারী আর্য ও অ-যজ্ঞকারী দস্যুদের মধ্যে ইন্দ্রকে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে। আর্যদের চোখে দস্যুরা ছিল মায়াবান, অর্থাৎ অশুভ জাদুতে পারদর্শী। বিশেষত অর্থব্বেদে এই ধরনের বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে দস্যুদের দেখানো হয়েছে দুরাত্মা হিসাবে। যজ্ঞ থেকে যাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানো দরকার (*অর্থববেদ*, ১২।১।৩৭)। *ঋগ্বেদ* -এর ১০।২২।৮ সূক্তে দেখা যায় দস্যুরা বিশ্বাসঘাতক, তারা আর্য রীতিনীতি মানে না। তারা প্রায় অমানুষ।

আর্য এবং দস্যুদের জীবনযাত্রার পার্থক্য আরও প্রকট হয় আর্য 'ব্রত' সম্পর্কে দস্যুদের অবস্থান নিয়ে। সাধারণভাবে 'ব্রত' মানে বিধিবিধান বা অনুশাসন। 'ব্রাত' মানে জনগোষ্ঠী বা বাহিনী। 'ব্রত' এবং 'ব্রাত' শব্দ দুটির মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে ব্রত শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সম্ভবত জনগোষ্ঠীর বিধি বা রীতিনীতি। দস্যুদের সাধারণত 'অব্রত' বা 'অন্যব্রত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অপব্রত' শব্দটিও ব্যবহার করা

হয়েছে দু' জায়গায়। সম্ভবত এটি দস্যু ও ভিন্নমতের আর্যদের প্রতি প্রযুক্ত (*ঋগ্বেদ্* ৫।৪২।৯; ও ৫।৪০।৬-এ 'অপব্রত' শব্দটি কৃষ্ণত্বের সমর্থক)। লক্ষণীয় যে 'দাস'দের প্রতি এই ধরনের কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়নি। এর থেকে আবার আভাস পাওয়া যায় যে, দস্যুদের থেকে দাসদের জীবনপ্রণালী আর্যদের সঙ্গে মিলত অনেক বেশি।[৭]

পরবর্তীকালে আর্য জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বাইরের জনগোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে কী করে জনগোষ্ঠীয় সমাজ ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণিগুলি গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে। স্বল্প পরিসরে বলা যেতে পারে, *ঋগ্বেদ* -এ 'বর্ণ' শব্দটি 'আর্য' এবং 'দাস' ('দেবাসো মনুং দাসস্য শম্মন্তে ন আক্যন্ত্ সুবিতায় বর্ণম', ১।১০৪।২; ৩।৩৪।৯) উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও শব্দটি কোনো শ্রম বিভাজনের ইঙ্গিত দেয় না। কিন্তু এই শ্রমবিভাজনই পরবর্তীকালে ব্যাপক ভাবে হয়ে ওঠে সামাজিক শ্রেণিগুলির ভিত্তি। 'আর্য' এবং 'দাস' বর্ণ ছিল দুটি বড়ো জনগোষ্ঠীয় দল। যেগুলি তখন ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছিল। *ঋগ্বেদ* -এ কোনো জাতির কথা নেই, কিন্তু এই সংহিতা থেকে ধারণা করা হয় ধীরে ধীরে অভ্যুদীয়মান শ্রেণিগুলি এই পর্বে ভ্রূণাবস্থায় ছিল। ব্রাক্ষণ শব্দটি এসেছে পনেরো বার, আর ক্ষত্রিয় শব্দটি এসেছে নয় বার। তা সত্ত্বেও 'জন' আর 'বিশ্' শব্দ দুটির পুনরাবৃত্তি ('জন' শব্দটি প্রায় দুশো পঁচাত্তর বার উল্লেখ আছে, আর 'বিশ,'-এর উল্লেখ আছে একশো সত্তর বার) এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি থেকে মনে হয় যে ঋগ্বেদীয় সমাজের চরিত্র ছিল মূলত জনগোষ্ঠীয়।

পরবর্তীকালে অনেক সময় দস্যুদের সঙ্গে দাসদের গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই দাস ও দস্যু এই সংশয়ের সমাধান করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে 'দস্যু-হত্যা' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও 'দাস-হত্যা' শব্দটি নেই। আর্য জনগোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যে

যুদ্ধে সহকারী সেনা হিসাবে দাসেদের উপস্থিত থাকলেও 'অপব্রত' 'অন্য ব্রত' ইত্যাদি প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত। তাছাড়া 'দাস-বিশ্' শব্দটি তিন জায়গায় উল্লেখ আছে (*ঋক্‌বেদ* ২।২১।৪, ৪।২৮।৪, ও ৬।২৫।২)। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *Studies in Indian Social Polity* (১৯৪৪) গ্রন্থে মত দিয়েছেন ঋক্ ৬।২৫।২-এ দাসের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, দাসেরা সে সময় বৈশ্যদের মর্যাদা পেত। অপরদিকে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* গ্রন্থে জানিয়েছেন বৈশ্যরা যেহেতু তখনও সামাজিক শ্রেণি হিসাবে ছিল না, ফলে 'বিশ্'কে গোষ্ঠীরূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।[১৩] সর্বোপরি শকদের একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী, ইরানীয় 'দহ'দের সঙ্গে 'দাকা'দের শনাক্তকরণ এমনটা নিশ্চিত করেছেন অধ্যাপক শর্মা। এই যুক্তি-প্রমাণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে দাস আর দস্যু এক নয়। যদিও আকৃতিগত দিক থেকে উভয়ের সঙ্গে আর্যদের প্রায় কোনো মিলই নেই। ঐতিহাসিক শেফার তাঁর *Ethnography of Ancient India* (১৯৫৪) গ্রন্থে বলেছেন দস্যু ভিলদের ঊর্ধ্বে আর দাস ও আর্যরা একই সামাজিক স্তরে ছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে 'দস্যু'র কোনো সবর্গ শব্দ নেই। প্রাচীন পারসি এবং আবেস্তীয় ভাষায় আমরা 'দহ্যু' শব্দটি পাই, কিন্তু তার অর্থ জনবসতি, 'জেলা, দেশ, ভূমি' এইসব। বিপরীতে সংস্কৃতে 'দস্যু' শব্দটি ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক নয়। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* গ্রন্থে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা বলেছেন 'দাস'রা সম্ভবত ছিল মিশ্র, ইন্দো-আর্যজাতির এক অগ্রবাহিনী। কাসাইটরা যে সময় ব্যাবিলোনিয়ায় (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০) আসে, আর্যরা প্রায় সেই সময়েই ভারতে এসেছিল এমনটা অনুমান করা হয়। উত্তর পারস্য থেকে নানা মানবগোষ্ঠী ভারতের দিকে এসেছিল নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, অথবা এসেছিল দুটি মূল ধারায়। তাদের আগমন প্রথম শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের অল্প কিছু পরেই। সে সময় 'দাস'রা ছিল ঋগ্বেদীয়

মানবগোষ্ঠীর ভাষা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের অংশ। তাই তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলাই ছিল ঋগ্বেদীয় মানবগোষ্ঠীর নীতি। দিবোদাস, বল্‌বূথ ও তরুক্ষের মতো দাস অধিপতিদের তারা অনায়াসেই নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। এই কারণেই আর্য জনগোষ্ঠীগুলির আন্তঃ সংঘাতের সময় দাসদের প্রায়শই আর্যদের মিত্র হিসাবে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় যে 'দাস' শব্দটি ইন্দো-আর্যদের স্বজাতীয় মানবগোষ্ঠীর থেকে উদ্ভূত, ভারতের অনার্য অধিবাসীদের থেকে নয়। সম্ভবত ঋগ্বেদের পরবর্তী পর্বে দাস শব্দটি নির্বিচারে ব্যবহার করা শুরু হয়। মূলে ইন্দো-ইউরোপীয় 'দাস'দের মধ্যে তখনও যারা জীবিত ছিল, এই শব্দটি দিয়ে শুধু তাদেরই বোঝানো হত। কেবল তাই নয়, প্রাগার্য দস্যু, রাক্ষস জাতীয় লোক এবং সেই শ্রেণির আর্য যারা ইতোমধ্যে গরিব হয়ে গেছে, অথবা স্বগোষ্ঠীয় অন্তঃকলহের দরুন যাদের বশীভূত করে ফেলা হয়েছে— তাদেরও 'দাস' বলে বোঝানো হত।[৮]

মূলত, ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এর সদস্যদের মধ্যে প্রখর শ্রেণি বিভাজন ছিল না। সাধারণত, আদি জনগোষ্ঠীর সমাজগুলির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ঐতিহাসিক লান্টমান তাঁর *The Origin of the Inequality of Social Classes* (১৯৩৮) গ্রন্থে দেখিয়েছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা ও কুকিদের মধ্যে শ্রেণি প্রথা নেই। এই আদিম জনগোষ্ঠীয় সমাজে মর্যাদাভেদ হয়তো ছিল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণি ছিল না। *ঋগ্বেদ* -এর ৮।৫।৩৮ সূক্তে দেখা যায় কামার (কর্মার), ছুতোর (তক্ষণ), মুচি (চর্মম্ন) তাঁতি ও অন্যান্য অনেক বৃত্তি সে সময় ছিল যথেষ্ট মর্যাদার। কিন্তু আর্য কারুশিল্পীদের বহু বংশধর, যারা তাদের পুরোনো বৃত্তিতেই থেকে গিয়েছিল, তাদের যে শূদ্রের পর্যায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তিন উচ্চবর্ণের সেবার ভারপ্রাপ্ত একটি সামাজিক শ্রেণি হিসাবে শূদ্রদের প্রথম কখন দেখা দিল? চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীনতম অনুমানটি হল *ঋগ্বেদ* -এর 'পুরুষ সূক্ত'। আদি স্রষ্টা, যিনি ওই সূক্তটিতে 'পুরুষ' বলে অভিহিত, তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ থেকে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। 'পুরুষের মুখ হল ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় রাজন্য (লক্ষণীয় শব্দটি ক্ষত্রিয় নয়), উরুদ্বয় বৈশ্য এবং দুই পা থেকে জাত হল শূদ্র। 'ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যকৃত উরুতদস্যযদ্বৈশ্য পড্যাং শূদ্রোহজায়ত' (*ঋগ্বেদ* ১০।৯০)।

এই একই সূক্তটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে *অথর্ববেদের* ঊনবিংশ কাণ্ডে (*অথর্ব* ১৯।৬।৬)। ওই একই কাণ্ডের আরও দুটি অংশে সম্ভবত চতুর্বর্ণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে[১৮] (*অথর্ব* ১৯।৩২।৮) 'দর্ভ' (ঘাস)-এর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে: তিনি যেন অর্চনাকারীকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও আর্যদের কাছে প্রিয় করে তোলেন। এখানে 'আর্য' শব্দটি সম্ভবত বৈশ্য অর্থে বসেছে। দ্বিতীয় অংশে (*অথর্ব* ১৯। ৬২। ১) দেবতা, রাজা, তথা শূদ্র ও আর্য উভয়েরই প্রিয় হওয়ার বাসনা প্রকাশ করা হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান এই ঊনবিংশ এবং বিংশ কাণ্ড অথর্ববেদের মূল সংহিতার পরিশিষ্ট। ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত' শেষের দিকের রচনা। *অথর্ববেদ*-এও এটি আছে সর্বশেষ অংশে। ইতিহাসবিদ হুইট্‌টি তাঁর 'হাভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ়'-এ পুরুষসূক্তের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব আটশো শতকের পরবর্তীকালে হওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন। ঋগ্বেদীয় পর্বেই শ্রম বিভাজন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একই পরিবারের লোকে কবিই, ভিষক এবং উপলপ্রক্ষিণী (জাঁতায় যব ইত্যাদি পেশা) হিসাবে কাজ করলেও তাদের মধ্যে কোনো সামাজিক বিভাজন ছিল না (*ঋগ্বেদ* ৯।১১২।৩)। *অথর্ববেদ*-এ অবশ্য শেষ দিকে কর্ম বিভাজন এবং জনগোষ্ঠী ও পরিবার গোষ্ঠী ক্রমে সামাজিক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে

গেল। সম্ভবত, তখনই শূদ্র জনগোষ্ঠী, বা আর্যদের যে অংশ দাসসুলভ কাজ করত, তাদের স্থান নির্ধারিত হল চতুর্থ বর্ণে। ফলে আমরা বলতে পারি সামাজিক শ্রেণি হিসাবে শূদ্রদের আবির্ভাব *অর্থববেদ*-এর শেষ দিকে, যখন 'পুরুষসূক্ত' ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল থেকে অনুপ্রবিষ্ট করা হল সেই সময়। ঠিক এর পর পরই বর্ণ ব্যবস্থার স্পষ্টতর রূপ দেখা গেল পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য সম্ভারে (সাম, যজুর্বেদ অথর্ব সংহিতা ত্রয়, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকগুলিতে); যেগুলি বৈদিক ঐতিহ্যবাহী, অথচ অপৌরুষেয় শ্রুতিপদবাচ্য নয়। আর তখন থেকেই সামাজিক রীতিনীতির কঠোরতা বাড়ল বহুগুণে। সূত্র সাহিত্যে, বিশেষত ধর্মসূত্রগুলিতে বৈদিক ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থার উচ্চাবচক্রম বজায় রাখার জন্য বিধি-নিষেধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিল। এর লক্ষণগুলি হল: ১) বর্ণ নির্দিষ্ট হবে জন্ম দ্বারা; ২) ব্রাহ্মণের বর্ণশ্রেষ্ঠ হিসাবে দাবি ও স্বীকৃতি; ৩) উচ্চতর তিন বর্ণকে দ্বিজ (অর্থাৎ উপনয়নের অধিকারী) বলে ঘোষণা; ৪) সবর্ণ বিবাহ (অর্থাৎ আন্তঃ বিবাহ)-এর উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ; ৫) গোত্রান্তরে বিবাহের (বহির্বিবাহ)-এর উপর ক্রমবর্ধমান বিধি; ৬) নারীর নাবালিকা পর্যায়ে বিবাহ অনুমোদনের মাধ্যমে এবং স্বামীকে ছায়াবৎ অনুগমন করার আদর্শ (ছায়বানুগতা)-র দ্বারা নারীর সামাজিক মর্যাদার ক্রমাবনতি। সূত্র সাহিত্য (সম্ভাব্য রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ কিংবা পঞ্চম শতক থেকে দু'শো খ্রিস্টপূর্ব) তাই বর্ণ ব্যবস্থায় কেবলমাত্র একটি সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতিষ্ঠান নয়, চতুরাশ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস) ক্রমপর্যায়ে তিন দ্বিজ বর্ণের জীবন অতিবাহিত করার অনুশাসন। এইসব মিলিয়েই (চতুরাশ্রমে শূদ্রের কোনো অধিকার নেই) বর্ণাশ্রম ধর্ম হয়ে উঠল রাজতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থার মতাদর্শ। সূত্র সাহিত্যের পরিণত রূপটি দেখা যাবে সুবৃহৎ স্মৃতি, অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। যার প্রতিনিধিস্থানীয় অবস্থানে আছে মনুসংহিতা, যজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি

এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব। তার ওপর *মনুসংহিতায়* দেখিয়ে দেওয়া হল যে, পঞ্চম বর্ণ বলে আদৌ কিছু নেই।[৯] প্রসঙ্গত প্রান্তিক হওয়া নিছক কাকতালীয় কোনো বিষয় নয়। প্রান্তিক হওয়ার মধ্যে একটা প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া আছে। কোনো জনগোষ্ঠীকে 'অপর' হিসাবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াটিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়। সমাজের কোনো বিশেষ অংশের মানুষের প্রান্তিকীকরণের জন্য, তাদের পৃথক পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যেও এই প্রক্রিয়া সমানভাবে কাজ করে। নাগরিকত্ব নাকচ করার কারণে কিংবা স্বদেশ থেকে নির্বাসনের উদ্দেশ্যেও এমন বিভাজন ঘটে থাকে। যার স্পষ্ট উদাহরণ আধুনিক পৃথিবীতে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে শরণার্থীতে পরিণত করা। ভিন্ন ভূগোল এবং সংস্কৃতি থেকে আগত মানুষদেরই শুধু 'অপর' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে এমনটা নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি করে, প্রায় বিস্ময়কর মাত্রায় 'অপর' উঠে এসেছে একই সমাজ থেকে।

ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আর্য ভাষাগুলির ব্যপ্তি থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, এক সময় আর্যভাষীরা চারদিকে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য বৈদিক যুগ থেকেই অনেক প্রোটো মুন্ডা এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠী শব্দ ঢুকে গেছে। *মহাভারত* -এর একটি কাহিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখত করা যায়। শান্তিপর্বের 'বর্ণশ্চত্বার ত্রাতে হি যেষাং ব্রহ্ম সরস্বতী বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্বা লোভাং ত্বজ্ঞানতাং গতঃ' শ্লোকের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে ব্রহ্মা প্রথমে চার বর্ণের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন সরস্বতীকে, বেদ যার অন্তর্গত। কিন্তু শূদ্ররা তাদের লোভের কারণে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পতিত হয় এবং বেদের অধিকার হারায়। অর্থব্বেদের গোড়ার দিকে শূদ্রদের তিনটি উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটিতে অর্চনাকারী একটি ওষধির সাহায্যে আর্য বা শূদ্র সবাইকে দেখতে

চাইছে, যাতে সে পিশাচকে খুঁজে বের করতে পারে (‘তয়াহং সর্ব পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য’ *অথর্ববেদ* ৪।২০।৪)। এই শ্লোকে কিন্তু ব্রাহ্মণ বা রাজন্যের কোনো উল্লেখ নেই। এখানে প্রশ্ন আসে ওই উল্লেখিত ‘আর্য’ বা ‘শূদ্র’ কি কোনো সামাজিক শ্রেণির (বর্ণ) প্রতিভূ? না কি দুটি জনগোষ্ঠী? অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* গ্রন্থে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। তিনি বলেছেন পূর্বে যেটা ছিল আর্য আর দাস-দস্যুর বিরোধ, পরবর্তীতে তার স্থান নিয়েছিল আর্য-শূদ্র বিরোধ।

অথর্ববেদ-এ গোড়ার দিকে একটি জনগোষ্ঠী হিসাবেই শূদ্রদের কথা বলা হয়েছে। ৫।২২।৭ ও ৫।২২।৮ সূক্তে ‘তক্‌মা’ জ্বরকে বলা হয়েছে সে যেন মূজবন্ত, বল্‌হিক এবং মহাবৃষদের সঙ্গে একটা কুলটা শূদ্রাকেও আক্রমণ করে। সম্ভবত এরা সবাই উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাস করত। মহাভারতে ‘শূদ্রাভীরাথ দরদাঃ— কাশ্মীরা পশুভিঃ সহ’ শ্লোকে দেখতে পাই আভীরদের সঙ্গে শূদ্র জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের কথা। অর্থব্বেদের ৫।২২।১২ সূক্তে আবার এও ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ওই জ্বর (তক্‌মা) যেন বিদেশিদের আক্রমণ করে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অর্থব্বেদের যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীগুলির প্রতি আর্যদের মনোভাব ছিল বিরূপ এবং ‘শূদ্রা’র উল্লেখ ওই পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। *পৈপ্পলাদ সংহিতা*-র সমতুল্য অংশটিতে ‘শূদ্রা’ শব্দের জায়গায় আছে ‘দাসী’ শব্দটি (পৈপ্প. ১৩।১।৯)। লক্ষণীয় এই যে, রচয়িতা মনে করেছেন যে শব্দ দুটি পরস্পর পরিবর্তনীয়। সুতরাং অর্থব্বেদের যে অংশটিকে মনে করা হয় সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক, সেখানে ‘শূদ্র’ শব্দটি জনগোষ্ঠী অর্থে বুঝতে হবে, ‘বর্ণ’ অর্থে নয়। মহাভারতে আভীরদের সঙ্গে যুক্ত ভাবে শূদ্রদেরও বার বার জনগোষ্ঠী রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাকাব্যের পরম্পরা অতীতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশম

শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে শূদ্র কুল ও শূদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমটিতে উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের 'কুল'এর সঙ্গে। পরে আভীর, দরদ, তুখার, পহ্লব ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে দিগ্বিজয় করতে গিয়ে নকুল যাদের জয় করেছিলেন, সেই তালিকায় জনগোষ্ঠী হিসাবে শূদ্রের উল্লেখ আছে। আর আছে রাজসূয় যজ্ঞ করার সময় যুধিষ্ঠিরকে যারা উপহার পাঠিয়েছিল। সেখানে আভীরদের সঙ্গে শূদ্রদের একযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০]

আভীররা কথা বলত 'আভীরী' নামের এক আর্য উপভাষায়। এদিকে দ্রাবিড়, পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি প্রাগার্য মানবগোষ্ঠীর তালিকাতেও শূদ্রের কোনো উল্লেখ নেই। তাদের বাসস্থান সর্বদাই বলা হয়েছে উত্তর-পশ্চিমে। পরবর্তীকালে ওই এলাকা আর্যদের অধিকারে চলে আসে। 'শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীম্'। আভীর ও শূদ্ররা বসতি স্থাপন করেছিল সরস্বতী নদীর কিনারে। তাদের প্রতি বিরূপতা বশতই সরস্বতী মরুভূমিতে হারিয়ে যায় ('শূদ্রোভীরা্ন প্রতি দ্বেষ্দ যত্র নষ্টা সরস্বতী')। এইসব উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দৃষদ্বতীর সঙ্গে সরস্বতীও ছিল আর্যদেশ নামে পরিচিত অঞ্চলের সীমানা। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* গ্রন্থে শূদ্রদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমান করেছেন যে, দাসদের মতো শূদ্ররাও ছিলেন ইন্দো আর্যদের স্বজাতি।[১১]

পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছর পর থেকে প্রায় হাজার বছর অবধি ভারতে নানা জাতীয় মানবগোষ্ঠী ক্রমাগত এসেছিল। ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনেও এই যুক্তির সমর্থন মেলে। তাই এমনও হতে পারে যে, শূদ্ররা ভারতে আসে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের শেষ দিকে। বৈদিক-আর্যরা তাদের পরবর্তী বৈদিক সমাজে চতুর্থ বর্ণ হিসাবে গৃহীত হয়। লক্ষণীয়, সরস্বতী নদী যে এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হত,

সেখানে নকশা করা ধূসর রঙের মাটির তৈরি তৈজসপত্রের অজস্র নিদর্শনস্থল পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছর আগে নাগাদ এর সূচনা ধরা হয়। শূদ্রদের সঙ্গে এই এলাকার যোগ পাওয়া গেছে।

মহাভারত -এর শান্তিপর্বে আছে যে পৈজবণ ছিলেন শূদ্ররাজা। কেবলমাত্র এই একটিমাত্র কিংবদন্তির ভিত্তিতেই দাবি করা হয়েছে শূদ্ররা আদিতে ক্ষত্রিয় ছিল। যদিও এই ধরনের মতের কোনো তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। শান্তিপর্বে যে বলা হয়েছে পৈজবণ ছিলেন শূদ্র, সেই কিংবদন্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তাঁকে ভারত জনগোষ্ঠীর প্রধান সুদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে দশ রাজার যুদ্ধের তিনিই ছিলেন বিখ্যাত শূদ্র নায়ক। বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য এই মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। এবং অন্য মহাকাব্য, পুরাণ কিংবা অন্য কোনো তথ্যসুত্রেও শান্তিপর্বের এই কিংবদন্তির সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। এই কিংবদন্তি মতে শূদ্ররাজ পৈজবণ যজ্ঞ করেছিলেন। একথা আবার *মহাভারত*-এর একেবারে শেষের দিকে আছে, যেখানে বলা হয়েছে শূদ্ররা পাঁচটি মহাযজ্ঞ ও দান করতে পারবে। এই কিংবদন্তির সত্য-মিথ্যা বিচার করা কঠিন। শূদ্ররা যে দান ও যজ্ঞ করতে পারে তার একটা পূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থিত করাই এর উদ্দেশ্য এমনটা মনে হয়। পরে দেখানো হবে যে, শান্তিপর্বের উদার মনোভাবের সঙ্গে এই কাহিনির সঙ্গতি রয়েছে।

মহাভারত-এ অম্বষ্ঠ, শিবি, সূরসেন ইত্যাদির সঙ্গে শূদ্র সেনাবাহিনীতে নারীও আছে, কিন্তু তাতে গোটা শূদ্র গোষ্ঠীই ক্ষত্রিয় বর্ণে পরিণত হয় না। সুতরাং, ক্ষত্রিয়দের শূদ্র পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছিল এই তত্ত্বের সমর্থনে প্রায় কোনো তথ্যই নেই। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের সময় সমাজে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাই— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

ও শূদ্র। ভারতবেত্তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'আর্যরা: সাহিত্যযুগ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন:

> প্রথম যুগে এইগুলি জন্মগত ছিল না, বরং এদের মধ্যে সম্পর্ক খানিকটা সঞ্চারী ছিল, অর্থাৎ নিজের রুচি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে যাওয়া যেত। এর কিছু নিদর্শন বেদে আছে। পরে অবশ্য ক্রমশই বর্ণগুলি জন্মগত, বংশগত হয়ে ওঠে।[১২]

'শূদ্র' শব্দের উৎপত্তি

'শূদ্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা বাদরায়ণের *বেদান্তসূত্র* -এ সর্বপ্রথম দেখা যায়। যেখানে শব্দটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'শুক' অর্থাৎ শোক এবং 'দ্রু' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'দ্র' অর্থাৎ ধাবন করা। 'শুগস্য তদনাদয়প্রবণাৎ তদাদ্রবণাতসুচ্যতে' (*বেদান্তসূত্র* ১।৩।৩৪)।

জনশ্রুতিকে কেন শূদ্র বলা হয়েছিল (*ছান্দোগ্য উপনিষদে* রাজা হিসাবে উল্লেখ আছে ৪।২।৩) সে সম্পর্কে শঙ্করের ভাষ্যে তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১) তিনি দুঃখের প্রতি ধাবিত হলেন (শূচম অভিদুদ্রাব'); ২) শোক তার দিকে ধেয়ে এল ('শূচা বা অভিদুদ্রুবে'); এবং ৩) শোকমগ্ন অবস্থায় তিনি রৈক্কর দিকে ধেয়ে গেলেন (শূচা বা রৈক্কম অভিদুদ্রুব')। *বেদান্তসূত্র*-এ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'শূদ্র' শব্দটিকে বোঝা যাবে কেবল তার অবয়বের অর্থের ব্যাখ্যা থেকে, অন্য কোনো ভাবে নয় (শূদ্র অবয় বার্থ স্পম্ভবাৎ রুচা থর্স্য চাসম্ভবাৎ)। পণ্ডিতবর্গ অবশ্য পরবর্তীকালে বাদরায়ণ-কৃত শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং তার উপর শঙ্করের ভাষ্য এই দুইয়ের কোনটিকেই সঠিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কথিত আছে, শঙ্কর যে জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই জনশ্রুতির

নায়ক ছিলেন মহাবৃষদের শাসক। অথর্ব্বেদে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের আদিবাসিন্দা হিসাবে তাঁর উল্লেখ আছে।

জনশ্রুতির রাজা শূদ্র বর্ণের ছিলেন কিনা তা নিয়েও বিতর্ক আছে। সম্ভবত, তিনি ছিলেন শূদ্র জনগোষ্ঠীর লোক। কিংবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর। ব্রাহ্মণ লেখকেরা যাদের শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

পাণিনির ব্যাকরণের 'উনাদিসূত্রে'র লেখকও শব্দটিকে অনুরূপ ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। সেখানে শূদ্র শব্দটিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'শূচ' বা 'শূক' ধাতু+'র' (শূচের্দশ্চ)। এই ক্ষেত্রে 'র' প্রত্যয় যোগের কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। পুরাণের ব্রাহ্মণ্য পরম্পরাতেও শূদ্র শব্দটিকে 'শূচ' (অর্থাৎ সন্তপ্ত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[৩০] *বায়ুপুরাণ* -এ বলা হয়েছে:

> শোচন্তকচ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্যাসু যে রতাঃ।
> নিস্তেজসো অল্পবীর্যশ্চ শূদ্রাস্তান ব্রবীৎ তু সঃ।।[১৩]

অপরদিকে *ভবিষ্যপুরাণ* ১।৪৪।২৩ ইঃ তে বলা হয়েছে বেদজ্ঞানের ক্ষরণ প্রাপ্তির জন্য তাদেরকে শূদ্র বলা হয় 'যে তে শ্রুর্তের্দ্রুতিং প্রাপ্তাঃ শূদ্রাস্তেনহ কীর্তিতাঃ' (*ভবিষ্যপুরাণ* ১।৪।২৩)। অর্থাৎ যারা দুঃখ করেছিল ও ধেয়ে আসছিল, পরিচর্যা রত ছিল, যারা নিস্তেজ ও অল্পবীর্য, তাদের 'শূদ্র' বলা হয়েছে। কিন্তু শূদ্র শব্দের ওই ধরনের ব্যুৎপত্তি শব্দটির অর্থ নির্ণয়ে ততটা সাহায় করে না, বরং এটি ওই বর্ণের পরবর্তী অবস্থারই পরিচায়ক।

বৌদ্ধরা শব্দটির কী ব্যাখ্যা দিয়েছে এই প্রসঙ্গে সেটিও দেখা যেতে পারে। বুদ্ধের মতে যারা রুদ্রচারী ও শূদ্রাচারী ('লুদ্দাচারা খুদ্দাচারা তি'), তারাই 'সুদ্দ' নামে পরিচিত। এইভাবেই শূদ্র শব্দটির উৎপত্তি। 'দীর্ঘনিকায় সূত্র'এ এই প্রসঙ্গে লেখা শ্লোকটি হল:

'সুদ্দাত্বেব অক্ষরং উপনিব্বত্তম'। অপরদিকে আদি মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ শব্দকোষে শূদ্র শব্দটি 'ক্ষুদ্র'র সমার্থক হয়ে গেছে আর এর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে 'শূদ্র'র উৎপত্তি 'ক্ষুদ্র' থেকে। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে এই দুই ব্যুৎপত্তির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে শূদ্রবর্ণের ধারণার সঙ্গে যেসব চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে ছিল, সেইগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ব্যুৎপত্তিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্য ব্যুৎপত্তিতে দেখা যায় শূদ্রদের দুর্দশা আর বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে সমাজে তাদের হীন ও অধস্তন অবস্থান। শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে সমকালীন সময়ের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা বোঝা যায়।[১৪]

এইভাবে বৈদিক সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ থেকে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যেতে পারে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাসকে। অংশত বাহ্যিক এবং অংশত অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে আর্য ও প্রাগার্য সাধারণের এক বৃহৎ অংশকে শূদ্রের পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *Ethnology of the Mahabharata* এবং ড. বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের *Who Where the Sudras* (১৯৪৬) গ্রন্থে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেহেতু এই সংঘাত হত মূলত গো-ধন এবং পরবর্তীকালে ভূমি ও তার উৎপাদনের অধিকার নিয়ে, তাই যারা এইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নিঃস্ব হয়ে গেল, তারাই নতুন সমাজে চতুর্থ বর্ণ হিসাবে গণ্য হতে থাকল। এভাবেই যজুর্বেদের যুগে শূদ্রের ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দাসত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন নারীর কাজও ঠিক হয়ে গেল: স্বামী, সন্তান আর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সেবা আর বাড়ির কাজ করা।

বেদ পরবর্তী যুগে শূদ্র

পরবর্তী বৈদিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি নতুন দিক উল্লেখযোগ্য। তা হল বৈশ্য ও শূদ্রের থেকে আলাদা করে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্য বিশেষ অবস্থান দাবি করার প্রবণতা। শূদ্রের সঙ্গে বৈশ্যকে এক করবার ও জনজীবন থেকে তাদের বর্জন করার যে প্রবণতা গোড়ার দিকের রচনাদিতে প্রচ্ছন্ন, পরের দিকে রচনায় তাই কিন্তু হয়ে উঠেছে প্রকট ও পরিস্ফূট। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* -এ বলা হয়েছে 'বিংশ চৈবাস্মৈ অচ্ছুদ্রং চ বর্ণম অগুবর্ত মানৌ কুবন্তি' (৮।৪)। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণরা যান ক্ষত্রিয়ের আগে, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্ররা তাদের অনুবর্তন করে।

সূচনায় সম্ভবত বৈদিক ভারতীয় ও আদিবাসীরা নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করত। এমনকী জনগোষ্ঠীগুলির ভাঙন ও তার সদস্যদের চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও হয়তো কিছুকাল এই প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে, পরবর্তী বৈদিক যুগে 'বর্ণভেদ' প্রথা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, উচ্চশ্রেণির স্ত্রীলোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির পুরুষের বিবাহের অনুমতি দেওয়া হত না। শূদ্র রমণীকে উচ্চবর্ণের পুরুষের ভোগসামগ্রী রূপে দেখার প্রবণতা সে সময় চালু হয়েছিল।

এই পর্বে আমরা চণ্ডালের প্রতি ঘৃণার চিহ্নও পাই। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৫।১০।৯) বলা হয়েছে যে সদাচারী লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হিসাবে উত্তম পুনর্জন্ম লাভ করবে। কিন্তু কদাচারী লোক প্রবেশ করবে কুক্কুরী, শূকরী অথবা চণ্ডালের পূতিগন্ধময় যোনিতে। এই পর্বের সূচনাকালীন রচনায় (বাজসেনিয় সংহিতা ও তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ) চণ্ডালকে দেখা যায় পুরুষামেধ যজ্ঞের বলি হিসাবে।

আলোচ্য পর্বের সমাজনীতিতে কয়েকটি অপকর্মের সঙ্গে শূদ্রদের যুক্ত হতে দেখা যায়। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এর একটি কাহিনিতে অঙ্গিরস গোত্রের শুনঃশেপ তাঁর পিতা অজীগর্তকে শূদ্র বলে নিন্দা করেছেন। কারণ তিনি তিনশো গোরুর বিনিময়ে বরুণের বলি রূপে নিজ পুত্রকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যদিও দেবতারা তাঁকে মুক্তি দেন এবং কলঙ্কমোচনের জন্য পিতা তাঁকে একশো গোরু দান করেন। তবুও শুনঃশেপ তাঁর পিতাকে কঠোর তিরস্কার করেছেন। তিনি বলেছেন— 'না পাগঃ শৌদ্রান্ ন্যায়াদ অসংধেয়ং ত্বয়া কৃতম্ (*ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ৭.১৭)। অর্থাৎ, তুমি এখনও শূদ্রের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত নও। কেননা এমন অপরাধ তুমি করেছ, যার কোনো ক্ষমা নেই। এর থেকে মনে হয় অজীগর্তের মতো ক্ষুৎপীড়িত অবস্থায় শূদ্ররা তাদের সন্তানদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। সেই সময় মনে করা হত যে, ঐহিক লাভের জন্য তারা স্বজনের প্রতিও নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতে পারে।

আবার *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* - এরই আর একটি কাহিনিতে দেখি, বিশ্বামিত্র যখন শুনঃশেপকে গ্রহণ করে জেষ্ঠ্যের প্রাধিকার সমেত তাঁকে নিজের শত পুত্রের মধ্যে প্রথম স্থান দেন, তখন তাঁর অগ্রজ পঞ্চাশ জন পুত্র শুনঃশেপকে প্রথম স্থান দিতে স্বীকৃত হননি। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের পিতা মহর্ষি বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেন সেই পঞ্চাশ জন পুত্রের বংশধরেরা হবে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মুতির, দস্যু ও 'অন্ত্য' (জাতিচ্যুত) ইত্যাদি নিম্নবর্গের। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিম্নবর্গের অনার্য মানবগোষ্ঠীকে আত্তীকরণের উদ্দেশ্যে কুলপঞ্জি আবিষ্কারের ব্যাপারে পুরোহিতদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার একটি আদি দৃষ্টান্ত এই বিবরণ থেকেই পাওয়া যায়।

বৈদিক পর্বের শেষ দিকে চতুরাশ্রমের প্রসঙ্গ এসেছে। তাতে পরবর্তীকালে শূদ্রদের জন্য শুধু গার্হস্থ্যই অনুমোদিত। এর থেকেই চলে আসে শূদ্রদের শিক্ষার প্রসঙ্গ। কারণ পরের দিকে নানা রচনায় দেখা যায় যে, ছাত্রজীবন পর্বে (ব্রহ্মচর্য আশ্রম) শূদ্রদের কোনো স্থান নেই। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সূচনা হয় উপনয়ন দিয়ে। বৈদিক পর্বে 'উপনয়ন' ও শিক্ষা না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শূদ্রদের প্রথম সুস্পষ্ট বর্জন করতে দেখা যায় সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্রে। যেখানে উচ্চতর তিন বর্ণের উপনয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে (১৯।১।৪; ২৬।১। ২০)। এই শ্রৌতসূত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, উপনয়ন, বেদপাঠ ও অগ্নি-আধান ফলপ্রসূ হতে পারে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই, যারা অশূদ্র ও কুকর্মে লিপ্ত হয় না (সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্র ২৬।১।৬)। দ্র্যাহ্যা শ্রৌত্যসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে উপনীত ছাত্র যেন শূদ্রদের সঙ্গে কথা না বলে। সত্যাষাঢ় শ্রৌত্যসূত্রে বলা হয়েছে যে মধুপর্ক নামের অনুষ্ঠানে শূদ্ররা স্নাতকদের পা ধুইয়ে দেবে।

বৈদিক পর্বের শেষের দিকে বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানে শূদ্রের দেহস্পর্শ বা দর্শন নিষিদ্ধ করার মতো কঠোর ব্যবস্থা দেখা দিতে শুরু করে। শতপথ ব্রাহ্মণে যজমানকে শূদ্রের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। এই শতপথ ব্রাহ্মণেই বিধান দেওয়া হয়েছে যে, সোমযোগের সূচনা 'প্রবর্গ্য' অনুষ্ঠানের যজমান অবশ্যই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের স্পর্শ এড়িয়ে চলবে, কারণ তারা অসত্য। কাঠক সংহিতায় এই জাতীয় একটি উল্লেখ ছাড়া স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে একই পর্যায়ভুক্ত করার এটিই হল প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। পরবর্তী সাহিত্যে এই বিষয়টি প্রায়শই দেখা যায়। বেদসম্মত, ঐতিহ্যসঙ্গত, সতত সনাতন জীবনধারণের উদ্দেশে গ্রন্থিত যে কুড়িটি স্মৃতি কিংবা ধর্মশাস্ত্র আছে, তার মধ্যে গৌতমস্মৃতি সব চাইতে পুরোনো। গৌতমস্মৃতি পরবর্তী ধর্মশাস্ত্র ধারায় আগে আসে বৌধায়নস্মৃতি, তারপর

আপস্তম্বস্মৃতি, বশিষ্ঠস্মৃতি। গৌতম ও বশিষ্ঠ'র মাঝখানে আছে হারীতস্মৃতি, যমস্মৃতি, দক্ষস্মৃতি, শঙ্খস্মৃতি, সংবর্তস্মৃতি, নারদস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, পরাশরস্মৃতি প্রভৃতি। যদিও কোনটি আগে কোনটি পরে সে সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একস্বর নন, তবে প্রাচীনতর স্মৃতি পঞ্জিকাগুলির রচনা যে খ্রিস্টপূর্ব ছয় থেকে চার শতাব্দীর মধ্যে রচিত, সে মতটি মোটের ওপর গৃহীত।

শতপথ ব্রাহ্মণে আরও বিধান দেওয়া হয়েছে, যে নারী পুত্রলাভের জন্য কোনো আচার পালন করছে, তাকে যেন কোনো বৃষল পুরুষ বা স্ত্রী স্পর্শ না করে। পরবর্তীকালে এই বৃষলরা শূদ্রদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে এবং চিত্রিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী হিসাবে।

এই বিধি-নিষেধগুলি পরের দিকে বৈদিক যুগে এতই কড়াকড়ি হয়ে দেখা যায়, এবং এতই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, উপনিষদে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ (৪।৩।২২) বলা হয়েছে যে, এমনকি চণ্ডাল ও পৌল্কসরাও আত্মার জগতে অচণ্ডাল অপৌল্কস হয়ে যায়। যেখানে সব ভেদ গুপ্ত হয়ে যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে (৫।২৪।৪) চণ্ডালও অগ্নিহোত্র যজ্ঞের উচ্ছিষ্টের অধিকারী। অগ্নিহোত্র ঘিরে ক্ষুধিত শিশুরা বসে থাকে, যেমন তারা ঘিরে বসে থাকে মাকে। নিম্নবর্গের সপক্ষে এই ধরনের প্রতিবাদে কতটা জনগোষ্ঠীয় সাম্যের প্রাচীন ধারণা থেকে পাওয়া যায়, তা তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু এই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় তা নয়। আর ঠিক এর উল্টোদিকে শূদ্রদের ওপর আরও বেশি করে বাধানিষেধ আরোপ করা অব্যাহত রাখলেন স্মৃতি, গৃহসূত্র ও ধর্মসূত্রের সংকলকেরা।[১৫]

মহাকাব্যে 'শূদ্র'

রামায়ণ-এর উত্তরকাণ্ডে প্রাচীনতম শম্বুক কাহিনিতে বলা আছে রাজার কোনো ক্রটির ফলে প্রজাদের অকালমৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এক ব্রাহ্মণ পুত্রের বাল্যকালে মৃত্যু ঘটলে ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃত্যুর জন্য সরাসরি রামচন্দ্রকেই দায়ী করেন। এমন দোষারোপের কারণ খুঁজতে রাম বেড়িয়ে পড়েন কোথায় তাঁর শাসনের ক্রটি হয়েছে তার অনুসন্ধানে। খুঁজতে খুঁজতে তিনি দেখলেন এক জায়গায় শূদ্র শম্বুক তপস্যা করছেন। এই দৃশ্য দেখে রামচন্দ্রের সহযোগী মহর্ষি নারদ বিধান দিলেন ব্রাহ্মণ বালকের অকালপ্রয়াণের কারণ শূদ্র শম্বুকের তপস্যা। বিধানে বিচলিত শ্রীরামচন্দ্র জানতে চাইলেন শম্বুকের এই তপস্যার উদ্দেশ্য কী? উত্তরে শম্বুক জানালানে যে, তিনি নশ্বর দেহে দেবত্বলাভের জন্য তাঁর তপস্যা শুরু করেছেন। এই উত্তর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্র তাঁর তরবারির এক কোপে শম্বুকের মাথা তাঁর ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন। তখন দেবতারা স্বর্গ থেকে রামচন্দ্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন, আর দেবতাদের বরে রামচন্দ্র সেই অকালপ্রয়াত ব্রাহ্মণ বালককে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

রামায়ণ-এর আর একটি আলোচিত আখ্যান হল রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা বনবাসে যাওয়ার সময় প্রথম রাতে এলেন রামের বন্ধু নিষাদরাজ গুহকের রাজ্যে। গুহক নানা খাদ্যসম্ভারে আপ্যায়ন করতে চাইলে রামচন্দ্র বললেন: তারা বনবাসী, অন্যের দান গ্রহণ করবেন না। গুহক যদি রথের ঘোড়াদের জন্য খাদ্য দেন তাহলে উপকার হয়। গুহক তাই করলেন। বনবাসের পরবর্তী দিনগুলিতে কিন্তু রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অত্রি, অনুসূয়া, ভারদ্বাজ ও অন্যান্য মুনি-ঋষিদের অতিথি হিসাবে তাঁদের দেওয়া ফলমূল খেয়েছেন। গুহকের কাছেও তা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে রাত্রিতে উপবাস করে

কাটালেন। সেটা কি গুহক জাতিতে নিষাদ ছিলেন বলে? রামরাজ্যে চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুত্ব কি শুধু কথার কথা? যে ফল, জল ব্রাহ্মণ ঋষিদের কাছ থেকে নেওয়া যায়, তা চণ্ডাল বন্ধুর কাছ থেকে নেওয়া যায় না![১৬]

পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের সূচনা এবং চূড়ান্ত রূপায়ণ এই দুই পর্বের মধ্যে প্রায় আট শতাব্দী সময় কেটে গেছে। এই মহাকাব্যের মধ্যেই বলা আছে এর শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজার। কেমন করে এই চব্বিশ হাজার শ্লোকের বীজকাব্য পল্লবায়িত হয় বিরাশি হাজার শ্লোকের মহাকাহিনি হয়ে উঠল সে কথাও মহাকাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে। এই কাব্যের মুখবন্ধ ছিল তিনটি: মনুর উপাখ্যান, আস্তিকের উপাখ্যান আর উপরিচর উপাখ্যান। অর্থাৎ মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। এর তিনটি পৃথক পৃথক নামও ছিল। সম্ভবত রচনার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ‘জয়’, ‘ভারত’ এবং ‘মহাভারত’। দীর্ঘ এই আট শতাব্দী ধরে উত্তর ভারত জুড়ে অন্যান্য সাহিত্যও রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল *মহাবস্তু* ও *ললিত বিস্তার*। কিছু কিছু জৈন গ্রন্থ, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, রামায়ণ* এবং *মনুসংহিতা*।

ভৃগুবংশীয় তরুণ ব্যক্তিরা ও শিষ্যরা খ্রিস্টিয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে দুটি অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ মনুসংহিতা ও মহাভারতের ভার্গব সংযোজন এই সময়েই ঘটেছিল। যেহেতু মহাভারত তার কাব্যগত উৎকর্ষের জন্য ততদিনে বিপুল ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ভার্গবদের পক্ষে নিজেদের মতামত বিজ্ঞাপিত করার এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ‘পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে ভার্গব সংযোজন’ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর ‘মহাভারত-এ ভার্গব প্রেক্ষপণের সামাজিক কারণ’ প্রবন্ধে। তাঁর যুক্তির সারমর্ম হল মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব তা

পাঠ করেন তাঁর পুত্র শুকদেবের কাছে, এবং তারপরে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কাছে। শুকদেব এটি আবৃত্তি করেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে এবং সম্ভবত সেই সময়ই চিরন্তন মূল্যবোধের নীতিমূলক আখ্যানগুলি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু এই প্রক্ষেপণ খুব বৃহৎ অংশের নয় এবং এই বীর গাথাত্মক কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত অংশের ভাবনা ও সৌন্দর্যবোধ মিলে যায়। অনেক পরে, শৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সোমযজ্ঞে, রাজা লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রসবাকে মহাকাব্যটি আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রথম অনুরোধ ছিল ভার্গব বংশের একটি ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য। এই ঘটনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে আলোচ্য অংশের রচয়িতা ভৃগুবংশের গুণকীর্তন করার সুযোগ পেয়ে যান, ভার্গবদের কীর্তিকে মহত্তর রূপে প্রচার করা হয় এবং প্রক্ষিপ্ত অংশের অতিরিক্ত প্রামাণ্যতা সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া যায়। যখন এই ভার্গবদের বিবরণ শেষ হল, তখন শৌনক ব্যাসরচিত ‘জয় সংহিতা’ শোনার ইচ্ছা করলেন। চারণ লোমহর্ষণ ও তাঁর পুত্র উগ্রসবা, এই সূত পরিবার একত্রে প্রক্ষিপ্ত অংশের এক বৃহৎ ভাগের অধ্যায়গুলি রচনা করেন। এই প্রক্ষেপণ, বর্তমান মহাকাব্যটির আকারের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি; একেই বলা হয়েছে ভার্গব বা ব্রাহ্মণ্য সংযোজন। রচনা শৈলীর বিচারে এই অংশটি দুর্বল, অতি অলংকৃত, শব্দ ভারাক্রান্ত এবং পুনরাক্তি দুষ্ট। আদি, বন, দ্রোণ, শল্য, শান্তি এবং অনুশাসন পর্বগুলির অধিকাংশই এর অন্তর্গত। এবং আশ্বমেধিক, আশ্রম বাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান এবং স্বর্গারোহণ সম্ভবত সম্পূর্ণ ভাবেই প্রক্ষেপণের অন্তর্ভুক্ত। এইখানে আকর্ষণীয় তথ্য এই যে, এই ভার্গববংশেই কৃষ্ণের জন্ম, সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে চূড়ান্ত ভাবে ভার্গবেরা কৃষ্ণের গুণগান করে যাবেন যতক্ষণ না তিনি প্রকৃত অর্থে একজন

দেবতা হয়ে উঠছেন। যে কৃষ্ণ পরবর্তীকালে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-তে (৪।১৩) বলছেন— ‘চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ’।

ভার্গব অংশের অন্যতম কেন্দ্রীয় ভাবনা হল বর্ণাশ্রমের উচ্চতম যে ব্রাহ্মণ তিনি রাজার মতোই পূজনীয়; তাঁর ক্রোধে সর্বনাশ হতে পারে। বাতাপি ও ঈম্বলের উপখ্যান, কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরামের উপাখ্যান প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ হল পৃথিবীচারী দেবতা। যখন বেণু পুত্র পৃথুর রাজ্যাভিষেক হয় তখন ভবিষ্যৎ প্রজাদের জন্য তাঁর প্রথম প্রতিশ্রুতিই ছিল যে তিনি ব্রাহ্মণদের শাস্তি দেবেন না এবং অন্তবর্ণ বিবাহ রোধ করবেন। এই ভার্গব অংশই আমরা প্রথম শুনতে পাই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ— ‘ব্রাহ্মণ’ জাতির কথা। জপতপ অধ্যয়ন ছাড়াও তাকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এবং সেই ব্রাহ্মণ পূজনীয়ও।

অর্বাচীন যুগের বৈদিক সাহিত্য থেকেই দেখা যায় ‘শূদ্র’ হল ভৃত্য, যে বাকি তিন বর্ণের সেবা করে। মহাভারতের এই ভার্গব অংশে বলা হয়েছে প্রজাপতি শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন বাকি তিন বর্ণের ভৃত্য রূপে (‘প্রজাপতির্হি বর্ণনাং দাসং শূদ্রম কল্পয়ৎ’)। শূদ্রের উচিত বিগতদ্বেষ হয়ে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা, ছত্র, প্রলেপন, জুতা, পাখা এবং পরিচ্ছদ যখন ব্যবহারের অযোগ্য হবে তখন তা শূদ্রকে দেওয়া যেতে পারে। যদিও প্রভু স্বচ্ছন্দে তার ভৃত্য শূদ্রের ধন ব্যবহার করতে পারে। ‘ছত্রং বেষ্টনং ঊশীনর মুপানদ্ ব্যজনানি চ। যাতাযামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারি নে। আধার্য্যানি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ।’

এর পাশাপাশি জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের তত্ত্ব ক্রমশ ঘাঁটি গেড়ে বসল মহাকাব্যের ভার্গব সংযোজিত অংশগুলিতে। পুনর্জন্ম, কর্ম ও ভাগ্যের তত্ত্ব সমূহ, অতীত

এবং ভবিষ্যতকে অজ্ঞা এবং অজ্ঞেয় বলে প্রচার করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস এই সবকিছুই অবধারিত ভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে দেয় এক বিশেষ শ্রেণির হাতে। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে এই সুবিধাভোগী ক্ষমতাধর সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের পূর্বজন্মের সেই অজ্ঞাত পাপকে ব্যাখ্যা করার নামে এবং উন্নততর অবস্থায় পুনর্জন্ম নিশ্চিত করার নামে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশ্নহীন আনুগত্য, অটল বিশ্বাস ও সেবা দাবি করে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নিয়তিবাদ, শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়া। এসব বর্ণনায় ভার্গব সংযোজিত অংশ ভারাক্রান্ত তত্ত্বের বিস্তারিত চর্চা দেখা যায় পুরাণ সমূহে, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্রে ও নিবন্ধগুলিতে। অথচ *ঋগ্বেদ*-এর অর্বাচীন অংশগুলিতে স্বর্গ সুখের বিষয়ে কিছু অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি থাকলেও জীবন এত আনন্দময় ছিল যে, সেই সময় মানুষের লক্ষ্য ছিল যত দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্ভব জীবনকে প্রাণ ভরে উপভোগ করা। একাধিক সূক্তে দেখা যায় বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা করছেন দীর্ঘ জীবন, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য সহ পার্থিব সুখ।

এই পথ ধরেই *মহাভারত*-এর 'অনুশাসন' পর্বে দেখি যে শ্রেণিরা পশুপাখি প্রভৃতি হয়ে বহু জন্ম পেরিয়ে মানুষ জীবন পায়, তারা প্রথমে চণ্ডালের ঘরে জন্মায়। ক্রমে সুকর্মের ফলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয় তাদের। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*[৭] (৫।১০।৭) অনুযায়ী ইহজগতে অর্জিত শুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) রয়েছে যাদের, খুব তাড়াতাড়ি তারা 'রমণীয়াং যোনিম্'— উৎকৃষ্ট যোনিতে অর্থাৎ উঁচু জাতে জন্মায়। আর যাদের অশুভ কর্মফলের অবশেষ থেকে গিয়েছে, তার শীঘ্রই 'কপূয়া যোনিম্'— নিকৃষ্ট যোনিতে, অর্থাৎ কুকুর, শুয়োর বা চণ্ডাল হয়ে জন্ম নেয়। লক্ষণীয় কুকুর, শুয়োর এবং চণ্ডাল হয়ে জন্মানোর মধ্যে উপনিষদকার কোনো গুণগত ফারাক দেখাননি। চণ্ডাল হল

ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের সন্তান। চণ্ডাল ও শ্বাপচ (কুকুরের মাংস খায় যারা) তারা থাকবে গ্রামের বাইরে। চণ্ডাল-বিশ্বামিত্র সংবাদে এমনটাই দেখা গেছে। জাতক কাহিনিতেও চণ্ডাল অস্পর্শ্য। গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শ ভারতের সামাজিক বিন্যাসকে অনেকাংশে আলোড়িত করেছিল, কিন্তু যে হিন্দুদের বর্ণ ব্যবস্থা শূদ্রদের সেবক বানিয়ে রেখেছিল, তার ভিত্তি নিয়ে বৌদ্ধরা খুব জোরালো প্রশ্ন তোলেননি।

মহাভারত - এ রয়েছে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ। ভরদ্বাজ প্রশ্ন করছেন, উত্তর দিচ্ছেন ভৃগু। ভরদ্বাজের একটি প্রশ্ন ছিল— দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, দৈত্য, সর্প, রাক্ষস, নাগ, পিশাপ ও মানুষ সবাই ব্রহ্মার সৃষ্টি, এদের সৃষ্টি করার পরে তিনি মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণবিভাগ করলেন, কিন্তু সব মানুষেরই তো কাম, ক্রোধ, লোভ, শোক, চিন্তা, খিদে, ভয়, রয়েছে। তাহলে এক জাতি থেকে অন্য জাতি আলাদা করা যাবে কী করে? সবার শরীর থেকেই মল, মূত্র, পিত্ত, কফ, রক্ত, ঘাম বের হয়, তবে জাতের বিভাজন হয় কী করে? স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে অসংখ্য জাতি, তাদের বর্ণ স্থির হবে কী করে?

উত্তরে ভৃগু বললেন— আদতে জাতিভেদ নেই, কারণ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ব্রহ্মা থেকেই। তিনি সবাইকে একই রকম সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে সবাই ব্রাহ্মণ ছিল, কাজের সূত্রে মানুষ বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা বিষয় ভোগে উৎসাহী, রুক্ষ মেজাজের, ক্রোধী, সাহসী, তারা স্বধর্মত্ব (ব্রাহ্মণ) ছেড়ে ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হল। যারা গোরু ও কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত, সেই সব ব্রাহ্মণ বৈশ্যে পরিণত হল। আর হিংসা ও মিথ্যার দিকে যাদের ঝোঁক, যারা লোভী, পরের সেবা করে, যাদের মধ্যে কোনো শূচিতা নেই এবং যাদের গায়ের রঙ কালো— সেই ব্রাহ্মণেরা শূদ্র হল। ব্রহ্মা চার

বর্ণের জন্যই সংস্কৃত ভাষায় বিধান দিয়ে ছিলেন, কিন্তু লোভের বশে শূদ্ররা বেদের অধিকার হারাল।

মহাভারত - এ বনপর্বে একবার ঋষি মার্কণ্ডেয় কাছে যুধিষ্ঠির জাতপাতের পঠন নিচ্ছিলেন। ঋষি জানালেন, ব্রহ্মা প্রথমেই প্রাণীদের নিষ্পাপ, পবিত্র, ধর্মপরায়ণ করেই গড়ে ছিলেন। সেই সুদূর আদিকালে সব মানুষই ছিল ব্রাহ্মণ সমান। সেই সময়ে সমাজে এত আতঙ্ক-উপদ্রব ছিল না। বাধাবিঘ্ন ছিল সামান্যই। মানুষ নিজের উদ্যোমেই কর্ম সফল হতে পারত। সেই সময় মানুষের আয়ু হত হাজার বছর। তারা হাজার পুত্রবান হত। কিন্তু ক্রমে সেই মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ দেখা দিল। জীবনযাপনের কুটিলতা ও প্রতারণা এসে পড়ল। ফলে আগের মতো নিষ্পাপ থাকল না। দুষ্কর্মের ফলে তারা নীচ যোনিতে অর্থাৎ নীচু জাতের নারীদের গর্ভে জন্মাতে থাকল। তারা নরকগামী হল এবং বার বার বিচিত্র সংসারে এসে পরস্পরের থেকে আশঙ্কায় থাকতে শুরু করল। পরস্পরের দুর্দাশার কারণ হতে থাকল। ক্রমে পাপমগ্ন হয়ে দুষ্টু বুদ্ধি নিয়ে দুষিত বংশে জন্ম নিতে লাগল। তারা স্বল্পায়ু হল, নাস্তিক হল, পরস্পরের মনের অমিল প্রকট হল।

দুটো কাহিনিতেই দেখা যাচ্ছে যে অতীতে বর্ণভেদ ছিল না, তাই এমন তথ্যের অনুবর্তন। সম্ভবত সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির মালিকানা গড়ে ওঠার আগে এমন পরিবেশ ছিল। যে কারণে পরবর্তী বৈদিক যুগেও সামাজিক ভেদাভেদ তীব্র না হতে পারার কারণ ছিল চাষ-আবাদের অনুন্নত পদ্ধতি। তখনও লাঙলের ফলা প্রধানত কাঠের হত, সাধারণত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হস্তশিল্প ও চাষের কাজে ব্যাপকভাবে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। প্রধানত পশুপালক এবং অনেকাংশে সমতাবাদী বৈদিক সমাজ থেকে ক্রমে কৃষিভিত্তিক ও শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। সভাপর্বে দেখা যায় নারদ

ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন যে রাজ্যে কৃষকদের সমৃদ্ধি রয়েছে তো? কৃষি নিশ্চয় বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নয়? অর্থাৎ অনাবৃষ্টিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে কি না সেটাই বুঝে নেওয়া। কৃষকদের কাছে বীজ আর খাবারের সংস্থান রয়েছে কি না এই প্রশ্নটাও ওঠে। যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য শাসনের নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদ যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কৃষির কথা জানতে চেয়েছেন, তাতে বোঝা যায় সে সময় কৃষির গুরুত্ব বেড়েছে। এই সময় পেশার বিভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি কৃষক, কারিগর, ভাড়াটে মজুর ও কৃষিদাসের উৎপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্ত ভোগের লক্ষ্যে বর্ণ ব্যবস্থাও বিকশিত হয়। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর *প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস* (১৯৯৬) গ্রন্থে জানিয়েছেন এই সময় থেকেই তথাকথিত 'দ্বিজ' তিন বর্ণের সঙ্গে চতুর্থ (শূদ্র) বর্ণের ফারাক আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ধর্মীয় ও বুদ্ধির বৃত্তির কাজ থেকে হাতের কাজ বা শারীরিক শ্রমকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমেই কার্যত বর্ণ শোষণ শুরু হয়। *মহাভারত*-এর মূল কাহিনির সঙ্গে পরবর্তীকালের সংযোজিত নীতিশিক্ষামূলক অংশগুলির ফারাক চোখে পড়ার মতো। মূল কাহিনিতে পাই পরবর্তী বৈদিক যুগের, সমাজের ছবি। আর নীতিমূলক অংশে প্রাক্-মৌর্য, মৌর্যোত্তর ও গুপ্ত যুগের সামাজিক প্রতিফলন। বশিষ্ঠ, গৌতম, আপস্তম্ব— তিন ধর্মশাস্ত্রীই শূদ্রকে বেদপাঠের অধিকার দেননি। যে সময় শাসন ও সমাজকে তথাকথিত বেদের বিধান অনুসারে চালানো হয়।

রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হলে যুধিষ্ঠির সহদেবকে নিমন্ত্রণের জন্য রাজ্যের মাননীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্রদের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রাজসূয় কিংবা অশ্বমেধের মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আয়োজিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত

হলেও বেদি ভবনে শূদ্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীপর্বে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রে একশো ছেলেকে অকালে হারিয়ে বিষাদে স্তব্ধ গান্ধারীকে কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিতে দিতে বলছেন, ছেলে তপস্যা করবে, এই আশা নিয়ে ব্রাহ্মণী গর্ভধারণ করে। ছেলে দাসত্ব করবে ভেবেই শূদ্রা গর্ভধারণ করে। ছেলে পশুপালন করবে মনে করে বৈশ্য স্ত্রী গর্ভধারণ করে, আর ছেলে যুদ্ধে প্রাণ দেবে ভেবেই ক্ষত্রিয়াণী গর্ভধারণ করে। শূদ্রের ছেলের দাসত্ব কাজ এটা বোঝাতে চমৎকার দুটি উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে তার সন্তানের ভার বইবে মনে করেই গাভী গর্ভধারণ করে এবং সন্তান ছুটবে ভেবে অশ্বী তার জন্ম দেয়। ভার বহনের গোরুর কাছে এবং ছোটার জন্য ঘোড়ার কাছে মানুষ যে প্রশ্নহীন আনুগত্য চায়, শূদ্রের কাছে উচ্চবর্ণের সেটাই দাবি। ভারবাহী গোরু ও ছুটন্ত ঘোড়া এই দুইয়ের লাগাম থাকে মানুষের হাতে, একই ভাবে শূদ্র দাসের নিয়ন্ত্রণ থাকে উচ্চবর্ণের হাতে। আপস্তম্ব বলেছেন, যে বর্ণ যত উঁচু, তার সেবায় শূদ্রের তত বেশি পুণ্য।

অনুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠির আর ভীষ্মের কথোপকথন অংশে দেখা যায় যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে জানতে চাইছেন উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের ধর্ম, কিন্তু সেই সেবার ধরন কেমন হওয়া উচিত? উত্তরে ভীষ্ম বলছেন, বেদবাদী পরাশরের পরামর্শ হল শূদ্র এমনকি সন্ন্যাসীদের আশ্রমে গিয়েও তাদের সেবা করবে। শূদ্রের আচরণ কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে শূদ্রের আচরণ হবে মিষ্টভাষী, একটুকুও রাগ থাকবে না। তার অলসতা, হিংসা থাকবে না। সে হবে ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও সৎ স্বভাবের। শূদ্র মনে ভাববে, যে কাজ সে করছে, সেটাই অন্য বর্ণের কেউ পারবে না। তাই তাকেই সেটা করতে হবে। কর্মের পরিণতিতে যদি তার মৃত্যুও হয়, সেটাই তার পরম গতি বলে মনে করবে। শরীরে প্রাণ থাকতে 'আদেহ পতনাৎ' শূদ্র এভাবেই সন্ন্যাসীদের সেবা করবে।

এই অনুশাসনপর্বে আর একটি অংশে পার্বতীর আগ্রহে তাঁকে বর্ণধর্ম পাঠ দিতে গিয়ে মহাদেব বলছেন— শূদ্রের পরম ধর্ম হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যর পরিচর্যা করা। মহাদেবের বয়ানে মহাভারতকার আরও জানাচ্ছেন যে, শূদ্র অবিমর্ষ মনে সারাক্ষণ উচ্চবর্ণের সেবা করবে। সৎ পথে থাকবে, দেব-দ্বিজে ভক্তি করবে। সবার খাওয়া শেষ হয়ে যা থাকবে তাই খাবে (শষান্নকৃত্যভোজনঃ)। এখানে মনে পড়বে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুযায়ী, বাসি, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত আগের দিনের রান্না, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র খাবার তমোগুণের লোকেদের প্রিয়। আবার ঋগ্বেদের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় অভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খাচ্ছেন বামদেব। আর মহাভারতে দেখা যায় অনাহারক্লিষ্ট বিশ্বামিত্র চণ্ডালের খাবার ভাগ বসাচ্ছেন। *ছান্দোগ্য উপনিষেদ*-এ দেখি দুর্ভিক্ষের দিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও চণ্ডালের কাছে থেকে চেয়ে তার এঁটো মাসকলাই খেয়ে খিদে মেটাচ্ছেন।

আসলে অন্য কোনো মাংস জোগাড় করতে না পেরেই সমাজের সবচেয়ে নীচু তলার মানুষ কুকুরের মাংস খেত। তাই তাদের বলা হত 'শ্বপচ' বা 'শ্বপাক' (শ্বন্ অর্থাৎ চণ্ডাল যারা কুকুর পাক করে)। অন্য কোনো মাংস কেনার সংগতি তাদের দেয়নি সমাজ, অথচ সেই সমাজই তাদের তাচ্ছিল্য করে 'শ্বপাক' আখ্যা দিয়েছে। একটা সময় পরে বিদ্যাচর্চা বা তপস্যার চেয়েও শূদ্রের অন্ন খাওয়া, না-খাওয়ার প্রশ্নটি ব্রাহ্মণদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠের ধর্মশাস্ত্রের নিদান— শূদ্রের দেওয়া খাবার পেটে রয়েছে এমন অবস্থায় যদি কোনো ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়, তবে সে পুনর্জন্মে গ্রাম্য শুয়োর হবে। কিংবা ওই শূদ্রের পরিবারে জন্মাবে। কারণ সে যতই বেদমন্ত্র পাঠ করে থাকুক, দেবতার উদ্দেশে যতই নৈবেদ্য দিয়ে থাকুক বা প্রার্থনা করে থাকুক, যদি শূদ্রের অন্ন খেয়ে থাকে, তবে তার ঊর্ধ্বগতির পথ রুদ্ধ। শূদ্রের অন্ন খাওয়ার পরে ব্রাহ্মণ যদি

যৌন মিলন করে, তার সন্তানও শূদ্র হবে। মহাভারতের ভার্গবের কালপর্বে সমাজ শাসনে এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশাসনপর্বে মহাদেব-পার্বতীর কথোপকথনে প্রশ্ন ওঠে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কখন শূদ্র হয়ে যায়? মহাদেব উত্তর দেন কর্মের প্রভাবেই এমনটা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাজ করলে বর্ণভ্রষ্ট হয় এবং সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়। মৃত্যুর পরে তার ঠাঁই হয় নরকে এবং পরে সে শূদ্র হয়ে জন্মায়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও নিজেদের ফেলে শূদ্রের কাজ করলে শূদ্রই হয়ে যায়। দ্বি-জাতি যারা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কেউই শূদ্রের অন্ন খাবে না। যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করছেন, বর্ণ সমাজে কে কার অন্ন খেতে পারে? উত্তরে ভীষ্মের নিদানের সারমর্ম ব্রাহ্মণ তার নিজ বর্ণের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যর অন্ন খেতে পারবে, কিন্তু সেই তিন বর্ণের কেউই শূদ্রদের অন্ন গ্রহণ করতে পারবে না। এই তিন উচ্চবর্ণ যদি শূদ্রর অন্ন খায়, তাহলে ধরে নিতে হবে তা পৃথিবীর মল খাওয়ার সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন খেলে নরকে পচে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নরকে যায়।[১৭]

এইভাবে জাতিভেদ যত পোক্ত হতে থাকে, সামাজিক অচলতা ততই ভবিতব্য হতে থাকে। উচ্চ শ্রেণির মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টাও তত বাড়তে থাকে। যখন দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জনসমূহকে কেবল পেশি শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন আরও বেশি করে ব্রাহ্মণ্য বিধানগুলিকে ধর্মীয় মোড়কে পেশ করার রাজনীতি বৃদ্ধি পায়।

এই জমিতেই দাঁড়িয়ে ছিল রামায়ণের শম্বুক আর মহাভারতের একলব্য। তাঁদের উত্তরণ ও আত্ম নির্মাণের পথ আগলে থেকেছে একের পর এক স্মৃতিশাস্ত্র। গৌতম

ধর্মশাস্ত্রে যেমনটি বলা হয়েছে, যদি শূদ্র বেদমন্ত্রের উচ্চারণ শোনে, তবে তার কানে গলানো সীসা বা গালা ঢেলে দিতে হবে। যদি সে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, তবে তার জিভ কেটে ফেলতে হবে। মন্ত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলার পরিণামে তাকে হত্যা করে দু' টুকরো করে রামচন্দ্র সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। একলব্যের অনুশীলন বা শম্বুকের তপস্যায় সিঁদুরে মেঘ দেখেছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই। এই প্রসঙ্গে চলে আসে কাশীরাম দাসের অনূদিত বহুল প্রচলিত মহাভারতের কথা। ১৯৪ ছত্রে গীতার অনেকগুলি অধ্যায়কেই তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছেন। এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে গীতার চতুর্ব্বর্ণ সম্মত কর্ম বিষষক শ্লোকগুচ্ছ: 'ক্ষত্রকুলে জন্মিয়া শাসিবে ভূমণ্ডল, বৈশ্যকুলে জন্মিমাত্র অতিথি-সেবন।/ শূদ্রকুলে মহাধর্ম দ্বিজ পরায়ণ॥/ ভাব করিয়া সেবিবে দ্বিজগণে।/ সর্ব্বকর্ম সমর্পিবে ব্রাহ্মণ চরণে॥' লক্ষণীয় কৃষ্ণ প্রদত্ত বর্ণানুসারী কৃত্যের অনুবর্তনের পাশাপাশি কাশীরাম দাসে ঢুকে পড়েছে গীতা বর্হিভূত আরেক অলঙ্ঘণীয় কর্তব্য: 'সহমৃতা হবে তার ভার্যা গুণবতী।/ পতি সহ ইন্দ্রপুরে করিবে বসতি॥' এইভাবে 'নারী' ও 'শূদ্র'-র জীবনযাপনের কর্তৃত্বের প্রশ্নে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বরাবরই তার একাধিপত্য বাজায় রেখেছে। খেয়াল পড়বে, স্ত্রী হল 'ভার্যা' আর শূদ্র হল 'ভৃত্য' অর্থাৎ, যাদের ভরণ করতে হয়।

অর্থশাস্ত্রে 'শূদ্র'দের অবস্থান

কেউ নিশ্চিত নন কৌটিল্য ঠিক কে? কী তাঁর সঠিক পরিচয়? আর ঠিক কবে সংকলিত হয়েছিল তাঁর নামে প্রচারিত অর্থশাস্ত্র। যদিও এ কথা ঠিক বিশাখাদত্ত রচিত *মুদ্রারাক্ষস* নাট্যে বিষ্ণুগুপ্তকে 'চাণক্য' নামে ডাকা হয়েছে, যে নাটকের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপদানের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় *অর্থশাস্ত্র* মহাগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে একশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়। অর্থশাস্ত্রের

'প্রথম অধিকরণ'-এর শিরোনাম 'বিনয়াধিকারিক'। এই 'বিনয়াধিকারিক'-এর তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এই আশ্বাসে যে, ঋগ্বেদ, সামদেব আর যজুর্বেদ এই তিন মিলে ত্রয়ী আর চার বর্ণ ও চার আশ্রম মিলে চতুরাশ্রম।

অর্থশাস্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাজকীয় ক্ষমতাকে অন্য সব কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। কম করে প্রায় তিরিশটি বিভাগের মাধ্যমে প্রজাদের এই কর্তৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। শূদ্রদের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট করার জন্য কৌটিল্য ধর্মসূত্রের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, শূদ্রের জীবিকা অর্জনের উপায় হল দ্বিজাতির সেবা করা ('শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা। অর্থশাস্ত্র ১।৩)। কিন্তু কারুশিল্পী, নর্তক, অভিনেতা ইত্যাদি বৃত্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রতিপালন করতে পারে। কৌটিল্য নিদান দিয়েছেন গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য একশো পরিবারের এক একটি গ্রামকে দু-চার ক্রোশ তফাতে বসানো উচিত। এবং এই ধরনের গ্রামের অধিবাসী হওয়া উচিত প্রধানত 'শূদ্র' ও 'কর্ষক'। (শূদ্রকর্ষকপ্রায়ং কুলশতাবরং পঞ্চশতকুলপং, গ্রামং ক্রোশ-দ্বিক্রোশ সীমানা মান্যো ন্যারক্ষং নিবেশয়েৎ। অর্থশাস্ত্র ২। ১) এখানে অবশ্য 'শূদ্রকর্ষকপ্রায়ং' এই শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ অর্থশাস্ত্রের অন্য কোনো অংশে এটি পাওয়া যায় না। বরং 'আদি পুরাণ'এর একুশতম অধ্যায়ে বসতিগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য 'শূদ্রকর্ষক ভূয়িষ্ঠা;' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই 'কর্ষক' হল বৈশ্যের অনুকল্প, কারণ *আদিপুরাণ* -এর ওই একই অধ্যায়ে বৈশ্য ও শূদ্রদের দুটি আলাদা পর্যায় বলা হয়েছে। যারা বাণিজ্য, কৃষি আর গো-পালন করে জীবন

নির্বাহ করে তাদের বৈশ্য বলা হয়ছে। আর শূদ্র বলা হয়েছে তাদের, যারা কারুশিল্পী এবং অ-কারুশিল্পী অর্থাৎ গৃহভৃত্য, কৃষি-শ্রমিক ইত্যাদি; যারা বৈশ্যদের জন্য শ্রম দান করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় *আদিপুরাণ*-এর এই শ্লোকগুলির ভিত্তি নিঃসন্দেহে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। কারণ এখানেও বিধান দেওয়া হয়েছে একটি গ্রামের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি পাঁচশো পরিবার এবং সবচেয়ে কম একশো পরিবার হওয়ার উচিত। আনুমানিক খ্রিস্টিয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের দিকে বৈশ্য কৃষকগোষ্ঠী কার্যত লুপ্ত হয়ে যায়, অথচ, প্রাচীনকাল থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত এই বৈশ্য কৃষকেরাই ছিল প্রধান করদাতা। ফলে কৌটিল্যের নির্দেশে শূদ্রদের অবস্থানের কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে না। এটি শুধুমাত্র শূদ্রদের বিভিন্ন ভূমিকার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মাত্র। অর্থাৎ, দাস, হস্তশিল্পী এবং কৃষি শ্রমিক হিসাবে ভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে নতুন গ্রাম স্থাপন করা। সম্ভবত শূদ্র জনসংখ্যার প্রাধান অংশকে কৃষি শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, কিংবা দাস হিসবে নিয়োগ অব্যাহত ছিল। স্বাধীনভাবে জীবনধারণের অন্য কোনো উপায় তাদের ছিল না। এখানে মনে রাখা উচিত বৈশ্য ব্যবসায়ী আর শূদ্র হস্তশিল্পী ও অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে মেগাস্থিনিস বর্ণিত তৃতীয় জাতির মিল পাওয়া যায়। যারা ব্যবসা, পণ্য দ্রব্য ফেরি এবং দৈহিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত।

কৌটিল্য বলেছেন পরাক্রান্ত ও নীচ জাতীয় রাজার চাইতে অভিজাত অথচ দুর্বল রাজাকে লোকে বেশি মান্যতা দেবে। অতএব, তাঁর মতে রাজার মহাকুলীন হওয়া অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এই একই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, যেমন চণ্ডালদের জন্য সংরক্ষিত কূপ শুধু তাদের নিজেদের ব্যবহারে লাগে, তেমনই নীচ কুলজাত রাজা শুধু নীচ কুলের মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, মোটেও আর্যদের নয়। এই সব থেকে এটাই বোঝা যায়

যে, নীচবর্ণের মানুষদের পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের আমলাতন্ত্রে পৌঁছানোর পথ সে সময় খোলা ছিল না।

গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল মৌর্য প্রশাসন যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে কিন্তু শূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়েছে। কৌটিল্যের বিধান অনুযায়ী অন্যান্যদের মধ্যে শূদ্রদের ভ্রাম্যমান চর হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করার দরুন তারা প্রতি মুহূর্তে প্রভুদের সংস্পর্শে আসত, তাই তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে ওই ভৃত্যদের সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হত। নিম্নবর্গের লোকেরা দূতের কাজও করত, কারণ, কৌটিল্য বলেছেন, অস্পৃশ্য হলেও দূত অবোধ্য।

অর্থশাস্ত্র-এ শূদ্রদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থার উল্লেখ বেশ কৌতুহল উদ্রেককারী। সম্ভবত নিয়মিত সেনাবাহিনীতে নীচু কাজের জন্য ভৃত্য ও পরিচারক হিসাবে শূদ্রদের নিয়োগ করা হত, পুরো দস্তুর সৈন্য হিসাবে নয়। অর্থশাস্ত্র থেকে এও জানা যায় যে, বিভিন্ন নতুন বসতিতে আদিম জনগোষ্ঠী, যেমন বাগুরিক, শবর, পুলিন্দ ও চণ্ডালদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হত।

আইন ও বিচার ব্যবস্থায় কৌটিল্য বর্ণবিধির নীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পতিত, চণ্ডাল ও নীচ বৃত্তির মানুষ তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের বিষয় ছাড়া অর্থ সংক্রান্ত সাক্ষী হতে পারবে না। কোনো ভৃত্য তার প্রভুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে না, এবং শূদ্রের মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে ভয়াবহ আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব পরিণামের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। যদিও অন্য তিন উচ্চতর বর্ণের ক্ষেত্রে এসবের কোনো উল্লেখ নেই।

শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও কৌটিল্য বিভিন্ন ধর্মসূত্রের বর্ণবিভেদকেই সমর্থন করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে চার বর্ণ ও 'অন্ত্যবাসয়ী'দের (অস্পৃশ্য) মধ্যে নিম্নবর্ণের কোনো মানুষ যদি উচ্চবর্ণের কোনো মানুষের নিন্দা করে, তাহলে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষকে অপমান করলে যে অর্থদণ্ড হয়, তার চাইতে বেশি অর্থদণ্ড দিতে হবে। কোনো শূদ্র ব্রাহ্মণকে যে অঙ্গ দিয়ে আঘাত করবে তা ছেদ করতে হবে এই নিয়মও অর্থশাস্ত্রে আছে। তবে এই নিয়মটি কৌটিল্যের কি না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে, কারণ এই অংশটি অনেক বেশি মনুবাদী ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সমার্থক।

আবার অন্য একটি বিধানে কৌটিল্য বলেছেন কোনো শ্বপাক যদি কোনো আর্যা রমণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বধ করা হবে এবং আর্যা রমণীর নাক আর কান কেটে নেওয়া হবে। এইসব চরম ব্যবস্থা যে শূদ্র ও শ্বপাকের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ কোনো শ্বপাকীর সঙ্গে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীকে কপালে গরম লোহা দিয়ে চিহ্নিত করে নির্বাসনে পাঠানোর বিধান কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। আবার উত্তরাধিকার বিধিতে কৌটিল্য প্রাচীন বর্ণভেদই রক্ষা করেছেন। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মিশ্রণে জাত সত্তা, যেমন সূত, মাগধ, ব্রাত্য ও রথকার পৈতৃক সম্পত্তিতে তাদের অংশের অধিকারী হবে যদি সে সম্পত্তি পর্যাপ্ত হয় তবেই। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য আরও বিধান দিয়েছেন যে, যেসব সন্তান উপরে উল্লেখিত জাতের চেয়েও নীচে অবস্থান করছে, তাদের পৈতৃক সম্পত্তির কোনো অংশের অধিকার নেই। তবে অন্যরা জীবনধারণের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর নির্ভর করতে পারবে। ফলে অয়োগব, ক্ষত্তা, নিষাদ, পুল্কস, চণ্ডাল স্বভাবতই উত্তরাধিকারের ভাগ থেকে বাদ পড়ে যায়। অবশ্য এদের তুলনায় পরাশবের (শূদ্রার গর্ভে জাত ব্রাহ্মণ সন্তান) অবস্থান ভালো। এদের প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে, যদি কোনো ব্রাহ্মণের সন্তান না হয়, তাহলে পরাশব পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। বাকি দু'ভাগ তার জীবিত সপিণ্ডদের ওপর বর্তাবে। তারা না থাকলে মৃতের আচার্য অথবা অন্তেবাসী ছাত্র পাবে। কোনো ব্রাহ্মণের যদি চতুর্বর্ণের প্রত্যেক স্ত্রীরই সন্তান হয়, সে ক্ষেত্রে কৌটিল্য ধর্মসূত্রের আংশবিভাগ নীতি মেনে নিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম ভাগ পাবে শূদ্রের সন্তান।

পাণিনি 'চণ্ডাল'দের শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করলেও কৌটিল্য চণ্ডালদের শূদ্র বলে মনে করেননি। চতুর্বর্ণ প্রথায় তাদের প্রায় স্থান নেই বললেই চলে। চণ্ডালদের 'অস্পৃশ্য' হিসাবে গণ্য করাই ছিল বিধি। অর্থশাস্ত্র থেকে চণ্ডালদের একটি নতুন বৃত্তি জানা যায়। বিধিভঙ্গকারী কোনো নারীকে গ্রামের মাঝখানে বেত্রাঘাত করার কাজে তাকে নিয়োগ করা হবে। যেসব পুরুষ ও নারী নানাভাবে আত্মহত্যা করবে, তাদের মৃতদেহ রাজপথ দিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে চণ্ডাল। অর্থশাস্ত্রে যাদের জাতি আর কার্যকে সমাজে হীন পর্যায়ের বলে দেগে দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকেই কৌটিল্য অপরাধী ও সন্দেহভাজনের তালিকাভুক্ত করেছেন। যার ধারাবাহিকতা এই আধুনিক যুগেও বহমান। এই প্রসঙ্গে আমাদের 'চুরিচামারি' শব্দটির কথাও মনে পড়ে যেতে পারে। চুরির সঙ্গে চামারের কোনো যোগ নেই। চুরি একটি অনৈতিক কাজ বলে গণ্য হয়, আর চামারি একটি বৃত্তি, সেখানে দেহশ্রম আর দক্ষতার মিশেল আছে। কোনো দেহশ্রম জনিত বৃত্তি কিংবা পেশাকে ঘৃণ্য এবং নীচু নজরে দেখার ব্রাহ্মণ্য প্রশিক্ষণ এইভাবেই আজও আমাদের মস্তিষ্ককে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করে।[১৮]

মনুস্মৃতি -তে 'শূদ্র'

অর্থশাস্ত্র পরবর্তী শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্যের অধিকাংশই মনুস্মৃতি থেকে পাওয়া। পণ্ডিতদের মতে এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব দু'শো-তিনশো শতকের মধ্যবর্তী সময়। গোড়ার দিকে বিভিন্ন পুরাণ বর্ণিত কলিযুগ বোধ হয় সেই সময় যখন তীব্র সামাজিক সংঘর্ষ বর্ণ বিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং নানারকম অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও বাক্‌ট্রীয়, গ্রিক, শক, পার্থব ও কুষাণদের অনুপ্রবেশ সমাজকে দুর্বল করে তুলেছিল। অংশত অশোকের বৌদ্ধনীতির প্রতিক্রিয়ায় এইসব নতুন জনবর্গের আবির্ভাবের ফলে মনু ব্রাহ্মণ্য সমাজকে সংরক্ষিত করার আপ্রাণ চেষ্টায় শূদ্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নিধান দেওয়া ছাড়াও বিদেশি আগন্তুকদের বর্ণ সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত বংশপত্রও প্রণয়ন করেছিলেন। আর এই একই উদ্দেশ্যে দণ্ডের শক্তিকে তিনি করে তুলেছিলেন অযথা মহিমান্বিত।

উচ্চতর জাতিদের সেবা করার জন্য ব্রহ্মা নির্দিষ্ট করেছেন শূদ্রদের এই প্রাচীন তত্ত্বটিই মনুসংহিতায় অধিক দৃঢ়তায় ঘোষিত। ব্যবসা, ঋণদান, কৃষিকর্ম আর গবাদি পশুর পরিচর্যার জন্য রাজা আদেশ করবেন বৈশ্যকে। শূদ্রের প্রতি আদেশ হবে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা। আর একটি বড়ো বিধান হল রাজা যেন বৈশ্য আর শূদ্রদের দিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ ও কর্তব্যগুলি পালন করিয়ে নেন। কারণ বৈশ্য আর শূদ্ররা তাদের কর্তব্য না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তাই এই শ্লোকটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোনো পূর্ববর্তী রচনায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্যবস্থা মনে হয় এক সামাজিক, অর্থনৈতিক সংকট পর্বের প্রতিফলন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নিঃসন্দেহে এই যুগ ছিল বহির্বাণিজ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পর্ব। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের প্রথম অর্ধে মৌসুমীবায়ুর কারণে আর দ্বিতীয় অর্ধে 'রেশম পথ' আবিষ্কারের ফলে ভারত স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও চিন এবং জলপথে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিরাট বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম দুই শতকের হুন, কুষাণ, রোমান ও আকার্সিত সাম্রাজ্য যে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা এনে দিয়েছিল, তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়। দামী কাঠ, সূতিবস্ত্র, রেশম, মণি-মাণিক্য, লৌহদ্রব্য, সর্বোপরি লবঙ্গ ও মরিচ ভারত থেকে রপ্তানি হত। বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন নগর ও শিল্প সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে বেশ ভালো সংখ্যায় মৃৎশিল্পী, গৃহনির্মাতা, ইষ্টকশিল্পী, মণিকার, রত্মকার, স্বর্ণকার, লৌহকার, পেতল আর ব্রোঞ্জের কাজে নিযুক্ত কর্মী, ভাস্কর এবং পোড়ামাটির শিল্পী, কাচ শিল্পী ও হাতির দাঁতের কারুশিল্পীদের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এই যুগে বেশ কিছু কারু শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। 'দীঘনিকা'য় চব্বিশটি বৃত্তির কথা আছে। 'মিলিন্দ পঞ্ঞহো' থেকে প্রায় ষাটটি বৃত্তির কথা জানা যায়। 'পন্মবণা' নামে পরিচিত একটি জৈন রচনা হস্তশিল্পীদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য যোগান দেয়। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বস্ত্রকার, তন্তুবায় ও রেশমশিল্পীকে কারু কার্যের দিক থেকে 'আর্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকে অনুমিত জৈনরা এসব কাজকে অশ্রদ্ধা করত না। লক্ষণীয় যে মধ্যযুগের গোড়ার দিক থেকে তন্তুবায়দের অস্পৃশ্য বলে ধরা হয়। বহির্বাণিজ্যের এই স্বর্ণযুগে মনু বিধান দিয়েছেন শূদ্ররা কারুবৃত্তি গ্রহণ করবে তখনই, যখন তারা উচ্চবর্ণকে প্রত্যক্ষভাবে সেবা করে জীবনধারণে অক্ষম হয়ে পড়বে। মনু বেশ কয়েকটি বিধান প্রণয়ন করেন, যা শূদ্রদের আর্থিক অবস্থাকে মন্দ করে দেয়। যেমন শূদ্র

ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ নির্দ্বিধায় তার শূদ্র দাসের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারবে। কারণ শূদ্র ধনের অধিকারী হতে পারে না (*মনুস্মৃতি* ৮।৪১৭)।

শূদ্ররা উচ্চবর্ণের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করলে মনু বেশ কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। ফলে কোনো শূদ্র যদি দ্বিজকে কটূ বাক্য বলে অপমান করে, তবে তার জিভ কেটে নেওয়া হবে (*মনুস্মৃতি* ৮। ২৭০)। 'দ্বিজ' শব্দটি এ ক্ষেত্রে শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়কে বোঝায়, কারণ শূদ্র কোনো বৈশ্যকে গালাগালি করলে এই শাস্তি না দেওয়ার জন্য পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মনু আরও বিধান দিয়েছেন যে, কোনো শূদ্র যদি দ্বিজের নাম ও জাতির অবজ্ঞা করে মন্তব্য করে, তাহলে দশ আঙুল লম্বা একটা গরম লোহার কাঠি তার মুখে ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে (মনুস্মৃতি ৮।২৭১)। দৈহিক আঘাত ও ওই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে শূদ্রদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নিম্নবর্ণের মানুষ ('অন্ত্যজঃ') যে অঙ্গ দিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষকে ('শ্রেষ্ঠঃ') আঘাত করবে, সেই অঙ্গ কেটে ফেলতে হবে (*মনুস্মৃতি* ৮।২৭৯)। টীকাকার কুল্লূকভট্ট এখানে 'অন্ত্যজঃ' অর্থে শূদ্র বুঝিয়েছেন, যা আগের শাস্তির বিধানগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। মনুসংহিতার অন্য একটি বিধান (৮।২৮১) সবচেয়ে নীচু ঘরে জন্ম যার ('অপকৃষ্টজঃ') এমন কোনো লোক যদি উচ্চজাতির ('উৎকৃষ্টঃ') কোনো মানুষের সঙ্গে একই রকম আসনে বসার চেষ্টা করে, তাহলে তার কোমরে গরম লোহার কাঠি দিয়ে দাগ গিয়ে তাকে নির্বাসন দেওয়া হবে। বা রাজা তার নিতম্বে গভীরভাবে ক্ষত করার শাস্তি দেবেন। এখানে 'অপকৃষ্টজঃ' আর 'উৎকৃষ্টঃ' শব্দের অর্থ যথাক্রমে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ। একইভাবে যদি কোনো শূদ্র উদ্ধতভাবে কোনো ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু ফেলে, তবে রাজা তার দুটি ঠোঁটই কেটে ফেলার ব্যবস্থা করবেন। যদি সে ব্রাহ্মণের ওপর প্রস্রাব করে বা বায়ু ত্যাগ করে, তাহলে

যথাক্রমে তার পুরুষাঙ্গ আর পায়ু কেটে ফেলার ব্যবস্থা করা হবে। আবার যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের চুল ধরে থাকলে রাজার উচিত নির্দ্বিধায় তার হাত কেটে ফেলা এবং ওই একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি ব্রাহ্মণের পা, দাড়ি, ঘাড় বা অণ্ডকোষ ধরে টানে। আর এইসব ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মনু আলাদা একটি বিধি প্রণয়ন করেছেন (মনুস্মৃতি ৯।২৪৮)। যদি হীন বংশজাত শূদ্র ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাহ্মণের 'বাধা ঘটায়' তাহলে রাজা তার জন্য বিভিন্ন ভয়ংকর দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতে, বাধা ঘটানোর অর্থ তার শারীরিক উৎপীড়ন, তার সম্পত্তি অপহরণ।

মনুস্মৃতি-র পাশাপাশি ধর্মশাস্ত্রেও এইসব বিধানের অস্তিত্ব দেখে বোঝা যায় যে উচ্চতম আর নিম্নতম বর্ণের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই অপ্রীতিকর। বিধানের অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অপরাধী শূদ্রদের উদ্দেশে কল্পিত। শূদ্র পুরুষ ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে মান্য সবচেয়ে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। অরক্ষিতা দ্বিজ জাতির স্ত্রীর সঙ্গে যে শূদ্র সহবাস করবে, সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব হারাবে। প্রসঙ্গত মনে পড়বে যে কৌটিল্য এই ক্ষেত্রে শূদ্র অপরাধীকে পুড়িয়ে মারার বিধান দিয়েছেন (*অর্থশাস্ত্র* ৪।১৩)।

দাসত্ব শূদ্রদের চিরন্তন নিয়তি— এই নীতি মনুই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই দাস নীতি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের মধ্যে প্রযোজ্য। মনু বলেছেন কেনা হোক বা না-হোক, শূদ্রকে দাসে পরিণত করা হবে, কারণ ব্রাহ্মণের সেবার জন্য ব্রহ্মা তাদের সৃষ্টি করেছেন। এর পরের দিকের শ্লোকে তিনি আরও যোগ করেছেন শূদ্রকে কখনই দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না। কারণ, দাস্যভাব তার স্বভাবজ। শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মনুর বিভিন্ন বিধানের অধিকাংশই প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতামতের

চর্বিতচর্বণ। বিষয়টা আরও জোরালো ভিত্তি দিতে তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন সৃষ্টি সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনি, যেখানে শূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়েছে সবার নীচে।

শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানেও মনু বর্ণভেদ রেখেছেন। তাঁর কথা অনুযায়ী (*মনুস্মৃতি* ২।৩১) ব্রাহ্মণদের নাম হওয়া উচিত মঙ্গলবাচক। ক্ষত্রিয়ের বল, বৈশ্যের ধন আর শূদ্রের নাম যেন কোনোকিছু ঘৃণ্য সূচিত করে। এরই অনুসিদ্ধান্ত থেকে তিনি বলেছেন চার বর্ণের উপাধি থেকে যথাক্রমে আনন্দ, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সেবা বোঝানো উচিত। শূদ্রের জন্য ব্যবহৃত 'বৃষল' শব্দটি ছিল গালি ও অমর্যাদার শব্দ। সমাস বিষয়ে পাণিনির একটি সূত্রের উদাহরণ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন 'দাসীর সদৃশ' বা 'বৃষলীর সদৃশ' শব্দ দুটি হচ্ছে গালাগালি। পতঞ্জলি এই প্রসঙ্গে আরও জানান যে বৃষল, দস্যু ও চোরকে সমাজে নিকৃষ্ট মানুষ হিসাবে দেখা হত। পতঞ্জলি থেকে আরও জানা যায় উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিদের যৌন তৃপ্তি দেওয়া ছিল দাসী ও বৃষলীদের কর্তব্য।

মনুসংহিতা -য় প্রথম চার জাতীয় বিবাহ 'ব্রেশ', 'দৈব', 'আর্য' আর 'প্রাজাপত্য' ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত। ক্ষত্রিয়দের জন্য 'রাক্ষস' এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য 'আসুর'। ব্রাহ্মণকে অন্য তিন বর্ণের চেয়ে পৃথক করাই ছিল সম্ভবত এই ক্ষেত্রে মনুর প্রধান উদ্দেশ্য। এরই পুনরাবৃত্তি মহাভারতের আদিপর্বে দেখা যায়। মনু বিধান দিয়েছেন 'আসুর' ও 'পৈশাচ' রীতিতে বিবাহ করা অনুচিত, কারণ কন্যা ক্রয়ের মাধ্যমে আসুর রীতিতে বিবাহ সাধারণত বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন সংকর জাতি, যেমন 'নিষাদ', 'পারশব', উগ্র', 'আয়াগব', 'ক্ষত্তা', 'চণ্ডাল', 'পুক্কস', 'কুক্কুটক' বর্ণের কথা মনু উল্লেখ করেছেন। এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন

বর্ণের সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি। উগ্র কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ ‘আবৃত’ সন্তানের জন্ম দেয়। অন্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে ‘আভীর’ এবং অয়োগব জাতির স্ত্রীর ক্ষেত্রে ‘ধিগ্বণ’। এছাড়া অয়োগব স্ত্রীর গর্ভে ‘দস্যু’, ‘বৈদেহক’ ও ‘নিষাদ’ যথাক্রমে ‘সৈরন্ধ্র’, ‘মৈত্রেয়ক’ ও ‘মার্গব’ বা দাসের জন্ম দেয়। শেষোক্তজন ‘কৈবর্ত’ নামেও পরিচিত। ‘বৈদেহক’ জাতির স্ত্রী থেকে ‘চণ্ডাল’, ‘পাণ্ডুপোপক’এর জন্ম দেয় এবং নিষাদ ‘আহিন্তক’এর। ওই একই জাতির স্ত্রীর ক্ষেত্রে ‘নিষাদ’ ‘কারাবর’-এর জন্ম দেয়। আর ‘বৈদেহক’, ‘কারাবার’ ও ‘নিষাদ’ স্ত্রী থেকে ‘চণ্ডাল’ অন্ত্যাবসায়ী নামক পুত্রের পিতা হয়, যাকে এমনকি বর্ণ প্রথার বর্হিভূত ব্যক্তিরাও ‘বাহ্য’ ঘৃণা করে। এই প্রসঙ্গে মনু আরও বলেছেন ‘সূত’, ‘বৈদেহক’, ‘চণ্ডাল’, ‘মাগধ’, ‘ক্ষত্তা’ ও ‘আয়াগব’রা একই জাতির স্ত্রীর গর্ভে যেসব সন্তানের জন্ম দেয়, তারা আরও বেশি ঘৃণ্য, জনকদের চেয়েও কলুষিত এবং তারা বর্ণ সমাজ বহির্ভূত।

বিভিন্ন সংকর জাতিকে তাদের বৃত্তির মাধ্যমে পৃথক করা হত। ‘চণ্ডাল’, ‘শ্বপাক’ ও ‘অন্ত্যাবসায়ী’রা অপরাধীদের বধ করার কাজে নিযুক্ত হত ও তাদের বস্ত্র-সজ্জা ও অলংকার গ্রহণ করত। ‘নিষাদ’রা মাছ ধরে জীবনধারণ করত এবং ‘মেদ’, ‘অন্ধ্র’, ‘মদুগু’ ও ‘চঞ্চু’দের বন্যপ্রাণী শিকারে নিয়োগ করা হত। গর্তের ভেতর যেসব প্রাণী বাস করে তাদের ধরা আর হত্যার কাজে ‘ক্ষত্তা’ ‘উগ্র’ ও ‘পুক্কস’রা নিযুক্ত ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই এরা ছিল পিছিয়ে পড়া আদিম জনগোষ্ঠী, যারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে নিজেদের বৃত্তির কারণে জায়গা পেয়েছিল। যেমন ‘অয়োগর্ব’রা কাঠের কাজ করত, ‘ধিগ্বণ’ ও ‘কারাবর’রা চামড়ার কাজ করত। আর ‘পাণ্ডুসোপাক’দের কাজ ছিল বেতের জিনিস তৈরি করা। ‘মার্গব’ আর ‘দাস’রা জেলের কাজ করত, তারা আর্যাবর্তের লোকেদের কাছে পরিচিত ছিল ‘কৈবর্ত’ নামে। আবার সৌরন্ধ্র’রা ‘বেণ’ বা ভাঁড়ের মতো

দেখতে বাজনা বাজিয়ে প্রভু কিংবা রাজার মনোরঞ্জনে পটু ছিল। এরা দাস না-হয়েও দাসেদের মতো থাকত। আবার ফাঁদ পেতে পশুপাখি শিকার করে জীবনযাপন করত। ‘মৈত্রয়ক’দের মিষ্টভাষী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের কাজ ছিল ভোর হলে ঘণ্টা বাজানো আর সমাজের মহান ব্যক্তিদের প্রশংসা করা।[১৯]

মনু বর্ণিত বিভিন্ন সংকর জাতির অধিকাংশ ছিল অস্পৃশ্য। নিষাদ, আয়োগর্ব, মেদ, অন্ধ্র, চঞ্চু, মদগু, ক্ষত্তা, পুক্কস, ধিগ্‌বণ আর বেনেদের কাজের কথা বলার পরে মনু নির্দেশ করেছেন যে এরা গ্রামের বাইরে চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, পর্বত ও উপবনের কাছে বাস করবে। এর থেকে দেখা যায়, এইসব জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস ছিল ব্রাহ্মণ্য বসতির বাইরে। চণ্ডাল আর শ্বপাকদের বাসনপত্র চিরকালের মতো বর্জন করা হত। কুকুর আর গাধা ছিল তাদের একমাত্র সম্পত্তি। তারা ভাঙা থালায় খেত, লোহার গয়না আর মৃত ব্যক্তির জামাকাপড় ব্যবহার করত। গ্রাম কিংবা নগরে তারা শুধু দিনের বেলায় কাজ করতে পারত। রাতে আসার অনুমতি তাদের ছিল না। মনু বিধান দিয়েছেন যে চণ্ডালদের কপালে এবং শরীরের অন্যত্র তপ্ত শলাকা দিয়ে চিহ্নিত করে তাদের বাকি জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে দিতে হবে। মনুর অন্য একটা বিধান অনুযায়ী শূদ্র যেন ব্রাহ্মণের শব বহন না করে। কারণ, সে যদি আহুতি ছুঁয়ে অপবিত্র করে, তাহলে সেই মৃত ব্যক্তি স্বর্গে পৌঁছাবে না। এইভাবে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তার সঙ্গে শূদ্রের পার্থক্য বজায় রাখা হয়েছে।

মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় সমাজের অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন মিশরের রাজত্বের পতনের পরবর্তী অবস্থার সাজুয্য লক্ষণীয়। সেখানে জনগন কিছুকাল পুরোহিত আর অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছিল। অতএব, অশোকের ব্যবস্থাদি ব্যর্থ করার চেয়ে মনুর বিভিন্ন বিধানের উদ্দেশ্য ছিল মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙনের

পরবর্তী বিভিন্ন অসংহতির শক্তিকে প্রতিহত করা। শূদ্ররা কাজ করতে অস্বীকার করার ফলেই নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষে শূদ্রদের দাসসুলভ প্রকৃতির প্রতি প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গত খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন রকম হুকুমনামা জারি করে নানা ধরনের মানুষকে তাদের নিজস্ব বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে মনুর বিভিন্ন ব্যবস্থার মোটামুটি একটি সাদৃশ্য আছে।

পরবর্তী যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব শূদ্রদের কাছে বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য প্রথা তাদের ওপর যেসব ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তার থেকে তারা সামান্য মুক্তি পেয়েছিল। বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী জাতির কাছে বিষ্ণুর উপাসনা দিয়েছিল মুক্তির প্রতিশ্রুতি।[২০]

বৌদ্ধধর্মে শূদ্র

'সুদ্দ দাসো বা' এই পালি শব্দবন্ধের অর্থ যে শূদ্র, সেই দাস।

মনুসংহিতা-য় যে প্রবল ব্রাহ্মণ্য উন্মাদনা দেখা যায়, তার প্রামাণিকতা সমসাময়িক সাহিত্য সম্ভারেও পাওয়া যায়। যেমন পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*, ভাসের নাটক, কিংবা *মিলিন্দ পঞ্হো, দিব্যাবদান, মহাবস্তু, সদ্ধার্মপুণ্ডরীক*-এর মতো বৌদ্ধ রচনায় চোখে পড়বে। *মনুস্মৃতি*-তে যেসব নিম্ন জাতির কথা বলা হয়েছে, সেই ধরনের বিশেষ কয়েকটি নিম্ন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় 'সদ্ধামর্পুণ্ডরীক' সূত্রে। সেখানে বলা হয়েছে যে চণ্ডাল কৌক্কুটিক (হাঁস, মুরগি ইত্যাদি পালনকারী), সংকরিক (শূয়োরের মাংসের কসাই), শৌণ্ডিক (মদ বিক্রেতা ও ফেরিওলা), মাংসক (কসাই), মৌষ্টিক (মুষ্টিযোদ্ধা), নট-নর্তক, বাল্লম ও মল্লম (কুস্তিগীর),

এদের সঙ্গে বৌদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের অনুগামীরা কোনো সংস্রব রাখবে না। নিষ্ঠুর ও অশুদ্ধ কাজের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য বৌদ্ধরা এই নিম্ন শ্রেণির মানুষদের তাচ্ছিল্য করত।

বৌদ্ধ রচনা *লঙ্কাবতার সূত্র* ও *ব্রজসূচি* থেকেও শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। প্রথমটি চারশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের আগে সংকলিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টির সময়কাল সম্পর্কে অতখানি নিশ্চিত হওয়া যায় না। সুশীল কুমার দে তাঁর *History of Sanskrit Literature* গ্রন্থে মৌর্যোত্তর যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কবি অশ্বঘোষের রচনা বলে মনে করেননি। ইং সিঙ অশ্বঘোষের রচনার যে তালিকার উল্লেখ করেছেন, সেখানে এই বই দুটির নাম নেই। প্রথম সহস্রবাদের শেষের দিকে এই বই দুটোর চিনা অনুবাদে বলা হয়েছে মূল লেখক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি। তবে ‘বজ্রসূচি’তে মনুসংহিতার বিভিন্ন উদ্ধৃতি দেখে অনুমান করা যায় এটি মনুর পরবর্তী রচনা। সদাচারী শূদ্রও যে প্রজন্মে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে, এই মত মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের নীতিমূলক অংশে যেমন আছে, ঠিক তেমনই রয়েছে *বজ্রসূচি*-তে। যেমন *মহাভারত* -এর বনপর্বে ঋষি কৌশিকের কাহিনি। আখ্যানে বলা হয়েছে অরণ্যচারীর বিভিন্ন কর্তব্য এবং তার অনুসারী নৈতিক আচরণ বিধি ঋষি কৌশিক শিখেছিলেন এক ধর্মজ্ঞ ব্যাধের কাছে। মিথিলার এই ব্যাধ দাবি করেছিলেন তিনি অগ্রজ ও গুরুজনদের সেবা করেছেন, সদা সত্য কথা বলেছেন, কাউকে ঈর্ষা করেননি, সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেছেন, এবং দেবতা, আশ্রিতা ও অতিথিদের সেবা করার পর যা অবশিষ্ট থেকেছে তাই দিয়ে জীবনধারণ করেছেন। তিনি কখনও কারও নিন্দা করেননি, কাউকে ঘৃণাও করেননি। বলা হয় এই কাহিনিটির সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সঙ্গতি আছে। লক্ষ করার বিষয় ব্যাস, কৌশিক, বিশ্বামিত্র

কিংবা বশিষ্ঠ প্রত্যেকেই নীচ কুলজাত কিন্তু তাঁরা তাঁদের কর্মের গুণে ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য হন। এই যুক্তি একইভাবে *বজ্রসূচি*-তেও দেখতে পাওয়া যায়।

শিক্ষায় শূদ্রদের অনাধিকারের ছবি *জাতক* কাহিনিগুলিতেও পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত *কারণ্ডিক জাতক*-এ আছে পৃথিবীর সব জায়গার মাটি যেমন সমান নয়, তেমনই সকলে শিক্ষার যোগ্য নয়। চিত্র সম্ভূত জাতকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দুই চণ্ডাল তক্ষশিলায় যায় লেখাপড়া শেখার আশায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়ে যায়। এবং তক্ষশিলা থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়। কটাহক জাতকে আছে আরেক কাহিনি। বোধিসত্ত্ব এক সময় বারাণসীতে বেশ ধনী এক মহাজন ছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী ও এক দাসী একই সময় দুটি ছেলের জন্ম দেন। একটু বেশি বয়স হলে মহাজনের ছেলে লেখাপড়া শিখতে গেল। দাসীর ছেলে গেল তার সঙ্গে কাঠের শ্লেট বয়ে নিয়ে যেতে। প্রভুর ছেলের লেখাপড়া শেখা দেখতে দেখতে দাসীর ছেলেও লেখা শিখে গেল। ঠিক যেমন দ্রোণ প্রত্যাখ্যান করার পর একলব্য নিজের অধ্যবসায়ে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।[২১]

উপসাঢ় জাতক-এর আরেক কাহিনিতে এক ব্রাহ্মণকে দেখি সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকে। শূদ্রের শব দাহ করা হয়েছিল এমন কোনো জায়গার ভয় তাকে তাড়া করে ফিরত। সারাক্ষণ পবিত্র শশ্মান খুঁজে বেড়াত সে। *অঙ্গুত্তর নিকায়* বুদ্ধ বলেছেন স্বেচ্ছাকৃত ও সঞ্চিত কর্ম ফল ভোগ করার আগে কখনও মুছে যায় না। এবং এগুলি এ জন্মের পরবর্তী কোনো জন্মে ফলতে পারে। স্বেচ্ছাকৃত ও সঞ্চিত কর্ম থেকে উপজাত অশুভের কোনো শেষ নেই, কাজেই সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করার জন্য পুনর্জন্ম অপরিহার্য হয়ে উঠল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে জন্মান্তর কর্মবাদের পুরো প্রকল্পটি সমাজের সর্বত্র সঞ্চরণ

করেছিল। আজীবিকরা যা পরিহার করল তা জন্মান্তর নয়, জন্মান্তরের হেতু যে কর্ম, সেই তত্ত্বটি। আর এর সাজুয্যে হিন্দু ধর্ম থেকে বৌদ্ধ ধর্মে অনুপ্রবেশ করল নিয়তিবাদ। যার দুটি ব্যাখ্যা: প্রথমটি নিজের কৃতকর্ম আর দ্বিতীয়টি ভাগ্য মানুষের জন্য যা আগে থেকেই মেপে রেখেছে। এই অজ্ঞেয় তত্ত্বটিকে কর্মবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হল, কিন্তু এর নিশ্চয়তাকে আরও নিশ্চিত করতে বলা হল নিজের অগোচরে পূর্বজন্ম থেকে মানুষের বহু পাপকর্ম সঞ্চিত থাকে, যা অপরিশোধিত ঋণের মতো কোন-না-কোন সময় শোধ করতেই হয়। আর এই তত্ত্বটির ওপর নির্ভর করে সমগ্র জাতক কাহিনি রচিত হল। জাতক কাহিনিগুলিতে জন্মান্তরবাদকে ধর্ম প্রত্যয়ের একটি স্থির স্তম্ভ হিসাবে ধরে নেওয়া হল। এই ধারণা থেকেই দেখা গেল জাতক কাহিনিগুলিতে বার বার বিভিন্ন জন্মে বুদ্ধের আবির্ভাব এবং সেটাও নীচ যোনি থেকে শুরু করে ক্রমশ উচ্চ যোনিতে জন্মের মধ্যে দিয়ে আর এইভাবেই বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্মের শূদ্র মতবাদের আত্তীকরণ ঘটল।

বৌদ্ধ তথ্যসূত্রগুলির মধ্যে চারটি সূক্ত (সংলাপ) সংগ্রহ, অর্থাৎ 'দীঘ', 'মজঝিম', 'সংযুক্ত ওঁ অঙ্গুত্তর' এবং এর সঙ্গে 'বিনয়পিটক'কে মোটামুটিভাবে প্রাক্-মৌর্য যুগের সংকলন বলে ধরা হয়, যদিও বিনয়পিটকের অনেকটাই ধরা হয় মৌর্য যুগের রচনা বলে 'জাতক'এর সময় স্থির করা আরও কঠিন। কৌতুহলজনক বিষয় এই যে, প্রাচীন জাতক কাহিনিগুলির পটভূমি হল ভারতের পশ্চিম অথবা মধ্য অংশ কিন্তু অধিকাংশ বর্তমান কাহিনির পটভূমি হল সারথি (শ্রাবস্তী) বা রাজগহ (রাজগৃহ)। সাধারণ ভাবে ধরা যেতে পারে যে তৃতীয়, চতুর্থ য় পঞ্চম খণ্ডের কাহিনিগুলি বর্তমান রূপ পেয়েছে পরে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ সরল কাহিনিই তার আগেকার।

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি তাঁর *An Introduction To the Study of Indian History* (1956) বইতে প্রস্তাব রেখেছেন, জাতক কাহিনি এমন এক সামাজিক অবস্থা উপস্থাপিত করে যা বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল, সম্ভবত সাতবাহন যুগের। এই প্রসঙ্গে যদিও ধরা যায় যে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার দু'-তিন শতাব্দী আগে অবস্থা যা ছিল, গাথা ও অতীত কাহিনিগুলিতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। জাতকের যে অংশগুলিতে 'চণ্ডাল' প্রসঙ্গ আছে, আমাদের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সেগুলিকে পরবর্তীকালের সংযোজন বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কারণ জাতকেই যেসব ঘৃণিত লোকের কথা আছে, প্রাক্-মৌর্য যুগের ব্রাহ্মণ্য রচনা দিয়ে তা পুরোপুরি সমর্থিত হয় না। ধর্মসূত্রগুলির যেখানে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, বৌদ্ধ আর জৈন তথ্যসূত্রে যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যের ওপর। নিম্নবর্গের ওপর প্রচ্ছন্ন সমবেদনাও দেখানো হয়েছে কদাচিৎ। উপরন্তু, ধর্মসূত্র এবং বৌদ্ধ ও জৈনসূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য যথাক্রমে উত্তর ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ।

শূদ্রদের সম্পর্কে আদি পালি রচনায় সরাসরি কিছু তথ্য আছে, জৈন রচনায় আরও কম। শূদ্ররা যে সেবক-শ্রেণি, সে কথা পরবর্তীকালে ধর্মসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে সুস্পষ্ট ভাবে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শূদ্রদের কর্তব্য হল, উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। সম্ভবত, শূদ্র সম্প্রদায়ের একাংশ তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, চিত্রকর ইত্যাদি কাজগুলি করতেন। পালি রচনায় এইসব শিল্পের উল্লেখ থাকলেও শিল্পীদের বর্ণের কোনো উল্লেখ নেই। দীঘনিকায় সূত্রের কিছু উল্লেখ থেকে ধারণা করা যেতে করা হয়, কিছু অবস্থাসম্পন্ন শূদ্র হস্তশিল্পী 'গৃহপালিত' (জৈন রচনায় গাভাবৈ নামে পরিচিত) ছিলেন। যেমন কুমার চুন্দ, যিনি গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শ্রমণদের খাইয়ে আপ্যায়িত

করেছিলেন। কিংবা চোখে পড়ার মতো ধনী কুমার সদ্দালপুত্ত, যাঁর পাঁচশো হাঁড়িকুঁড়ির দোকান ছিল। বহু কুমোর তাঁর অধীনে কাজ করত। সম্ভবত সংখ্যায় অল্প হলেও শূদ্রবর্ণভুক্ত কিছু হস্তশিল্পী প্রাক্-মৌর্য যুগে কৃষি অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তবে বৃহত্তর শূদ্র সাধারণ মনে হয় কৃষিকাজেই নিযুক্ত ছিল। আদি পালি রচনায় বহু জায়গায় ঠিক শূদ্রের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'দাস' ও 'কম্মকর'দের (ভাড়া করা শ্রমিক) চাষ আবাদের কাজে লাগানোর কথা আছে। ভূমিহীন শূদ্রদেরই যে 'কম্মকর' হিসাবে নিয়োগ করা হত, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। দাসেদের অধিকাংশই যে শূদ্র বর্ণজাত ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

দীঘ নিকায় বলা আছে 'সুদ্দোবা সুদ্দ-দাসোবা'— এই শব্দগুচ্ছ থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রথম তিন বর্ণের তালিকার পর শূদ্রদের অবস্থান নির্দেশ করার জন্য বুদ্ধ এই কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে 'সুদ্দ-দাসোবা' পদের অর্থ 'শ্রমজীবী দাস' করলে ভুল হবে। স্পষ্টভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি সমাবস্থান সূচক কর্মধারার উদাহরণ। এর অর্থ যিনি শূদ্র, তিনিই দাস। আর এও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে শূদ্রের সঙ্গে দাসেদের অভিন্ন করার বিষয়টি সর্বপ্রথম পাওয়া যাচ্ছে একটি আদি পালি রচনায়, ধর্মসূত্রে নয়। মৌর্য যুগে এসে মনু আরও স্পষ্টভাবে এই সামাজিক অবস্থার কথা ঘোষণা করলেন।

ধর্মসূত্র -এ গৌতম বিধান দিয়েছেন যে শূদ্র ভৃত্যরা উচ্চতর বর্ণের লোকেদের পরিত্যক্ত জুতো, ছাতা, কাপড়, মাদুর ইত্যাদি ব্যবহার করবে। জাতকের একটি কাহিনিতেও একই ছবি পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে ইঁদুরে কাটা পোশাক দাস ও কম্মকরেরা ব্যবহার করবে। ধর্মসূত্রে আরও বলা হয়েছে শূদ্ররা উচ্ছিষ্ট খাবে। 'বিনয়পিটক'-এর একটি অংশে দেখা যায় জনৈক বণিকের অসুস্থ স্ত্রী তার বমি করা ঘি

জমিয়ে রেখেছিল যাতে তা শূদ্র কিংবা কম্মকাররা গায়ে মাখতে পারে কিংবা ঘরের প্রদীপ জ্বালাতে পারে। এসব থেকে অনুমিত হয় সে সময় শূদ্র ভৃত্যরা তাদের প্রভুর ভুক্তাবশেষ খাবে এটা আদৌ অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিল না।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যারা জীবনধারণ করে, তাদের জীবন খুব কষ্টের ('পরেসং ভতিং কত্বা কিচ্ছেন জীবতি) জাতক ১ম, ২য়, ৩য় তিনটিতেই এই শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়। এক জায়গায় জনৈক শ্রমিক যিনি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তাঁর দুরাবস্থার জন্য বিলাপ করেছেন এই ভাষায়, 'আমি পারিশ্রমিক হিসাবে এক মাস্ক বা আধ মাসক পাই, আর তাই দিয়ে মাকে কোনরূপে প্রতিপালন করি।' এখানে বলা হয়েছে ঘেসেড়ার দৈনিক আয় দুই মাসক। কাতা ঘাস বাজারে বেচে তারা এই পেত। মাসক সম্ভবত এই সময়ের কোনো তামার মুদ্রা। আদি পালি রচনার অর্থকথা অনুযায়ী প্রচলিত মুদ্রা মানের ক্রমে এই মাসক মুদ্রাটি মান এতই নীচে ছিল যে এটিকে প্রায় নগণ্য বিবেচনা করা হত।

একটি জৈন রচনায় দাস, ভৃত্য (পেস্‌স), ও ভারবাহী পশুদের একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। পালি রচনাদিতে দাস, পেস্‌স, কম্মকরদের বহুল উল্লেখ আছে। বুদ্ধের যুগে বেতনের বিনিময়ে লোক ভাড়া করা প্রচলিত ছিল। বেতনজীবীর প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা অনেকগুলি শব্দ পাই। যেমন পেস্‌স, ভতক, পুরিস কিংবা কম্মকর। কিন্তু পালি রচনায় 'দাস' শব্দের সঙ্গে কম্মকর শব্দটিরও পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রেও এই একই প্রথা চোখে পড়ে। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিংবা অন্যান্য সংস্কৃত রচনায় কর্মকর শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই সব কিছু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে 'দাস' ও 'কম্মকর' ছিল একই সামাজিক পর্যায়ভুক্ত।

অঙ্গুত্তর নিকায় ও অন্যান্য পালি রচনাদিতে বার বার ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গহপতিদের বলা হয়েছে 'মহাসাল' (ধনবান)। অর্থাৎ, দাস, পেস্‌স, কম্মকর, পুরিস এবং ভতকরা তেমন ভাগ্যবান ছিল না। *বিনয়পিটক* -এ কৃষি, বাণিজ্য এবং গোপালন উঁচু ধরনের কাজ হিসাবে বিবেচিত হত। স্পষ্টতই এইগুলি বৈশ্যর কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে ছুতোর আর ঝাড়ুদারদের নীচ জাতীয় লোক বলে গণ্য করা হয়েছে। একই রচনায় পাঁচটি নীচ জাতীয় কাজের (হীনসিপ্পানি) উল্লেখ আছে। এরা হল নলকার (যে বাঁশের কাজ করে), কুম্ভকার (যে মাটির কাজ করে), পেসকার (যে বোনার কাজ করে), চম্মকার (যে চামড়ার কাজ করে) এবং নহপিত (যে চুল-দাড়ি কাটার কাজ করে)।

কিছু কিছু কারুকর্মকে নীচু নজরে দেখার যে প্রবণতা ছিল এই শব্দগুলি তারই ইঙ্গিত। যেহেতু শূদ্রদের নানান শাখা-প্রশাখার লোক এইসব বৃত্তি অবলম্বন করত, তাই কালক্রমে শূদ্রের ক্রিয়া ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'দীঘ নিকায়ে'র একটি অংশে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ 'লুদ্দাচার খুদ্দাচার তি' থেকেই স্পষ্ট। এর অর্থ হল শূদ্র হল তারাই, যারা মৃগয়া ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী। একটি জৈন রচনাতেও কুকুর, চোর, ডাকাত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি শব্দের মতো বৃষল, গৃহদাস (জন্মসূত্রে দাস), নীচকুলজাত হতভাগ্য ইত্যাদি শব্দও ঘৃণাবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আদি পালি রচনা *মজ্‌ঝিম নিকায়* -এ পাঁচটি ঘৃণ্য বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়: চণ্ডাল, নিষাদ, বেন, রথকার ও পুক্কস। বলা হয়েছে যে তারা নীচকুল বা হীনজাতি। *বিনয়পিটক* -এ পাই শ্রমণদের বুদ্ধ বিশেষ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ভিক্ষুদের আগে জাতি, সিপ্প, কম্ম ইত্যাদির উল্লেখ করে তাঁদের অপমানসুচক কথা না বলেন। বৌদ্ধ রচনায় কয়েকটি ঘৃণ্য জাতির সঙ্গে মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ সমাজের অস্পৃশ্য শাখাগুলির

মিল আছে। বৌদ্ধ ও জৈন রচনা অনুসারে পুক্কসরা শূদ্র বর্ণভুক্ত নয়। চণ্ডালরা সম্ভবত আদিতে ছিল আদিম এক জনগোষ্ঠী, যেমন শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, গৌড় কিংবা গান্ধারদের সঙ্গে এদেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু কালক্রমে চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা শুরু হয়। আপস্তম্ব'এর মতে কোনো চণ্ডালকে স্পর্শ ও দর্শন করাও পাপ। কিন্তু ধর্মসূত্রের দুটি প্রাচীনতর পুঁথিতে অবশ্য এই অংশটি পাওয়া যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রকট হয়ে শুরু করে আরও পরে; সম্ভবত প্রাক্-মৌর্য যুগের শেষ দিকে। পরবর্তীকালে গৌতমের রচনায় অনুরূপ একটি বিধান আছে। তাঁর মতে কোনো চণ্ডাল যদি কারও দেহ অপবিত্র করে, তবে সবস্ত্র স্নান করে শুদ্ধ হওয়া যায়।

পালি রচনায় চণ্ডালদের স্পষ্টতই অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে একটি জাতক কাহিনিতে চণ্ডালদের বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর হীনতম মানুষ হিসাবে। যে বাতাস চণ্ডালদের দেহ স্পর্শ করেছে, তার স্পর্শও দূষ্য বলে গণ্য করা হত। চণ্ডাল দর্শনই ছিল অমঙ্গলের পূর্বাভাস। তাই বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠী কন্যা চণ্ডাল দেখে নিজের চোখ ধুয়ে ফেলে, কারণ সেই ঘৃণ্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই চোখ কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত উচ্চতর বর্ণের সব লোকই চণ্ডালদের ঘৃণা করত, বিশেষত ব্রাহ্মণরা। এ নিয়ে জাতক কাহিনিগুলিতে বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পালি রচনা *অঙ্গুত্তর নিকায়ে* -র একটি উপমায় বলা হয়েছে যে, ছিন্নবস্ত্র পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে চণ্ডাল বালক বালিকারা গ্রাম ও নগরে ঢুকেই নম্র ভাবভঙ্গি করে ও চলে যায়। লক্ষণীয় চণ্ডাল বিষয়ে অধিকাংশ উল্লেখই পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী জাতক কাহিনিতে, বিশেষত চতুর্থ খণ্ডে। বেন'রা ছিল আর একটি আদিম জনগোষ্ঠী। তাদের জীবিকা ছিল

শিকার ও বাঁশের জিনিস তৈরি করা। পরবর্তী একটি জাতক কাহিনিতে 'বেণী' শব্দটি চণ্ডালদের সঙ্গে একযোগে ভৎর্সনা সূচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২২]

এখানে একটি প্রশ্ন আসে, কেন বিশেষ কয়েকটি বৃত্তিকেই অশুচি বলে দেগে দেওয়া হল? বেদোত্তর সমাজে দেখা দিতে শুরু করেছিল কায়িক শ্রম ও বৃত্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব। কালক্রমে উচ্চবর্ণের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা প্রাথমিক উৎপাদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিল, তাদের পদ আর বৃত্তি হয়ে উঠল বংশানুক্রমিক আর তখন থেকেই তাদের মধ্যে জেগে উঠল কায়িক শ্রমের প্রতি ঘৃণা। শুধু তাই নয়, যে হাত সেই কাজ করে, ঘৃণা প্রসারিত হল তার দিকেও। কায়িক শ্রমের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হল বস্তু বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা (ট্যাবু) এবং অশুচিতার আদিম ধারণা। এই দুই মিলেই সৃষ্টি হল অস্পৃশ্যতা। তারা কাজ করত মৃতদেহ নিয়ে, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অশুচিতা ও আতঙ্কের আদিম ধারণা। এর জন্য এই পেশার লোকেদের সংশ্রব পরিহার করা প্রয়োজন মনে হল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে এই অস্পৃশ্যতার ধারণা আরও প্রসারিত হল।

কৌলীন্য যুগে শূদ্র

ঋগ্বেদ থেকে জাতক কাহিনি অবধি বহু উদাহরণ আর তথ্য সমন্বয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি শূদ্র বা অস্পৃশ্যতা কীভাবে ভারতীয় ধর্মনীতির দোসর হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক এক ব্যাধি হয়ে উঠল। কিন্তু এর প্রভাব কি সমগ্র ভারত জুড়ে একই সময় একই রকমভাবে ছিল? প্রশ্নটা উঠে আসে বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে। সেই মহাভারতের যুগ থেকে এই প্রদেশকে বলা হয়েছে পাণ্ডববর্জিত। আবার কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরব পক্ষে থেকেছেন

নীচ কুলবংশজাত পূর্বাঞ্চলের রাজারা। সে সময় থেকেই আর্যাবর্তের মানুষজন গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণদের 'বৌদ্ধপাষণ্ড'দের সঙ্গে এক করে দেখেছে। গৌড় প্রদেশের ব্রাহ্মণরা (এখানে বৃহত্তর অর্থে গৌড়, বরেন্দ্র, রাঢ়, সমতট, সুহ্ম, বঙ্গ ইত্যাদি রাষ্ট্রব্যবস্থার সমন্বয় ধরা হচ্ছে) বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশার কারণেই মনু কিংবা যাজ্ঞবল্কীয় স্মৃতিশাস্ত্র মতের উপযুক্ত ছিল না। পালেরা দীর্ঘকাল গৌড়ে শাসন করার ফলে হিন্দু ধর্ম এখানে রাজানুকূল্য পায়নি। পরিস্থিতি পালটায় বহু পরে বর্মণ এবং সেন রাজবংশের সময়।

গৌড় প্রদেশে মনু নির্ধারিত সঠিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রয়োগের জন্য রাজা আদিশূরের কনৌজ থেকে একশো ব্রাহ্মণ আনার কাহিনিকে আধুনিক ঐতিহাসিকরা মান্যতা না দিলেও এই আখ্যানটি যে একটি নির্দিষ্ট দিক সূচিত করছে সে সম্পর্কে কোনো বিরোধ নেই। আর তা হল গৌড় বঙ্গে আর্যাবত থেকে ব্রাহ্মণের আগমন। সেন রাজা বল্লাল তাঁর গুরু অনিরুদ্ধের নির্দেশে লেখেন *দানসাগর* এবং *অদ্ভুতসাগর* গ্রন্থ দুটি। আর এই দুটি গ্রন্থের প্রায়োগিক দিক হল কৌলীন্য প্রথা। সেনেরা ছিলেন কর্ণাটকের মানুষ। তাঁরা মূলত বৈশ্য, কিন্তু গ্রহচক্রের ফেরে যুদ্ধবিগ্রহ করেই খ্যাতি পান, যে কারণে তাঁরা নিজেদের বলতেন ক্ষাত্র-বৈশ্য। দশ-এগারো শতকে যখন তাঁরা গৌড় প্রদেশে আসেন, তখন আরও বহু কিছুর সঙ্গে নিয়ে আসেন দক্ষিণ ভারতের আর্যধর্মের আনুষ্ঠানিকতা। বঙ্গ প্রদেশের ব্রাহ্মণরা আমিষাশী, বৌদ্ধ সংশ্রবে স্মৃতি কিংবা স্মার্ত শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধাচারী নয়। তাই সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন রাজা বল্লালসেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে যেমন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীতদের দর্শনের জয়গান গাইলেন, ঠিক তেমনই সমাজকে পিছিয়ে দিলেন সেই বেদ-পুরাণের যুগে। লক্ষ করলে দেখা যাবে বল্লালসেন তাঁর কৌলীন্য প্রথাকে সমাজে প্রচার করতে অভিনব এক রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন

ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয়দের ভূমি দান করবেন। পরিবর্তে তারা রাজানুদেশ মেনে সমাজকে বৈদিক অনুশাসনের পাঠ পড়াবে। কিংবদন্তি বলে ঠিক দ্বি-প্রহরে এই দানকার্য সম্পন্ন হবে বলে রাজ ঘোষণা ছিল। কিছু ব্রাহ্মণ লোভে পড়ে তার আগে চলে আসেন, আর কিছুজন সংশয়ে অনেক পরে, ফলে তাঁরা সামান্য গাঞি (গ্রাম) দান হিসাবে পেলেন। আর যাঁরা ঠিক দ্বি-প্রহরে উপস্থিত হলেন তাঁরা প্রত্যেকে একশোটা করে গ্রাম উপহার পেলেন।

বল্লালসেন সমাজকে *মনুস্মৃতি* -তে বাঁধতে চেয়ে আরও কিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেন, যার অন্যতম বৈশ্যদের শূদ্র স্তরে নামিয়ে আনা। এর পেছনেও একটি মুখরোচক কাহিনি রয়েছে। স্বর্ণবেনে মাধবাচার্যর সঙ্গে রাজার ব্যক্তিগত শত্রুতার কাহিনি। কাহিনি যাইহোক, এর ফলে বণিকদের সওদাগিরি অর্থাৎ সমুদ্র বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। অনুরুদ্ধের পুত্র হলায়ুধমিশ্র, মহাসন্ধিবিগ্রহিক গোবর্ধনাচার্য (যিনি কর্ণাটকের মগর বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন), উমাপতিধরদের রাজসভায় স্থান দিলেন রাজা বল্লাল আর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন। এঁদের বিধানে ব্রাহ্মণদের গো-দান, স্বর্ণদান, নিষ্কর ভূমিদান রাজার নিত্য কর্তব্য হয়ে ওঠে সে সময়। যে ব্রাহ্মণেরা সেদিন সমাজের শীর্ষ ছিলেন, তাঁদের ধিকাংশ কাশী, কনৌজী ব্রাহ্মণ, যাঁরা বারো শতকে যাগ যজ্ঞ, আহুতি, কন্যাদান, দেবদাসী প্রথা ইত্যাদির মধ্যে এই প্রদেশে চতুর্বণের প্রবল প্রয়োগ ঘটিয়ে ছিলেন। বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণদের একাধিক দার পরিগ্রহণের স্বীকৃতি দেওয়া, মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণ, স্ত্রীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদির প্রবলতা শুরু হয়। সম্পদ আর সামাজিক ক্ষমতা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য বর্ণের হাতে যেন নিশ্চিত থাকে, তার জন্য কুলপঞ্জি রচনা নুলো পঞ্চাননদের মতো পণ্ডিতদের প্রধান কর্তব্য হয়ে ওঠে। সমাজে শুরু হয় এক জনপ্রিয়

বৃত্তি: যার নাম ঘটকালি। এই অবস্থার শুরু সেই বারো শতকে যা প্রায় আটশো বছর ধরে এই বঙ্গভূমিতে অবিচল থেকে উনিশ শতকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনের কারণে নিস্তেজ হয়।

মনু প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সেন রাজারা বিদ্যোৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা (বিশেষত বল্লাল এবং লক্ষ্মণ) নিজেরা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তার পাশাপশি সমাজকে প্রাচীন ভারতের যুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। যার ফলে ধোয়ী কালিদাসের মেঘদূত অবলম্বনে লেখেন *পবনদূতম,* সেনেরা ছিলেন বৈষ্ণব, ধরা হয় কবি জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দম* রচনা করেন সেন রাজত্বে। এছাড়া হলায়ুধমিশ্রের *মৎস্যপুরাণ* কিংবা অন্যান্য স্মার্ত গ্রন্থের রচনা এই সময়কালে। সেন রাজপরিবার সমাজে উচ্চ-নীচ এমন তফাত সেদিন করে দিয়েছিলেন যে ১২০৪ সাল নাগাদ যখন এই প্রদেশ তুর্কিদের হস্তগত হল, তার তিনশো বছরের মধ্যে নীচু জাতের বাঙালিরা ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হল।[২৩]

চর্যাপদে শূদ্র

চর্যাগানের উৎপত্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি, যার সঙ্গে সামাজক বাস্তবতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। দশ থেকে বারো শতক পর্যন্ত রচিত গানগুলিতে ওই সময়পর্বের জনজীবনই প্রতিফলিত হয়েছে এমনটা ধরে নেওয়াই যায়। বাংলার ইতিহাসে আলোচ্য তিনশো বছরের রাজনৈতিক চরিত্রের নানা পালাবদল ঘটেছে। ওই সময়কালে এই ভূখণ্ডে পর্যায়ক্রমে পাল ও সেন বংশের রাজারা রাজত্ব করেছেন। ধর্মবিশ্বাসে এই দুই রাজবংশ ছিল সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও

সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অন্যদিকে সেনেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় পালেরা বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির অনুরাগী হলেও চতুর্বর্ণে বিন্যস্ত বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরাও পরোক্ষ সমর্থক ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের খোদিত শিলালিপি, দানকর্মের প্রকৃতি ইত্যাদি দেখে। আসলে ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মের অন্তরেও ঘটে গেছে নানা বাঁকবদল। একদা পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় আনুকূল্যে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পরে কেন্দ্রীয় পরিচালনায় শৈথিল্যে তার একাধিক শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয়েছিল। যোগকেন্দ্রিক তন্ত্রমতাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্মের শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান। বস্তুত, মানব সভ্যতার আদিকালে সংগীত কিংবা কাব্য ছিল তখনকার ধর্মসাধনার অন্যতম সোপান। সিদ্ধাচার্যদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমান্তরালে চলমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ধরা আছে অধিকাংশ চর্যায়। সম্ভবত সামাজিক বৈষম্য ও পক্ষপাত নিম্নসমাজের প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা যা সমাজজীবনে নানা অন্যায় ও ব্যভিচারের জন্ম দিয়েছিল, তারই প্রতি অবরুদ্ধ প্রতিবাদ লুকিয়ে আছে চর্যার ভিতরকার সামাজিক রূপকগুলিতে। চর্যার গানগুলিতে খুব খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শ্মাশনচারী ও শূকর পালনকারী ডোম, অরণ্যে বসবাসকারী শবর-শবরী, নটপেটিকাধারী নিঘৃর্ণ, কাপালিক, মদ চোলাইকারী শুঁড়ি, নদীর বুকে হাল-বৈঠা ধরে বসে থাকা মাঝিমল্লা, বস্ত্রবয়নকারী তাঁতি, তুলোধোনার বৃত্তিতে অভ্যস্ত ধুনুরি প্রভৃতি অজস্র বৃত্তিজীবীদের নিয়েই গড়েছিল চর্যার সমাজ।

বাংলায় আর্যীকরণের পথ প্রশস্ত হলে আর্য-অনার্যের মিলনের ফলে সমাজে বর্ণসংকরত্ব দেখা দেয়। নতুন করে বর্ণ বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজপতিরা ফলসরূপ সেন আমলে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তনে এই বর্ণ ব্যবস্থা আরও

প্রখরতা লাভ করে। সংকরত্বের অনুপাত ও ব্রাহ্মণ্যবোধ গ্রহণের মাত্রা অনুযায়ী শূদ্র শ্রেণিটিরও সৎ ও অসৎ এই দুই বিভাজন গড়ে ওঠে। আর ছিল বর্ণাশ্রমের বাইরে পড়ে থাকা অসংখ্য অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যরা। বৃহত্তর সমাজ পরিচালনায় এদের শ্রম ও সেবার প্রয়োজন হত বটে, কিন্তু তারা কোনো সামাজিক সম্মান পেত না। চর্যার অন্তত তিনটি উল্লেখে ডোম-শবরদের অন্ত্যেবাসী হিসাবে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। যার জের আজকের একুশ শতকের গ্রামের জনবিন্যাসের চিত্রেও মেলে। দশ নম্বর চর্যায় কবি ডোম্বী বা ডোমেদের নিবাসস্থল জানিয়েছেন এই ভাষায়: 'নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়ি আ।' সভ্য নাগরিক সমাজের আবাসস্থলের চৌহদ্দির বাইরে থাকে ডোম, চাঁড়ালরা। দ্বিতীয় উল্লেখটি আছে আঠাশ নম্বর চর্যায়: 'উঁচা উঁচা পার্বত তাঁহি বসই সবরী বালী।' অর্থাৎ, শবর বালিকা বাস করে উঁচু পাহাড়ের বুকে, যে স্থানটি দুর্গম ও বিপজ্জনক। তেত্রিশ নম্বর চর্যায় এই সংক্রান্ত তৃতীয় উল্লেখটি যেন এরই অনুবৃত্তিস্বরূপ লেখা হয়েছে। ঢেণ্টনপাদ লিখেছেন: 'টালত ঘর মোর নাহি পড়বেষী'। বার বার টিলা বা পর্বতের অনুষঙ্গে ধরে নেওয়া যায় বক্তা কেবল মূল সমাজের বাইরেই নেই, একই সঙ্গে যাপন করছে প্রতিবেশিহীন নিঃসঙ্গ জীবন।

খ্রিস্টিয় তেরো বা চোদ্দ শতকের দিকে বঙ্গদেশে সংকলিত বলে অনুমিত দুটি পুরাণ *বৃহদ্ধর্ম* ও *ব্রহ্মবৈবর্ত* প্রাক্-আধুনিক বাহান্ন জাত ব্যবস্থা ও সেই অনুযায়ী পুরাণগুলির উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যায় ওই সময়ে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণিরই একটা না একটা সুনির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত কোনো মানুষ সহজে বৃত্যান্তর গ্রহণ করতে পারত না। বৃত্তির এই সীমাবদ্ধতা গ্রাম সমাজকে একদিক থেকে যেমন স্থবির করে দিয়েছিল, অন্যদিকে বংশানুক্রমিক পেশায় পোক্ত, দক্ষ কারিগর শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল।

যদিও উপরোক্ত পুরাণ দুটিতে জাতি বর্ণের বিভাজনে কিছু অমিল দেখা যায়। যেমন বর্ণ বিচারে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ যেখানে রক্ত সঙ্গকরকেই মান্যতা ধরেছে, সেখানে *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণ শূদ্রত্ব দিয়েই সবকিছুকে বিচার করেছে। কিন্তু দুটি পুরাণই অন্ত্যজ অস্পৃশ্যদের তালিকা নির্মাণে অভিন্ন মতালম্বী। এই অন্ত্যজ ম্লেচ্ছরা ছিল বৃহত্তর হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত। চর্যার বিভিন্ন গান এদেরই উপস্থিতি আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেমন আঠারো ও সাতচল্লিশ নম্বর চর্যায় আছে চণ্ডালদের প্রসঙ্গ। শবরদের কথা পাওয়া যায় ছয়, তেইশ, আঠাশ ও পঞ্চাশ নম্বর পদে। চণ্ডালরা শবদাহ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আর শবররা বনে বনে ব্যাধবৃত্তি করে বেড়াত। কাপালিকেরা বর্ণব্যবস্থার বর্হিভূত বলে গণ্য হত, যাদের উল্লেখ আছে দশ, এগারো, তেরো, আর আঠারো নম্বর চর্যায়। অসৎ-শূদ্রের পর্যায়ে পড়ে শৌণ্ডিক (তিন), যুগী (তিরিশ), ধুনুরী (ছাব্বিশ), কাঠুরি (পাঁচ ও ছেচল্লিশ)। তাঁতি বা তন্তুবায়রা বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে উত্তম সংকর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। দশ ও পঁচিশ নম্বর চর্যায় তন্তুবায়দের উল্লেখ মেলে, যাদের পেশা বস্ত্র বয়ন। এর বাইরেও গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তাম্বুলী, জালিক ও নটদের উল্লেখ আছে বিভিন্ন চর্যায়। দড়জালিকারা দড় (অর্থাৎ জাল) নিয়ে জলে মাছ ধরছে এই ছবিও চর্যায় আছে। বণ্যপ্রাণী শিকারি ব্যাধেরা কীভাবে দলবেঁধে শিকার করত, আর বর্ণনা দিয়েছেন একজন চর্যাকার। শুঁড়ি বাড়িতে মদ চোলাইয়ের বর্ণনাও বিরআর চর্যায় মেলে। চাঁচিলের পদে আছে গাছ কেটে পাটা জুড়ে সাঁকো বানাবার ছবি। মাদুর ও মোটা কাপড় তৈরি করত কেউ কেউ, যার বিবরণ মেলে তান্তিপাদের পঁচিশ নম্বর পদে। কাপড় বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুতো তৈরি হত কার্পাস ফুলে, পঞ্চাশ নম্বর চর্যায় যার উল্লেখ আছে। ডোমেদের চাঙারি তৈরি কিংবা কাঠুরেদের গাছ কাটা বোধ হয় আজও বাংলার গ্রাম থেকে হারিয়ে যায়নি। পঁচিশ নম্বর চর্যার সূত্র

ধরে এমন অনুমানে পৌঁছান যায় যে, তাঁতিদের সকলের চরকা কিংবা সুতো ছিল না। কাহ্নপাদের লেখা নয় নম্বর চর্যা, মাহিন্ডার লেখা ষোল নম্বর চর্যায় হাতি পোষা, মাহুতের হাতি চালানোর শব্দ, পাগলা হাতির উন্মত্ততার কথা মেলে। এই মাহুত বৃত্তিতেও নিম্নশ্রেণির লোকেরাই সংযুক্ত ছিল। শবর-শবরীর কঙ্গুচিনা বা কাঙনি দানা চাষ এবং তার থেকে হাঁড়িয়া (মদ) তৈরি করার সংবাদ মেলে শবরপাদের পঞ্চাশ নম্বর পদে। একতারা বাজিয়ে গান করে ভিক্ষাবৃত্তির ছবি আছে বীনাপাদের সাতেরো নম্বর চর্যায়। কাহ্ন এগারো নম্বর চর্যায় লিখেছেন ডমরু বাজিয়ে কাপালিক যোগীর বিচরণের কথা।[২৪]

প্রাক্-আধুনিক যুগের সাহিত্যে শূদ্র

আমাদের দেশের মধ্যযুগ সব অর্থেই আলোকিত যুগ। ভক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি মুঘল শাসন ব্যবস্থৎ, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, সংগীতের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ এসবই এই সময় ঘটে। এই সময় প্রাদেশিক ভাষাগুলিরও সুস্পষ্ট পরিণতি দেখা যায়। যেমন বাংলায় মঙ্গলকাব্য কিংবা চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলি। কৃত্তিবাস ওঝা এবং কাশীরাম দাস মহাকাব্যের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে যেমন বর্ণভেদকে সামনে এনেছিলেন, এরই বিপরীতে অন্ত্যজ শ্রেণির দুঃখ কথা উঠে এসেছিল বাংলার মঙ্গলকাব্যে। এমন উদাহরণ এদেশে বিশেষ নেই, যেখানে কবি (অর্থাৎ কথক) উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি হয়েও নিম্নবর্ণের কাহিনি লিখে গেছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ চণ্ডীমঙ্গল। খুল্লনার বারমাস্যা। ব্যাধ কালকেতুর দুর্দশা এসবের বর্ণনায় নিম্নবর্ণের মানুষদের লাঞ্ছনা আর আর্থিক দুর্বিপাকের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে। আবার ধর্মমঙ্গল কালুডোম, তার স্ত্রী এরাও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কাব্যের বাস্তবতার গুণে। ধর্মঠাকুর ডোম পণ্ডিত দ্বারা পূজিত ছিলেন বলে এই দেবতার মাহাত্ম্য-মূলক মঙ্গলগান রচনা করতে ব্রাহ্মণ কবিরা প্রথম দিকে কুণ্ঠিত ছিলেন। এদের দর্শনও

যে অশুচি বলে গণ্য হত তার হদিশ মেলে ময়ূরভট্টের *ধর্মমঙ্গল* -এ, যেখানে কালু ডোমকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে 'তুই তো চণ্ডাল জাতি।/ নর মধ্যে হিন যাতি॥/ কেহ নাহি দেখএ বদন।' বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে রয়েছে ডোমের অন্নভক্ষণে ব্রাহ্মণের জাতিনাশের প্রসঙ্গ: 'মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল ক্ষয় খাইলা ডোমের অন্ন তোকে ছোঁবে কে।' এই ধরনের আরও একটি উদাহরণ আছে *মৈমনসিংহ গীতিকার* 'কঙ্ক ও লীলা' পালায়। অনাথ কঙ্ক চণ্ডালের ঘরে পালিত হাওয়ায় তাকে পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে সমাজপতিরা গর্গকে শাসায়— 'লও কঙ্ক মোদের ছাড়িয়া।' কেননা:

> জন্মায় চণ্ডালের অন্ন সেই জন খায়।
> যে তারে সমাজে তুলে সেই তো ব্রাহ্মণ নয়॥
> অনাচারে জাতি নষ্ট নষ্ট হয় কুল।[২৫]

কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* -এ মধুসংগ্রহ, কাঠকাটা, বন্য পশু শিকার, নৌকা চালানো প্রভৃতি বৃত্তির কথা জানা যায়। এইসব ঝুঁকি বহুল বৃত্তিতে এদেরই অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি। চামারদের জুতো বানানোর সংবাদ দিচ্ছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী: 'মোজা পানই জিন/ নিরাময়ে আনন্দিত/ চামার বসিয়া এক ভিত।' চৈতন্য পূর্ববর্তী হিন্দু সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল তখনকার সাহিত্যে স্পষ্ট দেখা যায়।

সেকালের স্বল্প আয়ের শ্রমজীবী গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল বেশির ভাগ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের দ্বারাই। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'বেরুনিয়া' নামের এক শ্রেণির দিনমজুরের কথা বলেছেন, যাদের জীবিকা ছিল সুতোয় রঙ দেওয়া, পট তৈরি করা, সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করা, মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করা, দোলা বা পালকি বওয়া, পশু শিকার করা ইত্যাদি। ময়ূরভট্টের *ধর্মমঙ্গল* -এ জাদুবিদ্যায় পারদর্শী বেদেনিদের কথা পাওয়া

যায়। অবশ্য শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাবে এই জাতি-বর্ণে বিভক্ত, পানাহার নিষিদ্ধ অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত মধ্যযুগের স্মৃতিশাসিত বাংলায় তাঁর বৈপ্লবিক শাস্ত্র-ধ্বংসী প্রাজ্ঞোক্তি— 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ।/ হরিভক্তিবিহীনেন দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ॥' আসলে ভক্তির পথ ধরেই মহাপ্রভু সামাজিক বর্ণবৈষম্যের বিষটুকু শোধন করতে চেয়েছিলেন। বিরুদ্ধ স্বরে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মধ্যযুগের বাংলায় 'বৈশ্য' নামে আলাদা কোনো বর্ণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও বৈশ্যদের বৃত্তি অবলম্বনকারী মানুষের অভাব ছিল না। এরাই সৎশূদ্র বা উত্তম সংকর জাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্য। সৎশূদ্ররা সমাজে জল-আচরণীয় ছিল। ফলে অস্পৃশ্যতার হীনবোধ এদের স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা যে সকলের ছিল এমনটা ভাবা হয়তো ঠিক নয়, তবুও স্বাধীন বৃত্তিতে তারা নিয়োজিত হয়ে কিছু অর্থকৌলীন্য লাভ করলে পূর্বকার কোনো কোনো বৃত্তি তারা পরিত্যাগ করেছিল। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, তিলি, গোপ, কর্মকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আঠারো শতকের শেষদিকে বর্ণভিত্তিক আভিজাত্যের সৌধশীর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের ধাক্কায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এই সময় অপেক্ষাকৃত নীচু বর্ণগুলির সামাজিক উত্তরণের চেষ্টা সমাজে খুব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। দেখা যায় রাণাঘাটের পাল চৌধুরী বংশের কৃষ্ণ পান্তি জাতিতে তাম্বুলি হয়েও জমিদারি কিনতে সমর্থ হন। রাজশাহীর দীঘাপতিয়ায় যিনি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি দয়ারাম রায়। এই সময়ের একটি কবিগান বলছে: তাঁতি ছিল কায়েত হলো ঢাকার মুন্সী নন্দলাল। নগরায়ণের আগে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ তেমনভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও উত্তম ও মধ্যম সংকরদের অর্থনৈতিক ভূমিকা তাদের মধ্যবিত্ত হিসাবে চিহ্নিত করায়। কর্মকার,

কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তাম্বুলি, বারুই, ময়রা প্রমুখ নয়টি কারিগর শ্রেণি নিজেদের মধ্যে মৈত্রীজোট করে এবং নিজেদের 'নবশাখ' বলে পরিচয় দেয়। পরে এদের সঙ্গে যোগ দেয় গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কংসবণিক, পালদার ও মধুনাপিত। এই বৈশ্যদের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা আছে চণ্ডীমঙ্গলে। পরবর্তীকালে দ্বিজ রামদেব, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখের রচনায় সামাজিক জাতি ও বর্ণ বিন্যাসের চেহারাটি আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আঠারো শতকের মধ্য ভাগে লেখা ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ কবি ছত্রিশটি জাতির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। দলিত, কিংবা নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত অসুখ, যার আরোগ্যের কোনো সাধু উদ্যোগ নেই সেই সময়কালের সাহিত্যে।

গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গোরু, পুকুর-ভরা মাছ, বাগান-ভরা সবজির প্রাচুর্যের সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি প্রবাদ প্রতিম হয়ে দেখা দিয়েছিল বিদেশি পর্যটক বর্নিয়ের, টার্ভানিয়ের, মানুচি, মানরিক, বারাবাসা, বাউরি, লিনস্ প্রমুখের স্মৃতিচারণায় বার বার উঠে এসেছে বাংলার সহজলোভ্য ভোগ্যবস্তু ও সম্পদশালিতার কথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদরপূর্তির বেশি উঠতে পারেনি। অন্নপূর্ণাকে দেবী জেনেও ঈশ্বরী পাটানীর একটাই প্রার্থনা ছিল: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' তাই অর্থবান ব্যক্তিরা বিলাসিতাময় জীবন কাটাতে সমর্থ হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না তাদের চেতনার স্তর।

একসময় যে বিধান ছিল ধর্মের বাধ্যবাধকতা, তাই দীর্ঘ যুগের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যে প্রকাশ পেল। কারণ সাহিত্য ইতিহাসের উপদান। শূদ্র বা অচ্ছুত বাঙালি জীবনে এমন গভীরে প্রথিত হয়ে আছে যে, যে ইসলাম ধর্মে জাতপাতের প্রশ্ন নেই, যে ধর্মে

অচ্ছুত, অস্পৃশ্যের কোনো ধারণা নেই, সেই ধর্মেও এই রোগের বীজাণু প্রবেশ করেছে। আজ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জাতের উঁচু-নীচু যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনই কেবলমাত্র জাত্যাভিমানের কারণেই নীচু কুলজাত মানুষদের আজও দলন করা হয় এই সমাজে। ফলে আজ নির্দ্বিধায় এটা বলা যায় ভারতীয় সমাজে জাতপাতের বৈষম্য হিন্দু ধর্মের অবদান হলেও কালে কালে তা বৌদ্ধ, জৈন ধর্মকে যেমন গ্রাস করেছে, তেমনই ইসলাম ধর্মও তার থেকে আলাদা থাকতে পারেনি। ইসলামের প্রথম যুগে প্রধানত ধর্মের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে বিভেদ দেখা দিয়েছিল। ফলে দুটি শাখার সৃষ্টি হয় শিয়া আর সুন্নি। মুসলমান সমাজে আর এক ধরনের বিভাজন আছে, তার মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক। যদিও সামাজিক স্তরের চেহারাই সেখানে পরিস্ফুট। আভিজাত্যের মানদণ্ডে তারা ত্রিধাস্তরে বিভক্ত। ১) আশরাফ, ২) আতরাফ, ৩) আরজল। বহিরাগত সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোঘলরা রক্তের বিশুদ্ধতায় আর অর্থকৌলীণ্যে অনায়াসে চিহ্নিত হয়ে যায় আশারফ নামে। মিশ্র শ্রেণির মধ্যবিত্ত মুসলমানদের বলা হত আশরাফ। আর ধর্মান্তরিত মেহনতি নিম্নবর্গের মানুষদের সসাধারণ পরিচয় দাঁড়ায় আরজল। এছাড়া আশরাফদের অন্তর্গত সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোঘলদের জাতি ও সামাজিক সম্মানগত ভেদ তো ছিলই। আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান সমাজকে শ্রেণিবাদহীন সম্প্রদায় বলে মনে হলেও, সকলের মধ্যে খোলাখুলি খানাপিনা, বিয়ে-সম্বন্ধের চল ছিল না। যদিও হিন্দুদের গোঁড়া জাতি ব্যবস্থা থেকে মুসলমান সমাজের এইসব বাছবিচার ছিল অনেক শিথিল। এইভাবে যারা একদিন ত্যাগ করেছিল হিন্দুধর্মের বর্ণ ব্যবস্থার নিপীড়ন, বহু ক্ষেত্রে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে তাদের পরিচয় কেবল পালটেছিল, কাজের প্রকৃতিতে কোনো পার্থক্য এল না। এই আরজল মুসলয়ানদের সার্বিক পরিস্থিতি জরিপ করে ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন: '... তাই তাঁতী মুস্লিম হয়ে

গেল জুল্‌হা, হাড়ি-ডোম-বাগদী-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে-নিকেরী, কাহার, কসাই, মুলঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজি, মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার ইত্যাদি। না ঘুচলো তাদের অশিক্ষা, না ঘুচলো তাদের দারিদ্য।'

কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রজা পত্তনের বর্ণনায় কারা কী ধরনের কাজ করত তার কাব্যিক তালিকা পেশ করেছেন কবিকঙ্কন তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে। এদের ওপর ভর করেই চলতে শুরু করেছিল মধ্যযুগের স্বয়ংসম্পূর্ণ মুসলমান সমাজ। হিন্দু সমাজের মতো এখানেও পাদপ্রদীপের নীচেই জমে রইল নিকষ কালো অন্ধকার। হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও কয়েকটি বৃত্তি ঘৃণ্য ছিল বলে মনে হয়। বিশেষ করে তেলি, জেলে ও হাজাম বা নাপিতবৃত্তি। সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' অঙ্কিত এক ধীবর কন্যা বলছে—

> আমি হই ধীবরের জাতি
> আমাতু অধিকহীন নাহি ছিল কোনো জাতি।[২৬]

অস্পৃশ্যতার কারণেই নসরুল্লাহ খোন্দকার *শরীয়তনামা* -য় বিধান লটকে দেন—

> কেহ বলে তেলি কিবা হাজমের ঘরে॥
> কিংবা মৎস বেচে, কিংবা যেবা মৎস মারে।
> সে সবের ঘরে বোলে খাইতে না পারে।[২৭]

দরিদ্র মুসলমানদের নির্ভেজাল ছবি তুলে ধরেছেন আলাওল তাঁর *তোহ্‌ফা*-তে

> গ্রামবাসী জনালি গোপাল হালদার
> নাহিক পাদুকা পায়ে জরাজীর্ণ ঘর।[২৮]

এতদ্‌সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে, ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত জাত-বর্ণ ব্যবস্থা সর্বজন স্বীকৃতি পায়নি। কোনো যুগেই স্বেচ্ছায় সবাই মেনে নেয়নি এটা। জাত-বর্ণ ব্যবস্থার সূচনাকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব সংগঠিত

হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই রুখে দাঁড়ানোর, প্রশ্ন তোলার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

---

১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৬

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১০. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২১

১১. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ২৪

১২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ২২

১৩. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ৩৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১৬. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ১৯৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৮. সিকদার, সুকুমার, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৭

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০১৫, পৃ. ৩৬

২০. সিকদার, সুকুমার, *মনুসংহিতার শূদ্রভাষ্য,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৩৫

২১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৩৪

২২. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯, পৃ. ৯৬

২৩. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, 'বাংলায় জাতির উৎপত্তি', *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ* (শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত), আই সি বি এস সিরিজ: ২৪, দিল্লী, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৫

২৪. দাশ, নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৫০-৫৬

২৫. রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত), *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৬৫

২৬. নস্কর, সনৎকুমার, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা,* দিয়া পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৩৪৭

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রান্তিকের ‘আত্মপরিচিতি’-র সন্ধান: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রান্তিকের ‘আত্মপরিচিতি’-র সন্ধান: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

> একদল মানুষ খুব হুল্লোড় করছে একটা ছবিকে ঘিরে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একদল শিকারী একটি বিশাল সিংহকে শিকার করছে। সেইখান দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষগুলির সমবেত এই হুল্লোড় চোখে পড়ল অন্য এক সিংহের। সে তখন মানুষগুলোকে বলল : বন্ধুরা, তোমরা ভুল করছ, যে শিল্পী ছবিটা এঁকেছে সে সত্য উপস্থাপনা করে নি, বরং তোমরা যা দেখতে চাও তাই তোমাদের দেখিয়েছে। এই ছবি দেখে মনে হবে সিংহের চেয়ে মানুষের শক্তি বেশি। কিন্তু বাস্তবে আমাদেরই জয়ী হওয়া উচিত ছিল। হতামও হয়তো তাই যদি আমরা সিংহরা ছবি আঁকতে জানতাম।[১]

যতদিন না সিংহদের মধ্যে ইতিহাস লেখকের জন্ম হবে, ততদিন শিকারের গল্পে শিকারীরই জয়গান চলবে। পৃথিবীতে মানব ইতিহাস রচনারও জন্ম হয় ঠিক শাসকের দৃষ্টির হাত ধরেই, রাজশক্তির শাসনদণ্ডটিকে আশ্রয় করে। যাঁরা ইতিহাস লিখতেন, তাঁরা রাজা অথবা রাজশক্তির আদেশে বা অনুগ্রহেই ইতিহাস লিখতেন। বিশ্বের মানব ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, ভারতবর্ষেও মানব ইতিহাস রচনার যে ধারা চলে এসেছে তা শাসকপন্থী ও একমুখী। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ দলিত, বহুজন, আদিবাসী সমাজের মানুষদের উৎস, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাচীনকালের ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছিল না বা থাকলেও তা ছিল একটি বহির্ভূত দৃষ্টির ইতিহাস। শোষণের উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছিল। একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা সব সময়ই তার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল দর্শন বা ব্যবস্থার সহায়তা নেয়। অন্যান্য ব্যবস্থাগুলোকে হয় ধ্বংস নইলে বিকৃত অথবা আত্মসাৎ করা হয়। সামাজিক বৈষম্য ও

অস্পৃশ্যতা ছিল সুবিধাজনক—বস্তুত প্রাচীন শাসকবর্গের জন্য প্রয়োজনীয়, সেই জন্য এইগুলিকে বহাল রেখে ধর্মীয় অনুশাসনকে চিরস্থায়ী করে এবং শোষণের অনুকূল সাংস্কৃতিক বিকাশ ও দর্শনকে প্রচার ও প্রসারের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধর্ম ও রাষ্ট্র হাত মিলিয়ে নিম্নতম শ্রেণি অর্থাৎ শূদ্রদের প্রথমে মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দাসত্বে বন্দী করে, পরে তারা অস্পৃশ্যতার নাগপাশে বাঁধা পড়ে। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অজ্ঞতা, অপমান, অবিচার, অত্যাচার এই সমস্ত মানবতা-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করতে করতে অস্তিত্বহীনতা তাদের প্রতিটি রক্তকণার সঙ্গে মিশে যায়। তাঁদের ভাববার সমস্ত পথগুলি সুচতুর কৌশলে চিরদিনের মতো বন্ধ বা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অতি সহজে, স্বেচ্ছায় জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা সর্বজন স্বীকৃতি পায়নি। কোনো যুগেই সবাই এটা মেনে নেয়নি। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সূচনাকাল থেকেই এর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন কালে দলিত, অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের মানুষ কখনও এককভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন, কখনও দলবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন এই জাতি-বর্ণ ভিত্তিক শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার আর অমানবিকতার বিরুদ্ধে।

চার্বাক দর্শন:

উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রায় দু-আড়াইশো বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে, কালে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা সংকলন উপনিষদ সাহিত্যরূপে গ্রন্থিত। সেই সময়ে দেশে চিন্তার জগতে

আত্মা, পরলোক, জন্মান্তরবাদকে অবলম্বন করে যে নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তার জন্ম হয়েছিল তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপনিষদকারা প্রত্যেকে নিজেদের উপলব্ধি ও মনন গ্রন্থনা করে রেখে গেছেন। তাই অনেকক্ষেত্রে *উপনিষদ*-এ যা পাই তা তত্ত্বের দিক থেকে শিথিল, পরস্পর-অসংলগ্ন, কখনও বা পরস্পর-বিরোধীও। যজ্ঞ থেকে মানুষের মন সরে গেছে, এমনই একটা পরিবেশে মণীষীরা সমাজে সংহতি রক্ষার জন্য যজ্ঞের একটা বিকল্প নির্মাণ করেছিলেন। সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠান চললেও বহু মানুষের মনে যখন যজ্ঞ সম্পর্কে অনীহা দেখা দিয়েছে তখন সমাজে তৎকালীন শাস্ত্রকাররা অন্য কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে এই নতুন তত্ত্বগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। রাজা, রাজন্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য কিছু ব্রহ্মসন্ধানী ব্যক্তিরাই এই নতুন নতুন তত্ত্বগুলি সম্পর্কে আগ্রহী। এই কালপর্বে সংশয় উচ্চারণ করেছেন এঁরাই। সমাধান দেওয়ার তত্ত্বগুলিও এঁদেরই নির্মিত। বলা বাহুল্য, উত্তর বা সমাধান বহু ক্ষেত্রেই সমাজের সুবিধাভোগী বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে; যেমন জন্মান্তরবাদ।

তৎকালীন বেদোত্তর সমাজে কায়িক শ্রম ও বৃত্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং কালক্রমে উচ্চবর্ণের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা, প্রাথমিক উৎপাদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। তাঁদের পদ ও কাজ হয়ে ওঠে বংশানুক্রমিক। তাঁদের মধ্যে জেগে ওঠে কায়িক শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্যমূলক ঘৃণার মনোভাব, শুধু তা-ই নয়, যে হাত সেই কাজ করে ঘৃণা প্রসারিত হয় তার দিকেও।

এই সময় শুধু চার্বাক নয়, বার্হস্পত্য, জৈন, বৌদ্ধ এবং আজীবিকরাও বেদের বহু মৌলিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত করেছেন। বেদ মূলত যজ্ঞ নির্ভর আর এঁরা প্রথমেই পরিহার করেছিলেন যজ্ঞের উপযোগিতা। *মুণ্ডক উপনিষদ*-এই একবার মাত্র স্পষ্ট করে বলা আছে যে যজ্ঞগুলি অদৃঢ় নৌকা, পারে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তাদের নেই। যজ্ঞের পরে ফলের অপ্রাপ্তি যজ্ঞ যুগে সংশয়ের সবচেয়ে বড় ভিত্তি রচনা করেছিল। লক্ষণীয়, অবৈদিক প্রস্থানগুলিকে পরবর্তী সাহিত্যে সাধারণভাবে 'লোকায়ত' বলা হয়েছে। 'লোকায়ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'লোকে আয়ত' অর্থাৎ যা সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিব্যপ্ত। উচ্চবর্ণের শ্রেণিস্বার্থকে আঘাত করে বলে 'লোকায়ত' নামটির একটি কুৎসিত অপব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। যার অর্থ অনেকটা এই রকম যে চার্বাক দর্শন আদতে ছিল স্থূল ভোগবিলাসবাদী জান্তব দর্শন। এই ভিত্তিতে *বিষ্ণুপুরাণ*-এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি কাহিনিও সৃষ্টি করা হয়েছে। কাহিনিটি এইরূপ – অসুরগণ বৈদিক ধর্মানুসারে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল। দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। অসুররা স্বর্গরাজ্য ভোগ করলে কী হবে দেবতাদের, এই দুর্ভাবনায় দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু অভয় দিয়ে তাঁর শরীর থেকে মায়া-মোহ সৃষ্টি করলেন এবং সেই মায়া-মোহকে আদেশ দিলেন তারা যেন অসুরদের এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যাতে তারা বৈদিক ধর্মানুসারী তপস্যার পথ পরিত্যাগ করে ঐহিক ভোগসুখে মত্ত হয়ে পড়ে। মায়া-মোহ তপস্যারত অসুরদের কাছে বেদ-বিরোধী, পরলোক-বিরোধী ঐহিক ভোগবিলাসবাদী বিপরীত দর্শনের মর্ম ব্যাখ্যা করল। অসুররা মায়া-মোহের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে তপস্যার পথ পরিত্যাগ করে ভোগবিলাসের পিছনে ছুটলেন। তাঁদের নৈতিক অধঃপতন ঘটল।

তখন দেবতারা অনায়াসে অসুরদের পরাস্ত করলেন। তাঁদের স্বর্গরাজ্য এইভাবে নিষ্কণ্টক হল। তুলনামূলক অধিকতর প্রচলিত কাহিনিটি হল – স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে দুর্বল করার জন্য ভোগবাদী দর্শন সৃষ্টি করে শিষ্য চার্বাকের মারফত প্রচার করেছিলেন। সাংস্কারিক সুখ-ভোগকামী সাধারণ মানুষ নিজের বাসনা-লালসা চরিতার্থ করার পিছনে দার্শনিক যুক্তির সমর্থন পাওয়ায় সহজেই এই দর্শন গ্রহণ করেছিল, তাই এর নাম 'লোকায়ত'।

এইসব কল্পকাহিনির বাইরে চার্বাক দর্শনের সুদূরপ্রসারী সামাজিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেছেন একজন জৈন দার্শনিক। তাঁর নাম মণিভদ্রসূরি। প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক হরিভদ্রসূরির একখানা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *ষড়দর্শনসমুচ্চয়*। আলোচ্য দার্শনিক প্রস্থানগুলি ক্রমানুসারে সাজানো আছে – বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক, জৈমেনীয়, মীমাংসা। কিন্তু সর্বশেষে চার্বাক দর্শন আছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে। গ্রন্থের নামে ছয়টি দর্শন প্রস্থানের ইঙ্গিত আছে কিন্তু চার্বাক দর্শনকে মিলিয়ে এই ক্ষেত্রে মোট সাতটি দর্শন আলোচিত হয়েছে। হয়তো হরিভদ্রসূরি চার্বাক দর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি। শেষে পরিশিষ্টাকারে সামান্য কিছু বলেছেন। কিন্তু গ্রন্থের টীকাকার মণিভদ্রসূরি চার্বাক দর্শনের সামাজিক তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এই দর্শনের যথেষ্ট গুরুত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হরিভদ্রসূরি তাঁর গ্রন্থে বেদান্ত দর্শনের নামমাত্র উল্লেখ করেননি।

চার্বাক প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। একমাত্র প্রত্যক্ষকে মেনে প্রমাণ বলে মেনে নিলে প্রত্যক্ষের অলক্ষ্য/অগম্য পরলোক, জন্মান্তর, অবিনশ্বর

আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল ও অদৃষ্টজনিত ইহলোকের দুঃখভোগ, পুণ্যকর্মের দ্বারা বা ঈশ্বরোপসনার দ্বারা স্বর্গলাভ বা মুক্তি — এ সমস্ত অন্ধ মূঢ় বিশ্বাস আর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষ তখন সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনার জন্য উচ্চবর্ণের কূটবুদ্ধি ও শ্রেণিস্বার্থ কলুষিত ধর্মীয় সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করবে। তারা মানুষের বাঁচার অধিকারের দাবীতে বিদ্রোহ করবে। চার্বাক কর্তৃক প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করার পিছনে সামাজিক তাৎপর্য হল এই দর্শন। মণিভদ্রের মূল বক্তব্য থেকে অনূদিত অংশটি খেয়াল করলে এই ক্ষেত্রে বিষয়টি স্পষ্ট হয়-

> যারা অস্পৃশ্য, অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, অশ্রুত, অদৃষ্ট, স্বর্গমোক্ষ প্রভৃতি সুখপিপাসায় চিত্ত সমর্পণ করে, দুঃসাধ্য তপস্যাদি জনিত ক্লেশ স্বীকার করে জীবন ক্ষয় করে তাদের এই ধরনের জীবনযাপন হল মহামূর্খতার দুঃসাহস মাত্র।
>
> আরো একটা কথা — কী আছে কী নেই প্রত্যক্ষকেই তার একমাত্র নিরিখ বলে মেনে নিলে জগৎটাকে আর অস্বীকার করা যায় না। তাহলে জগতের অন্তর্গত আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমাজব্যবস্থাকেও বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয়। তখন বঞ্চিত দরিদ্রও মনে করবে দেশের স্বর্ণভাণ্ডারেও আমার অধিকার আছে। এবং এ অধিকার কায়েম করে তখন সেও অনায়াসে নিজের দারিদ্র্যকে পদদলিত করবে। দাসও মনে প্রাণে স্বাধীনতা অবলম্বন করে দাসত্ব করতে অস্বীকার করবে। কেউ আর নিজের অনভিপ্রেত জীবনযাত্রার দৈন্য মেনে নেবে না। এভাবে সমাজে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বা ধনী-দরিদ্র সম্বন্ধ সম্বলিত শ্রেণীভেদ থাকবে না। তখন সংসারের বর্তমান সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। তাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এই হল চার্বাকের সুস্থির সিদ্ধান্ত।... তাই ধর্মের ভেকধারী পরবঞ্চনাপ্রবণ ধূর্তের দল অনুমান, শাস্ত্রবাক্য প্রভৃতিকে প্রমাণ বলে প্রচার করছে; এসব প্রমাণের কারা পাপপুণ্য, স্বর্গনরক প্রভৃতি অলীক কল্পনাকে সত্য বলে নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে; মূঢ় বিভ্রান্ত ইতর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে।[২]

চার্বাক বেদদ্রোহী, অতএব সমাজদ্রোহী। অতএব সনাতন বৈদিক সমাজের ক্ষমার অযোগ্য বিদ্রোহী দার্শনিক। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে চার্বাকরা বেদের কোন অংশকে মূলত আক্রমণ করেছেন। আক্রমণ করেছেন মূলত বেদের কর্মকাণ্ড অংশগুলিকে যেখানে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া কণ্টকিত যজ্ঞগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে অসাধারণ, সাহিত্যিক উৎকর্ষে সমুজ্জ্বল, উদার ভাবৈশ্চর্যে সমৃদ্ধ ঋক সংহিতা ও অন্যান্য সংহিতার মন্ত্রগুলিকে তিনি আক্রমণ করেননি।

চার্বাক দর্শনের এই সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য মনে রাখলে 'লোকায়ত' কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। আর এও বুঝতে অসুবিধা হয় না, শাস্ত্র লোকায়ত মত সম্বন্ধে এত বেশি অসহিষ্ণু কেন, কেন চার্বাককে মহাভারতে ও পরবর্তীকালে *বেণীসংহার* নাটকে 'রাক্ষস' বলা হয়েছে। দুর্যোধনের বন্ধু বলা হয়েছে। কেন 'ধার্মিক' ব্রাহ্মণরা তাকে তাড়া করে বধ করে। বোঝা যায় কেন পরস্পরবিরোধী দর্শন প্রস্থানও (যেমন 'মীমাংসা', যার অপর নাম 'পূর্বমীমাংসা' এবং 'বেদান্ত', যার প্রতিশব্দ 'উত্তরমীমাংসা') এবং সব কটি দর্শন গ্রন্থই চার্বাক মত আগে খণ্ডন করে পরে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছে। এর থেকে সূচিত হয় যে, চার্বাক মত আসলে শুধু জনপ্রিয়ই ছিল না; সমাজে এই মতের বহু অনুগামী ছিল, তাই প্রয়োজন ছিল সেই মতগুলিকে খণ্ডন করার – যাতে তার প্রসার রোধ করা যায়। লোকমানসে এর বিস্তার ছিল বলেই লোকায়তের সম্বন্ধে আতঙ্কটি এত বাস্তব এবং সেই পথ ধরেই এত অসহিষ্ণুতা। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-তে তাই সাংখ্য, যোগ, অন্বীক্ষিকীকে একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *মনুসংহিতা*-য় অন্বীক্ষিকীকে পরিহার করা হয়েছে; দণ্ডনীতি, অর্থনীতি, ত্রয়ী (বেদচর্চা) ও বার্তাকে (কৃষি ইত্যাদি)

স্বীকার করা হয়েছে। শংকরাচার্য মনুকে বারবার উদ্ধৃত করেন এবং সবচেয়ে প্রামান্য ধর্মশাস্ত্র বলে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র হিসাবে স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে বলা হয়েছে বারবার নাস্তিক, চার্বাকপন্থী, লোকায়ত, বার্হস্পত্যপন্থী, ইত্যাদি মানুষের পরিণতি শোচনীয়। ইসলামী ধর্মতত্ত্বে নাস্তিকের পরিণাম খুব যন্ত্রণাময় একটি নরক 'হাবিয়া দোজখ'-এ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। জৈন দার্শনিকরা চার্বাকের প্রতি মোটেও প্রসন্ন ছিলেন না। সেব্য-সেবক, ধনী-দরিদ্র ভেদশূন্য সমাজব্যবস্থার প্রতি তারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থক ছিলেন না। জৈনধর্ম বা জৈনদর্শনে বেদ বা ঈশ্বরের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়নি কিন্তু পারলৌকিক মুক্তি স্বীকার করা হয়েছে।[৩]

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। মহর্ষি যাস্কের (আনুমানিক খ্রি.পূ. ৬০০-৫০০ মধ্যে) *নিরুক্ত* গ্রন্থে যাজ্ঞিক সম্প্রদায় সম্মত বেদ ব্যাখ্যায় দেবতার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি, একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতে দেবতারা 'অপুরুষবিধ' অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। তাৎপর্য হল অচেতন পদার্থে কল্পনায় দেবত্ব আরোপ করে দেবতার কাল্পনিক অস্তিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। যাস্ক নিজে যাজ্ঞিক মতানুসারে বেদের ব্যাখ্যা করেছেন। মীমাংসকরা যাজ্ঞীক সম্প্রদায়ের দার্শনিক উত্তরসূরি। তাই শবরস্বামীর মীমাংসা ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে দেবতার অস্তিত্ব খণ্ডন করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি *বেদান্তসূত্র*-তে মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনির মত আলোচনা করলে দেখব *বেদান্তসূত্র* ও তার ভাষ্যে বলা হয়েছে জৈমিনির মতে দেবতারা সবই জড় পদার্থ। জৈমিনি বলেছেন – কর্মফল দান করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন। কর্মের ফল কর্মের স্বভাব থেকেই বর্তাবে। শব্দাদ্বৈতবাদী মহাবৈয়াকরণ ও দার্শনিক ভর্তৃহরির (শংকরের

পূর্ববর্তী) একটি চমকপ্রদ উক্তি প্রণিধানযোগ্য – বালক যখন কাঁদে তখন মা বলে খোকা, যে বাচ্চা কাঁদে তাকে বাঘে খায়। সত্যিই তো তার কাঁদুনে ছেলেকে কান্নার অপরাধে ঘরে ঢুকে বাঘে খাবে না। ভয় দেখিয়ে বাচ্চার কান্না থামানোটাই এই ক্ষেত্রে মায়ের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকেরও ঐ একই তাৎপর্য। নিষিদ্ধকর্ম থেকে নিবৃত্তি ও বিধেয় কর্মে প্রবৃত্তির জন্যই ঐ গালগল্পগুলি তৈরি হয়েছে। ওগুলি হল বিজ্ঞাপনের মতো, মীমাংসা দর্শনের ভাষায় বলে 'অর্থবাদ'। প্রসঙ্গান্তরে ভর্তৃহরি অনুরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন – বালককে শিক্ষা দেবার জন্য অনেক সময় কিছুটা ছলনার দরকার, যেমন রূপকথার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা। এভাবে অসত্য পথে সত্যে পৌঁছানো যায়। কুমারিলভট্ট *শ্লোকবার্তিক* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সর্বজ্ঞতা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। এই কুমারিলভট্টই আবার শবরস্বামী স্বর্গ-নরক অস্বীকার করায় অস্বস্তি বোধ করেছেন।

এযাবৎ আলোচিত বেদবিরোধী দার্শনিক প্রস্থানগুলিকে যদি একত্রিত করে দেখি তাহলে দেখব : প্রাচীন শ্রদ্ধেয় যাজ্ঞিক ও মীমাংসক যাস্ক, জৈমিনি, শবরস্বামী প্রমুখ দার্শনিক দেবতা ও ঈশ্বর স্বীকার করেন নি। শবরস্বামী পরলোক পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছেন। অদ্বৈতবাদী ভর্তৃহরি পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরককে আধুনিক বিজ্ঞাপনের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছেন। কুমারিলভট্ট অদ্বৈতবাদ, সর্বজ্ঞাবাদ, অলৌকিক যোগবিভূতি, ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করেছেন।[৪]

এত সব সত্ত্বেও শূদ্র-ম্লেচ্ছদের বেদাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত একটাই– সমাজে শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক মানুষের উপর উচ্চবর্ণের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচারভার পড়েছিল ব্রাহ্মণের

উপর। পিছনে ছিল ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবল ও বৈশ্যের ধনবল। এই অবাধ্যতা তো আসলে আধ্যাত্মিক স্তরে একটা প্রতিস্পর্ধা এবং জাগতিক স্তরে অসহযোগ, সমাজের ওপরতলার লোকের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা। এক্ষেত্রের রাষ্ট্র ও তার দ্বারা পরিপুষ্ট শাস্ত্রকাররা যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছক তৈরি করছে সমাজের তাতে ভেঙে পড়ার প্রভূত সম্ভাবনা।

এই কারণেই চার্বাকের মতবাদ পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষিত হয়নি। চার্বাকের প্রভাব যে জনমানসে খুবই বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ, এ মতকে খণ্ডন না করে কোনো দর্শনপ্রস্থান রচয়িতাই তাঁদের মত প্রতিষ্ঠা করেননি। তাও চার্বাক মতের যেটুকু রক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে শাস্ত্রসুলভ সংহতি নেই। শুধু নির্বোধরা চার্বাকপন্থী হলে শাস্ত্রকাররা এত ভয় পেতেন না। নচিকেতা যখন বলেছিল, কারো কারো মতে মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না, তখন সে সমাজে সঞ্চারমান নাস্তিক্যকেই প্রকাশ করেছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

তৎকালীন বিরোধী বেদ-দার্শনিক প্রস্থানগুলির পাশাপাশি সমাজজীবনে ধর্মীয় মুক্তির কথা তুলেছিল রাজপরিবার থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। এই দুই প্রতিবাদী ধর্ম প্রথম জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে। 'জন্ম' দিয়ে নয়, 'যোগ্যতা' দিয়ে মানুষকে মাপার মানদণ্ড গড়ে তুলতে চেয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম তার দরজা খুলে দিয়েছিল চতুর্বর্ণের সবার জন্যই। সকলেই সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষু হতে পারতেন। শুধু তাই নয়, মুক্তির দ্বার খোলা ছিল চণ্ডালদের জন্যও। এঁরাও নির্বাণসুখ লাভ করতে পারতেন। *মজ্‌ঝিম নিকায়* থেকে জানা যায় দস্যু অঙ্গুলিমালকে যখন বৌদ্ধ সঙ্ঘে গ্রহণ করা হল, তখন তিনি বিস্ময়

প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সত্যিই তাঁর আর্যজন্ম লাভ হল। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধরা তাঁদের সঙ্গে শূদ্রদের প্রবেশ করতে দিয়ে যেন তাঁদের প্রাচীন উপনয়নের অধিকার প্রত্যর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাঁদের এই অধিকার-চ্যুত করেছিল।

জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। দীঘনিকায় সূত্তে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, রাজা বা রাজত্বের অধিকারী যেমন রাজস্বের সবটুকু আত্মসাৎ করবেন না, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণও তেমনি নিজেরাই সমস্ত জ্ঞানের একাধিপতি হবেন না। বৌদ্ধমতে জাতি-নির্বিশেষে যে কেউই আচার্য হতে পারেন। দীঘনিকায় বলা হয়েছে যে সুদ্দি, চণ্ডাল, পুক্কুস — যাই হোক না কেন আচার্যকে সর্বদাই সম্মান দেখাতে হবে। সূত্তের একটি 'জাতক' কাহিনিতে আছে যে এক ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কাছ থেকে মন্ত্র শিখে, পরে লজ্জায় তাঁর গুরুকে অস্বীকার করেছিলেন, তাই তার মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এটি বৌদ্ধ মনোভাবের বৈশিষ্ট্যসূচক। আরেকটি ক্ষেত্রে এক চণ্ডাল (যিনি বোধিসত্ত্ব স্বয়ং) তাঁর এক ব্রাহ্মণ সহপাঠীকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করে তাকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আচার্য সে কাজের নিন্দা করেন।

প্রাচীন জৈনধর্মেও তাঁদের শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। চতুর্বর্ণের সকলকেই এবং চণ্ডালদের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। যেমন পরবর্তীকালের একটি জৈন আকরগ্রন্থে জনৈক রাজার কথা আছে, যিনি মাতঙ্গের কাছে মন্ত্র শিখার জন্য নিম্ন আসন গ্রহণ করেন। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বলা হয়েছে যে, জন্মসূত্রে 'সোবাগ' (অর্থাৎ চণ্ডাল) হরিসেন গিয়েছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ আচার্যের যজ্ঞভুমিতে এবং কৃচ্ছসাধন, উত্তম

জীবন, সৎপ্রয়াস, আত্মসংযম, প্রশান্তি, ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণদের মতো প্রাচীন জৈন সন্ন্যাসীরা তন্তুবায়সহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের পরিবারের খাদ্য প্রত্যাখ্যান করতেন না (আয়ারঙ্গ সুত্ত ২।১।২।২)। অনুরূপভাবে বিনয় পিটকে দেখি, বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও চতুর্বর্ণের প্রতি পরিবারেই আহার্য সন্ধান করতে পারতেন এবং আমন্ত্রণ জানালে তাঁদের গৃহে খাদ্যগ্রহণও করতে পারতেন ।

নিম্নবর্ণের লোকে যে সত্যিই বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন বেশ কয়েকটি নিদর্শন থেকে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। মাতঙ্গ ছিলেন 'চণ্ডাল-পুত্র'; তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেছিলেন যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরাও লাভ করতে পারেন নি। 'থের' এবং 'থেরীগাথা' রচয়িতাদের তালিকায় দুশো ঊনষাট জন থেরের মধ্যে অন্তত দশজন এবং ঊনষাট জন থেরীর মধ্যে অন্তত আটজন ছিলেন সমাজের সেই অংশভুক্ত, যাদের 'শূদ্র' বলে গণ্য করা যায়। এদের মধ্যে রয়েছেন নট, চণ্ডাল, পেটিকা-নির্মাতা, ব্যাধ, বারাঙ্গনা, ক্রীতদাসী। এও লক্ষণীয় যে, মহাবীরের প্রথম শিষ্যা ক্রীতদাসী বলে কথিত।[৫]

এতদসত্ত্বেও কোনো সংস্কারপন্থী ধর্মই নিম্নবর্গের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বৌদ্ধ সঙ্ঘে ঐ জাতীয় লোকের অনুপাত ও গুরুত্ব নগণ্য ছিল বলেই মনে হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর সমসময়ে আনাড় কালাম, রুদ্রক রামপুত্র, অজিত কেশকম্বলী, পূরণ কাশ্যপ, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতপুত্র, মস্করী গোসাল, কুকুদ, কাত্যায়ন, সঞ্জয় বৈরাটীপুত্র – এঁদের দেখা পান। এঁদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, কিন্তু এঁরা ছিলেন

সকলেই বেদবিরোধী, যজ্ঞবিরোধী, অনেকেই কর্মফল-বিরোধী, কেউ কেউ নিয়তিবাদীও। এঁরা নিজেদের দল নিয়ে গ্রামে, নগরে ঘুরে বেড়াতেন। এঁদের কথা শুনে নতুন নতুন লোক দলে যোগ দিতেন। মনে রাখতে হবে, এসব প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরা কোনো আদিম জনগোষ্ঠী নয়, মোটের উপর সভ্য পরিবেশে বসবাসকারী মিশ্র প্রাগার্য-আর্য এক জনগোষ্ঠী, যাদের মনে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা সংঘর্ষ নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রচলিত মত ও পথে তাদের চিত্ত তৃপ্তি পায়নি।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে...

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত উর্বরা জমিতে কৃষি বেশ পোক্তভাবে বিকশিত হওয়ায় বস্তুগত সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। আর্য-সামাজিক জীবনে এর প্রসার ছিল সুদূরপ্রসারী। এ ছিল এক যুগ সন্ধিক্ষণ। যে সময়ে আরও কিছু পরিবর্তনের সমাপতন হয়েছে। গোষ্ঠী পরিচিতির আবহাওয়া ধীরে ধীরে ভৌগলিক পরিচয়ের প্রাধান্য পেতে শুরু করে। কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, চেদি, কাশী, কোশল, মগধ ইত্যাদি ষোড়শ মহাজনপদ এই সময় সম্পদের প্রধান উৎস পশু নয়, তার জায়গা নিয়েছে জমি ও আর্থিক লেনদেন। পশুপালন ভিত্তিক গোষ্ঠীসমাজের জায়গা নিয়েছে নিবিড় কৃষিব্যবস্থা। কৃষিক্ষেত্রের আয়তনে ব্যাপকতা এসেছে। তাঁর সঙ্গে যোগ হয়েছে লৌহ প্রযুক্তির। লাঙলের লোহার ফলা আর অন্যান্য কারিগরির সাহায্যে সমাজে উদ্বৃত্ত বেড়েছে। সেই উদ্বৃত্তে ভাগ বসাতে বর্ণব্যবস্থা তার শিকড় ছড়িয়েছে সমাজের গভীরে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে বৌদ্ধযুগ থেকেই ধনীব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্ভব। বৌদ্ধ গ্রন্থে ক্ষত্রিয়ের সন্দেহাতীত শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রাহ্মণের ঠাঁই হয়েছে অভিজাত (রাজন্য বা ক্ষত্রিয়)-দের

নীচে। লোহার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ক্ষত্রিয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরোহিত শ্রেণির তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সময়কার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও রেষারেষির বহু নমুনা মহাভারত ও পুরাণগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বর্ণব্যবস্থার জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের পারস্পরিক অবস্থান এক রকম থাকেনি। বরং বারবার বদলেছে। শ্রেণিস্বার্থ নিয়ে কখনও সংঘর্ষ, কখনও সহাবস্থান দেখা গিয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে। আকারে ও আয়তনে বৈশ্যের সংকোচন ও শূদ্রের বিস্ফোরণ ঘটেছে। যদিও প্রকৃত অর্থে এসকল ছিল মূলত উচ্চবর্ণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ। শূদ্র সেখানে অবান্তর।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জেরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শ্রেণির সামনে বড়সড় রাজনৈতিক সুযোগ এসে যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে শেষ মৌর্য রাজাকে সরিয়ে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণ সুঙ্গ রাজত্বের সূচনা করে। শুরু হয় বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। পরে যা গুপ্তশাসন জুড়েও ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। অনার্য ভূমিপুত্র, শূদ্র, ম্লেচ্ছ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমূহকে কেবল পেশিশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ্য বিধানগুলিকে কঠোর অনুশাসনের মোড়কে পেশ করা হল। এই সুঙ্গ ও গুপ্ত যুগেই সম্ভবত মহাভারতে সংযোজিত হয়েছিল শান্তি ও অনুশাসনপর্ব, যার আদি-অন্ত জুড়ে ছিল ব্রাহ্মণ্য মহিমাকীর্তন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামাজিক ভেদাভেদের উৎস-মূলে রয়েছে সম্পদ ও উৎপাদনের অসম বর্ণন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বৈশ্য ও শূদ্রের উপরে প্রভুত্ব বজায় রাখা এবং কৃষক, কারিগর, ভাড়াটে শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের উৎপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা। *মনুসংহিতা* বার বার জোর দিয়েছে বৈশ্য ও শূদ্র যেন কোন অবস্থাতেই তাদের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্য

থেকে সরে আসতে না পারে, সেই ক্ষেত্রে অরাজকতা দেখা দেবে। কারণ, এই দুই বর্ণের প্রত্যক্ষ শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে থাকে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা, যার উদ্বৃত্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সুখ-সমৃদ্ধি। সম্ভবত এই কথা মাথায় রেখেই *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে দণ্ডের উপরে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৬]

মহাভারত-এর বনপর্বে বকরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরের কাছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দেবত্বের কারণ জানতে চেয়েছেন। অর্থাৎ এই দুই বর্ণই মর্ত্যের দেবতা। অপরপক্ষে বকের প্রশ্ন ছিল – জীবিত থেকেও মানুষ কেন মৃতের মতো থাকে। যুধিষ্ঠিরের উত্তর – দারিদ্রের কারণেই মৃতের মতো থাকে। বলা চলে জীবন্মৃত। এই উদ্যোগ পর্বেই তিনি বলেছেন দারিদ্র্যের চেয়ে কষ্টকর অবস্থা হয় না। কারণ তখন অন্নসংস্থান থাকে না। বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন শান্তিপর্বের একাধিক আখ্যানে দেখি শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে রাজা যুধিষ্ঠিরের করা প্রশ্নগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্নই প্রজা অসন্তোষ সংক্রান্ত। কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্র*-এ (১।৪।২) রাজাকে সাবধান করে দিয়েছেন একাধিকবার, শাসন যদি অতি কঠোর হয়, অর্থাৎ তা এক পর্যায়ে পীড়ন হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা প্রজাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনু এই ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে তাঁর সংহিতার 'রাজধর্ম' অধ্যায়ে (৭।২৭-২৮) বলেছেন যে রাজার কেবল বিষয়েই মন, যিনি ক্রোধপরায়ণ, ছলনাশ্রয়ী – দণ্ডই তাকে হত্যা করে। রাজধর্মভ্রষ্ট রাজা সবান্ধবে নিহত হন – 'ধর্মাদ্বচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্'। প্রজা রক্ষার কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যে রাজা পীড়নে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন, সম্পদের সহবাসে যার দম্ভ আকাশছোঁয়া, প্রজারা যার অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি রব তোলে, তেমন রাজার যে চরম পরিণতি হতে পারে, এমনকী, প্রজদের হাতে সে রাজার বিনাশ

পর্যন্ত ঘটতে পারে, তেমন কথা অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম বলেছেন। প্রজারা যোদ্ধার বেশে অরক্ষক, ধনসম্পদ অপহরণকারী, জনগণের অধিকার হরণকারী, অ-নায়ক রাজাকে নির্দয় ভাবে মেরে ফেলবে। কারণ, সেই রাজাই সাক্ষাৎ কলি। লক্ষণীয়, বিদ্রোহ কিংবা বিক্ষোভ দেখিয়ে নয়, একেবারে প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাঁকে মেরে তবেই বিদ্রোহীরা শান্ত হবে।[৭]

একথা ঠিক যে, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারেরা কোথাও জনবিদ্রোহ বা বিপ্লবের কোনো সুসংহত দার্শনিক তত্ত্ব বা মার্গ-সন্ধান দিয়ে যাননি। রাজার স্বৈরাচার ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছলে জনগণের প্রতিরোধ সংগত হবে, তার কোনো স্পষ্ট রূপরেখাও রেখে যাননি তাঁরা। তবুও এরই মধ্যে ঠারেঠোরে, ইশারায়, ইঙ্গিতে থেকে গেছে জনবিদ্রোহের সম্ভাবনার বীজ। জনবিদ্রোহের এমন অনেক নজির আছে জাতকমালায়। *খণ্ডহাল জাতক*-এ রাজপুরোহিত, যে আবার বিচারকও, তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণের আওয়াজ ওঠানো দিয়ে কাহিনি শুরু। খণ্ডহাল ঘুষখোর, ফলে তার বিচার পক্ষপাতদুষ্ট। একবার ঘুষের বিনিময়ে দোষীকে ছেড়ে দিয়ে নির্দোষের সাজা ঘোষণা করে রাজপুত্র চন্দ্রকুমারের কাছে ধরা পড়ে যায় সে। তার বিচার উল্টে দেয় রাজপুত্র। এর পরেই খণ্ডহাল রাজপুত্র চন্দ্রকুমারকে প্রাণে মারার পরিকল্পনা করেন। রাজাকে বোঝাতে সমর্থ হন যে, চন্দ্রকুমার-সহ আরও কিছু নিকটাত্মীয়কে যজ্ঞে বলি দিলে রাজা দেবলোকে যাবেন। খবর পেয়ে প্রজারা খেপে ওঠে। খণ্ডহালকে তো তারা প্রাণে মারেই, রাজাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। শেষমেশ বোধিসত্ত্ব (রাজপুত্র চন্দ্রকুমার)-র চেষ্টায় রাজা প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু তাঁকে আর কিছুতেই নিজেদের রাজা দেখতে রাজি নয় বিক্ষুব্ধ জনতা। রাজবেশ কেড়ে নিয়ে

রাজাকে তারা গেরুয়া পরিয়ে মাথায় ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে, এক কথায় চূড়ান্ত হেনস্থা করে নগর থেকে তাড়িয়ে দেয় চণ্ডালপল্লীতে।

সত্যংকিল জাতক-এ রাজা উপকারী (বোধিসত্ত্ব)-র প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর বদলে তাঁকে বধ করার আদেশ দিলে বোধিসত্ত্বের মুখে রাজার কৃতঘ্নতার বৃত্তান্ত শুনে নগরবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে মুগুরপেটা করে রাজাকে মেরে ফেলে এবং অশ্রদ্ধায়, অবহেলায় মৃতদেহ রাস্তার ধারে খানায় ফেলে দেয়।

মণিচোর জাতক-এ কামুক রাজার কুনজরে পড়ে পল্লীবাসী গৃহবধূ সুজাতার দিকে। রাজা সুজাতার স্বামী বোধিসত্ত্বকে অন্যায় পথে চোর সাজানোর ষড়যন্ত্রে তার গোরুর গাড়িতে নিজের চূড়ামণি লুকিয়ে রাখলেন। পরে রাজার লোকলস্কর গাড়ি তল্লাশি করে মণি বার করে তাকে চোর সাব্যস্ত করল। চক্রী রাজা বোধিসত্ত্বের মাথা কাটার আদেশ দিলেন। গৃহবধূ সুজাতার বিলাপ শুনে দেবরাজ প্রকট হয়ে রাজাকে বধ করে বোধিসত্ত্বকে রাজবেশ পরালেন এবং উপস্থিত জনতাকে বুঝিয়েও দিলেন যে রাজার এই পরিণতি পাপাচারেরই ফল। অধার্মিক রাজা নিহত হওয়ায় প্রজারাও খুশি।

আবার *পদকুশলমানব জাতক*-এ দেখি রাজা ও রাজপুরোহিতের মিলিত ষড়যন্ত্রকে প্রজাদের সামনে তুলে ধরেন বোধিসত্ত্ব। পরিণতিতে প্রজাবৃন্দ কর্তৃক রাজা নিধন।[৮]

যুগপ্রবাহী শূদ্র বঞ্চনায় প্রভুদের প্রতি শূদ্রদেরও যে খুব অনুকূল মনোভাব ছিল না তা অনেকাংশেই স্পষ্ট, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই মনোভাবের প্রকাশ ঘটার সুযোগ ছিল না। ফলস্বরূপ নানা ক্ষেত্রেই শূদ্রদের নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে

পড়ার প্রবণতা দেখা গেছে। ডাকাতি, সিঁধ কেটে চুরি, মন্দিরের সম্পদ চুরি, প্রভুকে খুন করা। কখনও কখনও তা ব্রাহ্মণের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে আক্রমণ, এমনকি রাজদ্রোহেরও রূপ নিয়েছে। যদিও রোমে ৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে ধরনের দাস বিদ্রোহ হয়েছিল, ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে স্পার্টাকাসের মৃত্যু এবং প্রকাশ্যে ছয় হাজার দাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারায় যে বিদ্রোহের ইতি ঘটে তেমন নজির এদেশে মেলে না। অপশাসনের জেরে রাজা বেনকে হত্যা করার কথা ভীষ্ম শুনিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে। নহুষ, সুদাস, সুমুখ, নৈমির মত অত্যাচারী যে সব রাজা জনরোষের শিকার হয়েছেন অনুরূপ কিছু নজির ইতিহাসেও রয়েছে। মৌর্য ও শুঙ্গ বংশের শেষ দুই রাজা বৃহদ্রথ ও ভদাভদ্র, আরও অনেকে পরে রাষ্ট্রকূট রাজা চতুর্থ গোবিন্দকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল অপশাসনের জেরে – প্রজা-মন্ত্রী-সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠায়।

কর্ণের বর্ম খুলে নেওয়া, একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়া – দুটি ভিন্ন চরিত্র, কিন্তু তাদের উপর পীড়নের ভাষা একই রকম। কর্ণের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় ইন্দ্র, একলব্যের বেলায় ব্রাহ্মণ দ্রোণ শাসকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিল। *রামায়ণ*-এ শম্বুকের তপস্যা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের আতঙ্কিত করেছিল। শম্বুকের রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণ বালক প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। শূদ্রের অনিষ্টের সঙ্গে উচ্চবর্ণ – বিশেষ করে ব্রাহ্মণের ইষ্টের সরাসরি যোগ। শূদ্রের শ্রম খাটিয়ে উৎপাদনের উদ্বৃত্তে ব্রাহ্মণের সুখ সমৃদ্ধি, তাই যে কোনো মূল্যে শূদ্রের উত্তরণ রুখতে হয়, প্রয়োজনে প্রাণের বিনিময়ে হলেও। জন্মসূত্র ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, সমাজ নির্দিষ্ট পরিচয় ছাড়িয়ে আত্মপরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা, গুণ ও কর্মের মাধ্যমে নতুন পরিচয় তৈরির চেষ্টা করেছেন কর্ণ। সূতপুত্র বলে

সমাজ তার হাতে রথের ঘোড়া ছোটানোর চাবুক তুলে দিতে চেয়েছিল, কর্ণ তার বদলে তুলে নিয়েছিল ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র। কর্ণ, একলব্য, শম্বুক – একধরনের উত্তরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিম্নবর্গের কারোর উত্তরণের স্বপ্ন দেখা সেদিনের সমাজে ছিল ভয়াবহ রূপে ব্যতিক্রম। কিন্তু আত্মপরিচয় সন্ধানী মানুষের সারাক্ষণের প্রয়াস থাকে ওই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ছুটে যাওয়ার, এমনকী, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। কার্যত প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার পরে একলব্যের সাধনার বিবরণ বিস্তারে নেই মহাভারতে। তবে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁর উপস্থিতির একটিমাত্র উল্লেখেই টের পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের দেওয়া প্রতিবন্ধিত্ব নিয়েও সেই সময়ের রাজন্যকূলে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এতটাই বিশিষ্ট যে, শিশুপাল ওই রাজসূয়তে কৃষ্ণের বদলে একলব্যকেও অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য মনে করেছিলেন। নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রতিভা থাকে না এই কৌশলী অপপ্রচারের বিপরীতে এরা দাঁড়িয়ে চিরভাস্বর। অনার্য ঘটোৎকচের মৃত্যুর বিনিময়ে এসেছিল অর্জুনের জীবনের নিশ্চয়তা। এই প্রসঙ্গে শোকাচ্ছন্ন যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বলেছিলেন যে, কর্ণ না মারলে ঘটোৎকচকে আমিই মারতাম। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী, যজ্ঞবিরোধী, অধার্মিক, পাপাত্মা ছিল সে। আশ্চর্য এই যে মহাভারত তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কিন্তু কৃষ্ণের এই বয়ানের সমর্থন মিলবে না।

সুকৌশলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, বিরুদ্ধ স্বরকে চাপা দেওয়ার দৃষ্টান্তও একাধিক। *মহাভারত*-এ নিষাদ জাতির জন্ম বেশ অগৌরবের। যেমন করে বিধাতা পুরুষের পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি, তেমনই নিহত রাজা বেণ-এর ডান ঊরু মন্থন করে বেঁটে, বিকৃত আকারের নিষাদের জন্ম। বেণ রাজার খুব একটা সুখ্যাতি নেই

মহাভারতে। তিনি ছিলেন ক্রোধী রাজা, প্রজাপীড়ক। ঋষিরা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেন তাঁকে। তারপর ঋষিরা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নিহত বেণের ডান ঊরু মন্থন করলে বিকৃতাকার, বেঁটে, পোড়া কাঠের মতো কালো রক্তবর্ণ চোখ এক পুরুষের উৎপত্তি হয়। ঋষিরা তাকে বললেন নিষাদ – অর্থাৎ বসো। ইত্যবসরে সুকৌশলে বলা হয়ে গেল অনেকগুলি কথা। বনবাসী, পর্বতবাসী, নিষ্ঠুর স্বভাব নিষাদের জন্মকথা। দাগিয়ে দেওয়া হল কুৎসিত, নিষ্ঠুর রূপে হত্যা করাই যাদের দস্তুর।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি গৌতম অন্য নজির গড়েছিলেন। সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে চায়। সে জানে এ বিদ্যায় কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। সত্যকামের মা জাবালা যৌবনে বহু পুরুষের পরিচর্যা করে তাকে পেয়েছেন, তাই তাঁরও অজানা সত্যকামের প্রকৃত পিতৃপরিচয়। কিন্তু জাবালা তাই নিয়ে পুত্রের কাছে কোনো ভণিতা করেননি। দৃঢ় স্বরে বলেছেন, তুমি সত্যকাম, জাবালার সন্তান বলেই নিজের পরিচয় দিও। অর্থাৎ পিতৃপরিচয় নেই তো কী, মায়ের পরিচয়ই যথেষ্ট। গুরু গৌতমের কাছে সেই পরিচয়ই দেয় সত্যকাম। গুরু গৌতম সত্যকামের সত্যনিষ্ঠাকে মর্যাদা দিলেন। দ্রোণাচার্য যা পারেননি, গৌতম তা করলেন। সত্যকামকে শিষ্যের মর্যাদা দিলেন। পরবর্তীকালে ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কাহিনি সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেছেন, সত্যকামের সত্যবাদিতাই যে ব্রাহ্মণ পরিচয়ের কবচ, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই ঋষি গৌতম তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মা জাবালা তাঁর ছেলের জাত-গোত্রের ঠিকানা না জানলেও শেষমেশ নিশ্চিত করতেই হল যে গৌতম অব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম বিদ্যার পাঠ দেননি।

সহজিয়া দর্শন...

চর্যার গানগুলিকে খুব খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, শ্মশানচারী ও শূকর পালনকারী ডোম, অরণ্যে বসবাসকারী শবর-শবরী, নটপেটিকাধারী নিঘৃণ কাপালিক, মদ-চোলাইকারী শুঁড়ি, নদীর বুকে হাল-বৈঠা ধরে বসে থাকা মাঝি-মাল্লা, বয়নকারী তাঁতী, তুলো ধোনার বৃত্তিতে অভ্যস্ত ধুনুরি প্রভৃতি অজস্র বৃত্তিজীবীদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল চর্যার কবিদের আঁকা বাংলার জীবন। চর্যাকারদের আশ্রয় ছিল তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ দর্শন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিসরে বাংলায় দুটি রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল – পাল ও সেন বংশ। ধর্মমতে পালরাজারা ছিল বৌদ্ধ, অন্যদিকে সেন রাজারা ছিলেন কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তার যাবতীয় আচার-বিচার, কৃত্য সংস্কার, সামাজিক স্তরভেদ ইত্যাদি নিয়ে সেন আমলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হাড়ি, ডোম শবর প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিগুলি এরই ফলে উচ্চবর্ণ কর্তৃক প্রবল নির্যাতনের মুখে পড়ে। সামাজিক স্তরভেদে এরা ছিল অস্পৃশ্য। দুঃখ জর্জর নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষের রুদ্ধ যন্ত্রণা ভাষা পেয়েছিল সংগীতের আধারে। চর্যার কবিরা তাই সাংকেতিক ভাষায় কাব্য রচনা করতে বসেও তুলে এনেছেন তাঁদের চেনা জগৎ, জানা মানুষ এবং শুনিয়েছেন নিজস্ব জীবন-পাঁচালি। ক্ষুধাকাতর শিশুর শীর্ণ শরীর, ভাঙা কলসীতে এক ফোঁটা জল, শূন্য হাঁড়ি, জীর্ণ বস্ত্র, ভাঙা কুঁড়ে ঘরে– এসব দারিদ্র্যের চিত্রে ভরা চর্যাগীতি, তাকে অতিক্রম করে বৈভবের ছবি চর্যাকারেরা আঁকতে পারেননি। চর্যাকারদের নিঃসীম দারিদ্র্যের এই সকল ছবির মধ্য দিয়েই যেন তৎকালীন ধনকামীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারি ছিল। তাঁরা দেখালেন অনুরাগে ও আসঙ্গলিপ্সায় ব্রাহ্মণ সন্তান নতজানু হলেন নিম্নবর্ণের ডোম রমণীর সামনে। ১০ নং চর্যায়

জাতপাতের সকল বাধানিষেধ এক নিমেষে উড়িয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন নগরের বাইরে নিম্নবর্ণের ডোম প্রেয়সীর কুঁড়ে ঘর। হাজার হাজার বছর আগে চর্যাকাররা জাত-ধর্মকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের স্পর্ধার সূচনা করেছিলেন। চর্যার কবিরা আত্মনির্ভর নারীর ছবি এঁকেছেন। সারা চর্যাগানগুলি জুড়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কর্মের একাধিক প্রসঙ্গ চিত্রিত। ব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণ্য ভুলে রাত্রির অন্ধকারে ডোম রমণীর কুঁড়েতে পৌঁছে যেতে পারে দেহ সম্ভোগের স্বাধীন ইচ্ছে নিয়ে, তেমনই বিবাহিতা অথচ ঘরে স্বামী না থাকা স্ত্রীকেও তাঁরা দিয়েছেন মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের অধিকার। যে অধিকার থেকে দিনের বেলায় কাকের ডাকে ভয় পাওয়া বউটি 'কাঠকি বাধা' অতিক্রম করে অভিসারিকা হতে পারে রাতের অন্ধকারে। এই নিশাভিসারকে ব্যভিচারের ক্লেদযুক্ত নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতার আলোকদীপ্ত ইঙ্গিত রূপেও পড়াই যায়। ব্রাত্যজনের প্রকৃত যাপন-কথা ইতিহাসে আদতে কতখানি স্থান পেয়েছে তা প্রশ্নাতীত নয়। অন্ত্যজ হয়ে অন্ত্যজদের কথা বলার যে স্পর্ধা সেদিন চর্যাকারেরা দেখিয়েছিলেন তা বড়ো গর্বের, বড়ো শ্লাঘার। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এরই নাম সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ; অনার্যদের কাছে যা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামিল, বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে আঘাত।

চৈতন্য প্রভাব...

কর্মফলবাদ, জন্মান্তরবাদ ও বর্ণাশ্রয়ী বৃত্তির ধারণা একত্রিত হয়ে জাতিভেদ যে সময় একটি অনড় দৃঢ় মূল প্রাতিষ্ঠানিক প্রথারূপে সমাজে জাঁকিয়ে বসেছে, সেই কালপর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬ – ১৫৩৩) আবির্ভাব। তাঁর প্রভাবে সেকালের জাতি-বর্ণ বিভক্ত, পানাহার-নিষিদ্ধ, অর্থনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত স্মৃতিশাসিত বাংলায় তাঁর বৈপ্লবিক শাস্ত্র-

ধ্বংসী প্রাজ্ঞোক্তি ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ। হরিভক্তি বিহীনেন দ্বিজোহপি শ্বপচাধমঃ’। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলায় ভেঙে পড়া হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপটে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন নির্যাতিত হিন্দু ও বিধ্বস্ত হিন্দুধর্মের অন্যতম পুনর্গঠক। বিপুল মাত্রার গণসংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমভক্তির আদর্শে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত, নারী-পুরুষ সকলকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাই বাংলার শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিসমূহের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ছিল খুবই সুদূরপ্রসারী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তুলনায় প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন আরও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী। বোধহয় প্রথম জীবনে অবধূত হওয়ার কারণে কোণও স্থানু সামাজিক বিধানকেই তিনি মানতেন না। বস্তুত তাঁর উদ্যোগেই পানিহাটিতে একদা চিঁড়া মহোৎসবে ছত্রিশ জাতের একত্র পংক্তিভোজনের মতো অসম্ভব ঘটনা ঘটেছিল। নিমাই-নিতাইয়ের এই যৌথ আন্দোলনের ফলেই বাংলার চিরাচরিত জাতব্যবস্থা এবং সামাজিক আইন-কানুন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হবার সুবাদে ব্রাহ্মণের গুরু হবার অধিকার লাভ করেন। ব্রাহ্মণ শিষ্যরাও বর্ণগরিমা বিসর্জন দিয়ে সেইসব গুরুর চরণস্পর্শ করে পদধূলি নিতেন। এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুই ব্যক্তিত্ব হলেন উত্তরবঙ্গের কায়স্থ নরোত্তম দত্ত ও মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ শ্যামানন্দ। ভক্তির পথ ধরেই মহাপ্রভু সামাজিক বর্ণবৈষম্যের বিষটুকু শোধন করতে চেয়েছিলেন। শূদ্র ও বিষয়সেবী হওয়ার কারণে রামানন্দ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরদানকালে বারবার কুণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁর সংকোচ দূর করে বলেছিলেন, ‘কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়/ যেই

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়’। একই সঙ্গে দ্বিজ ও চণ্ডালের প্রচলিত সংজ্ঞাও পরিবর্তিত করে দিয়ে কৃষ্ণভক্তির নিরিখে বললেন, ‘চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে/ বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে’। এই নতুন আদর্শই সেদিন মানবমুক্তির দিশা দেখিয়েছিল। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে।

১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে তপশিলি উপজাতির অন্তর্গত ২০, ৮২, ৩১৪ জন ও তপশীলী জাতির অন্তর্গত উপরোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ১৬, ৫৬, ৮৪১ জনকে বৈষ্ণব বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তিবাদী ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার এই এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ড. হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর *Social Mobility in Bengal* (১৯৮১) বইয়ে বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন জাতিগত ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাসে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ, নবশাখ, অ-জলচল, নবশাখ ও অ-জলচলের মধ্যবর্তী ও অন্ত্যজ – এই ছয়টি পরম্পরাগত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। আর ছিল মুসলমানরা। এমতাবস্থায় চৈতন্যের ধর্মান্দোলন স্থবিরতাপ্রাপ্ত জাতি-বর্ণ প্রথাকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়। যার ফলে সামাজিক পরিচলনের একটা অবকাশ তৈরি হয়। শ্রেণিগত বিচারে সামাজিক সচলতা মুখ্যত দুই প্রকার — ১) Horizontal mobility অর্থাৎ সমস্তর বা অনুভূমিক সচলতা এবং ২) Vertical mobility অর্থাৎ স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ বা উল্লম্ব সচলতা। প্রথমটি একই সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত; দ্বিতীয়টি ভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত। সমস্তর সচলতায় কায়স্থ কিংবা বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ গুরুর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে উল্লম্ব সচলতায় জল-অচল শূদ্র এবং মুসলমানরা ভক্তি ও নৈষ্ঠিকতার জোরে বৈষ্ণবগুরুতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রজন্মগত

বিচারে সচলতাকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত , অর্থাৎ এক ভক্ত পরিবারে এক পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ সচলতা হল প্রজন্মান্তরগত সচলতা, যেমন মুরারি গুপ্ত বা যবন হরিদাস। দ্বিতীয়ত, যখন একাধিক পুরুষ ধরে নানা প্রজন্ম সঞ্চারিত হয় তখন সেটি বিবেচিত হয় বহু প্রজন্মবাহিত সচলতা বলে। এর উদাহরণ অদ্বৈতাচার্য শিবানন্দ সেন, নিত্যানন্দ প্রভু এবং এদের পরবর্তী প্রজন্ম। উপরোক্ত সামাজিক সচলতার কতগুলি প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ করা যায় যা কিয়দংশে সামাজিক প্রগতির ইঙ্গিতবাহী। পূর্বে পুথিপাঠ, পুথি রচনা, লিপি কর্ম ইত্যাদিতে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণিস্থ লোকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এইসব ক্ষেত্রে, বিশেষত লিপিকরের ভূমিকায় তথাকথিত শূদ্রদের বিপুল মাত্রায় অংশগ্রহণ করার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। নারীর সামাজিক অবস্থান অনেকটাই পালটে যায় বৈষ্ণব সমাজে। তাদের শূদ্রত্ব ঘুচে যায়, মুছে যায় ধর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সীমা। তাঁরাও পুরুষদের পাশাপাশি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন – জাহ্নবীদেবী, সীতাদেবী, হেমলতা ঠাকুরানী যার প্রমাণ। চৈতন্যের মুসলিম শিষ্য ছিলেন চামার হরিদাস, এছাড়াও কয়েকজন পাঠান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এঁদের মধ্যে 'দাবিস্তান উল্-মজহর' গ্রন্থের প্রণেতা কাজী এবং বিজুলি খানও ছিলেন। যে ধরনের জাতি-নিরপেক্ষতা নিয়ে এই নতুন ধর্মের শুরু হয়ে ছিল, চৈতন্যের মৃত্যুর পর মতভেদ, দলভেদে তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীরতে কলকাতার বনেদি বংশে অন্তঃপুরিকাদের লেখাপড়া শেখানোর ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীদের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। বিদ্যার এই চলমানতা এক অর্থে সামাজিক অগ্রগতিরই সূচক।

এরই পাশাপাশি তথ্য হিসাবে এটা উল্লেখ্য যে, বাইতি, ভুঁইমালি, ধোবা, দোসাদ, ডোম, জেলে, কৈবর্ত, মালো, কাওয়া, পোদ, রাজওয়ার, শুঁড়ি, তিয়র প্রভৃতি শূদ্র ও অন্ত্যজদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্ম তেমনভাবে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। এরা বরং বাউলধর্মী গৌণ সম্প্রদায়ের প্রভাবপুষ্ট ছিলেন। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র স্ব-সমাজ সম্প্রসারণের তাগিদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েচিলেন – ‘নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়’ এই অভিধায়।

পরবর্তীকালে মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তি আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত তার বৈপ্লবিক চরিত্র ধরে রাখতে পারেনি। বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্য পরবর্তীকালে বৃন্দাবনীয় গোস্বামীদের বর্ণাশ্রমভিত্তিক বৈষ্ণবীয় স্মৃতি সংহিতা শাস্ত্র ও দর্শনের ভাবনায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ এগুলিতে খুবই প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়।[৯]

মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন...

বৈদিক কর্মকাণ্ড ও আচার-বিচারের জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মমার্গ পরিহার করে ভক্তির সহজ অনুভবের পথ-সন্ধান দিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের চিন্তানায়করা। পরবর্তীকালে তা প্রসারিত হয় পশ্চিম ও উত্তর ভারতে, সর্বশেষে পূর্বভারতে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভক্তিপথ গুলির আবির্ভাবের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। দেখা যাবে, প্রাতিষ্ঠানিক আচারর বিরুদ্ধে বারবার এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্ত। কখনও বেদের,কখনও পুরাণের,কখনও কোরাণের নির্দেশের বাইরে এসে নিজস্ব ভাবনা যাপনের পৃথক পরিসর খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। ধর্মের স্ট্রাকচারের উল্টোদিকে একটা কাউন্টার স্ট্রাকচার প্রস্তাব

করেছে ভক্তি। অনেকটা সেই কারণেই বোধহয় ভক্তিকে অনেকে আন্দোলন বলতে চান। ভক্তিসাহিত্যের প্রায় পুরোটাই লেখা হয়েছে আঞ্চ দেশীয় ভাষায়,সংস্কৃতে নয়। এমনিকি সংস্কৃতের অতিনির্দিষ্টতা ভক্তির অস্থিরতাকে ধারণ করার উপযুক্ত নয় বলেও মনে হয়েছে কখনও কখনও। দেবভাষার প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে রেখেছেন কবীর প্রাকৃতজনের ভাষাকে। কর্ণাটকে এবং মহারাষ্ট্রে পাঁচ-ছ'শো বছর আগে বীরশৈব অথবা বারকরী ঘরাণার ভক্ত সন্তের দল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন প্রেম আর নিবেদনের গান শুনিয়ে।

এই সকল উদারপন্থী সাধকদের পরিচয় এবং সামাজিক অবস্থান লক্ষ করলে দেখি, গুরু রামানন্দ (ব্রাহ্মণ) বাদে অন্য সকলেই নিম্নবর্গের – স্বয়ং কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা, দাদূ ধনকর (তুলো সাফ করতেন), রুইদাস চর্মকার, রজ্জব মদ বিক্রি করতেন (কলাল), শুক্লহংস ধোপা এবং নামদেব কাপড় রাঙাতেন (রংরেজি বা ছিপি)। অর্থাৎ জন্মপরিচয় ও বৃত্তিগত অবস্থান ছিল সমাজের নীচের দিকে। রামানন্দ পারিবারিক সূত্রে বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মে তত্ত্বগত ভাবে জাতিগত স্বীকৃত হওয়ার কথা নয়, কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিল ভিন্নরকম। তাই রামানন্দ তাঁর মতের ভিত্তি গড়েছিলেন জাত অস্বীকার করার ওপরে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গের ক্ষতিকর প্রভাব খর্ব করবার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি বিবৃত করলেন কথ্যভাষায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সকল জাতের সঙ্গেই ছিল তাঁর আহারবিহার, এবং পরে রামানন্দী সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা মূলনীতিও হয়ে ওঠে। রামানন্দের শিষ্য মুচি রবিদাসের দুই শিষ্যা ছিলেন চিতোরের শিশোদীয় রানার দুই রানী মীরাবাঈ ও ঝালি।

চতুর্দশ শতকে কাশ্মীরে এক উদারপন্থী মহিলা সাধকের আবির্ভাব হয়। ইনি নিজেকে হিন্দু বা মুসলিম কোনো পরিচয়েও অভিহিত করতেন না। উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তা কবীর, নানক, রজ্জব প্রমুখ সন্তরা কিন্তু জাতিভেদকে সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর মূর্তিপূজারও বিরোধী ছিলেন। অথচ শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবনায় পৌত্তলিকতার স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়াকাণ্ডের সূত্রে আচার-বিচারও যৎসামান্য রয়ে গিয়েছিল। আর সেই আচার-বিচারের পথ ধরেই পরবর্তীকালে ভক্তিধর্ম বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ঘেরাটোপে আটকে পড়ে।

কবীর (১৩৮৩-১৪২০) ছিলেন জোলা। রামানন্দের বারোজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কবীর ছিলেন অন্যতম। তিনি বলতেন, বিষ্ণু-আল্লা-রাম-রহিম ভাষাভেদ মাত্র, বস্তুত এরা একজনেরই নাম। এঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যায় প্রায় সমান ছিলেন। কবীর গান ও কবিতায় উপলব্ধির এই গভীর তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন, যেখানে শাস্ত্র-পুরোহিতের ঠাঁই নেই, মূর্তি পূজার অর্থ নেই, জাতি-ধর্ম বিচারে সব মানুষই ভগবানের সন্তান, ভাই-ভাই। কবীর কথ্যভাষায় গান, কবিতা রচনা করতেন, সংস্কৃত ভাষাকে বলেছেন বদ্ধ কূপ। কবীরের শিষ্য মদনা পেশায় ছিলেন কসাই এবং অপর শিষ্য লাভা ছিলেন অচ্ছুত। তাঁর কয়েকটি দোঁহা যদি দেখি পাশাপাশি রেখে তাহলে বুঝতে পারব তাঁর চিন্তাভাবনার সারাৎসার টুকু।

> আমি কাবার পথে বেরিয়েছিলাম হজে
> কিন্তু পথেই মিশেছি আল্লাতে
> ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলেন তিনি
> অনেকখানি ঝগড়ারই ভঙ্গিতে,
> কে তোমাকে বলল কাবায় যেতে? (১০৩ নং দোঁহা)[১০]

আরও স্পষ্ট ভাষায় তিনি ১০৬ নং দোঁহায় বলছেন –

মন রাঙালে না যোগী
কাপড়খানিই শুধু রাঙালে
বসেছ আসন পেতে মন্দিরের মাঝে
ব্রহ্ম ছেড়ে পাথরের পূজায় নিরত।
জটাজূট বাড়িয়েছ শুধু আর ফুটিয়েছ কান
দীর্ঘতর হল শুধু দাঁড়ির বহর,হায়
মূর্খ রয়ে গেলে তবু তুমি।
...
বলেন কবির, ভাই শোনো সাধুজন
তুমি এক বদ্ধ জীব
যমের দুয়ারে উপনীত॥[১১]

এ যেন স্পষ্ট থাপ্পর আড়ম্বরপূর্ণ ভক্তিচর্চার প্রতি। ৯৮ নং দোঁহায় করেন তাঁর সেই মোক্ষম জিজ্জাসা –

...হিন্দু এবং তুর্কির যিনি প্রভু পরম
তিনি তো একই,তবে আর কেন বিসম্বাদ
মোল্লা এবং শেখের তাহলে কী দরকার?[১২]

দ্বিধাহীন ভাষায় তিনি এও বলতে ভোলেন না, ‘মরণের চোখে সমান সকলে- ভিখারি ও রাজা।’

চোদ্দ শতকের মারাঠী ভক্ত কবি সোয়ারাবাঈ ছিলেন বরাকরী ধারার সন্ত। জন্ম ‘নীচু’ জাতে। আর এক বিখ্যাত সাধক চোখামেলার স্ত্রী হিসাবে তাঁর পরিচয় দেন কেউ কেউ। সারা জীবনে প্রায় ষাটখানি অভঙ্গ লিখেছেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নানা অত্যাচারের

বিরোধিতা তাঁর একাধিক গানে। বিঠোবার প্রতি তাঁর কুণ্ঠাহীন ভালোবাসা অধিকার বোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

৭৭ নং অভঙ্গে তিনি বিঠোবাকে স্বামিন সম্বোধন করে বলেন-

> ...
> তোমাকে এখন ভয় কী?
> অন্যেরও ভয়ে থাকি না কুঁকড়ে।
> কত আর বলি,থোড়াই কেয়ার তোমাকে
> রাগ কর আর যাই কর বলি হে প্রভু,
> এই আমি বসে,সোয়ারা, হব না পিছপা।[১৩]

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর যে 'দীন ইলাহী' ধর্মমত প্রবর্তন করেন তাতে শাস্ত্র-পুরোহিত নিরপেক্ষ এক ধর্মাচরণের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল স্তম্ভগুলি ছিল অহিংসা, দয়া, দান ইত্যাদি সার্বজনিক, মানবিক গুণের চর্চা, ইসলাম, জরাথ্রুষ্টীয় ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এর মধ্যে মিশে ছিল। সামাজিক ভাবে কুসংস্কার নিবারণ করা আকবরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এর মধ্যে সম্প্রদায়-নির্বিচারে যে ধর্মাচরণের ভিত্তি নির্মিত হয় তা সম্ভবত সম্রাটের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্তদের মতের মধ্যে সমন্বয় প্রচেষ্টারই ফল। প্রচলিত ধর্মের সত্তার বাইরে এক উন্মুক্ত ভূমিতে মানুষকে নিয়ে আসাই যেন বাদশাহ'র লক্ষ্য ছিল।

এর কাছাকাছি সময়ে বহু চিশতি ও সুফী ইসলামের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে এসে সম্প্রদায়ের বেড়া ভেঙে নিরঞ্জন ভগবৎসাধনায় প্রবৃত্ত হন, শিয়া-সুন্নি ভেদ মানতেন না; তেমনই অন্য সম্প্রদায়ের সীমানায় তাঁরা বিশ্বাস রাখতেন না। এঁদের মধ্যেও শেখ

মঈনুদ্দীন নিজামুদ্দিন চিশতি, বিশেষভাবে আমীর খসরু জনপ্রিয় ছিলেন। উদারপন্থী দারা শুকোহ তাঁর উদার মতের জন্য রাজপরিবারে অপাঙক্তেয় ছিলেন এবং অনেকটা এই কারণেই মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন। ভক্ত রামদাস (১৬০৮-১৬৮১) পূর্ব আশ্রমে নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন। পরে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে উদার মতের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। শূদ্র তুকারাম (১৬০৮-১৬৪৯) জন্মেছিলেন মহারাষ্ট্রে, ইনি চৈতন্যভক্ত ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর শিষ্যরাও সেই উদার মত অবলম্বন করেছিলেন।

কখনও কখনও কিছু প্রতিবাদী ধারা স্বীকৃতি পেয়েছিল, কখনও বা কঠিন সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এঁদের, শারীরিক অত্যাচারে। ধোপা-নাপিত বন্ধ, একঘরে করা, অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড এবং পরিশেষে মৃত্যু – এ পর্যন্ত সব কিছুরই ইতিহাসে নজির রয়েছে। এত বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কেন এঁরা সমাজের বহুসংখ্যক শক্তিশালী, বিত্তশালী ও ক্ষমতাশীন শাস্ত্রকার ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধাচারণ করতে গেলেন? কী পেলেন এই বিদ্রোহের বিনিময়ে? কী উদ্বুদ্ধ করেছিল এই শক্তিহীন অশিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতিবাদ করতে? সম্ভবত জাতপাত-সম্প্রদায়ের নামে, ধর্মের নামে মানুষের ওপরে মানুষের অত্যাচার দেখে প্রতিবাদ না করে এঁরা ক্ষমা পাননি আপন অন্তরাত্মার কাছে। সহজ মানবিক বোধে এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্ম-জাত-সম্প্রদায় কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের সৃষ্টি।

গৌন ধর্মসম্প্রদায়...

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সর্বপ্রকার জাতিভেদ উপেক্ষা করে, বৈদিক প্রথাকে অস্বীকার করে উদার ধর্মাচরণের মুখোমুখি দাঁড়ালেন হরিচাঁদ ঠাকুর। মতুয়া আন্দোলনের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আট বছর আগে ১৮১২ সালে, তৎকালীন ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ, বাংলাদেশ) জল-জঙ্গলে ঘেরা সাফলিডাঙা গ্রামে। সম্পন্ন কৃষক পরিবার হলেও তাঁরা ছিলেন তৎকালে অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্য। পরবর্তীকালে জমিদারের দ্বারা নির্যাতিত এবং বাস্তুচ্যুত। সমকালোপযোগী একটি ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রবল আলোড়ন তুলেছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের খুব কাছাকাছি সময়ে মতুয়া ধর্মান্দোলনের সূচনা।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুখ্যত, কলকাতা মহানগরের আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের হাত ধরে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সূচনা। পরবর্তীকালে তাঁরা সমাজসেবামূলক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে কিছু ক্ষেত্রে পল্লীগ্রামে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বার্তা পৌঁছালেও সাধারণের মধ্যে তা কাঙ্ক্ষিত গতি লাভ করেনি। বিপরীত দিকে মতুয়া আন্দোলনের সূচনা বিল-বাওড়ে ঘেরা বিভিন্ন জনপদে, সব থেকে ব্রাত্য, পশ্চাদপদ জনতার মধ্যে। দু-একটি আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথার বদল নয়, মতুয়া দরড়শন প্রচলিত হিন্দু ধর্মের জাতিভেদাত্মক সমাজ কাঠামোটাকেই অস্বীকার করে। বাতিল করেছিল মন্ত্র-তন্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, এমনকি বৈদিক বিধানও। এই বিদ্রোহের পথে অর্জিত হয়েছিল আত্মপ্রত্যয়। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাজবংশীদের মধ্যে যে বিদ্রোহী লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়টির বিস্তার ঘটেছিল,

তার নাম ক্ষেপা দল। তারা কঠোরভাবে একেশ্বরবাদী, এব-দেবীতে অবিশ্বাসী এবং জাতিভেদ বিরোধী। ময়মনসিংহ অঞ্চলের আদিবাসী সহ নিপীড়িত কৃষকবর্গ এক সময়ে যে লৌকিক ধর্মটিকে আশ্রয় করে বিপ্লবী হয়ে ওঠে, তার নাম পাগল পন্থা। প্রবর্তক করম শাহ। পাগলপন্থীদের মতে সমস্ত জমির মালিক আল্লাহ। সেই জমিকে সন্তানসম লালন করে যে কৃষক সেই তো জমির ফসলের ন্যায্য অধিকারী। তাঁদের মতে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই উঁচু-নীচুতে। সব মানুষ ভাই-ভাই। তাই করম শাহের ভক্তরা তাঁকে সম্বোধন করে ভাইসাহেব বলে। গ্রামাঞ্চলের কৃষক যাপনের সঙ্গে তাঁদের ধর্ম সঙ্গতিপূর্ণ।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদ ঠাকুর। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি ধর্ম বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জগৎকর্তাকে ভজনা করা হয় বলে এই সম্প্রদায়ের নামে কর্তাভজা। মানুষরূপেই ঈশ্বর মানুষের কাছে থাকেন। গুরুই নরদেহী ঈশ্বর। তিনি সহজ নিধি, মালা, তিলক, দাঁড়ি, চুল, টুপি ইত্যাদি পরিচ্ছদের প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরের ভাব থাকবে অন্তরে।

পূর্ববঙ্গের নিম্ন জলাভূমি বরিশাল অঞ্চলে প্রচারিত হয় পাগলচাঁদের ধর্মমত। প্রবর্তক রাধানাথ মিস্ত্রী। কল্পিত ঈশ্বরকে নয়, পিতা-মাতাকেই ঈশ্বরের রূপ কল্পনার কথা বলা হয়েছে। জাতিভেদ যেমন তিনি মানতেন না, তেমনই নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথাও বলা হয়েছে এ ধর্মে। পাগলচাঁদ ব্রাহ্মণ বর্জিত মাতৃভাষায় বিয়ের রীতি চালু করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতে বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা চালু ছিল।

বাংলায় দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বলিষ্ঠ ধারা সহজিয়া মতবাদ। এর প্রবর্তক তিলকরাম শিরোমণি। ১১৮৪ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টে তাঁর আবির্ভাব। অস্পৃশ্যতার দূরীকরণের মধ্য দিয়ে সমাজে সাম্যের রূপ প্রতিষ্ঠা ছিল এই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সেই সময়ে আরও একটি গৌণ ধর্ম প্রচলিত ছিলে এই অঞ্চলে। সেটি হল জগন্মোহিনী সম্প্রদায়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জগন্মোহন গোঁসাই। এই সম্প্রদায়ের জাতবিচার নেই। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত তাঁরা 'গুরু সত্য' মহা বাক্যে বিশ্বাসী।

উনবিংশ শতকের সূচনায় বাংলায় ব্রাত্য সমাজের ধর্মযাজক হিসাবে উঠে আসে বলরাম হাঁড়ির নাম। তাঁর অনুসারীরা বলা হাড়ি নামে খ্যাত। এই ধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাস রাখে না। আঠারো ও উনিশ শতকে উদ্ভূত অন্যান্য লৌকিক কর্মের মত নারীসঙ্গী নিয়ে কায়া সাধনা বা মৈথুন তাঁদের ধর্ম নয়, আবার তাদের ধর্মে চৈতন্য প্রভাবের চিহ্ন নেই। 'যাহা দেখিনি নয়নে/ তাহা ভজিব কেমনে'। এটাই বলা হাড়িদের মূল মন্ত্র, সেই কারণে তাঁদের একমাত্র উপাস্য বলরাম। কিন্তু শুধু মুখে হাঁড়ির নাম নিলেই তাঁকে পাওয়া যাবে না, তাঁকে পেতে গেলে ত্যাগ করা চাই। দেখাদেখি আর জাতপাতের ভেদবুদ্ধি নিম্নবর্ণের ধর্মসাধনার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সাধন বিস্তার। গ্রামীণ মানুষের সুরের সাধনা সহজাত। সিরাজ সাঁই, লালন, গগনহরকরা, দুদ্দু শাহ, শাহজালালের মত অগণিত মরমী সাধক তাঁদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পুষ্ট করেছেন ভক্তির ধারাকে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভক্তি সাধনার বিস্তার লক্ষিত হয় মতুয়া ধর্মে। কর্তাভজা, সাহেবধনী বলাহাঁড়ি সহ অগণিত লোকধর্ম তথা দলিতবর্গের ধর্ম সাধনার প্রসারের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ধর্মসম্প্রদায়গুলি বিশিষ্ট অর্থে নিপীড়িত, উপেক্ষিত

মানুষের আত্মজাগরণের ভূমিকা পালন করেছেন বহুমুখী সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই সব লোকায়ত ধর্মান্দোলনগুলির মাধ্যমে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

নিম্নবর্গীয় গণবিদ্রোহের ইতিহাস:

চর্যাপদের সময়কালেই একাদশ শতকের মধ্যগগনে কৈবর্ত নায়ক দিব্যকের নেতৃত্বে সংগটিত হয়েছিল কৈবর্ত বিদ্রোহ (১০৭০ খ্রিস্টাব্দ)। কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রায় সমসাময়িক একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত *রামচরিত* গ্রন্থ। এছাড়াও কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের *কামাউলি পট্ট*, মদন পালের *মানহালি পট্ট* ও ভোজ বর্মনের *বেলবা পট্ট*-এও এই বিদ্রোহের উল্লেখ রয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালের আমলে। যদি এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র একটি সামন্ত বিদ্রোহই হত, যদি এর পেছনে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত গণসমর্থন না থাকত, তাহলে তিন পুরুষ ধরে কৈবর্ত শাসকগণ বারেন্দ্রীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *রামচরিত* থেকে জানা যায় যে দিব্যকের তৃতীয় অধঃস্তন পুরুষ ভীম অতিশয় জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের কৈবর্তরা ছিলেন মূলত কৃষি ও মৎস্যজীবী। পালরাজা মহীপালের অপশাসনে জর্জরিত হয়ে কৈর্বতরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করে খোদ রাজতন্ত্রকেই। গণ অভ্যুত্থানের এই প্রবল শক্তির সামনে মহীলাপ নিহত হন। মহীপালের পর রামপাল শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করেন, রামপালকে শেষ অবধি ছোট-বড় বিভিন্ন সামন্তদের সাহায্য নিতে হয়েছিল এই বিদ্রোহ দমনে।

রামচরিত পালবংশীয় রাজা রাম পালের মাহাত্ম্য বর্ণন কাব্য। কবির কাছে রামপালের প্রধান কীর্তি কৈবর্ত বিপ্লব দমন। আর সেই কারণেই কৈবর্ত বিপ্লব প্রসঙ্গ। তাই বুঝতে অসুবিধা হয়না কেন সন্ধ্যাকর নন্দী *রামচরিত* কাব্যে দিব্যর্ককে 'দস্যু', 'উপাধিব্রতী', 'কুৎসিত কৈবর্ত নৃপ' এবং এই বিদ্রোহকে 'অনিকম' (অপবিত্র) বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাল আমলের শেষাশেষি সেকালের বৃহৎবঙ্গে নিম্নবর্গের এই গণ অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতবাহী গণবিদ্রোহের সাক্ষী হিসাবে থেকে গেছে।

মেদিনীপুর শহরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রানী ছিলেন রানী শিরোমণি। তাঁর রাজত্বে সংঘটিত হয়েছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নবর্গীয় প্রজাদের দ্বারা সংগঠিত গণ অভ্যুত্থান। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৭৯৯ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে জোরালো আঘাত হেনেছিল। লক্ষণ সিং নামে এক ব্যক্তি ১৫৬৮ সালে কর্ণগড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণ সিংহ জাতিতে ছিলেন সদ্‌গোপ (মতান্তরে কায়স্থ)। পরবর্তী প্রজন্মের রাজা অজিত সিংয়ের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন রানী শিরোমণি, যিনি ছিলেন চুয়াড় পরিবারের কন্যা। অজিত সিংয়ের মৃত্যুর পর ১৭৫৫ সালে রানী শিরোমণি সিংহাসনে বসেন। এই সময় পর্বেই চুয়াড় বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। চুয়াড়দের মধ্যে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল লোধা, শবর, বাগদী, ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি। পাইকন জমিভোগ পুরুষানুক্রমে ভোগ করত এইসব সৈনিক বা পাইকরা। ইংরেজরা কৌশলে এই জমি দখল করলে মূলত জমি হারানোর ক্রোধেই চুয়াড় বিদ্রোহের জন্ম হয়। 'জান' দেব তবু 'জমি' দেব না – এই

স্লোগান নিয়ে বিদ্রোহ চলেছিল প্রায় সতেরো বছর ধরে। চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলেছিল মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমান্তে শিলদা-তে, ১৭৯৮ সালে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বাগদী সর্দার গোবর্ধন দিকপতি। প্রথমে দুটি গ্রাম জ্বালিয়ে এই গণবিদ্রোহের সূচনা হয়। পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রানী শিরোমণি নিজেই চুয়াড় বিদ্রোহের নেপথ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিদ্রোহ চলাকালে একসময়ে চুয়াড় বিদ্রোহের নেত্রী রানী শিরোমণি ধরা পড়েন। রানী শিরোমণি ছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। অপর একজন মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নারী হলেন রানী রাসমণি। তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও চাষিদের জন্য কিছু ন্যায্য দাবী আদায় করেছিলেন। বিদ্রোহ বলাবাহুল্য এই কালপর্বে সংগঠিত সমস্ত বিদ্রোহগুলির অধিকাংশই ছিল অসংগঠিত সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। ইংরেজ শাসক ও উচ্চবর্গীয় জমিদার, ভূস্বামীদের শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সকল অসমসাহসিক প্রতিরোধ কৃষকদের আত্মবলিদান পরবর্তীকালের স্বাধীনতা আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহগুলির অন্তঃসলিলা প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। ১৭৬৮ সাল থেকে চুয়াড় বিদ্রোহ শুরু হয়ে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ১৭৯৮-৯৯ সাল নাগাদ চরমে ওঠে। ১৮১৩-১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে এবং ১৮৩২ সালে আবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিব্যাপ্তি লাভ করে, যার নাম হয় 'গঙ্গানারায়ণ হামলা'। রংপুর কৃষক বিদ্রোহের শুরু সন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের দু-দশক পরে, ১৭৮৩ সালে। রংপুর বিদ্রোহের পটভূমি হিসাবে জমিদারি অব্যবস্থা, বর্ধিত হারে খাজনা প্রদানে কৃষকদের ব্যর্থতা, এর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রচলতি মুরার বণ্টনে ওজন ঘাটতি। এই সকল সমস্যার কারণে জমিদার, কৃষক দুই পক্ষই

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। খাজনা ও আবওয়াব আদায়ে কৃষকদের ওপর জুলুম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পরিণতিতে এই বিদ্রোহ ছিল কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সশস্ত্র সংগ্রাম যার মাধ্যমে তাঁরা কোম্পানির সরকারকে নতুন নীতি নির্ধারণে ও রাজস্ব নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছিলেন।

১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাগণ প্রথমবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন চাকমা দলপতি 'রাজা' শের দৌলত ও তাঁর সেনাপতি রামু খাঁ। ইংরেজ শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়ন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠলে রামু ও শের দৌলত চাক্‌মা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে ইজারাদারি ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের ডাক দেয়। প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ হয় এবং তারই সঙ্গে ইজারাদারগণের তুলার গোলা লুণ্ঠিত হয়। রামু খাঁ নেতৃত্বে চাক্‌মাগণ ইজারাদারগণের বড় বড় ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলে। বিদ্রোহী চাক্‌মাদের দমন অসম্ভব বুঝতে পেরে ইংরেজরা সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারে যেখান থেকে চাক্‌মারা উদ্বৃত্ত তুলার বিনিময়ে খাদ্য, লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ করত সেই সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারের বহুস্থানে সৈন্যের পাহারা বসিয়ে চাক্‌মাদের বাজারে আসা বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। তাদের এই কৌশল সাফল্য লাভ করে এবং চাক্‌মারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অযতদিন ইজারাদারদের মারফত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা বর্তমান ছিল ততদিন অবধি ক্রমান্বয়ে ১৭৭৬, ১৭৮২, ১৭৮৪, ১৭৮৭-তে চাক্‌মারা বিদ্রোহের দ্বারস্থ হয়েছে। ইজারা প্রথার অবসান ঘটিয়েই শেষ অবধি ইংরেজরা এই বিদ্রোহের অবসান ঘটায়।

পাগলদের বিদ্রোহের প্রথম পর্ব ১৮২৪-২৫, দ্বিতীয় পর্ব ১৮২৫-৩২, চূড়ান্ত রূপ পায় ১৮৩৩ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে অবস্থির গারো পাহাড় অঞ্চলে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে সুসঙ্গরাজ প্রভৃতি জমিদারগোষ্ঠীর যে নিষ্ঠুর শোষণ ও উৎপীড়ন অব্যাবহতভাবে জারি ছিল, গারো বিদ্রোহ ছিল এরই অনিবার্য পরিণতি। এই অঞ্চলের কোচ, হাজং প্রভৃতি পর্বত অরণ্যচারী আদিম অধিবাসীগণ ও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গারো বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে করম শা নামক এক ফকির সুসঙ্গ পরগণায় এসে এই অঞ্চের গারো ও হাজংদের সাম্যমূলক 'পাগলাপন্থী' বা বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে জমিদারগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের উৎপীড়ন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ গারো ও হাজংগণ এই নতুন ধর্মমতের আশ্রয় করম শা ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। এই সময় সুসঙ্গের শঙ্করপুর নিবাসী ছপাতি গারো পার্বত্য অঞ্চলের সুসঙ্গ ও শেরপুর জমিদারীর অন্তর্গত গারো, হাজং, কোচ, মেচ, হাড়ি ও অন্যান্য অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তা জমিদারদের প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে পর ১৮৩৪ সালে জানকু পাথর ও দোবরাজ গারো বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। গারোরা একসময় সরকারকে কর প্রদান করতে অস্বীকার করে। ইংরেজরা তীব্র দমন পীড়ন ও নৃসংশতার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করলেও বিপুল কর ও খাজনার ভারে বিপর্যস্ত এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে তা স্থানীয় শাসক ও ইংরেজ সরকার উভয়েই উপলব্ধি করেছিল।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোমেশ্বর সিং নামক ঈশা খাঁর জনৈক সৈনিক গারো পাহাড়ের বাসিন্দা হাজংদের সহায়তা নিয়ে গারোদের পরাজিত করে সামন্তবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোমেশ্বর সিংহর বংশধররাই এই অঞ্চলে বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করেছিল। ১৭৭০ সালে সোমেশ্বর জমিদারের উত্তরসূরি রাজা কিশোর বহু হাজং পরিবারকে দুর্গাপুর থানায় ধরে নিয়ে আসেন এবং তাদের হাতি ধরার কাজে নিয়োজিত করা হয়। বহুদিন ধরে এই প্রাণঘাতী কাজ করার পর উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হাজংরা এই অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দলিত আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলন 'হাতি খেদা বিদ্রোহ' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। জীবন নিয়ে ঝুঁকির এই কাজকে যখন জমিদাররা বাধ্যতামূলক বেগার কাজে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে তখনই হাজংরা তাদের নেতা মনা সর্দারের নেতৃত্বে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একদা জমিদারদের পূর্বপুরুষ যে গারোদের পদানত করে রেখেছিল, সেই গারোদের উত্তর পুরুষেরাই সুযোগ বুঝে হাজংদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। নেতা মনা সর্দারকে ধরে হাতির পায়ের নীচে পিষে মেরে ফেললেও বিদ্রোহ উত্তরোত্তর হিংস্র আকার ধারণ করে। তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হাতির আক্রমণে বহু জমিদারদের পাইক-বররন্দাজরা হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। হাজং ও গারোদের যৌথ আক্রমণের তীব্রতার সামনে দাঁড়াতে না পেরে জমিদারবর্গ আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যায় নেত্রকোনায়। রাগে, ক্ষোভে, প্রতিশোধে হাজং ও গারোগণ সমবেতভাবে জঙ্গলে অবস্থিত বড় বড় সমস্ত 'হাতি খেদা' গুঁড়িয়ে দেয়। ফলে ফ্যারাংপাড়া,

বিজয়পুর, চেংনী, ধেন্‌কি, আড়পাজ, ভরতপুর ইত্যাদি অঞ্চলে আর কোনো 'হাতি খেদা'র অস্তিত্ব থাকে না।

ত্রিপুরা বা কুমিল্লার রোশনাবাদের সমশের গাজী নামের দরিদ্র কৃষকের সন্তান ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ত্রিপুরার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুর দখল করে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুই বছরের মাথায় ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্য নবাব মীরকাশেমের সাহায্যে সমশেরকে পরাজিত করে তোপের মুখে বেঁধে তাঁকে হত্যা করেন।

সিধু কানুর নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালের বহুলালোচিত সাঁওতাল বিদ্রোহ বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের প্রতীক হিসাবে এখনও পরিগণিত হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। তুলনায় স্বল্প পরিচিত একটি কৃষক বিদ্রোহ হল তুষখালীর বিদ্রোহ (১৮৫৮-১৮৭৫)। তুষখালীর এই বিদ্রোহের ছিল দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে টাকির জমিদার প্রিয়নাথ চৌধুরীর প্রজাশাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় পর্যায় খাজনার নতুন নিরিখ চালু করার জন্য পণ্য মোরেলের প্রয়াসের বিরুদ্ধে।

১৯২২ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় নানকাররা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। খাই খোরাকির বিনিময়ে মজুর খাটাবার ব্যবস্থাটাই ছিল নানকার ব্যবস্থা। মধ্যযুগীয় ক্রীতদাসের মতো ছিল তাদের অবস্থা। ১৯৪৭ সালে সিলেটে এই নানকারদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার লাখের মতো। তৎকালীন সিলেটের মোট

জনসংখ্যার এক-দশমাংশ। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার এই নানকার প্রথা বিলুপ্ত করেছিল।

ময়মনসিংহের সুসং-দুর্গাপুর অঞ্চল বা গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৩৭-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ – এই বারো বছর ধরে গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট নেতা মনি সিংহের নেতৃত্বে টংক আন্দোলন। টংক প্রথাটি এই রকম ছিল যে, জমিতে ফসল না হলেও কৃষকরা জমিদারকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকত। টাকায় খাজনা নেওয়া ও টংক প্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকার এই প্রথা বাতিল করেছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়িতে তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এটি মূলত ফসলের দু'ভাগ, নিজ খোলানে ধান তোলা, বেআইনি কর বন্ধ করা, খাজনা হ্রাস ইতাদির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন। ভারতের কৃষক আন্দোলনে প্রবল অভিঘাত এনেছিল তেভাগা আন্দোলন। ব্রিটিশ আমলে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ বীরভূম তথা সারা বাংলার সমাজজীবনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৭৮৮ সালের মাঝামাঝি জুড়ে মালপাহাড়িয়া ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষি, কারিগররা একত্রিত হয়ে ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৭৮৯-এর জানুয়ারিতে এঁরা বীরভূমের এক বিরাট বাজার লুঠ করে অত্যাচারী মহাজনদের আড়ত থেকে খাদ্যদ্রব্য, শস্যগোলা ও বণিকদের কুঠি লুঠ করে, কোথাও কোথাও মাঠের ফসল কেটে নেয় এবং ইংরেজদের ডাক লুঠ করে। ১৭৯০-এর শুরুতে বিদ্রোহীরা রাজনগর অধিকার করে নেয় এবং প্রায় সারা বীরভূমই তাদের দখলে চলে যায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তঃকলহের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ শাসকরা দৃঢ় হাতে বিদ্রোহ দমন করে এবং বন্দী

বিদ্রোহীদের সঙ্গে অতীব নিষ্ঠুর আচরণ করে ১৭৯১ সালে এই গণবিক্ষোভকে নিস্তেজ করে ফেলে।

১৮৩১-৩২ সাল নাগাদ তৎকালীন সিংভূমে সংগঠিত কোল বিদ্রোহ ছিল এইরকম একটি অসমসাহসী অভ্যুত্থান। জমিদার, মহাজন ও বিদেশি ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা – এই সমস্তর বিরুদ্ধে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটেছিল একবার নয় বারবার – ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৫-৫৬, পরে আবার ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮০-৮১ সনের বিদ্রোহ। ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের বীরভূম-বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ অঞ্চলের সাঁওতাল, অ-সাঁওতাল সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ে। দীর্ঘ আট মাস ধরে ইংরেজ কোম্পানির পুঁজিবাদি সরকার হাজার হাজার উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত সৈন্য দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের উপর গণহত্যা চালাবার এবং তাদের গ্রামগুলি ধ্বংস করবার পর যখন এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে তখনও শোষিত ও নির্যাতিত কৃষকদের উপর সরকার প্রতিহিংসা নিতে দ্বিধা করে নি। বন্দী হিসাবে ৫২ খানা গ্রামের ২৫১ জনের বিচার হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাঁওতাল ১৯১, ন্যাস ৩৪, ডোম ৫, ধাঙড় ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভুঁইয়া ৬ ও রাজোয়ার ১। এই তালিকা থেকে কিছুটা বিদ্রোহের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। এই পথ ধরেই দাক্ষিণাত্যের মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থা (১৮৭৫-৭৬), মালাবারের (কেরালা) মোপলা কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল।

১৯২৮ সালে কলকাতা ও হাওড়ার মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে যে আন্দোলনগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সাফল্য লাভ করেছিল, লবণ আন্দোলন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধী তাঁর ৭৮ জন ঘনিষ্ঠ সহচর নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা করে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের যে সূচনা করেছিলেন, তার ঢেউ যেমন সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেও তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। বহু প্রাচীনকাল থেকেই নিম্নবঙ্গে তথা দক্ষিণবঙ্গে লবণ উৎপন্ন হত। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা, কাকদ্বীপের পাকুড়তলা প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনকালের নুন মাপার পাত্র 'কুড়ি' আবিষ্কৃত হয়েছে। মোগলযুগে দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের নোনাজল মাঠে ধরে করকচ লবণ ও ওই জল আগুনে ফুটিয়ে সাধারণ লবণ তৈরি করা হত এবং গঙ্গার খাত ধরে নৌবহরের সাহায্যে তা বাইরে রপ্তানি করা হত। যারা লবণ তৈরি করত তাদের বলা হত 'মলঙ্গী'। লবণ আন্দোলনের যুগে ক্যানিং, চম্পাহাটি (পিয়ালী নদীর আশেপাশে), কুলপি, কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, রামগঙ্গা, মন্দিরবাজার, মগরাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক লবণ উৎপাদনের খবর পাওয়া যায় এবং হাটে হাটে বিলাতি লবণ বিক্রির বিরোধিতা করা হয়। সোনারপুর থানায় হলং খেয়াদা অঞ্চলে ডিহি, কামরাবাদ, শিরগাছি, দাঁড়িগাছি, নয়াবাদ, রাধানগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হত। এই সময় পুলিশ ডিহি গ্রাম থেকে ২২ জনকে ধরে নিয়ে যায় এবং লবণ তৈরির জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে যায়। যারা ধরা পড়েছিল তারা সব পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন

চালানো হয়। মগরাহাট থানার ঝিনকির হাটে বিলাতি লবণের হাড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন স্থানীয় লবণ সত্যাগ্রহীরা, তাঁরা সকলেই ছিলেন সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ।

ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী, কৃষক জামাতিয়া, কুকি সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষকদের তিপ্রা বিদ্রোহ (১৮৫০), জামাতিয়া বিদ্রোহ (১৮৬৩), কুকি বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০) ছিল ত্রিপুরার রাজবংশের উগ্র সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিণতি।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদার ও কৃষকের পারস্পরিক শ্রেণিসম্পর্ক বিশ্লেষণ করার তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে প্রথমেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে এই সম্পর্কের ইতিহাস শুধু প্রভুত্বের অধিকারী জমিদারই রচনা করে না, কৃষকও এই ইতিহাসের কর্তা। এই ইতিহাসে একদিকে যেমন রয়েছে জমিদার ও ঔপনিবেশিক শাসকের আধিপত্য বিস্তার ও শোষণমুখী চরিত্র, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে কৃষকদের প্রতিরোধ। আধিপত্য আর প্রতিরোধ এই দুই দ্বান্দ্বিক সংঘাতের মধ্যে দিয়েই সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস এগিয়েছে।[১৪]

বৃহত্তর ভারতের আত্মমর্যাদা আন্দোলন:

পশ্চিমভারত

ব্রিটিশদের আগমন এবং ভারতবর্ষে শাসক হিসাবে তাদের প্রতিষ্ঠা, সঙ্গে নিয়ে আসা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা আর প্রগতিশীল উৎপাদন রীতি এই দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটায়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী বিষয় হল – একটি নতুন বিধিবদ্ধ প্রগতিশীল আইন ব্যবস্থা যা পুরনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রভাবিত ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাল।

ব্রিটিশ শাসন এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে তাদের সুবিধামত একদিকে যেমন ভেঙে ফেলল, অন্যদিকে নির্মাণও করল। এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নতুন জীবনবোধের জন্ম হল। ইংরেজি ভাষার প্রচলন ও প্রসারের ফলে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণির জন্ম হতে থাকল। আধুনিক শিক্ষার প্রসারেরফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হল এবং নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে সমমর্যাদাবোধ ও অর্থনৈতিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটতে থাকল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি তার নিজের প্রয়োজনেই নিম্নবর্গের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হল। ফলে নিম্নবর্গের উন্নতির আকাঙ্ক্ষাও প্রবলভাবে জেগে উঠল। এই সচেতন আকাঙ্ক্ষাই নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে নানারকম আন্দোলনের জন্ম দেয়। আগেকার আন্দোলনগুলি ছিল মূলত ধর্মীয় এবং কখনো কখনো সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিরোধমূলক। এখন তার পাশাপাশি ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার সমতার দাবি উঠে এল। নৈতিক মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কষ্টিপাথরে মানবিক সম্পর্কগুলি পরীক্ষিত হতে থাকল, সমাজ পুনর্বিন্যাসের কাজ উৎসাহ পেল। এই উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক পরিমণ্ডলটির অন্তর্বস্তুতে নতুন জীবনবোধের শিকড় সমাজভূমির গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হল।

এইরকম সময়ে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৮-৯০) নামে একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁকে ভীতি প্রদর্শন করেও বশ করা যায়নি, বরং তিনি কঠোরভাবে হিন্দুধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। কেবল তাই নয়, এই প্রথম একজন মানুষ যিনি নিম্নবর্গ থেকে উঠে এসে আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। জাতি-বর্ণগত উচ্চাভিমান সমর্থনকারীদের তিনি তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে নিম্নবর্ণ মালী (কুনবি) পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু খ্রিস্টান পাদ্রীদের সংস্পর্শে এসে তিনি অনেক পড়াশোনা করেছিলেন। তার ফলেই আধুনিক চিন্তা-চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকে খোলাখুলি ভাবে আক্রমণ করেন। তিনি অনেকগুলি বই ও পুস্তিকা লেখেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে *ব্রাহ্মণাবেস কাসর* পুস্তিকা, ১৮৭১ সালে *দীনবন্ধু* ও ১৮৭২ সালে তাঁর বিখ্যাত বই *গুলামগিরি* প্রকাশিত হয়। হিন্দু ধর্মীয় জাতপাত প্রথাকে *গুলামগিরিতে* তিনি আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সঙ্গে তুলনা করেন। পশ্চিম ভারতের মারাঠা কুনবিরা হল স্পৃশ্য শূদ্র ও মাহার মাং-রা হল অস্পৃশ্য শূদ্র। আর এই শূদ্রাতিশূদ্রদের প্রধাণ শত্রু হল ব্রাহ্মণবাদ। এই ছিল তাঁর মতামত। ১৮৮৩ সালে কৃষকদের দুর্দশা বিষয়ে তিনি লেখেন *শ্রেতকার্যচা আসুদা* বা কৃষকের চাবুক নামে একটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ। ১৮৮৫ সালে জ্যোতিবা ফুলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করে একটি প্রচারপত্র 'ইশারা' প্রকাশ করেন। সেচের ব্যবস্থা, মহাজনদের দ্বারা জমি হরণ, করের বোঝা, মহাজনী ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে তিনি কৃষকদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এভাবে কৃষকদের মধ্যে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের সংগঠিত করেছিলেন। জ্যোতিবা ফুলে জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মের বিরোধিতা করেছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিপ্রতীপে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতিরাও ফুলে সত্যশোধক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন নিপীড়িত শ্রেণি ও কৃষক সমাজের সমস্যা সমাধান কংগ্রেস যে মতাদর্শের বিশ্বাসী, তা দিয়ে সম্ভব নয়। অস্পৃশ্যতা, জাতি ব্যবস্থা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জ্যোতিরাও-এর লড়াইয়ে

স্ত্রী সাবিত্রীবাঈ ফুলে ছিলেন সহযোদ্ধা। দলিত, দরিদ্র, নিম্নবর্গের মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে সাবিত্রীবাঈ ফুলের অবদান ছিল অসম্ভবের গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার বিস্তারের পাশাপাশি এই ফুলে দম্পতি ছিলেন অক্লান্ত সমাজ সংস্কারক। ১৮৫০ সালে সাবিত্রীবাঈ একটি মহিলা সংগঠনের সঙ্গে সেক্রেটারি হিসাবে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেটির নাম ছিল 'মহিলা সেবা মন্ডল'। তৎকালীন জেলা শাসক, ই সি জোন্সের স্ত্রী তার সভানেত্রী ছিলেন। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল মেয়েদের তাদের অধিকার ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা। ১৮৫২-তে এই সংস্থা মকর সংক্রান্তির সময় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানটি ছিল তিলগুল আর হলদি কুমকুমের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে সব জাতি ও ধর্মের মহিলাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আর লেখা হয়েছিল যে আমন্ত্রিতরা সবাই সমান ব্যবহার পাবে। বলা বাহুল্য, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই ধরনের অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো তখনকার সমাজে অবশ্যই এক অত্যন্ত ব্যতিক্রমী প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল। তৎকালীন বাল্যবিধবাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষ অবলীলায় যৌন সংসর্গ করায় বহু অযাচিত সন্তানের জন্ম হত।তাদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন দিতে ১৮৬৩ সালে ফুলে দম্পতি গড়ে তোলেন বালহত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ।সেটি বিধবা মেয়েদের জন্য এমন একটি আশ্রয় কেন্দ্র ছিল যেখানে অন্তঃসত্ত্বা বিধবা মেয়েরা নিরাপদে থাকতে পারবেন, তাঁদের সন্তান প্রসব করতে পারবেন এবং সেই সন্তানকে কারো দত্তক নেওয়ার জন্য রেখে যেতে পারবেন। এটি সম্ভবত ভারতে প্রথম শিশুহত্যা রোধের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। ১৮৮৪ সালের মধ্যে ৩৫ জন ব্রাহ্মণ বিধবা নানা জায়গা থেকে এসে ঐ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাবিত্রীবাঈ নিজে তাদের সন্তান প্রসবে

সাহায্য করেন এবং তাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। পরবর্তীতে ১৮৭৪ সালে এই নিঃসন্তান ফুলে দম্পতি কাশিবাঈ নামের এক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তানকে দত্তক নেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ির বিধবা মেয়েদের মাথা নেড়া করার শতাব্দী প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে সাবিত্রীবাঈ প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে এই প্রথার বিরুদ্ধে এগিয়ে এসে নাপিতরা ধর্মঘট করে। এই ঘটনা ছিল সর্বার্থেই ঐতিহাসিক। ধর্মঘট সংঘটিত করেছিলেন দীনবন্ধু পত্রিকার সম্পাদক, নারায়ণ মেঘাজি লাখান্ডে,তবে এর পিছনে ছিল সাবিত্রীবাঈের বিপুল উৎসাহ মূলক অনুপ্রেরণা। তাঁরা সেদিন নাপিতদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যাতে বিধবাদের মাথা না কামানো হয়। ঐতিহাসিক এই নাপিতদের ধর্মঘটের খবর *দি টাইমস* পত্রিকায় ৯ এপ্রিল, ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয়। বিলেত থেকেও মেয়েরা চিঠি লিখে এই লড়াইকে অভিনন্দন জানায়।

১৮৯৭ সালে বিশ্বব্যাপী বিউবনিক প্লেগের মহামারি দেখা যায়।সাবিত্রী ও তাঁর পালিত পুত্র যশবন্ত রায় এই সময় অসহায় রোগীদের সেবা করার জন্য পুণেতে একটি ক্লিনিক খোলেন। এই বছরই এক সময় একটি প্লেগ আক্রান্ত বালকের সেবা করতে গিয়ে সেই মারণ ব্যাধি সাবিত্রীবাঈকে ধরে এবং তার থেজে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশ একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহান সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারকে হারায়।

পরবর্তীকালে জ্যোতিরাও ফুলের ভাবশিষ্য হিসাবেই যেন মহারাষ্ট্রে দলিত আন্দোলনের একজন নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হলেন ড. বি. আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রি.)। তিনি জন্মেছিলেন মহারাষ্ট্রের মূলানির মাহার গোষ্ঠীতে। মুচি ও মেথর বৃত্তি

করে এই শ্রেণির মানুষ। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে একটানা বঞ্চনার শিকার হতে হতে একসময় তিনি দলিত মুক্তি আন্দোলনের একজন নায়ক হিসাবে অবতীর্ণ হন। ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য যে 'কালচারাল হেজিমনি' শাসকশ্রেণি ব্রাহ্মণরা মানুষের চেতনায় – চিন্তাধারায় ঢুকিয়ে রেখেছিল তার জন্য শুধু সংগ্রাম যথেষ্ট ছিল না, দরকার ছিল প্রতি-আখ্যানের।[১৫]

মহারাষ্ট্রের পূর্ববর্তী দলিত সন্তসাহিত্য ছিল আধ্যাত্মিক ঘরানার। লোকগান, লোকনাট্যের আধারেই মূলত এই সাহিত্য নির্মিত হত। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ তুকারাম, রামদাস প্রমুখের পাশে শূদ্র কবি চোখামেলা *ভুতলোচে আভাঙ* (বাংলায় নামটি হতে পারে 'মাটির অন্তরের গান') লিখে সেই ত্রয়োদশ শতকে শূদ্র কলমচিদের আঙুলে দিয়েছিলেন খানিকটা সাহস। ড. আম্বেদকর আধ্যাত্মচিন্তার বদলে আনলেন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিবোধ। ১৯২০ সালে তিনি প্রকাশ করলেন *মূক নায়ক* নামের সাময়িক পত্র, পরবর্তীতে *বহিঃষ্কৃত ভারত* (১৯২৭), *সমতা* (১৯২৮), *প্রবুদ্ধ ভারত* (১৯৫৬), *জনতা* (১৯৩০) সাময়িক পত্রের প্রকাশ করেন এবং দলিত সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত রণধ্বনিটি তুলেছিলেন – 'Educate, Agitate, Organise'। ১৯৩৬ সালে ড. আম্বেদকর 'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' গঠন করেন এবং ১৯৪৫ সালে বোম্বাইয়ে 'পিপলস এডুকেশন সোসাইটি'রও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সিদ্ধার্থ কলেজ' থেকে ১৯৫০ সালের প্রথম ব্যাচের দলিত তরুণরা স্নাতক হয়ে বেরিয়ে এসে গঠন করেন 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সংঘ'। এই সাহিত্য সংগঠন থেকেই পরবর্তীকালে 'মহারাষ্ট্র দলিত সাহিত্য সংঘ'-র জন্ম হয়।

এরই পাশাপাশি, ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর দলিত সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মাহাড়ের চাভাদর পুকুর পাড়ে লক্ষ দলিতজনের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাত-বর্ণের সংবিধান *মনুস্মৃতি* গ্রন্থখানি ড. বি. আর. আম্বেদকর দাহ করেন। ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে সংবিধানের দ্বারা বিজিত ভূমি-পুত্রদের মানুষের অধিকার থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত করে আসছে, সেই সংবিধান বা *মনুস্মৃতি* নামে কুখ্যাত সেই গ্রন্থ পুড়িয়ে দিয়ে কেবল আক্ষরিক অর্থেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন না— দলিতদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকেই পুড়িয়ে দিলেন এবং নতুন মূল্যবোধেরও জন্ম দিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর আম্বেদকর অসংখ্য অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তৎ উপস্থিত বৌদ্ধ ভাবধারাই সম্পূর্ণ সমর্পিত না হয়ে তিনি বৌদ্ধ আদর্শকে এক নয়া-বৌদ্ধ ধারাই পৌঁছে দেন নিপীড়িত মানুষের কাছে।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকরবাদ, বৌদ্ধদর্শন ও মার্কসবাদের দর্শনগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। দলিত মুক্তির প্রশ্নে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের দুটি মূল ধারা দেখা যায়— এক ধারায় আম্বেদকর এবং বুদ্ধের দর্শন যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য ধারায় কমিউনিজম ও সমাজবাদের পথে আগ্রহ। ড. আম্বেদকর মার্কসবাদের বিরোধী ছিলেন না। ১৯৫৬ সালে বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম ও কমিউনিজম সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, মার্কসবাদ ক্ষমতা দখলের জন্য হিংসাকে প্রত্যাখ্যান করে না, বৌদ্ধ দর্শন অহিংসা, দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি সামাজিক গুণের উপর জোর দেয়। অর্থাৎ উভয়েরই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য দলিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। ড. আম্বেদকরের ‘Buddha or

Karl Marx’ লেখাতে তাঁর প্রিয় বৌদ্ধ মতকে আর মার্কসসবাদকে এক গ্রন্থিতে রেখেছেন। তুলনা করেছেন। ‘Buddha or Karl Marx’-এর শুরুই হচ্ছে বুদ্ধ ও মার্কস সাম্যবাদী চিন্তার সাদৃশ্যের কথা বলে। আনন্দ টেলটুম্বডে তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকাতে বলেছেন যে বাবাসাহেব আম্বেদকর যদি মার্কসবাদ বিরোধী হতেন তবে তাঁর প্রিয় বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদের তুলনাতেই যেতেন না। বহু ভারতীয় মার্কসবাদী মনে করেন যে অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic reform) করলে, ব্যক্তি মালিকানার সম্পত্তি (private property)-র বিলোপ ঘটলে জাতিব্যবস্থা নিজে থেকেই চলে যাবে। পরবর্তীকালে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার অন্যতম তাত্ত্বিক (Subaltern Studies) দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Rethinking Working-Class History* (১৯৮৯) বইতে গঙ্গার পাড়ে পাটকলের কর্মী-শ্রমিকদের মধ্যে জাতপাতের বিশ্বাস কীভাবে নিয়ন্ত্রক হয়েছে উচ্চ-নীচ অমর্যাদার মানুষদের তা বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক কাঠামো সেখানে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায় নি। Teodor Shanin-এর *Late Marx and the Russian Road* (১৯৮৩) বই থেকে জানতে পারি মার্কসবাদের পরিণতি ইতিহাসের ছক (সামন্ততন্ত্র > ধনতন্ত্র > সমাজতন্ত্র) যে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার করেনি সেটা মার্কস গভীরভাবে ভেবেছিলেন।

গান্ধীজীর হরিজন ও মার্কসের প্রলেতারিয়েত এই দুই আশ্রয়ধর্মী ও বিধ্বংসী সংজ্ঞার বাইরে তারা তাদের জন্য এক নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন বোধ করে। ১৯৫৮ সালে প্রথম সম্মেলন, পরবর্তী কালে ১৯৬৭ সালের ‘মহারাষ্ট্র বৌদ্ধ সাহিত্য পরিষদ’-এর একটি সম্মেলনের বক্তা এম. এন. ওয়াংখাড়ে প্রথম বলেন যে *রামায়ণ মহাভারত*-এর মতন চেতনা ও অস্তিত্ব বেষ্টিত কোনো সাহিত্যে দলিতদের মধ্যে নেই, দলিতদের আলাদা

সাহিত্য তৈরি করতে হবে মার্কিন দেশের কালোদের মত যা জুড়ে থাকবে তাদের বাস্তবতার সাথে। ১৯৬৯ সালে 'মারাঠাওয়াড়া' পত্রিকার দীপাবলী সংখ্যায় দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা, ইতিহাস আর পরিচয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়, তারপরত থেকেই 'দলিত সাহিত্য' শব্দটি মারাঠা সাহিত্যের আলোচনায় এক বিশেষ ধরনের সাহিত্য প্রকরণের জন্ম দেয়। ১৯৭২ সালের ৯ জুলাই মহারাষ্ট্রের ব্যতিক্রমী ও শক্তিশালী দলিত কবি নামদেও ধসাল-এর বস্তিবাড়ির টালির চালার নীচে অর্জুন ডাঙলে, জে.ভি. পাওয়ার, দয়া পাওয়ার, উমাকান্ত রণধীর প্রমুখ সাহিত্যিকরা মিলিত আড্ডায় ব্ল্যাক প্যান্থার-দের ধাঁচে 'দলিত প্যান্থার' নামের সাংস্কৃতিক মঞ্চের জন্ম দেয়।

ষাটের দশকের শেষের দিকে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের প্রতি বিক্ষুব্ধ নকশাল আন্দোলন এই সমস্যাগুলিকে আরও প্রকটভাবে তুলে ধরেছিল। গোটা বিশ্ব ঐ সময়েই বামপন্থী দর্শন মার্কসকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছিল। গ্রামসির ভাবধারায় পুষ্ট আলথুসার'রা মার্কসের তত্ত্বে 'Economic Determinism'-র খানিকটা বাইরে গিয়ে ভাবার কথা বার বার বলেছেন। আম্বেদকর মার্কসীয় বিপ্লবে হিংসা (violence)-কে কীভাবে দেখেছেন সেটা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। মার্কসবাদীরা শ্রেণি (class) নিয়ে কথা বলেছেন আর জাতপাত (caste) নিয়ে চেপে গিয়েছেন এটা বড্ড বেশি মোটা দাগের একটি মূল্যায়ন। আমাদের খেয়ালে আসবে আম্বেদকর তাঁর *দ্য বুদ্ধ অ্যান্ড হিজ ধম্মো* (১৯৫৭)-র চতুর্থ অধ্যায় 'রিলিজিয়ান অ্যান্ড ধর্ম'-তে ধর্ম ও ধম্মো বা রিলিজিয়ান ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করে দেখিয়েছেন এবং সেখানেও আম্বেদকর বলতে চেয়েছেন যে সত্যিকারের বা প্রকৃত ধর্ম সমাজ উন্নতির কথা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার

কথা বলে এবং বুদ্ধের ধর্ম ঠিক সেটাই বাস্তবায়িত করে। আম্বেদকরের চোখে গীতার মূল ভিত্তি ছিল চতুর্বর্ণ বা জাত ব্যবস্থা, যাতে প্রকৃত ধর্ম বা সামাজিক ন্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে গোটা বিশ্বের কালো মানুষদের মুক্তি আন্দোলনের এক বিশ্ববরেণ্য পুরোধা ডব্লু. ই. বি. ডুবয়েসের কথা। আম্বেদকর ডুবয়েসকে অন্তত দু'খানা চিঠি লিখেছিলেন, ইউনিভার্সিটি অব মাসাচুসেটস অ্যামহার্স্ট-এর ডুবয়েস আর্কাইভে এই দু'খানা চিঠিই সংরক্ষিত আছে। ডুবয়েসকে আম্বেদকর চিঠি লিখেছিলেন এইটি জানতে যে, কীভাবে তিনিও ঠিক একইভাবে ইউনাইটেড নেশনস-এ ও পৃথিবীর সমস্ত জনমানসের কাছে ভারতের জাতিভেদ প্রথা বা caste system–এর কুফল ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে পারেন। ডুবয়েস ১৮৯৬ থেকে ১৯৫০ অবধি তাঁর অনন্যসাধারণ লেখালেখি, গবেষণা, শিক্ষকতা, সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমেরিকা তথা পৃথিবীর সমস্ত দেশে বর্ণবিদ্বেষকে উচ্ছেদ করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর *The Souls of Black Folks* (১৯০৩) ও তার পূর্ববর্তী দুটি বই *The Negro Church* (১৯২১) এবং *The Philadelphia Negro* (১৮৮৯) বইগুলিতে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম কালো মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের কথা উঠে আসে। ঠিক একইভাবে আম্বেদকরের *Who were the Sudras* (১৯৪৬), *Riddles in Hinduism* (১৯৮৭) ও *The Annihilation of Caste* (১৯৩৬) বইগুলিতে হিন্দু সমাজের ভয়ঙ্কর জাতিপ্রথার প্রসঙ্গ উঠে আসে। ১৯১৯ সালে ডুবয়েস 'প্যান আফ্রিকান কনফারেন্স'-এর আহ্বান করেন, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত নিপীড়িত ও কালো মানুষদের একত্রিত করা, যা কিনা পরবর্তীতে 'প্যান আফ্রিকানিজম'

নামে জনপ্রিয় হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৭০-এর দশকে 'দলিত প্যান্থার্স ম্যানিফেস্টো'তে 'দলিত' এই ক্যাটাগরিটিকে অনেক বিস্তারিত বা প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছিল। 'দলিত' এই শব্দটি যে কোনো ধরনের প্রান্তিকতা বা মার্জিনালাইজেশনকে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ দলিত বলতে দলিত প্যান্থার্সরা অস্পৃশ্যতার শিকার নীচু জাতির মানুষ ছাড়াও গরীব কৃষক, বর্ণবৈষম্যের শিকার কালো মানুষ, নির্যাতিত নারী অর্থাৎ সব ধরনের প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষদেরই বোঝাতে চেয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দলিত প্যান্থার্সরা বহুলাংশে আমেরিকার ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যারা কিনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রান্তিক, দলিত ও বৈষম্যের শিকার হওয়া মানুষদের এক হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন।[১৬]

এই সময় থেকেই দলিত সাহিত্য আন্দোলন মহারাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলে। কন্নড় প্রদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় সমাজবদলের লক্ষ্য সামনে রেখে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গড়ে উঠেছিল 'বাঞ্জইয়া' আন্দোলন, কর্ণাটকের বুসা আন্দোলন ও দলিত সংঘর্ষ সমিতির মতো সংগঠনের ক্রমবিকাশ, তামিলনাড়ুতে গড়ে ওঠা তপশিলী জাতি মুক্তি আন্দোলন মঞ্চ (স্ক্যালম), উত্তরপ্রদেশে দলিত ঘোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি (DSSSS)। এই সমিতি পরবর্তীকালে বামসেফ ও আরো পরে BSP-তে রূপান্তরিত হয়। কেরালার প্রেক্ষাপটে সিড়িয়ানের মতো মঞ্চ এই একই সাংগঠনিক বিকাশের নজির তুলে ধরে যেখানে সাহিত্য, সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক রাজনীতি পারস্পরিক আদান প্রদানে ঘনিষ্ঠ। এরাওয়া প্রতিবাদীদের মধ্য থেকে উঠে আসেন শ্রী নারায়ণ গুরু (১৮৫৫)। ভারতের শূদ্রদের

প্রতিবাদী ধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটে পেরিয়ার ই.ভি. রাম – যিনি পেরিয়ার নামেই অধিক খ্যাত (জন্ম ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ)। ব্রাহ্মণবাদের বিরুদ্ধে পেরিয়ারের সংগ্রামের রণনীতি তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল। প্রথম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি, দ্বিতীয় ধর্মান্তরকরণের আহ্বান, তৃতীয় দ্রাবিড় স্থানের স্লোগান।

'দলিত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ [দ + ত (স্ম) – বিণ] যাকে দলন করা হয়েছে অর্থাৎ মর্দিত, শোষিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, পিষ্ট, উৎপীড়িত ও শাসিত। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা থেকেই দলিত সাহিত্যের জন্ম। একদল মানুষ ভারতবর্ষে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ তারাই অস্পৃশ্য হিসাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের শিকার – তাদের মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই সাহিত্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

দলিত ইতিহাসচর্চার বহুমাত্রিকতা প্রকাশ পায় দলিত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। অর্থাৎ দলিত সাহিত্যচর্চার সঙ্গে দলিত ইতিহাসের সম্পর্ক নিবিড়। দলিত ইতিহাসের এই বহুমাত্রিকতা বুঝতে গেলে, বাঙালি দলিত লেখকদের সাহিত্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে বুঝতে গেলে সর্বভারতীয় দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটকে বিস্তারিতভাবে বুঝতে হবে। মারাঠি দলিত সাহিত্য আন্দোলন একটি বিশেষ সাহিত্য আন্দোলন হয়ে প্রাদেশিক সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। ১৯৯৭ সালে সাহিত্য আকাদেমি থেকে দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় *দলিত* নামে যে বইটি প্রকাশ পেয়েছে, তার ভূমিকায় সম্পাদক মারাঠি দলিত সাহিত্যের দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার এই ইতিহাসটিকে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যায় ১৯৭১ থেকে '৯২ – এই দুই দশকে ইংরেজি ভাষায় মারাঠি দলিত সাহিত্যের প্রচার

এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে তার আদর্শকে সামনে রেখে ভারতের অন্য প্রদেশের দলিতরা কলমে নতুন করে কালি ভরে নেওয়ার উৎসাহ অর্জন করেন, শুরু হয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে দলিত সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা।

দক্ষিণ ভারত

ব্রিটিশ শক্তি ভারত ভূখণ্ডের শাসনক্ষমতা দখল করার পর ১৮৭০ সাল নাগাদ ব্রিটেন থেকে বিপুল সংখ্যায় ইংরেজ বিনিয়োগকারী দক্ষিণ ভারতে আসতে থাকে। এই ইংরেজ পরিবাগুলির প্রয়োজন ছিল বাগান মালি, ক্ষৌরকার, বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা, রান্নার জন্য রাঁধুনি, ধোপা ও পাহারাদারদের ঘোড়ার পরিচর্যা করার লোক, সহিস – মোটের ওপর সমস্ত কায়িক শ্রমের কাজগুলিতে। ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণীয়রা তথাকথিত নীচু পেশাগুলি থেকে নিজেদের এই সকল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় তামিলনাড়ুর নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য অংশের মানুষজন, যাঁরা এতদিন পর্যন্ত সমাজে কায়িক শ্রমের কাজ করতেন এবং নিপীড়নের শিকার হতেন তাঁরাই ইংরেজদের বাড়ি, বাগান, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সাফাই ইত্যাদি কাজগুলিতে যুক্ত হয়েছিলেন। রেললাইন পাতা, ভারী মাল বহন, পোস্ট অফিসের পত্রবাহক, বিল্ডিং নির্মাণ, ব্রিজ-রাস্তা নির্মাণ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাড়ির কাজ ইত্যাদি পেশাতে নিযুক্ত নিম্নবর্গের মানুষদের বসতি তৈরি হয়েছিল ইগমোর, চেৎপুট, তেয় নাম্পেত, আলহাত্তাম ইত্যাদি অঞ্চলগুলিতে।

১৮২০ থেকে ১৮২৭ পর্যন্ত থমাস মুনরো ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেল। তাঁর অধীনে থাকা হিল স্টেট কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান জর্জ হেরিংটনের অধীণে চাকরি করতেন অস্পৃশ্য পারিয়াহ সম্প্রদায়ের তিরু কন্দপ্পন। কন্দপ্পন ছিলেন তামিল ভাষাবিদ এবং তাঁর কাছে তালপাতায় লেখা প্রাচীন তামিল নীতিকথা কাব্য তিরু কুরালের একটি সংস্করণ রক্ষিত ছিল। তাঁর পুত্র কথাবরায়ণ বাল্যকালে স্কুলের শিক্ষক আয়োথি থাসের চিন্তাভাবনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পরবর্তী জীবনে তার নামটি গ্রহণ করেন। কাজের সূত্রে কথাবরায়ণ সপরিবারে নীলগিরি পাহাড়ের উটাই অঞ্চলে চলে যান এবং ১৮৭০ সাল থেকে তিনি নীলগিরি পাহাড়ের টোড উপজাতিদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। ১৮৭৬ সালে তাদের নিয়ে 'অদ্বৈত সভা' নামের একটি সংগঠন তৈরি করেন।

১৮৮২ সালে রেভারেন্ড রটিনাম সর্বনিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের তামিলদের নিয়ে 'দ্রাবিড় অ্যাসোসিয়েশ্ন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। মাদ্রাজ সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য রটিনাম বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রটিনামের সঙ্গে আয়োদি থাসের পরিচয় হলে তাঁরা যৌথ উদ্যোগে *দ্রাবিড় পাণ্ডিয়ান* নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পণয়মকোত্তাই-এর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের শিক্ষক টি ধর্মরাজনের নেতৃত্বে পরিচালিত 'মাদ্রাজ মহাজন সভা'র একটি মিটিংয়ে আয়োদি থাস তামিলনাডুতে বর্ণকাঠামোর সবচেয়ে নীচে থাকা অস্পৃশ্য পারিয়াহ সম্প্রদায়কে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়ার দাবি তোলেন এবং পারিয়াহ সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখেন।

ঐ সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণীয়রা থাসের দুটি দাবীর প্রবল সমালোচনা করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দেন যে তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে যতই পরিচয় দিক না কেন শাস্ত্রমতে শিব অথবা বিষ্ণু কেউই তাঁদের পূজ্য দেবতা নয়। তাদের নিজস্ব দেবতা হল কারুপ্পা স্বামী এবং সুদালামদন। ‘পারিয়াহ’ সম্প্রদায়ের মানুষদের এদের পূজার অধিকারটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই ঘটনা থাসকে-কে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যে হিন্দুধর্মের সংস্কারের কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই পরিকল্পনা তাঁর কাছে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং পরবর্তীকালে আয়োথী থাস হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। এই পর্বে এসে তিনি উপলব্ধি করেন যে কেবলমাত্র হিন্দু পরিচয়কে অস্বীকার করলেই হবে না, নিম্নবর্ণ-অস্পৃশ্য-নিপীড়িত মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য চাই একটি সঠিক আত্মপরিচয়। তিনি হিন্দু ধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করে বহিরাগত আর্যদের তামিলদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করলেন। ১৮৮১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জনসমীক্ষায় তিনি সরকারের কাছে সমাজে অস্পৃশ্য বা পঞ্চমবর্ণ বলে পরিচিত তামিলদের প্রকৃত তামিল বলে উল্লেখ করার দাবি জানান। ১৮৮৬ সালে জনসমীক্ষার তালিকা প্রকাশিত হলে সমাজের অস্পৃশ্য অংশ হিসাবে চিহ্নিত তামিলদের ‘হিন্দু নয়’ বলে উল্লেখ করে সরকার। এটি সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত যে আয়োদি হাসের বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তথাকথিত অস্পৃশ্য অংশের মানুষ ‘বর্ণ বা জাতপাতমুক্ত দ্রাবিড়’ হিসাবে প্রথম সেনসাসে বিবেচিত হয়েছিল, যা তামিল নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষকে ক্রমোচ্চ স্তর বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং নিজেদের

প্রকৃত আত্মপরিচয়কে খুঁজে নিতে সাহায্য করেছিল। থাস কর্তৃক প্রকাশিত *দ্রাবিড় পাণ্ডিয়ান* পত্রিকাটি এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময়কালে প্রকাশিত একাধিক পত্রিকা *সূর্যোদয়ম* (১৮৬৯), *পঞ্চমা* (১৮৭১), *সুগিরদবসনি* (১৮৭৭), *দ্রাবিড়-পাণ্ডিয়ান* (১৮৮৫), *দ্রাবিড় মিত্রন* (১৮৮৫), *অনরর মিত্রন* (১৮৮৬), *মহর্বিকথাতুলন* (১৮৮৮), *পারিয়াহ* (১৮৯৩), *ইল্লার অধুক্কম* (১৮৯৮), *পুলোগা ব্যসন* (১৯০০), *দ্রাবিড় কোকিলাম* (১৯০৭), *আমিঝার* (১৯০৭) এবং *তামিল কলম* (তামিলনারী) (১৯০৭) ইত্যাদি পত্রিকাগুলির মূল বক্তব্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সকল সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকাগুলির মূল ধ্বনি ছিল জাতপাত অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথাকে নাকচ, ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র সমালোচনা এবং হিন্দু ধর্মের মনুর অনুশাসনগুলিকে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করা ও অস্বীকার করা এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখব আয়াদি থাস, এ.পি. পেরিয়ারসামি পুলাভরা, টি সি নারায়ণাস্বামী পিল্লাই, টি আই সামিকান্নু পুলাভার, পণ্ডিত মুনিসামি, রেজ মালাই শ্রীনিবাসন, জন রটিনাম, মুথবীরা পাভালাব, কে স্বপ্নেশ্বরী আম্মল প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কোনো রকম আপোষপন্থী মানসিকতাকে এঁরা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে এঁরা তামিল জাতীয়তাবাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে লেখালিখি ও সভাসমিতির মাধ্যমে হিন্দু সমাজের শূদ্র, অতিশূদ্র বলে চিহ্নিত মানুষদের সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। পারিয়াহ সম্প্রদায়ের আয়োদি থাস-এর সঙ্গে এইচ.এস.ওলকটের— যিনি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি, সাক্ষাৎকারকে একটি সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ওলকটের

সহায়তায় আয়োদি থাস কয়েকজন আন্দোলনকারী নিয়ে শ্রীলঙ্কা যান এবং বৌদ্ধভিক্ষু সুমঙ্গলা নায়াকের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে মাদ্রাজে তিনি শাক্য-বৌদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আয়োদি থাসের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নে তামিল নিম্নবর্গের আন্দোলন বৌদ্ধবাদের মধ্যেই তাঁর ভাবনা ও আশা-আকাঙ্খার দার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন।

আয়োদি থাসের সমসাময়িক দক্ষিণভারতের আরেকজন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন পোকালা লক্ষ্মী নারাসু (১৮৬০-১৯৩৪)। ১৯১৭ সালে পি.এল. নারাসু মাদ্রাজে বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা গ্রন্থ *এ স্টাডি অফ কাস্ট*। জাতপাত ব্যবস্থার আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রথম দিককার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বই বলা যেতে পারে এই *এ স্টাডি অব কাস্ট*-কে। ভীমরাও আম্বেদকর পি. লক্ষ্মী নারাসুর রচনা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আয়োদি থাসের সমসাময়িক অদ্বৈতবাদী আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু নারায়ণাগুরু বা গুরুস্বামী (১৮৫৬-১৯২৮) জাতপাত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। নারায়ণা গুরু ছিলেন কেরালার অস্পৃশ্য 'এঝাবা' সম্প্রদায়ের মানুষ ও ধর্মগুরু। ১৯০৩ সালে নারায়ণ গুরুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় ডাক্তার পদ্মনাভন পাপলু (১৮৬৩-১৯৫০) কেরালার এঝাবা সম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের নিয়ে 'শ্রীনারায়ণা ধর্ম পরিপালন যোগম' বা SNDPJ তৈরি করেন। খুব শীঘ্রই এই সংগঠন দেশের সর্ববৃহৎ অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯১ সালে 'মালায়লি মেমোরিয়াল রিভল্ট' নামে পরিচিত সংস্কার আন্দোলন কেরালায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার

করেছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পাপলু। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৯৬ সালে তৈরি হয় 'এঝাবা সভা'। কেরালার থানকুশার থেকে একটি আইনি সংবাদপত্র প্রকাশ করে মালয়ালি জনগণের অধিকারের কথা তুলে ধরার কাজ করছিলেন তিনি।

১৯০২ সালে মারাঠা কোলহাপুর প্রিন্সলি স্টেটের শাসক ছত্রপতি শাহু মহারাজ (১৮৭৪-১৯২২) তাঁর রাজ্যে সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ আসন অব্রাহ্মণ অংশের জন্য সংরক্ষণ করার মধ্য দিয়ে শোধক আন্দোলন পুনরায় শুরু করেন। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে তিনি পুনরায় 'সত্য শোধক সমাজ' সংগঠিত করে নিম্নবর্ণের মানুষদের আন্দোলনে সামিল করেন। যদিও দ্বিতীয় পর্বের এই আন্দোলনে ফুলের চিন্তাভাবনা থেকে সরে গিয়ে সাহু মহারাজ নিজের সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এমন দাবি করে আন্দোলন শুরু করেন। এছাড়া ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণীয় কৃষক ও ভূমিহীন অস্পৃশ্যদের হাত থেকে এই আন্দোলন অব্রাহ্মণ জমিদার ও ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়ে। সত্য শোধক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বেই এই আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। গড়ে ওঠে 'জাস্টিস পার্টি'।

পেরিয়ার ই.ভি.রামসামীর জন্ম হয় ১৮৯৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর এড়োড শহরে। তাঁরা ছিলেন কর্ণাটকের বালিজা নায়ডু সম্প্রদায়ের মানুষ। বর্ণকাঠামোয় যাঁদের অবস্থান 'শূদ্র'। ১৯১৬ সালের ২০ নভেম্বর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অব্রাহ্মণ তামিল নেতারা সাউথ ইন্ডিয়ান লিবারাল ফেডারেশন (SILF) বা 'জাস্টিস পার্টি' গঠন করেন। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা এম.সি. রাজাহ (১৮৮৩-১৯৪৩) ছিলে SILF–এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৬ সালের ২০ ডিসেম্বর SILF বা জাস্টিস পার্টি 'অব্রাহ্মণদের ইস্তেহার' নামে একটি

ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রটিকেই দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় নিম্নবর্গীয়দের সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসাবে ধরা হয়। ১৯২০ সালে প্রথম অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে এম.সি. রাজাহ মাদ্রাজ বিধানসনভায় নির্বাচিত হন। ১৯২২ সালে রাজাহ 'পারিয়াহ' এবং 'পঞ্চমা' পদবী সরকারি নথি থেকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন এবং তার পরিবর্তে আদি দ্রাবিড় ও আদি অন্ধ্র পদবী ব্যবহারের প্রস্তাব আনেন। জাস্টিস পার্টির সঙ্গে মতের অমিল হওয়া এম. সি. রাজাহ জাস্টিস পার্টি (SILF) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীকালে 'All India Depressed Castes Association' গঠন করেন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যুক্ত হলেন ই.ভি.রামসামী এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কংগ্রেসের ১৯২২-এর তিরুচিরাপল্লী সম্মেলনে, ১৯২৩-এর মাদ্রাজ সম্মেলনে এবং ১৯২৪-এর তিরুবাম্মামালাই সম্মেলনে অব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্ণীয় ও অস্পৃশ্যদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিতে সফল হলেন ই. ভি. রামসামী।

১৯২৪ সালের ভাইকম সত্যাগ্রহ ছিল দক্ষিণ ভারতে সংঘটিত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদী রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এবং জাতপাতগত বৈষম্যের অবসানের দাবিতে নিপীড়িত তামিল জনতার মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের প্রথম ঐতিহাসিক সংগ্রাম। ১৮৮৪ সালের ত্রাভানকোরের মহারাজা সরকারের একটি সার্কুলার অনুযায়ী কেরালার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ভাইকমের শ্রী মহাদেব মন্দিরের বাইরের রাস্তায় চারিদিকে বোর্ড টাঙানো ছিল, যাতে লেখা থাকতো, 'এঝাবা ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য মানুষদের জন্য

এই রাস্তা নিষিদ্ধ।' অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯২৫ সালে মন্দিরের সংলগ্ন চারটি রাস্তার গেট অস্পৃশ্যদের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পরে ১৯২৮ সালে ত্রাভানকোরের মন্দিরের আশপাশ দিয়ে যাওয়া সমস্ত রাস্তা নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য অংশের মানুষদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এই জয়ের পর ভাইকমের সত্যাগ্রহীরা ই.ভি.রামসামীকে 'ভাইকমের বীর' উপাধিতে ভূষিত করেন। শেষমেশ ১৯৩৬ সালে 'ভাইকম সত্যাগ্রহ' জয়ী হয় এবং ভারতবর্ষের সমস্ত মনির চত্বরে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের প্রবেশকে আইনি স্বীকৃতি দেয় সরকার।

১৯২৫ সালের নভেম্বরেই কংগ্রেস পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ই.ভি.রামসামী। ১৯২৪-এর 'ভাইকম আন্দোলন' ও ১৯২৫-এর 'গুরুকূলম'-এর ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তিনি একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯২৫ সালে ই.ভি.রামসামী ও এস. রামনাথন যৌথ ভাবে শুরু করেন 'সুয়ামারিয়াদাই ইয়াক্কম' বা 'আত্মমর্যাদা আন্দোলন' (The Self Respect Movement)। 'কুদি-আরসু' পত্রিকাকে এই সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ভান্নিকুলা ক্ষত্রিয়, নাজর, আগমুদিয়া, ইসাই ভেল্লালা সম্প্রদায়ের মানুষরা হিন্দু বর্ণ কাঠামোয় যাদের স্থান ছিল একেবারে নীচে, আত্মমর্যাদা আন্দোলনকারীরা তাদের একদম কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন তাঁদের বক্তব্যকে। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত আত্মমর্যাদা আন্দোলনের দ্বিতীয় সম্মেলনে দেবদাসী প্রথাকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পেরিয়ার ই.ভি.রামসামী দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্য দলিত পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজেদের দ্রাবিড় বা তামিল জাতীয়তাবাদী পরিচয়কে সামনে আনতে সফল হন।[১৭]

অবিভক্ত বাংলা দেশ

বাংলার নিম্নবর্ণীয়দের প্রথম দিককার রচনাগুলি ছিল মূলত জাতি আন্দোলন কেন্দ্রিক। উনিশ শতকের শেষ দশক ও বিশ শতকের গোড়ায় রাজবংশী, পৌন্ড্র, মাল, কৈবর্ত্য, নমঃশূদ্র, ধোবা, ভুঁইমালি, পাটনি, বাগদি, চাঁই ইত্যাদি নিম্নবর্ণীয় জাতিগুলির মধ্যে জাগরিত আত্মচেতনার বিকাশকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য নিম্নবর্ণীয় চিন্তাবিদগণ তাঁদের জাতির (caste) ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৭০-এর দশকে পূর্ববাংলার নমঃশূদ্রদের মধ্যে। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলের নমঃশূদ্রগণ এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে সামাজিক সম্মান ও শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন। হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৭৮) শিক্ষানুরাগ ও আত্মোন্নয়নের নিরলস প্রচেষ্টা বিশ শতকে নমঃশূদ্রদের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। ওড়াকান্দির ঠাকুর পরিবারের ‘মতুয়া’ ধর্মমতের আদর্শে বলীয়ান হয়ে নমঃশূদ্ররা বাংলার রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের পথে অগ্রসর হন ১৯৩০-এর দশক থেকে। নমঃশূদ্রদের মতো সামাজিক সম্মান অর্জনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন রাজবংশী, পৌন্ড্র, মালো, ভুঁইমালি সহ কয়েকটি নিম্নবর্ণীয় জাতি। পঞ্চানন বর্মা (১৮৭২-১৯৩৬) ও মধুসূদন সরকারের আইনজীবীরা ক্ষত্রিয় জাতির মতো সম্মান অর্জনের জন্য ১৯১০ সালে গঠন করেছিলেন ‘রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি’র। অনুরূপভাবে রাইচরণ সরদার (১৮৭৬-১৯৪২), অনুকুলচন্দ্র দাস (১৮৯৪-১৯৪৭), মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-১৯২৮) ও

আরো কতিপয় পৌন্ড্র মধ্যবিত্ত চিন্তাবিদ 'সর্ববঙ্গ পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সমিতি' স্থাপন করে 'পৌন্ড্র -ক্ষত্রিয়' আন্দোলন শুরু করেন। মালোদের ক্ষেত্রে 'মল্ল ক্ষত্রিয়' আন্দোলনেও মালো বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বাংলার বিভিন্ন তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌন্ড্র, বাগদি, বাউরি, মাল, কৈবর্ত্য, মালো ও শুঁড়ি সম্প্রদায়। বাংলায় নিম্নবর্ণের প্রথম পত্রিকা 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' (১৯০৭) মাসিক পত্রিকা হিসাবে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি থেকে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য নমঃশূদ্রদের চণ্ডাল গালিমোচনের জন্য নমঃশূদ্র সুহৃদ পত্রিকার বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত একটানা চণ্ডাল শব্দ বর্জনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালের সেন্সাসে 'নমঃশূদ্র' শব্দ গৃহীত হয়। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত রাসবিহারী রায়ের সম্পাদনায় *নমঃশূদ্র দর্পণ*, ১৯১১ সালে শশীকুমার বাড়ৈ বিশ্বাসের সম্পাদনায় *নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব*, ১৯১৪ সালে রাইচরণ বিশ্বাসের সম্পাদনায় *পতাকা*, ১৯১০ সালে রাইচরণ সরদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পৌন্ড্র সমাজের প্রথম পত্রিকা *ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব*। পরবর্তীকালে পৌন্ড্র সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। যথাক্রমে মহেন্দ্রনাথ করণ ও ভবসিন্ধু লস্করের সম্পাদনায় *প্রতিজ্ঞা* (১৯২৪), ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ও মহেন্দ্রনাথ করণের সম্পাদনায় অপর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা ছিল *পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার* (১৯২৪)। মতুয়া মহাসংঘের মুখপাত্র হিসাবে *অনন্ত বিজয়* (১৯৪০) পত্রিকাটির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশভাগ পরবর্তী সময় প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে ঠাকুরনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিরাট এক উদ্বাস্তু উপনিবেশ, এই সময়ে মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে

১৯৪৯ সালে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে প্রকাশিত হয় *ঠাকুরনগর পত্রিকা*। লক্ষণীয় বিশ শতকের প্রথম দিকে নিম্নবর্ণীয়দের পত্রিকা প্রকাশের সূচনা লক্ষিত হয়। পত্রিকাগুলির রচনা ও প্রকাশনা যে খুব উন্নতমানের সে দাবি সঙ্গত নয়; কিন্তু নিম্নবর্ণের আত্মজাগরণের দর্শন হিসাবে পত্রিকাগুলি যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অস্মিতাদর্শ, আমহি, মাগোজ, মারাঠাওয়াড়া, সত্যকথা ইত্যাদি পত্রিকাগুলি যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, রায় সেই অভিন্ন ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে বর্তমান বাংলার কিছু দলিত পত্র-পত্রিকা। সেইগুলির মধ্যে অন্যতম *চতুর্থ দুনিয়া, দলিত কণ্ঠ, আজকের একলব্য, নীল আকাশ, অদলবদল, বহুজন দর্পণ, জাগরণ, নীল দিগন্ত, যুগ চেতনা, সূর্যা এখন, সত্যকাম, পথ সংকেত, চেতনা, অধিজনকথা, পৌন্ড্রসমাচার* ইত্যাদি।

উপরিউক্ত পত্র-পত্রিকার মধ্যে দলিত সাহিত্যের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য— যন্ত্রণা (Suffering), প্রত্যাখ্যান (Negation) ও বিদ্রোহ (Revolt) কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুভবের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র দলিত সমাজের প্রতিভূ হয়ে ওঠে।

এই পথ ধরেই ১৯৮৭ সালে বেশ কয়েকজন দলিত বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসে মহারাষ্ট্রের দলিত প্যান্থারের ধাঁচে ‘বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ’ গড়ে তোলেন। এই সংস্থাটির সভাপতি ছিলেন বিমল বিশ্বাস এবং সম্পাদক নকুল মল্লিক। এদের উদ্যোগে ১৯৮৭-র এপ্রিলে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে দু’দিন ব্যাপী দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরই পাঁচ বছর বাদে ১৯৯২ সালে স্থাপিত হল ‘বাংলা দলিত সাহিত্য

সংস্থা'। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন জগবন্ধু বিশ্বাস ও সম্পাদক অমর বিশ্বাস। এই সংস্থার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয় ১৯৯২ সালের ভায়না গ্রামে।

সুশীলকুমার বর্মণ তাঁর *অব্রাহ্মণ পুরোহিত* বইটিতে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখিয়েছিলেন রাঢ়বাংলার বিভিন্ন দেবস্থানে পূজারি হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন অব্রাহ্মণ পুরোহিত। কোথাও রয়েছেন লোধা-শবর পুরোহিত, কোথাও বাগদি, কোথাও বাউরি, কোথাও লোহার, কোথাও জেলে কৈবর্ত, আবার কোনো থানে রয়েছেন কুড়মি পুরোহিত। কোনো থানে রয়েছেন একসঙ্গে শবর ও ব্রাহ্মণ পূজারি। কোনো থানে পুরোহিতই নেই, ভক্তরাই সেখানে পুরোহিত।

ঝাড়গ্রামে আদিম কাল থেকে যে সমস্ত দেব-দেবীর পুজো হয়ে আসছে সেই থানগুলি হয় আদিবাসী নয়তো তথাকথিত নিম্নবর্গীয় পুরোহিত পুজো করে আসছেন। কেঁদুয়ামাতার পুরোহিত সম্প্রদায় বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ। জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে গ্রামদেবতা ও লৌকিক দেব-দেবীর পূজক হিসাবে অধিকাংশ দেবস্থানে নিযুক্ত আছেন অব্রাহ্মণ পুরোহিত। যাঁরা তফশিলি জাতি, কুড়মি জাতি সম্প্রদায় বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। জঙ্গলমহলে প্রতিটি গ্রামে একটি করে দেবস্থান রয়েছে। যেটিকে বলে গ্রামস্থান বা গরামথান। সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন গ্রামদেবতা বা গরামদেবতা। গরাম ছাড়াও গ্রামে পূজিত হন বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী, যেমন শীতলা, মনসা, বাশুলি, খাঁদারানি, সাতবহুনি, বাখুৎ, বড়াম প্রভৃতি। এইসব দেবতার অব্রাহ্মণ পূজকদের বলা হয় দেহরি। ব্রাহ্মণদের মত দেহরিরা বংশ পরম্পরায় পূজকের কাজ করে থাকেন। জঙ্গলমহলের গ্রামগুলিতে তফসিলি জাতি, কুড়মি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ,

সদগোপ, মাহিষ্য ও অন্যান্য বর্ণের বসবাস থাকলেও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ দেবস্থানে বা ঠাকুরথানে দেহরিদের পৌরোহিত্য স্বীকার করে নেন। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলর বিখ্যাত দেবস্থানে রয়েছেন বহু অব্রাহ্মণ পুরোহিত। এরা মূলত বাগদি, বাউরি, জেলে কৈবর্ত, ভোগতা লোহার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি তফসিলি জাতি এবং লোধা-শবর, ভূমিজ, মুণ্ডা, মাহালি প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর। তারা নিজেদের সহজ সরল ভাষায় দেবতাকে আহ্বান করে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের উল্টোদিকে এই তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও কুড়মী সম্প্রদায়ের মানুষরাই রাঢ়বাংলার আদিমতম বাসিন্দা।[১৮]

দলিত নন্দনতত্ত্ব গ্রন্থের লেখক শরণকুমার লিম্বালের মতে দলিত সাহিত্যের বেদনা কোনো 'আমি'র বেদনা নয়, এই বেদনা সমগ্র অস্পৃশ্য সমাজের বেদনা। এইখানেই তৈরি হয় সেই প্রশ্ন— দলিত সাহিত্যের স্রষ্টা হবে কারা? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দলিত বুদ্ধিজীবী শিবির দ্বিধাবিভক্ত। এক দলের মতে, দলিতের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি সম্পন্ন যে কোনো লেখকই লিখতে পারেন এমন সাহিত্য। কিন্তু সংখ্যাগুরু অংশের মত, একজন জন্ম-দলিতই যথার্থভাবে দলিতের বেদনা বুঝতে সক্ষম। এই বক্তব্যকে মান্যতা দিলে দলিত সাহিত্য হয়ে ওঠে এমন এক সারস্বত প্রয়াস যা বিশুদ্ধভাবে দলিতদের নিয়ে, দলিতদের জন্য ও দলিতদের দ্বারা সংগঠিত। এই অভিমুখটিকে গুরুত্ব দিলে 'আত্মজীবনী' নামক সংরূপটি হয়ে ওঠে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী সাংস্কৃতিক হাতিয়ার।

তথ্যসূত্র:

---

১. রায়, শিবনারায়ণ ও রেজা, শামিম (সম্পাদিত); *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ৭৬

২. গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত, *চার্বাক দর্শন*, অবভাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ১৪-১৫

৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়াত দর্শন*, নিউ এজ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৮১৬, পৃ. ২২

৪. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, গাঙচিল, কলকাতা,

৫. ঘোষ, স্বাতী, *থেরীগাথা: প্রথম মানবীর স্বর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৪, পৃ. ১১

৬. আচার্য, দেবীদাস, *মহাভারতে নিম্নবর্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ৩৩

৭. আচার্য, দেবীদাস, *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ১০৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

৯. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, *বাংলার সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩১

১০. কাফি, আব্দুল, *দুরের মাদল*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৫৯

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১৪. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, 'মেদিনীপুরের আদিবাসী রাজনীতি', *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত* (ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত), একুশ শতক, বইমেলা ২০১৬, পৃ. ৫২

১৫. চ্যাটার্জি, দেবী, *সমাজ রাষ্ট্র ও প্রান্তিকতা,* অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ৮৭

১৬. নস্কর, সনৎ কুমার(সম্পাদিত), *এক অন্তহীন মহামানব: বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর,* পৌন্ড্র মহাসঙ্ঘ, বারুইপুর, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩৬

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়, *দক্ষিন ভারতের অস্পৃশ্য আন্দোলন: পেরিয়ার ই. ভি. রামাস্বামী,* নিস্পলক, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ১১৮

১৮. বর্মন, সুশীল কুমার, *অব্রাহ্মন পুরহিত,* মান্দাস, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩, পৃ. ২১

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় দলিত আত্মজীবনী: বিদ্রোহের বর্ণমালা

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বভারতীয় দলিত আত্মজীবনী: বিদ্রোহের বর্ণমালা

দলিত জীবনের খুঁটিনাটি যাপন দলিতের একান্ত নিজস্ব; এমন এক বোধ এবং দায় থেকে আত্মজীবনীর লেখকেরা তাঁদের আত্মস্মৃতি রচনা করেছেন। দলিতের আত্মজীবনী বা দলিত লেখকের আত্মজীবনী— এমন কোনো স্বতন্ত্র উপবর্গীয় বিভাজন 'আত্মজীবনী'র সংরূপের ধারায় অন্তর্গত কিনা, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। মার্কিন দেশের কালো লেখকরা একসময় আত্মকথার ধারাকে আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। অনেক তরুণ দলিত লেখক আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা একে বলেছেন খর্বতার সাহিত্য বা 'বনসাইজেসন'। কারণ অস্পৃশ্যতা ও নির্বাসনের নন্দনতত্ত্ব আত্মপ্রতিনিধিত্বের রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, আত্মজীবনীর ভর কেন্দ্রে এই 'আমি' স্রষ্টার অবচেতনের নির্মাণ। কিন্তু অল্প মনোনিবেশ করলেই বুঝে ফেলা সম্ভব এই 'আমি' এক অত্যন্ত সচেতন ও মননশীল নির্মাণ। অপরদিকে লিখিত জীবন থেকে 'জীবনী' লেখকদের যে সত্তাগত দূরত্ব থাকে, আত্মজীবনী সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত। 'জীবনী' লেখা অনেকটা নির্ভর করে ঘটনা সংগ্রহের উপর। কিন্তু আত্মজীবনীর চমৎকারিত্ব নির্ভর করে আত্মউপলব্ধির উপর। আত্মজীবনীতে যেহেতু 'আত্ম'টিই প্রধান, তাই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই 'আত্ম'-র উপস্থাপনা একটি জরুরি বিষয় হয়ে ওঠে। এই আত্মকথনের জন্মদাতা যদি একজন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে থাকেন, তখন সেই আত্মজীবনী 'বিশেষ' কিছু বলতে চায়। যেখানে স্মৃতিমেদুরতা নয়, কঠোর আত্মসংগ্রাম পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে।

বাংলায় যেমন বাঙালি দলিত সাহিত্যিকরা নিজেদের কথা লিখে চলেছেন, ঠিক তেমনই তারা দু'হাতে গ্রহণ করেছেন ভারতের অন্যান্য প্রান্তের দলিত গল্প, কবিতা, উপন্যাস, আত্মজীবনী ইত্যাদিকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদের ক্ষেত্রে, অবদান রয়েছে দলিত, অ-দলিত দুই বর্গের মানুষদেরই। ১৯৯২ সালে অর্জুন ডাঙলের সম্পাদনায় 'ওরিয়েন্ট লঙম্যান' থেকে প্রকাশিত হয় *পয়জনড ব্রেড* (১৯৯২) – দলিতদের কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী আলোচনার সংকলন। ১৯৯৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক দেবেশ রায়ের সম্পাদনায় এর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য বইটিতে পাই দয়া পাওয়ার (১৯৩৫-১৯৯৬)-এর আত্মজীবনী *বলুতা* (১৯৭৮)-এর অংশবিশেষ। ফোর্ড ফাউন্ডেশন কর্তৃক পুরস্কৃত বহু আলোচিত এবং সমাদৃত এই আত্মজীবনীটির একাধিক ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে। Jerry Pinto-র অনুবাদে 'স্পিকিং টাইগার' প্রকাশনা থেকে ২০১৫ সালে অনূদিত হয়েছে *Baluta*, তরজমায় শান্তা গোখেল।

নবারুণ ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদটির শিরোনাম *খোকা, পেট ভরে খা*। এখানে দয়া পাওয়ারের শৈশব, কৈশোরের ছবি পাই। আলোচ্য দলিত লেখকের ছোটবেলা কেটেছে 'কাভাখানা'তে। গোলপিঠার বেশ্যাপল্লী ছাড়ালেই ছিল কাভাখানা। এই গোলপিঠা (মুম্বাই শহরের যৌনকর্মী পল্লী) অঞ্চলেরই মাংসের দোকানের কসাইয়ের ছেলে উল্লেখযোগ্য একজন দলিত লেখক নামদেও ধসাল (১৯৪৯-২০১৪)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নামও ছিল *গোলপিঠা* (১৯৭২), যা আদতে এই অন্ধকার পৃথিবীর মানচিত্র।

দয়া পাওয়ার মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। মাহার পুরুষেরা মুটের কাজ করত। মেয়েরা রাস্তা থেকে ছেঁড়া-পচা ন্যাকড়া, কাগজ, ভাঙা কাচ, লোহা ও বোতল কাছের মঙ্গলদাস বাজারে বেচে আসত। এছাড়াও তারা আশেপাশের বেশ্যাবাড়ির বেশ্যাদের শাড়ি ধোওয়ার কাজ করত। বেশ্যাবাড়ির খদ্দেরদের লালসার সামনে মাহার মেয়েদের ইজ্জত ছিল কাচের মতোই ঠুনকো। লেখকের বাবা বোম্বাইয়ের ড্রাই ডকে কাজ করতেন। ঠাকুমা দেবকাই অল্পবয়সে স্বামীকে হারিয়ে জঞ্জাল কুড়িয়ে তাঁর দুই ছেলেকে বড়ো করে তুলেছিলেন। অভিভাবকহীন এই অল্পবয়সী বিধবার উপর তাঁর নিজের জ্ঞাতিরাও ছিল নির্দয়। তারা সবাই মিলে নিয়ম করেছিল, বিধবাকে গাঁয়ের দরজায় পাহারা দিতে হবে। জন্তু-জানোয়ার মরলে টেনে নিয়ে যেতে হবে। গাঁয়ে কেউ মারা গেলে তাঁকেই রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দিয়ে বেড়াতে হবে। একদিন এই ফরমান ঘোষণার সময় গাঁয়ের বাসিন্দা কোনডিবা তাঁকে মারাত্মক অপদস্থ করলে তিনি দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে বোম্বাই চলে যান। লেখক বাকি জীবন ভুলতে পারেননি তাঁর ঠাকুরমা আজি-র সেই 'খোকা, পেট ভরে খা' স্নেহবচন, যা তিনি মৃত্যু অবধি বলে গেছেন। ছেলেরা যখন খেতে বসত, বুড়ি তাদের পিঠে বার বার হাত বুলিয়ে দিতেন আর বলতেন 'খোকা, পেট ভরে খা'।[১]

বলুতা-র অপর একটি অংশ নবারুণ ভট্টাচার্য অনুবাদ করেছেন 'আমরা সবাই রাজা' নামে। মাহারদের মধ্যে তাদের প্রাচীন 'বাহান্ন দফা' অধিকার নিয়ে একটি অস্বস্তিকর গল্প বংশপরম্পরায় চালু ছিল। পাইথান ও বেদার-এর মুসলমান রাজা মাহারদের ঐ বাহান্ন দফা অধিকার দিয়েছিলেন। আলোচ্য লেখক পরবর্তীকালে ভিট্টোল রামজী শিন্দে রচিত *দ্য আনটাচেবলস প্রবলেমস ইন ইণ্ডিয়া* বইতে এই দানপত্রটি ও

তৎসংক্রান্ত গল্পটি দেখেন। পুরন্ধর দুর্গে একটি বুরুজ বানানোর স্বার্থে রাজার পর্ষদ ইয়েসাজি নাইক চিরে তার বড়ছেলে ও পুত্রবধূকে ঐ বুরুজের তলায় জীবন্ত বলি দিয়ে রাজার এই অনুগ্রহ লাভ করেছিল। অপর উপকথাটিও ছিল মাহারদের বিশ্বস্ততার গল্প। রাজার সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে তখনকার দিনের দিল্লির বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করবার সময় এক মাহার যুবক রাজার কাছে একটি ছোটো কাঠের বাক্স জমা দিয়ে যায় এই মর্মে যে, বাক্সে তার একটি অতি মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে, যা সে ফিরে এসে নেবে। ফিরে আসার পর যখন রাজসভায় তাদের ঐ একাকী যাত্রা নিয়ে সন্দেহের জন্ম হয়, তখন সে রাজাকে বাক্সটি খুলে দেখতে বলে। বাক্স খুলে রাজা দেখেন যে, বাক্সের মধ্যে রয়েছে তার কাটা পুরুষাঙ্গ যা সে যাওয়ার আগে কেটে রেখে গিয়েছিল। তার এই আত্মঘাতী বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে সে তার সমগ্র জাতির জন্য ঐ 'বাহান্ন দফা অধিকার' চেয়ে নিয়েছিল রাজার কাছ থেকে। পশ্চিম মহারাষ্ট্রে রাডির কাছে একটি জায়গার নাম ছিল 'হাড়কি', অর্থাৎ ছোটো হাড়ের টুকরো। আর পাহাড়ের ছায়ায় গাঁ থেকে অনেক দূরে যে জমি ছিল, তাকে বলা হত 'হাড়ভালা'। চব্বিশ ঘণ্টা কাজের জোয়াল টেনে, দাসত্বের গ্লানি সর্বাঙ্গে মাখার বিনিময়ে তাদের পাওনা ছিল 'বলুতা', অর্থাৎ ফসলের একটি অংশ। কুয়োতলায় মারুতি দেবতার গায়ে মাহার মেয়েদের ছায়া পড়লে দেবতা অপবিত্র হবেন এই যুক্তিতে গাঁয়ের রাস্তা মাহারদের জন্য বন্ধ করে দিলে মাহাররা চরম অনিশ্চতার মধ্যে পড়ে। শেষে সহৃদয় খ্রিস্টান জেলাশাসক, যিনি জন্মসূত্রে একজন মাহার ছিলেন, তাঁর হস্তক্ষেপে মোড়লরা লিখিতভাবে কবুল করতে বাধ্য হয় যে তারা আর কখনো মাহারদের জল নেওয়ার রাস্তা বন্ধ করবে না। লেখকের জাভাজিবুয়া বহুদিন ধরে সেই কবুলপত্রটি একটি টিনের কৌটায় ভরে সন্তর্পণে আগলে রেখেছিলেন। লেখাপড়া শিখে লেখক সেই

কবুলপত্রটি দেখেন। জাভাজিবুয়া তাঁর এই গর্বের ধন 'তমসুক'টি মৃত্যুর আগে তাঁর ছেলের হাতে দিয়ে যান, যা তাঁর কাছে ছিল এক ঘড়া সোনার মোহরের মতো দুর্লভ।[২]

মারাঠি দলিত লেখক শঙ্কররাও খরাটের আত্মকথন *তরল অন্তরাল*-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন নীতা সেন সমর্থ। অনুবাদটির শিরোনাম 'কুয়োর ভিতর মড়া'। মাহারদের কাজ ছিল চৌকিদারের দায়িত্ব, এবং মড়া মানুষের পাহারা দেওয়া, যতক্ষণ না থানার বড়ো দারোগা তার সেপাই নিয়ে তদন্তে আসে। লেখক তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলছেন: একবার গাঁয়ের এক কুয়োতে এক মড়া ফুলে ঢোল হয়ে ভেসে বড়ো দারোগা এসে তদন্ত শেষে যখন তাঁকে কুয়ো থেকে মড়া তুলতে বলে, তখন তিনি প্রতিবাদ করেন। এর ফলে দারোগা সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, 'শালা, নর্দমার পোকা! নাম জলে, নয়ত চাবকে নামাব।' অসহায় মানুষটি যখন কুয়ায় নামছিলেন অভুক্ত পেটে, লেখক তখন উপর থেকে একটি সাপ্কে দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে বাবাকে সাবধান করার চেষ্টা করে।

> বাবা আমার দিকে ওপরে তাকিয়ে রাগে, হতাশায় বললে, 'নারে খোকা, যা হয় আমারই গাঁয়ের আর পাঁচজন জানুক মারদের রাম-কে সাপে কেটেছে, তাতেই ও মরেছে। গাঁয়ের চৌকিদারি ছেড়ে ও যখন একটা পুরনো ভাঙা পচা কুঁয়ো থেকে মরা তুলছিল তখন ওকে সাপে কেটেছে। সারা গাঁয়ের লোক দেখুক, দেশের সরকার জানুক, সারা সংসার জেনে যাক।[৩]

এইভাবে পচে যাওয়া, বীভৎস, দুর্গন্ধ যুক্ত মড়াটিকে কুয়ো থেকে তুলে আবার মাইল আষ্টেক দূরে ডাক্তারের কাছে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যেতে হয় অভুক্ত, অস্নাত লেখকের বাবাকে। কারণ এটাই ছিল তাঁর বিধিলিপি। *তরল অন্তরাল*-এরই অপর একটি অংশ অনুবাদ করেছেন সন্তোষ চক্রবর্তী, যাঁর নাম *হাড়ের ব্যাপারী*। মাহারদের দৈনন্দিন

রুজি-রোজগারের দলিল যেন এই অংশটি। লেখক বলেছেন ক্লাস ফোর থেকে পাওয়া তার জলপানির এক টাকার পুরোটাই চলে যেত লবণ আর মশলা কিনতে। হাতখরচের জন্য তিনি ওই বয়স থেকেই আঠা সংগ্রহ, করঞ্জা ফল বিক্রি, মধু বিক্রি, দিনমজুর খাটতে শুরু করেন। তাঁর শৈশবের অন্যতম আনন্দের দিন ছিল সেদিন, যেদিন মরা জন্তু-জানোয়ারের হাড় কিনতে হাড়ের ব্যাপারি তাঁদের গ্রামে আসত আর মাহার, মাংদের বাচ্চা-বুড়োর মধ্যে নদীর ধারে হাড়গোড় খোঁজার ধুম পড়ে যেত। এই দু'আনা, চার আনা রোজগারই ছিল মাহারদের অন্নসংস্থানের উপায়। মারাঠি লেখক দাদাসাহেব মোরের *গবাল*-এর অংশবিশেষের অনুবাদ করেছেন তপতী সেনগুপ্ত; যার নাম *দলছুট যাযাবর*। লেখকের সম্প্রদায়ের মানুষেরা মঙ্গলবার দিন তাদের সঞ্চিত শস্যদানা, মুরগি নিয়ে হাটে যেত কিন্তু সেখানে-

> চুরি চামারি শূরু করব এই আশঙ্কায় প্রত্যেকেই আমাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রাখত। আমাদের সঞ্চিত খিচুড়ি শস্যদানা বা সংগৃহীত মুরগি কিনতে কেউ এগিয়ে এল না। সম্ভাব্য খদ্দেররা ধরে নিল যে পাখিগুলি আমাদের চুরি করা সম্পত্তি। বাজারে প্রত্যেকের চোখেই আমরা চোর। নির্দিষ্ট বাজারদরের অর্ধেক দামে আমরা আমাদের মিশ্রিত শস্যগুলি পাখির খোরাক হিসেবে বেচতে বাধ্য হলাম। সমাজে আমাদের মানুষ বলে কেউ গণ্য করে না – আমরা পতিত, অতএব আমাদের জিনিসগুলোরও কোন দাম নেই, আমরা যেন অন্য দুনিয়ার আজব জীব।[৪]

লেখক তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন সমস্ত ক্ষেত্রে নীরবে অপমান সহ্য করতে থাকা তাঁর পূর্বপুরুষকে, যাঁরা পড়তে চেয়েও পড়তে পারেননি। কয়দিন ছাড়া ছাড়া তাঁবু গুটিয়ে নতুন বাসস্থানের সন্ধান বেরিয়ে পড়া ছিল এই পিঙ্গল যোশী সম্প্রদায়ের দিনলিপি। লেখক তাঁর প্রথম দিনের ভিক্ষা চাইতে যাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আব্বা আমাকে বল, আমি কেমন করে ভিক্ষা চাইব? কী বলব প্রথমে?' জনসাধারণের মধ্য প্রচলিত

বিশ্বাস আছে যে, এই যোশীরাই পিঙ্গলা পেঁচার ভাষা বুঝতে পারে। পেটের তাড়নায় এই পাখির নাম ভাঙিয়ে তারা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে।

মারাঠি লেখক পি. আই. সোনকাম্বলের *আঠয়ানিন্‌চে পকশি*-র অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত। অনুবাদের শিরোনাম 'এটাও কেটে যাবে'। পিতৃমাতৃহীন অসহায় লেখকের ছেলেবেলার কথা পড়তে গিয়ে দেখি অতি অল্প বয়সেই তাঁর জামাইবাবু ধোনদিবা তাঁকে আড়াই টাকা মাস মাইনের বিনিময়ে কিসাও রাও পাতিলের কাছে চাকর হিসাবে বিক্রি করে দেয়। পাতিলের বাড়িতে তাকে খেতে দেওয়া হত ঘুঁটের গাদার পাশে, যেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা মল-মূত্র ত্যাগ করে। কারণ সে অচ্ছ্যুৎ। খেতে কাজ করার সময়ে সে বিঠল নামের এক স্কুল ফেরতা ছেলেকে ঘাস নিড়োতে নিড়োতে জিজ্ঞেস করত ইংরেজি ভাষাটা শক্ত কিনা? কারণ সে পড়তে চাইত। স্কুলে যেতে চাইত। আর সবার মতো স্বপ্ন দেখত এই সময়টাও একদিন নিশ্চয় কেটে যাবে।[৫]

কন্নড় দলিত সাহিত্যিক অরবিন্দ মালাগাত্তির *গভর্নমেন্ট ব্রাহ্মণ*-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন জি. কুমারাপ্পা ও শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়। অনুবাদটির শিরোনাম *কালো বিড়াল কখনো সাদা হয় না*। লেখকের ছেলেবেলায় তাঁর মা ঝরনার জলে তার গা ধুইয়ে দিতেন। সারা শরীর একটা খড়খড়ে সাদা পাথর দিয়ে ঘসে দিতেন। তাঁর কালো শরীর তখন আর কালো নয়, বাদামী দেখাত। লেখক বড়ো হয়ে জানতে পারেন গ্রামের প্রান্তে দলিতদের জন্য নির্ধারিত ওই ঝর্ণার জলের আসল উৎস ছিল গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর রোজকার নোংরা জল।

লেখাটির এক জায়গায় তিনি তাঁর প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন পাঠকের কাছেই-

> আপনারা কী কখনো এইরকম নর্দমার জলে স্নান করেছেন, কখনো কী জামা-কাপড় এই রকম জলে ধুয়েছেন? কখনো কী আপনি দাঁত মাজার পর এইরকম জলে কুলকুচি করেছেন?[৬]

তেলেঙ্গানার ফতেনগর গেট রেল কলোনিতে এক দলিত মাদিগা পরিবারে ১৯৪৬ সালের ২ জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওয়াই. বি. সত্যনারায়ণ (ড. এলুকাতি বালাইয়া সত্যনারায়ণ)। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা আত্মকথা *My Father Baliah*। ২০২০ সালে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় *আমার বাবা বালাইয়া : একটি তেলেগু দলিত পরিবারের আত্মকথা* নামে। নব্বইয়ের দশকের কবি ও অনুবাদক শৌভিক দে সরকারের তরজমায়।

লেখক ওয়াই. বি. সত্যনারায়ণ ১৯৭১ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে নিরমালের সরকারি জুনিয়র কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘদিন হায়দ্রাবাদের ধর্মবন্ত কলেজে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। কাকতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের মতাদর্শে বিশ্বাসী বালাইয়া সত্যনারায়ণ নব্বই দশকের শুরু থেকে দলিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ২০০৬ সালের ১৪ অক্টোবর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি হায়দ্রাবাদের 'সেন্টার ফর দলিত স্টাডিজ'-এর সভাপতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিরাপদ, সম্মানীয় ও স্বচ্ছল অবস্থানে পৌঁছনোর পর কেন তিনি পিছন ফিরে দেখতে চাইলেন সেই সব অমানুষিক সংগ্রাম আর নিপীড়নের ইতিহাসকে এই প্রশ্ন হয়তো বা পাঠকের মনে তৈরি হতে পারে।

সেই সম্ভাবনা থেকেই লেখক বইটির প্রাক্‌কথন অংশের শেষে লিখেছেন-

> আমি আমার পরিবারের ইতিহাস গোড়া থেকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের উত্তর প্রজন্মের অনেকেই এই ইতিহাস জানে না এবং যে অবর্ণনীয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে সেটা তাঁরা জানেন না। এই বইয়ে আমি সেসব প্রতিকূলতা, লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছি, যাতে তারা জানতে পারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কী ধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের। আমি এসব কথা না লিখলে আমার পরবর্তী প্রজন্ম কোনদিনই জানতে পারবে না তাদের পারিবারিক ইতিহাসের কথা। আর আমাদের মতো দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরা, যারা আজ উন্নততর জীবনের খোঁজে নিজের অতীতকে ভুলে যেতে চাইছে, তারাও অতীতের সঙ্গে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাবে।[৭]

এই পারিবারিক জীবনীতে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাদিগা সম্প্রদায়ের দলিত পরিবারের জীবনযাত্রার বিবরণ নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে, যা এক হিসাবে দক্ষিণ ভারতের তেলেগুভাষী দলিত সমাজের সামাজিক ইতিহাস হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে পড়বে এই আবহাওয়াতেই বড়ো হয়ে উঠেছিলেন রোহিত ভেমুলা, তেলেঙ্গানার এক দলিত পরিবারে। শৈশবের একাকিত্ব ও পরবর্তী ছাত্রজীবনে বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মহত্যা করেন রোহিত ২০১৬ সালের ১৭ জানুয়ারি। তাঁর লেখা চিঠির একটি বাক্যেই লুকিয়ে ছিল দলিত সমাজের ঐতিহাসিক বিড়ম্বনার সংক্ষিপ্তসার— 'আমার জন্মই এক প্রাণনাশক দুর্ঘটনা।'

এরই পাশাপাশি যখন এক দলিত মাদিগা অর্থাৎ অচ্ছ্যুৎ চামার তাঁর আত্মজীবনীর শুরুতেই স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন -

> আমাদের ইতিহাস নিজেদেরই লেখার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণরা কোনো গল্পের শুরুতে যে লাইনটা লিখে এসেছে এতদিন, "একদা এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল..." সেই ঐতিহ্য শেষ হওয়া প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি উন্নততর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এই ইতিহাস শুধু আমার পরিবারেরই নয়, প্রতিটি দলিত এবং অ-দলিতেরও জানা প্রয়োজন।[৮]

আত্মকথাটি শুরু হয়েছে লেখকের পিতামহ নরসাইয়ার তৎকালীন হায়দ্রাবাদের নিজামকে এক জোড়া বাছুরের চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো উপহার দেওয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ একর জমি প্রাপ্তি ঘটনার মধ্য দিয়ে। আকস্মিক এই জমিপ্রাপ্তি নরসাইয়াকে একরাশ আনন্দের বদলে আশঙ্কার মুখে ঠেলে দেয়। ভাঙ্গপল্লীতে সেই সময় ভেলাম্মা সম্প্রদায়ের মানুষরা পুরুষাণুক্রমে জমিদারি করত। অচিরেই গ্রামের মুখিয়া দোরার হাভেলিতে নরসাইয়ার ডাক পড়ে।

> শালা কুত্তার বাচ্চা ছোটলোক চামার! কে তোকে বলেছিল সরকারকে ভেট দিয়ে জমি উপহার নিতে?[৯]

এই দোরা বলপূর্বক আটচল্লিশ একর জমি কেড়ে নিয়ে মাত্র দুই একর জমিতে চাষ আবাদের অনুমতি দেয় নরসাইয়াকে। সমাজের কোন অংশ ভূমিহীন? মনুবাদী সমাজের যে আদর্শ, সেই সমাজে চণ্ডাল এবং নিষাদ, দলিত, অচ্ছ্যুৎরা জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত। ঐতিহাসিকভাবে এই শ্রেণি ভূমিহীন। মুঘল যুগের জমি-করের নিয়ম পেরিয়ে যখন ঔপনিবেশিক শাসন যখন এই সমাজে প্রবেশ করে, ততদিনে প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে একটি বৃহৎ ভূমিহীন, পরাধীন, ভূমিদাস— দলিত শ্রমিক শ্রেণির জন্ম হয়ে গেছে। তাই বিষয়টা আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, নিজের কর্মদক্ষতায় পাওয়া নিজাম প্রদত্ত সেই জমি দোরাকে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন নরসাইয়া। কারণ নরসাইয়ের মতো অস্পৃশ্যরা দীর্ঘকাল ধরে জেনে এসেছেন যে, তাঁদের মতো ছোটোলোকরা জমিদার হলে ভগবান তাঁদের শাপ দিয়ে অন্ধ করে দেবেন।

ব্রিটিশ শাসনকালে আর্মি ছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট, বন্দর, খনি এবং বিভিন্ন কলকারখানায় প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া, অস্পৃশ্য

দলিত মানুষরা এইসব শ্রমসাধ্য, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগ দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল। অস্পৃশ্যতার নিদান দিয়ে সমাজ বহির্ভূত রাখার যে সংস্কার বজায় রেখেছিল বর্ণহিন্দুরা, তার থেকে প্রথমবারের মত কিছুটা হলেও তারা বেরিয়ে এসে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজের মূল স্রোতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। লেখকের তিন প্রজন্ম রেলওয়েতে চাকরি করে রেল কলোনিতে থেকেছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর শিক্ষাকে শুধুমাত্র অন্ন সংস্থানের সহায়ক হিসাবে দেখেননি, শতাব্দী ধরে চলে আসা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দলিতদের আত্মমর্যাদা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই লেখকের বাবা, একজন সামান্য চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হয়ে তাঁর সন্তানদের পড়াশোনা করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এলুকাতি পরিবারের আব্বাসায়লু আম্মা, নরসিংহ রাও, আনজাইয়া ও লেখকের অন্য ভাইরা কলেজের অধ্যাপনা পেশায় যোগদান করেন। তাঁরা তিন ভাই পিএইচ.ডি. করে ডক্টরেট হয়েছিলেন, যা অনেক শিক্ষিত পরিবারের কাছেও স্বপ্ন ছিল।

মাহার সম্প্রদায়ভুক্ত মারাঠী লেখক শরণকুমার লিম্বালের আত্মজীবনী *অক্করমাশী* বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'বেজন্মা' শিরোনামে বাংলা অনুবাদ করেছেন অনুরিমা চন্দ। আত্মকথার শুরুতে 'লেখকের কথা' অংশে লিম্বালে বলেছেন -

> আমার মা অস্পৃশ্য জনজাতি ভুক্ত আর বাবা একজন উচ্চবংশজাত ভারতবর্ষের আর পাঁচটা সুবিধাভোগী শ্রেণিভুক্তের একজন। একজন বড় হয়েছে কুঁড়ে ঘরে, অন্যজন প্রাসাদে। একজনের কাছে ছিল না একটুকরো জমি, অন্যজন জমিদার। তাদের ছেলে আমি, এক বেজন্মা। পরিত্যক্ত এবং অবৈধ — এই আমার পরিচয়। আমার মা-বাবার অনৈতিকতার সম্পর্ককে আমি ধর্ষণ ছাড়া আর কোন উপমা দেব জানি না। ... প্রত্যেক গ্রামেই একজন করে পাটিল আছে, যে অজস্র জমি জায়গার মালিক। এদের সবার অন্তত একটি করে রক্ষিতা থাকে। আমার এই জীবনকথা এই জন্যই লেখা, যে সবাই

জানুক এক বেশ্যার সন্তান হওয়ার কী যন্ত্রণা। একদিকে উচ্চবর্ণের মানুষেরা যারা আমাদের হেয় করে, অস্পৃশ্য গণ্য করে, অন্যদিকে আমাদের নিজের সমাজের সবাই, যারা আমাদের পর করে দেয় আক্করমাশী বলে।[১০]

আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক ঘরে বাইরে দ্বিমুখী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে পড়েন। গোপাল প্রধানের সঙ্গে কথোপকথনে, যার শিরোনাম– 'আমার বইকে আমি হাতিয়ার মনে করি', তিনি বলেছেন -

আমার মা এই আত্মকথা শোনার পর রেগে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমার মান সম্মান আমার ছেলে লোকজনের সামনে নিলাম করে দিয়েছে। আমার মা আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। পাঁচ-ছ বছর উনি আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আমার বাবা সর্দার ছিলেন, উনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিতে শুরু করেন, যে যে গ্রামে আমি থাকতে শুরু করেছিলাম, সেই সমস্ত গ্রামের লোকজন রেগে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে আমি তাদের গ্রামের বদনাম করছি আমি গ্রামে যেতে ভয় পেতে শুরু করি। অন্যদিকে যে আন্দোলনের জন্য আমি লিখেছিলাম সেই আন্দোলনের সবাই আমার উপর রেগে গেল, কারণ একজন দলিত মহিলা গ্রামের মোড়লের উপপত্নী, সেই কথা আমার লেখায় স্থান পায়, যা সমগ্র দলিত সমাজের বদনাম করেছিল বলে তারা মনে করে। তাদের কথা, আমাদের সমাজের সমস্ত মহিলা উপপত্নী নাকি? আমার তখন এক নিঃসঙ্গ জীবন, এক আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়ে গেছিলাম।[১১]

তাঁর আত্মজীবনী আসলে দুটি শ্রেণির সম্পর্কের কথা। উচ্চবর্ণের পুরুষতন্ত্র ও নিম্নবর্ণের নারীর অসহায়ত্বের কথা। নিম্নবর্ণের নারীর নিজেকে সমর্পণের, উচ্চবর্ণের ক্ষমতাশালী পুরুষকে বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গের গল্প। হিংসার সঙ্গে বিস্মৃতির গভীর সম্পর্ক আছে। মিলন কুন্দেরা তাঁর *The Book of Laughter and Forgetting* (১৯৭৮) বইতে এই বিস্মৃতির রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে এমন এক টোটালিটারিয়ান শাসনের কথা বলেন, যা গণ-বিস্মৃতি তৈরি করার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায়। এই পরিস্থিতিতে খোদ স্মৃতিই হয়ে ওঠে প্রতিরোধের একটি উপায়।

হিংসার স্মৃতির ধরনটাই এরকম যে, অনেক সময়েই যিনি যন্ত্রণা পেয়েছেন, স্বেচ্ছায় তিনি তা বিস্মৃত হয়েছেন। এ এমন একধরনের হিংসা, যার সঙ্গে লড়াই চলে স্মৃতির মধ্যে দিয়ে।

পরবর্তীকালে *অক্কারমাশী* জনপ্রিয় হয়। অনেক পুরস্কার লাভ করে। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে লেখক এক কথোপকথনে জানান —

> পরবর্তীতে পাঠকরা অক্কারমাশীকে মাথায় তুলে রাখলেন। পুরস্কার পেলাম অনেক। গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি নিজেই লোকজনদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সমাজের এবং জাতের ভাই সব, কেউ ধর্ষিতা হলে, কোনও নারী অপমানিতা হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমাদের আন্দোলনেরই অংশ। তার কথা সোচ্চারে বলা, সবার সামনে তুলে ধরে প্রতিবাদ জানানোটাই আমাদের কর্তব্য। আমরা এই বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। লিম্বালে এই সমাজেরই একজন লোক, এই সমাজেরই একজন নারীর সন্তান, যাঁর মাকে উচ্চবর্ণের পুরুষ উপপত্নী বানিয়ে রেখেছিল এবং এই কারণেই এই কথাগুলো শুধুমাত্র একজনের কথা নয়। এই বিষয়টিকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে আন্দোলন কখনোই সঠিক পথে এগিয়ে চলবে না।[১২]

এই উদ্দেশ্য নিয়ে আত্মজীবনী নামের সংরূপকে প্রতিরোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার করে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই শরণ কুমার লিম্বালে দ্বিধাহীন লেখনীতে নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধান করেছেন।

> আমার পর নাগি হয়, তারপর নির্মি, বাণী, সুনি, পমি, তাম্মা, ইন্দিরা, সিদ্রাম — কতগুলো সন্তান। একই গর্ভের একই রক্ত সেচে বেড়ে ওঠা এতগুলো প্রাণ। এক মা। কিন্তু পিতা ভিন্ন ভিন্ন। মাসামার বিঠ্ঠলের সঙ্গে তিনটি সন্তান ছিল। প্রথমে ভানুদাস, যে মারা যায়, তারপরে চন্দ্রকান্ত আর লক্ষণ। মায়ের কাছ থেকে এদের দুজনকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হনমন্তার বীজে আমার জন্ম হয়। কাকা, হান্নুরের যশবন্ত রাও, সিদ্রামাপ্পা পাটিলের থেকে হয় নাগি, নির্মলা, বনমালা, সুনন্দা, প্রমীলা, শ্রীকান্ত, ইন্দিরা এবং সিদ্রাম। কাকা এদের সবার জন্মপত্রে জাতি হিসেবে হিন্দু লিঙ্গায়েত বসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু গ্রামের একটি লিঙ্গায়েত আমাদের ছুঁত না। নিজের জাতের লোকেরাই

আমাদের স্বীকার করত না। এটাও যেন এক সমান্তরাল দলিত বস্তি। আমার পিতা লিঙ্গায়েত, তার পিতা ও পিতার পিতাও লিঙ্গায়েত, তাই আমিও লিঙ্গায়েত। আমার মা অচ্ছ্যুত, মাহার, তাই আমিও দলিত, অচ্ছ্যুৎ! কিন্তু জন্ম থেকে আমায় বড় করেছে আমার দাদু, মানে মাহমুদ দস্তগীর জমাদার, এক মুসলমান। তাই আমিও মুসলমান! তাহলে কেন আমার দাদুর মমতা আমার উপরে দাবি রাখতে পারে না তার ধর্মের? আমি কি সবর্ণ? না! কারণ আমার মা অস্পৃশ্য। আমি কি অস্পৃশ্য? না! কারণ আমার পিতা সবর্ণ। আমি জরাসন্ধের মতো। এই গ্রাম এবং গ্রামের প্রান্তে, দু'দিকেই বিভাজিত। তাহলে আমি কে? আমার নাড়ির উৎস কার থেকে?[১৩]

উত্তরপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রাম 'বরলা'য় অচ্ছ্যুৎ চুহড় জাতে জন্মেছিল যে বালকটি, উচ্চবর্ণের মানুষের তাচ্ছিল্য আর অত্যাচার সহ্য করে, প্রতি পদক্ষেপে বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, নিজের সমাজের অসহ্য নোংরা পরিবেশ-পরিস্থিতি-কুসংস্কার কাটিয়ে উঠে পরিণত বয়সে হয়ে উঠলেন এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ওমপ্রকাশ বাল্মিকী। মাতৃভাষা হিন্দিতে লিপিবদ্ধ করলেন সেই দিনগুলির ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা— আত্মকাহিনি 'জুঠন'। বাংলায় যার অর্থ এঁটো বা উচ্ছিষ্ট। লেখক তাঁর আত্মকথায় বসবাসের পরিবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন -

চারিদিকেই ময়লা জমে থাকত। এত দুর্গন্ধ যে এক মিনিটেই দম বন্ধ হয়ে যাবে। শুয়োর, উলঙ্গ বাচ্চা, কুকুর আর রোজকার ঝগড়াঝাঁটি – এই ছিল ওই গলিগুলোর পরিবেশ। ওখানেই কেটেছে আমার ছেলেবেলা। বর্ণ-ব্যবস্থাকে যাঁরা আদর্শ বলে মনে করেন তাঁদের যদি কিছুদিন এই পরিবেশে থাকতে হয় তবে তাদের মত পাল্টে যাবে।[১৪]

দলিত আত্মজীবনীগুলিতে দেখা যায় কায়িক পরিশ্রমের কাজ অথবা সমাজে যে সব কাজকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় যেমন বর্জ্য পরিষ্কার অথবা মড়া পোড়ানো যেগুলি উচ্চবর্ণের মানুষেরা করতে চান না, সেগুলিকে অন্ত্যজ মানুষকে দিয়ে করানো হয়, অথচ

তাদের সবসময় মূল সমাজের বাইরে রাখা হয় এবং তাদের থেকে মানুষের ন্যূণতম অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়। আম্বেদকর তাঁর প্রখ্যাত তত্ত্বে বলেছেন -

> যখন মানুষ যাযাবর থেকে স্থিতিশীল সমাজের দিকে এগোচ্ছিল, তখন বিভিন্ন উপজাতি নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এবং কিছু কিছু জাতির অনেক মানুষ মারা গিয়ে কয়েকজন মাত্র পড়ে থাকে। এই ভাঙা জাতের মানুষরা পরাধীন হয় বিজেতাদের কাছে, কিন্তু যেহেতু প্রাচীন সমাজে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রচলন ছিল না তাই রক্তগত বিশুদ্ধতার কারণে এই জাতভাঙা মানুষদের মূল সমাজে স্থান দেওয়া হয়নি। তাদের রাখা হয় গ্রামের বাইরে। তবে তাদের বেঁচে থাকার ন্যূণতম উপাদান হিসেবে যে সাহায্য মূল সমাজ করত, তার জন্য বিবিধ অবাঞ্ছিত ও অপরিষ্কার কাজের জন্য এই মানুষের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা হত। তাদের বহিরাগত ও অধিকারহীন অবস্থা বোঝানোর জন্য ছিন্ন পোষাক ও উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণের রীতি ছিল। এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা প্রাচীনকাল থেকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ হয়ে বর্তমান ভারতবর্ষেও সমান ভাবে সঞ্চারিত।[১৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আম্বেদকর তাঁর অচ্ছুৎ বিষয়ে লেখা 'The Untoucheables: Where They and Why They Became Untouchables?' নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন যে, অচ্ছুৎ মানুষদের অন্তজ বলার কারণ প্রধাণত তারা গ্রামের বাইরে স্থান পেত। মূল সমাজে তাদের স্থান ছিল না। সাম্প্রতিক গবেষণায় জোয়েল লী তাঁর 'Odor Order : How Caste is Inscribed in Space and Sensoria in Comparative Studies of South Africa and the Middle East' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন দলিত মানুষের বাসস্থান সাধারণত দুর্গন্ধযুক্ত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হয়। গোপাল গুরু তাঁর 'Experience, Space and Justice in the cracked Mirror : An Indian Debate on Experience Theory' প্রবন্ধেও দলিত মানুষের এই স্থানিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যারা আম্বেদরকের ভাষায় 'বহিষ্কৃত ভারত'।

স্বাধীন ভারতবর্ষেও লেখাপড়া শেখার চেষ্টায় মাস্টারের আদেশে যাঁকে সারা স্কুল আর স্কুলের মাঠ ঝাঁট দিতে হয়, তিনি লেখেন -

> তৃতীয় দিন আমি ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ বসে পড়লুম। খানিকবাদে তাঁর হুঙ্কার শুনতে পেলুম – আরে ওই চুহড়ে, মাদারচোদ – কোথায় ঢুকে গেলি... নিজের মায়ের...? তাঁর হুঙ্কার শুনে আমি থরথর করে কাঁপছিলুম। এক ত্যাগী ছেলে চিৎকার করে বলল — 'মাস্‌সাব, ও ওই কোণে বসে।'
>
> হেডমাস্টার লাফিয়ে উঠে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। তার আঙুলগুলো আমার ঘাড়ে খুব জোরে চেপে বসেছিল ঠিক যেমন করে নেকড়ে ছাগল বাচ্চা তুলে নিয়ে যায়। ক্লাসঘর থেকে হেঁচকা টানে এনে বাইরের বারান্দায় ছুঁড়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন – 'যা, সারা মাঠটা ঝাঁট দে... নয়তো পোঁদে লঙ্কা ঘষে স্কুল থেকে বের করে দেব।'[১৬]

বইটির শুরুতে 'লেখকের কথা' অংশে ওমপ্রকাশ বাল্মিকী লিখেছেন বইটি বেরনোর পরের প্রতিক্রিয়ার কথা।

> এক নিকট আত্মীয় ভয়ও পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন — 'আত্মকথা লিখে যেন নিজের প্রতিষ্ঠা খোয়াবেন না।'
>
> যা সত্য তা সবার সামনে তুলে ধরতে সংকোচ কেন? যিনি একথা বলেন – 'আমাদের এখানে এমন হয় না।' অর্থাৎ নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার ইচ্ছে — তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন, এই যন্ত্রণার দংশন সেই জানে যাকে এটা সইতে হয়েছে।[১৭]

কন্নড় দলিত সাহিত্যিক সিদ্দালিঙ্গাইয়ের কন্নড় ভাষায় লেখা আত্মজীবনী 'ওরু কেরি'-র ইংরেজি অনুবাদ নবায়না প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয় – *A Word with You, World: The Autobiography of a Poet* (২০১৩) নামে। অনুবাদক এস. আর. রামকৃষ্ণ। অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিকের সম্পাদনায় *আমারও কিছু বলার আছে : একজন কন্নড় দলিত কবির আত্মজীবনী* নামে অনূদিত হয়।

সিদ্দালিঙ্গাইয়া একজন প্রথম সারির কন্নড় কবি, নাট্যকার, সমাজকর্মী, শিক্ষক ও রাজনীতিক। সামান্য এক ভাগচাষি পরিবারের দারিদ্র্যনিপীড়িত জীবন থেকে তাঁর অধ্যাপক হয়ে ওঠা। তাঁর আত্মজীবনী শেষ পঞ্চাশ বছরের কন্নড় সাহিত্য, সাংস্কৃতিক জীবন ও রাজনীতি সম্বন্ধে একটি টীকাভাষ্যও বটে। একই সঙ্গে মার্কস, আম্বেদকর ও পেরিয়ারের দর্শনে তাঁর আস্থা ও সেই পথে আন্দোলন নির্মাণ করা, দলিত মুক্তি সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) ও স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার ভূমিকা উল্লেখিত তাঁর আত্মজীবনীতে। দলিত বাঞ্ডয়া আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি কন্নড় ভাষায় দলিত সাহিত্যের সূচনা করেন। ১৯৮৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি কর্ণাটক বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

ছাত্রজীবনে খরচ চালানোর জন্য লেখক নানা ধরনের কাজ করেছেন। আত্মজীবনীর চতুর্থ অধ্যায়ে সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন -

> আবর্জনাগুলো গর্তে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় যাতে কোনো পরিচিত ব্যক্তি আমায় চিনতে না পারে সেই ভয়ে দৌড় লাগাতাম। তারপরেও ঝুঁকি এড়াতে আমি মুখে কালি মেখে নিশ্চিন্ত হতাম যে আমাকে আর চেনা যাচ্ছে কি না।[১৮]

প্রথম বেতন থেকে তিনি আম্বেদকরের লেখা *অস্পৃশ্যারু* (*The Untouchables, Who Where They and Why they Became Untouchables*) বইটি কিনেছিলেন, যা ছিল তাঁর ভবিষ্যত জীবনের গতিপথ নির্ধারণকারী সিদ্ধান্ত।

পরবর্তীকালে সিদ্দালিঙ্গাইয়া দলিত সংঘর্ষ সমিতি (DSS) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাহিত্য কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, কীভাবে কবিতায়, স্লোগানে

স্লোগানে অত্যাচারিত মানুষদের সেতুবন্ধ তৈরি করে, আলোচ্য আত্মজীবনীটির প্রতিটি অধ্যায়ে তারই ইতিহাস লিপিবদ্ধ।

লাতুর জেলার ধনেগাঁওতে উচল্যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লক্ষণ গায়কয়াড়-এর আত্মকথন *উচল্যা* মারাঠি ভাষায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বই (বইটির মারাঠি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন মাধুরী সিংহ)। আত্মকথনের শুরুতে 'লেখকের কথা' অংশে লিখছেন -

> আমি যে সমাজে জন্মেছি, সে সমাজ তথাকথিত বর্ণব্যবস্থার দিক থেকে অপাংক্তেয় বলে গণ্য। একশো নয় হাজার বছরের বর্ণব্যবস্থায় আমরা সর্বসাধারণের কাছে মানুষ বলে স্বীকৃত নই। আমাদের সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজ সরকার জন্মগত অপরাধী বলে ছাপ মেরে দিয়েছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণরা অপরাধী বলে আমাদের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করেছে, এখনও তাই করে চলেছে। আমাদের জীবন ধারণের সমস্ত উপায় বন্ধ বলেই চুরি করে বাঁচতে হয়।[১৯]

জন্তু জানোয়ারদের যেমন কোথাও বিক্রি করতে নিয়ে গেলে, গাঁয়ের মোড়লের দাখিলা লাগে, তেমনি ওই জন্তু জানোয়ারের মতোই উচল্যাদের দাখিলা লাগে— এই কথাগুলি বলেছেন লক্ষণ গায়কয়াড় তাঁর আত্মজীবনী উপন্যাস 'উচল্যা'য়। 'উচল্যা' এক আদিবাসী সম্প্রদায়, যাকে বলা যেতে পারে জন্মলগ্ন থেকে অপরাধী (বর্ন ক্রিমিন্যাল)। কিছু নিম্নবর্গের মানুষ ব্রিটিশ রাজের কল্যাণে **১৮৭১** সালে জন্মগত অপরাধী সম্প্রদায়ের ছাপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটা মনুষ্য সমাজ ভ্রূণ অবস্থা থেকেই অপরাধী। অপরাধ না করলেও সে অপরাধী। প্রশাসন, রাজনৈতিক কর্মী, পুলিশ, এমনকী গ্রামের মাতব্বর— সকলের কাছেই তারা বিনা অপরাধে অপরাধী। পাতার পর পাতায় লেখকের বর্ণনায় ফুটে ওঠে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া লাঞ্ছনা, অপমানের কথা। একটি ঘটনায় দেখি,

লাতুর অঞ্চলের জায়বা নামের একজন, যিনি অল্প জমি কিনে চাষবাস করে কায়িক শ্রমে জীবন কাটায়। একদিন গ্রামের কোথাও পকেটমার হওয়ায় এবং পকেটমারকে খুঁজে না পাওয়ায়, ওপরওয়ালার চাপে পুলিশ পকেট কাটার দায়ে জায়বাকে গ্রেপ্তার করে অকথ্য অত্যাচার চালায়। এই পীড়ন থেকে তার বউও বাদ যায় না। অত্যাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তারা মরিয়া হয়ে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। আশেপাশে যারা ক্ষেতে কাজ করছিল, তারা এই দৃশ্য দেখে ছুটে আসে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে একজন বলে, 'হুজুর, ওরা চোর নয়'। পরে লেখক পুলিশের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারে যে, আসল পকেটমারকে খুঁজে না পাওয়া উপরওয়ালার চাপে পুলিশ জায়েবাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ, প্রশাসন, গ্রামের মাতব্বররা এইসব মানুষদের এই চুরিবৃত্তি থেকে উত্তরণের সুযোগ দেয় না। লেখক উস্থানাবাদের অসহায় ছেলেদের লাতুরে নিয়ে গিয়ে সুতো কলে কাজ দিলে তারা বেশ কিছুদিন নিরুপদ্রবে কাজ করলেও শেষরক্ষা হয় না। যেহেতু তারা উস্থানাবাদের ছেলে হয়ে লাতুরে কাজ করছে এবং যেহেতু তারা পারিধি সম্প্রদায়ের অর্থাৎ উচল্যা সম্প্রদায়ের শরিক, তাই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া আদিবাসী। অতএব চুরি না করলেও চুরির মতলবে এসেছে কিনা কে জানে! এইরকম আরও কত মর্মান্তিক নির্যাতন। হীরাবাঈ তার সদ্যোজাত শিশুকে বাঁচানোর জন্য জন্মনিরোধক অস্ত্রোপচার করিয়ে পাওয়া দু'শো টাকা দিয়ে জোয়ার বোনে। জোয়ার, শিশু সব সমত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কারণ একটাই, তারা জন্মগতভাবে অপরাধী তকমা পাওয়া সম্প্রদায়। লেখক একাধিকবার বিনা কারণে নিজের মা, মাতৃস্থানীয়াদের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করেছেন। বিনা অপরাধে জাত-পঞ্চায়েতের বিধানে গ্রামের ঠাসা লোকের মাঝে, স্বামীর সামনে লেখকের মায়ের মাথা মুড়োনো হয়। মা মুখে কাপড় ঠুসে কান্না চাপেন, এতেও শেষ হয় না। তাঁর সেই ন্যাড়া

মাথায় বেশ করে সিঁদুর লাগিয়ে গ্রামের উচ্চবর্ণ মাতব্বররা শুয়োরের মাংস ভোজন করতে করতে পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠে। লেখকের অসহায় প্রতিবন্ধী বাবা যখন তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছেলেকে জানান যে, 'অনেক দূর লেখাপড়া শেখো, জীবনে বড় হও'। লেখক আর পিছনে ফিরে তাকাননি। বইটি লেখার জন্য তাঁকেও জাত-পঞ্চায়েতের সামনে দাঁড়াতে হয়; তাঁদের বৃত্তির গোপন কৌশল লোকসাধারণকে জানানোর অপরাধে। পরবর্তীকালে তিনি গড়ে তোলেন তাঁদেরই মতো মানুষদের জন্য 'ভ্রাম্যমান বিমুক্ত আদিবাসী সংগঠন'। লেখক স্বপ্ন দেখেন শোষণমুক্ত সমাজে তাঁর সম্প্রদায় সুস্থভাবে বাঁচবে একদিন। লক্ষ্মণ গায়কোয়াড় তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন *উচল্যা* লেখার পেছনে অপর এক বিখ্যাত দলিত লেখক লক্ষ্মণ মানের আত্মজীবনী *উপরা*-র অনুপ্রেণার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'উপরা' আত্মজীবনীটি সাহিত্য অকাদেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত। 'অক্করমশী' আত্মকথার লেখক শরণকুমার লিম্বালে 'উচ্যলা'র নির্মাণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। দলিত সাহিত্য সম্ভার এইভাবেই সম্মিলিত আন্দোলনের আতুঁড়ঘর হয়ে উঠেছে।

দলিত সমাজের ড. কে. সত্যনারায়ণ ও প্রফেসর সুসি থারু মিলিতভাবে সম্পাদনা করেছেন *নো আলফাবেট ইন সাইট : নিউ দলিত রাইটিংস ফ্রম সাউথ ইণ্ডিয়া* (২০১১)। তামিল ও মালয়ালাম ভাষায় দলিত লেখকদের বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেছেন দলিত লেখকদের লেখাপত্র— তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'পেঙ্গুইন' প্রকাশনা থেকে বের হয়েছে। একই ভাবে আলোচ্য সম্পাদকদ্বয় কন্নড় ভাষার দলিত সাহিত্য নিয়ে এবং তেলেগু ভাষার দলিত সাহিত্য নিয়ে 'হারপার কলিন্স'এর মত বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে *from those stubs, steel nibs are sprouting: New Dalit Writing from South India* (২০১৩)।

মালয়ালাম ভাষায় একখানি আত্মজীবনী লিখেছিলেন এম কুনহামান। ইংরেজি তরজমায় যার নাম Dissent। কুনহামান ছিলেন এক দলিত, হতদরিদ্র দিনমজুর মা-বাবার সন্তান। তাঁর আগে কেরলের দলিত জনগোষ্ঠী থেকে মাত্র একজনই পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। তিনি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন। তবে দু'জনেই দলিত হলেও এই দুইজন মালয়ালির সামাজিক অবস্থানগত ফারাক ছিল বিস্তর। এই আপোষহীন, স্পষ্টবাক ব্যক্তি মানুষটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার কথা ভাবাই যাবে না কেরলের বিশেষ প্রেক্ষিতটি বাদ দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কেরল সফরে সেখানকার জাতপাতের অবস্থা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ যেন পাগলা গারদ'। দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতেই প্রাণপাত করেছেন তাঁর দিনমজুর বাবা-মা। মজুরের কাজ প্রায়ই জোটে না। ফলে চেয়েচিন্তে গুজরান। সঙ্গে একরাশ অপমান। গৃহস্থবাড়ির বাইরে মাটিতে খোঁদল করে কলাপাতা রেখে অপেক্ষা করা। কখন গৃহকর্ত্রী এক বাটি লপসি ঢেলে দেবে সেখানে। স্কুলের দিনগুলিতে প্রধান সঙ্গী খিদে আর খিদে। লপসি না জুটলে দাদা দুটো কাঁচা আম এনে দিত। তাই খেয়ে বাকি পেট জল দিয়ে ভরে আবার ক্লাসে। শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'বই আনিসনি কেন?' উত্তর, বই নেই। শিক্ষকের কটাক্ষ, 'লপসির লোভেই তাহলে স্কুলে আসা'। সেদিন লপসি বিতরণের সময় পালিয়ে দূরে কাঁঠাল গাছের নীচে বসে থাকলেন। তীব্র অভিমান আর খিদের আগুন নিয়ে। পরবর্তীকালে উপাচার্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী; বস্তুত একাধিক মুখ্যমন্ত্রী দেখা হলে কাউকেই দু'কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েননি তিনি। সেইসব বাদ-প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও রয়েছে বইটি জুড়ে।

ক্রমবিন্যাস অনুসারে কেরলে হিন্দুদের মোটামুটি তিনটি ধাপে ফেলা যায়। উপরের ধাপে নাম্বুদ্রি এবং নায়াররা। তারপর দু'রকম জাতি যাঁরা উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য

ছিলেন। যাদের মধ্যে আবার উপরে ইরাভা এবং নীচে পুলায়া, পারায়া চেরুমার ইত্যাদি। এই ইরাভার সঙ্গে তৃতীয় এবং নিম্নতম ধাপের পুলায়া, পারায়াদের পার্থক্যের ইতিহাস অনেকটা আমদের নমঃশূদ্রর সঙ্গে বাগদি-বাউরিদের পার্থক্যের মতো। নমঃশূদ্রদের যেমন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর, এরাভাদের তেমন শ্রীনারায়ণ গুরু এবং তাঁর অনুগামীদের সংগঠন— শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন (এস.এন.ডি.পি.) যোগম্। উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য ছিল শিক্ষার উন্নতি, স্বক্ষমতা। প্রতিস্পর্ধী রাজনীতির বাগধারা নির্মাণ করতে হলে যে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন, এটা বুঝেছিলেন এঁরা। এস.এন.ডি.পি. যোগমের প্রথম সেক্রেটারি হয়েছিলেন কলকাতায় পড়াশোনা করা মালয়ালাম ভাষার প্রথম আধুনিক গীতিকবি কুমারন আসন। ইরাভারা সংখ্যায় ভারি। বেশিরভাগই ছিল কৃষক। শিক্ষার সুযোগ পেয়ে পরে বিভিন্ন পেশায় ও উচ্চপদে আসীন হয় তারা। কেরলের রাজনীতিতে এদের প্রভূত গুরুত্ব। কেরল সিপিএম-এর দুই উচ্চতম ব্যক্তিত্ব কে.আর. গৌরী এবং ভি.এস. অচ্যুতানন্দের উত্থান এই ইরাভাদের সংগঠিত শক্তির ফলে।

এম. কুনহামান যখন স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়েন, তখন একদিন শিক্ষক বোর্ডে কী একটা লিখে তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলেন, ‘এই পানম, বল।’ ‘পানম’ তাঁর জাত নাম। এইরকম কয়েকবার শোনার পর আর থাকতে না পেরে বালক কুনহামান বলেন, ‘স্যার আমার জাতনাম ধরে ডাকবেন না; আমাকে কুনহামান বলবেন।’ এই কারণে অমানবিক প্রহার জুটেছিল। পরবর্তী জীবনে এই মেধাবী ছাত্রটি অর্থনীতিতে পিএইচ.ডি. করে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ২৭ বছর কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর ২০০৬ সালে টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সেস-এ যোগ দেন। মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য পদ থেকে মতবিরোধের কারণে পদত্যাগ

করেন। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ কর্মকাণ্ডে কিংবা সেমিনার কনফারেন্সে সর্বদাই 'অস্বস্তিকর' পরিস্থিতির কারণ হয়ে উঠেছেন তিনি। সেমিনারে পেপার পড়া শেষ করতে পারেননি ক্ষিপ্ত শ্রোতাদের বাধায়। কিন্তু উচ্চবর্ণের সমাজে পছন্দসই ব্যক্তি হওয়ার কোনো দায় অনুভব করেননি। আজীবন নিজ যোগ্যতায় অ্যাকাডেমিক জগতে দাপটের সঙ্গে বিচরণ করলেও প্রাতিষ্ঠানিক মূলধারা তাঁকে উপযোজিত করে নিতে পারেনি।

কেরলে অধিক সংখ্যায় প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের উপস্থিতি দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কারণ উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে দলিতদের স্থান ছিল না। অস্পৃশ্য এবং অদ্রষ্টব্য জাতের মানুষদের কাজ জোটানোই মুশকিল ছিল। অতএব ভিক্ষাই ছিল জীবিকা। অদ্ভুতভাবে ভিক্ষা চাইত তারা। গৃহস্থবাড়ির বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখে তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ করত, তা শুনে বাড়ির কেউ নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার রেখে যেত।

কুনহামান যখন স্কুলে যেতে শুরু করেছেন, তখন কেরলের মানুষ ভারতের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার দেখে ফেলেছে। যাঁরা মনে করেন কেরলের যাবতীয় সমাজ সংস্কার বামপন্থী আন্দোলনের ফসল, কুনহামান তাঁদেরও অসন্তুষ্টির কারণ হবেন। বামপন্থা যে প্রথাগত বৈষম্যকে তেমন কমাতে পারেনি, উচ্চবর্ণের ক্ষমতার দাপট যে বামপন্থায়ও ঢুকে আছে, আলোচ্য আত্মজীবনী জুড়ে একাধিকবার সেই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণের মানুষ এখন কিছুটা ক্ষমতা পেয়েছে যা দিয়ে তারা উচ্চবর্ণের বিরোধিতা করতে পারে, দর কষাকষি করতে পারেদ। কিন্তু তারা জাত ব্যবস্থার মূলোৎপাটনের জন্য ভাবে না। অর্থনৈতিকভাবে উচ্চশ্রেণিতে প্রবেশ করে,

রাজনীতিতে প্রবেশ করে, তারা যেন জাত ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখতেই আগ্রহী। কারণ তাতে তাদেরই লাভ। দলিত রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল জাত-ব্যবস্থাটিকেই নির্মূল করা। তিনি এই প্রসঙ্গে এরাভাদ্রকেও বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, তিনি সংরক্ষণ-বিরোধী। সংরক্ষণ ব্যবস্থা দলিতদের একাংশের কাছে উপরে ওঠার যে সুযোগ এনে দিয়েছে, এটা সংরক্ষণ না থাকলে হত না। কুনহামান মনে করতেন কে আর নারায়ণ ছিলেন 'ক্রিমি লেয়ার'-ভুক্ত, মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য থেকে সরে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান তিনি কখনও নেননি।[২০]

হিন্দি ভাষায় লেখা ড. লক্ষণ যাদবের আত্মজীবনীর নাম *প্রোফেসর কী ডাইরি* (২০২৪)। কুড়ি দিনে এই বইটির ২৬ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। অত্যন্ত সাহসী এই লেখাটি লক্ষণ সমর্পণ করেছেন রোহিত ভেমুলা ও তাঁরই মতো অগণিত অপূর্ণ সম্ভাবনাকে। বলাই বাহুল্য, লক্ষণ পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মানুষ। লক্ষণ যাদব ১৪ বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি কলেজে অ্যাডহক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার পর কর্মচ্যূত হন। অসামান্য এই বেস্ট সেলারটি তাঁর দিনলিপি। একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পড়াশোনা করে মা, বাবা, ভাই, বোন সকলের স্বপ্নের দায় নিয়ে তিনি দিল্লিতে আসেন। পড়াশোনা করেন। সোনার মেডেল পান। গবেষণা শুরু করেন এবং একটি গোটা পরিবারের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার পথে এগিয়ে যান। সেই স্বপ্ন আর তার পরিণতি ধরা আছে তাঁর এই ১৪ বছরের কাহিনিতে। বইটির একটি উপশিরোনামের বাংলা তরজমা করলে দাঁড়ায় 'উচ্চ শিক্ষার না বলা কাহিনি'।

লক্ষণ যাদব তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখেছেন, ‘সচেতন নাগরিক হওয়ার শর্ত এই যে আপনি সেই সত্যকে জানেন, যা আসলে লুকিয়ে রাখা আছে। সেই সত্য যাকে শুধুই মেনে নেওয়া হয়।’ তিনি এই ভূমিকাটি লিখেছেন এদেশের দলিত নারী-শিক্ষার পথিকৃৎ সাবিত্রী বাঈ ফুলের জন্মদিনে। তিনি আত্মকথনে লিখেছেন, এদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটশনে আছে। তাকে অস্থায়ী শিক্ষকের অক্সিজেন দিয়ে চালু রাখা আছে। তেমনি একজন অস্থায়ী শিক্ষক ছিলেন লক্ষণ যাদব। আত্মকথার অভিজ্ঞতাগুলির আনাচে কানাচে মিশে আছে ইউনিভার্সিটি চত্বরে ভেসে থাকা জাতিবিদ্বেষমূলক রাজনীতি। অস্থায়ী শিক্ষকের প্রতি আচরণ এবং স্থায়ী শিক্ষকদের অদ্ভুত ভোগবাদী জীবন। দিল্লির জাকির হোসেন কলেজের অ্যাডহক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর লক্ষণ যাদবের ‘রাতে শুয়ে শুয়ে মনে পড়ত সবাই বলেছে একটা লক্ষণ যাদব আমাদের এত তামাশা করছে, ভুলেও আর কোনো যাদবকে এই সিস্টেমে ঢুকতে দিও না।’ এমনকি সংঘ পরিবারের পায়ে আত্মসমর্পণ করলেও ভাগ্য খোলে না। সঙ্গী হওয়ার জন্য কিন্তু সবর্ণ হওয়া সৌভাগ্য। ইন্টারভিউ দিতে দিতে ক্লান্ত একজন বলেন, ‘আমাদের এখানে জাত হল প্যারাসিটামল। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী সব রাজনীতিতেই এই ওষুধের প্রবল ব্যবহার আছে।’ তাঁর এক সহকর্মীই একদিন বলেছিলেন এর জন্য তো লালু-মুলায়ম আছে। একে অখিলেশ যাদব বা তেজস্বী যাদব চাকরি দেবে। একজন অধ্যাপক যখন এই কথা বলেন, তখন ভারতে নিপীড়িতের জাত-পরিচিতি নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। লক্ষণ যাদব ছাড়া বাকি সবাই স্থায়ী পদ পায়। শেষ দিনে লক্ষণকে এই মন্তব্য শুনতে হয়, ‘বলবে আবার চাকরিও নেবে’। লক্ষণ এই দেশের

সেই ইতিহাসের অংশীদার হয়ে যান, যেখানে নীচু জাতির লোক মুখ খুললেই সে মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়ার বিধান আছে। বেশি বললে জিভ ছিঁড়ে ফেলার আদেশ।

আলোচ্য লেখকের কর্মজীবন ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ হয়। তারিখটা এই দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আম্বেদকরের মৃত্যু দিন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন। কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের অনেক কারণ ছিল। তিনি তাঁদের কাছে সংঘবিরোধী, বামপন্থী, আপোষ না মানা, নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা একজন, যাঁকে নিয়ে ভবিষ্যতে সমস্যা হবে। ব্যবস্থা সবসময়ই চায় একনায়কতন্ত্রের কাছে ব্যক্তি মানুষের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ। আত্মকথাটির শেষ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে লক্ষণ যাদবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির সারংসার— মা, বাবা, কাকা, ভাই, বোন, দাদি, পরদাদা, যাদের বংশে কেউ প্রথমবার অধ্যাপনা করছে, তপ্ত লু-তে দুপুরের গোরু, মোষ চরানো, বৃষ্টিতে ভিজে ধান পোঁতা, মধ্যরাতে গমের খেতে জল দেওয়া সেই প্রজন্ম হয়তো কোনো বড়ো স্বপ্ন দেখেনি, কিন্তু চেষ্টা করেছে, একটা টাকা বাঁচলেও তা দিয়ে সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়েছে। ভেবেছে একমাত্র শিক্ষাই দাসত্বের শিকল ভাঙতে পারবে। তিনি জানেন তাঁর উপর বহু শতাব্দীর শ্রম, রক্ত, ঘামের ঋণ আছে। শিক্ষাই পারে সেই ঋণ শোধ করতে।

লক্ষণ যাদবের চোদ্দ বছরের অধ্যাপনা জীবন সহজ ছিল না। তার অন্যতম কারণ শিক্ষক হিসাবে তাঁর দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা। একজন পশ্চাৎপদ জাতির অস্থায়ী শিক্ষক, কেন তিনি দক্ষ হবেন? তিনি তো চলবেন মাথা নীচু করে, সকলের বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ সহ্য করে। সর্বোপরি ঊর্ধ্বতনকে তোয়াজ করে। ভারতের বর্ণব্যবস্থার জটিলতায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যেও ছোটো-বড়োর বিভেদ আছে। ভিতরকার এই অনৈক্যের কারণেই সফল

আন্দোলন শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধতে পারেনি, লক্ষণ যাদবের চোদ্দ বছরেই সরকারের তরফে নিয়োগের ২০০ পয়েন্ট রোস্টার নামিয়ে ১৩ পয়েন্ট করা হয়, যাতে সংরক্ষিত পদে প্রার্থীর সংখ্যা কমানো যায়। এই নিয়ে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এটিকে নাকচ করে দেয়। এই সময়েই নাগরিকপঞ্জি ও সিএএ নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। জামিয়াতে দিল্লি পুলিশের হানা, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের আন্দোলন, এর সঙ্গেই অ্যাডহকের স্থায়ীকরণের লড়াই তো আছেই, লক্ষণ যাদব দেখেছেন এক অ্যাডহক অধ্যাপক আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার অজুহাত হিসাবে বলেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গোটা দেশ তো রাস্তায় নামেনি। আবার কেউ কেউ সেই আপ্তবাক্যটি বলেছেন, আমি শিক্ষক, আই হেট পলিটিক্স। আত্মজীবনীকার দেখেছেন এই বাক্যবন্ধটি সুচতুরভাবে তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতিবিমুখ তৈরি করেছে, সেটাও এক ধরনের রাজনীতি। স্পষ্টবক্তা লক্ষণ এতটাই শাসকের চক্ষুশূল যে তাঁর সহকর্মী, স্বজাতি অনুযোগ করেছেন যে, সে যাদব হওয়ার জন্য দুঃখিত; কারণ তাঁর ও লক্ষণের পদবি এক। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য ছিল অনেকটা এইরকম, ‘তোমার এই সব বিপ্লবের জন্য আমাদের মতো লোকের ক্ষতি হয়। আমাদের কেউ চাকরি দেবে না।’ আর. বি. মোরের জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর পুত্র সত্যেন্দ্র মোরে লিখেছেন, সেই সময় মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে নিরক্ষর যেকোন মানুষকে সই করতে গেলে টিপ ছাপ নয়, একটি বিশেষ প্রতীক আঁকতে হত। যেমন মাহারদের ক্ষেত্রে লাঠি (যেহেতু তারা গ্রাম পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল), চামারদের ক্ষেত্রে সূচ, কুনবি (কৃষক)-দের ক্ষেত্রে লাঙল ইত্যাদি। অর্থাৎ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে যে জাতি যত উঁচুতে অবস্থান করে, সেই জাতির লোকেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা তত উঁচু।[২১]

ড. আম্বেদকর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মর্মবস্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন বলেই বাবাসাহেব তাঁর দল ছেড়ে মোরের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্তকে বিন্দুমাত্র খাটো করেননি। শুধু যে দুশ্চিন্তাটির কথা তিনি মোরের কাছে রেখেছিলেন সেটি হল তাঁর এই অদম্য সাহস ও সততাকে কমিউনিস্ট পার্টি মূল্য দেবে তো?

বাবাসাহেব আম্বেদকরের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মোরে বলেছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির লড়াই ছাড়া দলিত মুক্তি অসম্ভব। আবার যেহেতু শ্রমজীবীদের মধ্যেও দলিতরা তুলনায় অনেক বেশি শোষিত, এবং তারাই শ্রমজীবীদের সিংহভাগ অংশ, তাই স্বতন্ত্র দলিত মুক্তির আন্দোলন ছাড়া শ্রমজীবী আন্দোলন তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি বলেছিলেন বিভিন্ন কারণে কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। তাই তাঁর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান আসলে এই দুই আন্দোলনের মধ্যে সেতুর কাজ করবে। তিনি বাবাসাহেবকে কথা দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও তিনি দলিত আন্দোলনের রাস্তা কখনও ছাড়বেন না। দলিত পরিচিতির বেশ কিছু কর্মী কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বাবাজি মোরেই ভারতের প্রথম দলিত, যিনি দলিত আন্দোলনের সক্রিয় নেতা হয়েও সচেতনভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

রামচন্দ্র বাবাজি মোরের চিন্তা ও দর্শন মনে করায় পরবর্তীকালের একজন অন্যতম দলিত চিন্তাবিদ আনন্দ তেলতুম্বডের বহুল আলোচিত বই *Republic of Caste : Thinking Inequality in the time of Neo-Liberal Hindutva*–এর কথা। ২০১৮-য় প্রকাশিত এই বইতে আনন্দ দেখিয়েছেন আজকের ভারতের হিন্দুত্ব এবং নয়া উদারবাদ,

বিশেষ করে দলিত এবং প্রান্তিক মানুষদের মনোজগতে যে উপনিবেশ তৈরি করেছে, তার প্রকৃতি অনুধাবন না করলে এই আপাত বৈপরীত্যগুলিকে অবাস্তব মনে হতে পারে। বইটিতে পুঁজি আর ধর্মের ঝাঁঝালো অনুপানকে তিনি নিজে এবং সামূহিকভাবে সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত সহযাত্রীদের নিয়ে বুঝতে চেয়েছেন; কীভাবে এই দেশে অসাম্য, জাত বৈষম্য এবং ধর্মের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এরই পাশাপাশি তিনি এও বিশ্লেষণ করেছেন সমসময়ে সংখ্যাগুরুর ভাষায় কথা বলার জন্য জাতবৈষম্য এবং ধর্মীয় মৌলবাদ একজোট হয়ে বাজারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকায় ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তেলতুম্বড়ে নিয়মিত ভাবে *মার্জিন স্পিকস* নামে একটি কলাম লিখে গেছেন। শতাধিক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের এই কলামে ছিল ভারতের সমসময়ের ইতিহাসের বিবরণ ও বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষপট তৈরি হয়েছে জাত এবং শ্রেণির ধারণার ঐতিহাসিকতায় জাতের অবসানের জন্য জনপ্লাবী আন্দোলনের সাফল্য এবং ব্যর্থতার বিবরণে। ধর্ম এবং জাতের গভীর গোপন চলাচল অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি নব্বই দশকের পর থেকে ভারতে ধর্ম এবং অর্থনীতির নতুন অবয়ব কীভাবে আমাদের প্রতিরোধের চেনা উপাদানগুলিকে অকেজো করে দিচ্ছে, তার অন্তর্তদন্তে। এর বাইরেও রয়েছে ভারতের সমসাময়িক রাজনীতির দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা— কাঁসিরামের দলিত পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির ঘটনা এবং বিলয় আর নাগরিক সমাজের মধ্য থেকে আম-আদমি পার্টির প্রায় অরাজনৈতিক উত্থানের ভালো-মন্দ।

তফশিল-ভুক্ত জাতগুলির মধ্যে আম্বেদকরপন্থী দলিত আন্দোলনে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, আশা ছিল যারা এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে, তারা হল মহারাষ্ট্রে মাহার, অন্ধ্রপ্রদেশে মালা, উত্তরপ্রদেশে যাদব, তামিলনাড়ুতে পাল্লার এবং কর্ণাটকে হোলেয়া প্রভৃতি জাতি। তেলতুম্বডের নিরীক্ষণ বলে দুঃখজনকভাবে তারা তাদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বরঞ্চ এর উলটোদিকে তফশিলের মধ্যে অন্যান্য জাতের তুলনায় তাদের উচ্চস্তরে অবস্থানের ব্যাপারে সচেতনতা জাহির করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, অসম সুযোগ-সুবিধার সামাজিক কাঠামোয় কারোর জন্মের ‘দুর্ঘটনা’ যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্বাসটা এত সযত্নে লুকিয়ে রাখা আছে যে, এমনকি যারা এই ব্যবস্থার উৎপীড়নের শিকার, তাদেরও নজর এড়িয়ে যায়। কেন তিনি একথা বলছেন? কারণ, তিনি দেখেছেন মুম্বাইয়ের একজন মাহার জাতের সরকারি আমলার পুত্র নিশ্চয়ই কম সুবিধাভোগী, কিন্তু গডচিরোলির প্রত্যন্ত গ্রামের ভূমিহীন মাহার জাতের কৃষি শ্রমিকের পুত্র তার তুলনায় অনেক বেশি বঞ্চিত। যদিও দুই ক্ষেত্রেই তাদের জন্মানোয় তাদের কোনো হাত নেই। এ এক দুর্ঘটনা মাত্র।

দ্য সাউথ এশিয়া মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি অ্যাকাডেমিক জার্নাল (SAMAJ)-এ প্রকাশিত, নভেম্বর ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রোলাঁ লার্দোয়াঁর সঙ্গে দীর্ঘ ধারাবাহিক কথোপকথন, প্রকৃতপক্ষে আনন্দ তেলতুম্বডের আত্মজীবনী, যেখানে তিনি স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে তাঁর ছেলেবেলা, পড়াশোনা আর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজের উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। নিজে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন বলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের ‘রাজনীতি’ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই

কথোপকথনে তিনি বলেছেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এই জাতের আমলাতান্ত্রিক চলাচল ঠিক চেনাজানা ছকে হয় না। জাত এখানে কাজ করে কখনও লাভ আর কখনও ক্ষতির হিসাবে। যদি কেউ দলিত হিসাবে পরিচিত হয়ে যায়, তাহলে প্রথমেই তাকে অবান্তর করে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাপারটা যখন এইভাবে দেখা হয় যে, তফশিলি জাতিভুক্ত কর্মচারীরা তুলনায় অন্যদের চেয়ে বেশি বিনয়ী, বেশি অনুগত এবং বেশি বিশ্বস্ত, তাহলে যেমন রাজনীতিতে, তেমনই প্রশাসনিক ক্ষমতায় যাঁরা আছেন তাঁদের কাছেই এটা একটা অসাম্প্রদায়িক এবং 'ভেবে দেখার মতো' একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, 'আমাকে সাধারণ ভাবে সংরক্ষণ-বিরোধী বলে ভাবা হয়, কিন্তু আমি যে বলতে চাইছি সেটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে নয়। আমি সংরক্ষণের পেছনের রাজনীতিটাকে উন্মোচন করতে চাই, বোঝাতে চাই, মানুষকে বিভাজিত করার জন্য আর জাত সচেতনতাকে আরো শক্তপোক্ত করার জন্য সংরক্ষণ কীভাবে শাসক শ্রেণির হাতে একটা অস্ত্র হয়ে উঠেছে'।

আত্মকথনে তেলতুম্বডে জানান যে তিনি আম্বেদকরকে পড়ার আগেই মার্কসকে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সরাসরি মার্কসের মৌলিক গ্রন্থ না হলেও কলেজে পড়ার সময় তাঁর হাতে আসে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রচারধর্মী নানা লেখা। তিনি বলেন যে তাঁর স্কুলের পাঠ্যবইয়ে কেবলমাত্র একটা অধ্যায়ে আম্বেদকরের নিজের ছেলেবেলা সম্পর্কে স্মৃতির অংশটুকুর বাইরে আম্বেদকর সম্পর্কিত বাদবাকি সবটুকুই ছিল উপকথা-অতিকথায় পর্যবসিত। লেখকের এই উপকথায় কোনো উৎসাহ ছিল না। বরঞ্চ তাঁর উৎসাহ বরাবরই মার্কসের চিন্তার সঙ্গে আম্বেদকরের জাতের অবলুপ্তির আন্দোলনের সম্ভাব্য সমন্বয়ে। ভারতের জাত-বৈষম্যের বিচার করতে গিয়ে তেলতুম্বদের মনে হয়েছে

মার্কসবাদীদের কাছে ভারতের বাস্তবতায় শ্রেণির ধারণায় একটা অনড় পুঁথিগত নির্ভরতা আছে। অথচ মার্কস নিজে 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' (১৮৫৩) প্রবন্ধে জাতকে চরিত্রায়িত করেছিলেন ভারতের প্রগতি এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান নির্ধারক বাধা হিসাবে। আনন্দ তেলতুম্বদে শ্রেণিহীন এবং জাত-বিলুপ্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ লড়াইয়ের ইতিহাস সন্ধান করেছেন, কারণ লড়াইয়ের এই দুই রাস্তার মধ্যে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া দূরত্বে তিনি বিচলিত। একদিকে দলিত আন্দোলনের অন্দরমহলে প্রশ্নাতুর আত্মসমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর, আবার অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মী হিসাবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা— এই দুই ভূমিকাতেই তিনি রাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণ। ভারতের বাইরে দলিত সমস্যার অন্যতম দক্ষ বিশ্লেষক ফরাসি নৃতাত্ত্বিক নিকোলো জাউল 'জৈবিক বুদ্ধিজীবী' হিসাবে তেলতুম্বদের অবদানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি দলিতদের রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারণাটিকে তৈরী করতে পেরেছেন। তাঁর বিশ্লেষণের আগে পর্যন্ত আমরা জাত-ব্যবস্থাকে একটি সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে ভাবতাম; যা ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া, যা অতীত থেকে আমরা বহন করে এসেছি এবং যা মার্কসবাদের শ্রেণি এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।'

আনন্দ তেলতুম্বড়ে যে সাংস্কৃতিক এবং বস্তুগত বিশ্লেষণের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাকেই নিকোলাস জাউল বলেছেন 'জাতব্যবস্থার রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিশ্লেষণ'।[২২]

ঠিক পরিকল্পিত আকারে আত্মজীবনী নয়, কিন্তু আত্ম-অভিজ্ঞতার ভঙ্গিতে লেখা *Waiting For A Visa*, ১৯৯০ সালে People's Education Society কর্তৃক প্রকাশিত

হয় বুকলেট আকারে। বরোদার রাজা সায়াজিরাও গাইকোয়াড়ের দেওয়া বৃত্তি নিয়ে ১৯১৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর জীবনে এ ছিল যেন এক জন্মান্তর। কারণ হিংস্র জাতপাতের অভিশাপ এখানে আর তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল না। তিনি অনায়াসে পেয়েছিলেন সেলিগম্যানের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষক, পান তাঁর নিজের প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি – ভারতে যা ছিল অকল্পনীয়। ১৯১৫ সালে 'প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য' বিষয়ে থিসিস লিখে লাভ করেন অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি। আর ১৯১৬ সালে 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ' বিষয়ে গবেষণাপত্রের জন্য লাভ করেন পি.এইচ.ডি.। কিন্তু টাকা শেষ হওয়ায় লন্ডনে আরেকটি গবেষণা শুরু করেও অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন। অবশ্য দ্বিতীয়বারের বিদেশ যাত্রায় (১৯২০ সালে) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এসসি. ও ১৯২৩ সালে ডি.এসসি. উপাধি লাভ করেন। লন্ডনের গ্রেস ইন থেকে পাশ করেন ব্যারিস্টারি (বার-এট-ল ১৯২২)।

অর্জিত ডিগ্রিগুলি দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে দ্বিতীয়বার যখন তিনি বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। তবুও বৃত্তির শর্ত হিসাবে বরোদার রাজার সামরিক সচিবের কাজে যোগ দেন। কিন্তু মাহার সন্তান হিসাবে থাকার জায়গা জোটে না কোথাও। এক পারসি হোটেলে হিন্দু পরিচয়ে থাকেন কিছু দিন, কিন্তু একসময় নিজের অফিসের একজন ব্রাহ্মণ আরদালি তাঁকে জল দিতে অস্বীকার করে, ফাইল ছুড়ে দেয়, এর পাশাপাশি নানারকম অপপ্রচার করে বেড়ায়। পার্সি হোটেলেও থাকা যায় না। চলে আসতে হয় বোম্বে। কারণ তাঁর জন্য ভারতে কোনো সুবিচার নেই।

এরপর বহু কষ্টে বোম্বাইয়ের সিডেনহাম কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। মাহার পরিচয় জেনে প্রথমে ছাত্ররা তাঁকে বয়কট করে, পরে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে অন্য ছাত্ররাও ভিড় জমাত তাঁর ক্লাসে। কিন্তু এখানেও বসার ঘরে জলপানে পর্যন্ত বাধা। এরই মাঝে তিনি আইন কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষের পদ পান। বহু বাধাবিঘ্নের মধ্যেই তিন বছর কাজও করেন তিনি। *Waiting For A Visa*-র মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতে আম্বেদকরের দলিত মুক্তির জন্য মরণপণ লড়াইয়ের বীজ।[২৩]

আম্বেদকরের পরে প্রথম যে আন্দোলন মহারাষ্ট্রকে কাঁপাতে পেরেছে তা আম্বেদকরেরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী দাদাসাহেব গাইকোয়ারের তোলা ভূমির অধিকারের প্রশ্নটি। আম্বেদকর নিজেও জমিকে দলিত মুক্তির একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন বলেই মনে করতেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সুরজ ইয়েংড়ে *দি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর ‘দলিতালিটি’ নামে একটি সাপ্তাহিক কলমের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর *কাস্ট ম্যাটার্স* বইটি দলিত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার মহলগুলিকে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। প্রথম প্রজন্মের দলিত ইয়েংড়ে একাধিক মহাদেশে পড়াশোনা করেছেন। দলিত বস্তিতে বড়ো হওয়ার অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থেকে গল্প শুরু। পরবর্তীকালে ইয়ংড়ে যত বড়ো হন, বুঝতে পারেন আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, এমনকী রাজনীতিতেও কতখানি জল-অচল পরিস্থিতি তাঁদের জন্য তৈরি হয়ে আছে। দলিত সমাজের ভিতরেও যে জাতপাত রয়েছে, যা বয়ে নিয়ে চলেন দলিত অভিজাতরা, ব্রাহ্মণ্যবাদী মতবাদের অনিবার্য প্রভাব ছাড়া এই ঘটনা অসম্ভব।

খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে পাই গোপাল গুরুর আত্মকথনধর্মী লেখা *আমার জীবন ও দলিত তত্ত্ব* শিরোনামে, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের তরজমায়। ভারতের অগ্রগণ্য

সমাজবিজ্ঞানী গোপাল গুরু জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ থেকে অবসর নিয়েছেন; তার আগে দিল্লি, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমান সময়ের অন্যতম এই দলিত তাত্ত্বিক কলম্বিয়া, অক্সফোর্ড ও পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কাজ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কেমন ছিল জ্ঞানকাণ্ডের এই অসামান্য মেধাবী মানুষটির বাল্যকাল?

> আমাদের জীর্ণ বাড়িটি ছিল রাস্তার ধারে, পাঁচিলের বালাই ছিল না, ধুলো মেখে পথের ধুলোয় বেবাক মিশে থাকতাম আমরা। কোনও রকমে দাঁড়িয়ে থাকা খড়ের দেওয়াল, চাল দিয়ে বৃষ্টির জল ঢুকত ঘরে, পাকা বাড়ি নেই বলে মায়ের দুঃখের শেষ ছিল না। একটা পাকা বাড়ির আশা তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়নি। আমার ছোটো ভাই রমেশের মৃত্যু তাঁর স্বপ্ন "পূরণ" করেছিল – তার জন্য একটি নতুন কবর খোঁড়া হয়েছে জেনে নিজের যন্ত্রণাকে সংহত করে মা শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : ছেলেটা অন্তত একটা পাকা ঘর পেল! [২৪]

কথকের মায়ের কল্পনায় কবর ছিল একটা সুরক্ষিত ঘর, যেখানে শরীর ঠাঁই পায়। উষ্ণ সেই ঘর, তার চারিদিকে ঘেরা, খড়ের দেওয়াল আর চালা দিয়ে জল ঢোকে না। মৃত সন্তানের জীবনযন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি তাই কোনো স্বর্গীয় আশীর্বাদ না চেয়ে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন মাথার উপর শক্তপোক্ত ছাদের।

গোপাল গুরু লিখেছেন—

> আমার অভিজ্ঞতা বলে যে অস্পৃশ্যতা হল মানবিক সত্তার ওপর এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ, যা সেই মানবিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে, বিচ্ছিন্ন করে। এ হল একই সঙ্গে 'মানবদ্রোহ এবং দেহদ্রোহ'। মনুর বিধান এই ধারণাটির মধ্য দিয়ে মানবিক সত্তার পচন ঘটিয়েছে।... যে মনুবাদীরা চূড়ান্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ জারি করতে চায়, তারা চায় যে মানুষের নৈতিক সত্তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাক। আমি আমার জীবনে অনেকবার বহু

শতাব্দী ধরে চলে আসা এই প্রক্রিয়ার শিকার হয়েছি, মুখোমুখি হয়েছি ওই নিয়ন্ত্রণওয়ালাদের। [২৫]

তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনা এই রকম: লেখক একবার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে নিজেদের গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে জল পিপাসার কারণে লামকর্নির এক উচ্চবর্ণের মহিলার কাছে জল চাওয়ায় তিনি তাঁদের জাতের নাম জানতে চান। জাত পরিচয় পাওয়ার পর তিনি রেগে আগুন হয়ে তৃষ্ণার্ত লেখককে কুকুরের মতো দুর-দুর করে তাড়িয়ে দেন। পরবর্তীকালে একবার লেখক জলগাঁও ন'হাটে গ্রামের এক সম্পন্ন চাষি কাশীরাম নহাটের চোখে দেখেছিলেন সেই একই বিতৃষ্ণা, যখন লেখক চাষির বাড়ির গোবর নিকানো মেঝেতে পা রেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে গোপাল গুরু লিখেছেন —

আমি তাঁর গোবর-সুদ্ধ মেঝেতে পা রেখেছি, এটা নিয়ে তার যতটা সমস্যা ছিল, তার চেয়েও বড় ব্যাপার ছিল আমার পোশাক-আশাক, ভাবভঙ্গি — একজন 'আধুনিক অস্পৃশ্য'-র মুখোমুখি হয়ে তিনি যেন নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন।... সমাজের দৃষ্টিতে আমি গণ্য হই এমন একটি অস্তিত্ব হিসেবে, যে 'গড়পড়তা দলিত'-এর থেকে বেশি, কিন্তু বিদ্যাজগতের অগ্রণী কৃতবিদ্যদের থেকে কম।[২৬]

গোপাল গুরু জানিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত, দুই অর্থেই এই সর্বক্ষণের অসম্পূর্ণতাবোধ তাঁর আত্মমূল্যায়নের কাজটিকে ক্রমাগত দুঃসহ করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধ, গান্ধি, আম্বেদকরের ধারণায় পেয়েছেন সেই চেতনার আকর্ষণ, যা তাঁকে শিখিয়েছে কীভাবে নৈতিকতার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে সহজ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে ওঠা যায়।

রাজনীতির কারণেই ১৯৪৭ সাল থেকেই দলিত সমাজকে উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্তির একটা চেষ্টা প্রবল ভাবে লক্ষ করা যায়। যে কারণে পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কিংবা অধুনা পশ্চিমবঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের গুরুত্ব উঁচু সমাজ স্বীকার

করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ওই একই সমীকরণে কাঁসিরামের রাজনীতি একসময় উত্তর প্রদেশের বর্ণহিন্দুদের রাজনীতিকে উৎখাতে সফল হয়। এই প্রেক্ষিতেই আলোচনায় চলে আসে সাম্প্রতিক সময়ে ভানওয়ার মেঘবংশীর আত্মজীবনী মূলক বই *I Could not be a Hindu* (২০২০)। এই বইটিতে দুটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে মেঘবংশী আলোচনা করেছেন। ১) কেন দলিতদের হিন্দু হিসাবে গণ্য করা যাবে না? এবং ২) হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করার চেয়ে দলিত সাংস্কৃতিক কাঠামো অনুসরণ করা কেন ভারতের পক্ষে ভাল হবে? এর অর্থ এই নয় যে, সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে ভ্রান্ত এমন ধর্মতাত্ত্বিকতার আলোচনা এই বইটিতে নেই। এই বইয়ের আলোচনায় সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল লেখক আবেগের (যা সচরাচর রাগের বহিঃপ্রাকশা) আতিশায্যে তাঁর যুক্তিকে লঘু হতে দেননি। বরং তিনি নীচু স্বরেই তাঁর যুক্তি এবং তথ্য পরিবেশন করে তাঁর আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই বইতে মেঘবংশী দেখিয়েছেন সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দুরা কীভাবে যুগ-যুগ ধরে দলিতদের ওপর নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার করে আসছে। লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে। হিন্দুধর্মের উচ্চ বর্ণের মানুষেরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়) পরজীবী, নারীবিদ্বেষী, হিংস্র, নিপীড়ক, স্থূল এবং ‘আধ্যাত্মিক ফ্যাসিবাদ’এর সমার্থক। অন্যদিকে, দলিত সমাজের উৎপাদনশীল, সমতাবাদী, গণতান্ত্রিক, সৃজনশীল, কম বস্তুবাদী এবং ভবিষ্যতের সুস্থ ভারতের দিকে একটি টেকসই পথ তৈরি করতে সক্ষম হিসাবে তিনি দাবি করেছেন।

ভানওয়ার মেঘবংশীর জীবনের গতিপথ চমকপ্রদ। প্রথম জীবনে দেশের দলিতদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর বঞ্চনাকে বিস্তারিতভাবে লিখে প্রকাশ করার কারণে তাঁকে মানসিক পীড়নের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বিশেষত বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে তিনি অপমান আর প্রত্যাখান পেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা

করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরবর্তী জীবনে বৃহত্তর মানবতার সন্ধান তাঁকে আম্বেদকরবাদে দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরএসএস'এর সদস্য হয়েও একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, মুসলমানেরা 'আমাদের মতোই দেশপ্রেমিক'।

মুসলিম ও দলিতদের প্রতি আরএসএস ক্যাডারদের মনোভাবের কথা স্মরণ করে তিনি বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতোই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'তারা কেবল মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য আমাদের ব্যবহার করতে চায়, অন্যথায় আমাদের কিছু যায় আসে না'।

তাঁর বইয়ে 'টুওয়ার্ডস আম্বেদকরবাদ' উপশিরোনামের অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত কিন্তু আকর্ষণীয়। তিনি লিখেছেন -

> আমি বাবাসাহেব আম্বেদকরের কথা পঞ্চজন্য, পাথে কান, রাষ্ট্র ধর্ম এবং জাহ্নবীর মতো সংঘের প্রকাশনাগুলিতে পড়েছিলাম, যা থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম যে বাবাসাহেব একজন মহান জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং ভারতের সংবিধান রচনায় অবদান রেখেছিলেন। তিনি সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা এবং গেরুয়া পতাকাকে জাতীয় পতাকা করতে চেয়েছিলেন।[২৭]

তাঁর পড়া আম্বেদকরের প্রথম বই, *রিডলস ইন হিন্দুধর্ম,* তাঁর মনকে উড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি আরও দাবি করেছেন —

> তারপর বাবাসাহেবের লেখা সব কিছু খুঁজে পেলাম। আমি তাঁর জীবনে উদ্ভূত অনেক তিক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে শিখেছি, যাঁর সাথে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বর্ণবিন্যাস ও বৈষম্যের ঘৃণ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ কীভাবে দায়ী তা আমাকে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছিল।[২৮]

পরবর্তীকালে, ভানওয়ার মেঘবংশী কবীর, পেরিয়ার এবং ফুলে পড়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন যে, দলিত সাহিত্যের ভাণ্ডার সময়ের সাথে নিজেকে সংহত করেছে এবং এখন

একটি বিস্তৃত নতুন এক বোধের প্রস্তাবের সামনে, যার অর্থ মানবিক পরিচয়ের অনুসন্ধান। অবশেষে, তিনি সত্যিকারের আম্বেদকরবাদী সংগঠন, বিএএমসিইএফ - অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড (এসসি, এসটি, এবং ওবিসি) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্মচারী ফেডারেশন দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যা কাঁসিরাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে এবং জাতিভেদ প্রথা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, ভানওয়ার মেঘবংশী মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনের মতো ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের কাছাকাছি যাওয়ার আগে তাঁর নিজস্ব সংগঠন এবং প্রকাশনা তৈরি করেছিলেন, যা সেই সময়ে তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ছিল। তাঁর লড়াইটা ছিল কঠিন। যাঁরা আম্বেদকরের ত্রয়ী 'ইকুয়ালিটি, লিবার্টি অ্যান্ড ফ্র্যাটারনিটি'কে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের মতো তাঁকেও সব ধরনের চাপ ও ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। বইয়ের উপসংহারে তিনি বলেছেন ‘আমার পরিবারের সদস্যরা প্রাণঘাতী শারীরিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন, আমার উপর মিথ্যা মামলা চাপানো হয়েছে, বানোয়াট অভিযোগ তদন্তের দিকে পরিচালিত করেছে। পুলিশ, সিআইডি, সিবিআই, আইবি সব মিলিয়ে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে তদন্ত চলছে। এই ধরনের চরম হয়রানি আজও চলছে’।

এরই পাশাপাশি আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই কাঞ্চন ইলাইহা রচিত *Why I am not a Hindu*। এই বইটি ১৯৯৬ সালে কলকাতার ‘সময়’ প্রকাশনী থেকে প্রথম বের হয়ে এখনও বিশেষ আলোচিত। বইটিতে মূলত শূদ্র আলোচকের দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বলা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *লোকায়ত দর্শন* যেমন বস্তুবাদী দৃষ্টিতে হিন্দু ভাববাদী দর্শনকে বুঝে নেওয়া এবং আলোচনার একটি আকর গ্রন্থ, ঠিক তেমনই ইলাইহার এই বইটি শূদ্রদের দৃষ্টিতে সমগ্র হিন্দুধর্মের পূর্বাপর বুঝে নেওয়ার

জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে মনু যাদের সমাজের অন্ত্যজ বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাদের নিজের ভাষ্যে সেই মনুবাদের সমালোচনা আমরা পাই এই বইয়ে। এই বই সম্পর্কে যেমন ‘Mid Day’ পত্রিকার সম্পাদক আকর প্যাটেল জানিয়েছেন ‘আধুনিক ক্লাসিক’, তেমন ‘Outlook’র সম্পাদক সাগরিকা ঘোষ তাঁর মুগ্ধতা জানয়েছেন এইভাবে:

> In Kanchan Illaiah’s conceptual universe, you feel the pain of life. In his ideas, you sense the vulnerability of battling unpredictable waters. But in his intellectual adventurousness, you also seen the gaiety of robust combat and the fun of the fight. [২৯]

এই বইতে ইলাইহা ‘দলিত বহুজন’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে:

> I have not used the terms like ‘lower castes’ or ‘Harijans’ while referring to the Other Backward Classes (OBCs) and Scheduled Castes (SCs) because the very usaged of such terms subordinates the productive castes. Dalitbahujan history has evoled several concepts and terms refer to the castes that constitute SCs and OBCs. [৩০]

ভূমিকার এই অংশ থেকে বোঝা যায় শূদ্রদের স্থান এবং স্থানাঙ্ক বুঝে নেওয়ার জন্য তিনি শব্দের গোলকধাঁধা না ঘুরে প্রথমেই তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন। এই বইয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন দলিতবহুজনদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ এবং বর্ণ ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে। যে কারণে দলিবহুজনদের শৈশব, পারিবারিক জীবন, বাজার অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকতায় তাদের বিন্যাস, তাদের দেব-দেবীর কল্পনা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে হিন্দুদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক আলোচনা এই বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবনা। এভাবে তিনি এই কথাটাই খুব স্পষ্ট করে যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রবিদেরাই শুরুর সময় থেকে দলিতবহুজনদের হিন্দুদের সমাজ ব্যবস্থার বাইরে রেখে

এসেছেন। দলিতবহুজনদের অস্পৃশ্য, অশুচি রাখার বিভিন্ন বিধান দিয়েছেন ধর্মবেত্তারা। ফলে সামগ্রিকভাবে শূদ্র কিংবা অন্ত্যজরা হিন্দুধর্মের বাইরের মানুষ। আর সে কারণে আজ রাজনীতির প্রয়োজনে যখন ভারতের বিরাট সংখ্যক দলিতবহুজনদের বিভিন্ন সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে, তখন এটা স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন, দলিতবহুজনেরা আগে যেমন সমগ্র হিন্দু সমাজের অংশ ছিল না, এখনও নয়। তারা স্বতন্ত্র। তারা অপাঙক্তেয়।

এইভাবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত সমাজের আত্মানুসন্ধান এবং চাহিদা-আকাঙক্ষাকে বুঝে নিতে গেলে দলিত লেখকদের আত্মজীবনী কাছে হাত পাততেই হবে। দলিত জীবনের অন্তর্গত বঞ্চনা-লড়াই-বঞ্চনার ক্রমিক ধারাবিবরণ এই আত্মজীবনীগুলিতেই সততার সঙ্গে লিখিত, যা দালিত সমাজের বাইরের সাহিত্যের সঙ্গে মেলে না।

তথ্যসূত্র:

---

১. পাওয়ার, দয়া, 'খোকা পেট ভরে খা', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২১৯

২. পাওয়ার, দয়া, 'আমরা সবাই রাজা', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২২৭

৩. খরাট, শঙ্কর রাও, 'হাড়ের ব্যাপারি', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৫১

৪. মোরে, দাদাসাহেব, 'দলছুট যাযাবর', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৬৭

৫. সোনকাম্বলে, পি. আই., ‘এটাও কেটে যাবে’, *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৮৩

৬. মালাগাত্তি, অরবিন্দ, ‘কালো বিড়াল কখনো সাদা হয় না’, *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৮৯

৭. সত্যনারায়ন, ওয়াই. বি., *আমার বাবা বালাইয়া: একটি তেলেগু দলিত পরিবারের আত্মকথা,* সৌভিক দে সরকার অনুবাদ, হাওয়াকল, কলকাতা, অক্টোবর ২০২০, পৃ. ১৫

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১০. লিম্বালে, শরণকুমার, *বেজন্মা,* অনুরিমা চন্দ (অনুবাদ), দোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, মার্চ ২০২২, পৃ. ৩

১১. প্রামাণিক, মৃন্ময় (সম্পাদিত), *দলিত চেতনা দলিত দর্শন: কথায় কথায় শরণকুমার লিম্বালে,* ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৫

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১৩. লিম্বালে, শরণকুমার, *বেজন্মা,* অনুরিমা চন্দ (অনুবাদ), দোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, মার্চ ২০২২, পৃ. ৮২

১৪. বাল্মিকী, ওমপ্রকাশ, *উচ্ছিষ্ট,* তপনকুমার ঘোষ (অনুবাদ), প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৪

১৫. সেনগুপ্ত, সম্রাট, *প্রতিবাদের পাঠক্রম,* তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, পৃ. ২৫৮

১৬. বাল্মিকী, ওমপ্রকাশ, *উচ্ছিষ্ট,* তপনকুমার ঘোষ (অনুবাদ), প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৭

১৭. বাল্মিকী, ওমপ্রকাশ, *উচ্ছিষ্ট,* তপনকুমার ঘোষ (অনুবাদ), প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৮

১৮. লিঙ্গাইয়া, সিদ্দা, *আমারও কিছু বলার আছে: একজন কন্নড় দলিত কবির আত্মজীবনী,* মান্দাস, কলকাতা, নভেম্বর ২০২৩, পৃ. ৩৪

১৯. গায়কয়াড়, লক্ষণ, *উচল্যা,* মাধুরী সিংহ (অনুবাদ), সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, পৃ. ২৭

২০. চক্রবর্তী, অচিন, 'কেরালার জাতপাতের জটিল চালচিত্র', *দলিত ভারত,* অনুস্টুপ, কলকাতা, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮, বর্ষা ২০২৪, পৃ. ৬২৬

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা, 'ভীত শিক্ষক, মেরুদণ্ডহীন শিক্ষার্থী অ মৃত নাগরিক', *দলিত ভারত,* অনুস্টুপ, কলকাতা, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮, বর্ষা ২০২৪, পৃ. ৬৩১

২২. ঘোষাল, শুভময়, 'সে পথে তুমি একা: আনন্দ তেলতুম্বডের অন্বেষণ', *দলিত ভারত,* অনুস্টুপ, কলকাতা, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮, বর্ষা ২০২৪, পৃ. ৫৯৭

২৩. আম্বেদকর, বাবাসাহেব, *ওয়েটিং ফর এ ভিসা,* সমক প্রকাশন, ১৯৯০, পৃ. ১৬

২৪. গুরু, গোপাল, *আমার জীবন ও দলিত তত্ত্ব* (অনুবাদ-অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়), *দলিত ভারত,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮, বর্ষা ২০২৪, পৃ. ২১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

২৭. মেঘাবংশী, ভানওয়ার, *আই কুড নট বি হিন্দু: দি স্টোরি অফ আ দলিত ইন দি আর এস এস,* নভায়না পাবলিশার্স, দিল্লী, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১১৫

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

২৯. ইলাইয়া, কাঞ্চা, *হোয়াই আই এম নট আ হিন্দু,* ভাটকাল ও সেন পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৪৬

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: সাহিত্য ও প্রতিরোধের রাজনীতি

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনী: সাহিত্য ও প্রতিরোধের রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ১৯৯২ সালে চুনী কোটালের আত্মহননের অব্যবহিত পরে 'বাঙালা দলিত সাহিত্য' সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল। ১৯৯২ সালের ১৬ আগস্ট বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আদিবাসী ছাত্রী চুনী কোটাল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের ক্রমাগত বর্ণবিদ্বেষী নিপীড়নের কারণে আত্মহত্যা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তেলেগু দলিত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল ১৯৮৫ সালে করমচেদু দলিত নির্যাতনের কাহিনির পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসাবে। অন্ধ্রপ্রদেশে জোতদারদের দ্বারা কাম্মা দলিতদের উপর ঘটা করমচেদু গণহত্যার পর নিম্নবর্গের আন্দোলনকারীরা জাতীয়স্তরে ব্যাপক আন্দোলনের দ্বারা সরকারকে তপশিলি জাতি-উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইন প্রনয়নে বাধ্য হয় ৬ জন দলিতের গণহত্যা ও ৩ জন দলিত মহিলার চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও সম্মানহানির প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ছিল তেলেগু দলিত সাহিত্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কারণ। এভাবেই শাসন ও শোষণের যুগলবন্দী আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এভাবেই সমান্তরালে চলতে থাকে। ১৯১৫ সালে হরিদাস পালের *একজন পতিত জাতির কর্মী* প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা দলিত আত্মজীবনী তার যাত্রা শুরু করেছিল।

জীবনের উপান্তে গিয়ে পৌন্ড্র সমাজের প্রথম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রাইচরণ সরদার লেখেন *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্যপরীক্ষা* (১৯৫৯)। মোট চারটি খণ্ডে বিন্যস্ত এই স্মৃতিকথার প্রতিটি অক্ষরে বিধৃত হয়েছে তাঁর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের চালচিত্র। ১৮৭৬

সালের জাতক রাইচরণ ১৯০০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন। কৃষিজীবী পরিবারের এই সন্তানের মূল নিবাস ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মগেরহাট থানার বনসুন্দরিয়া গ্রামে। বিপুল প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করে মেধাবী রাইচরণ প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে ওকালতি বৃত্তিতে যোগ দেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি পৌণ্ড্রদের সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'জল-অচল' দলিত সম্প্রদায়ের এই মানুষটি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২৮ সালের জুন মাসে ৫৫ জন অনুগামী নিয়ে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিয়ে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নাম লাভ এবং দ্বাদশাহ অশৌচবিধি পালনের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি মূলত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ ও বেণীমাধব হালদারের পন্থানুগামী ছিলেন। এই মতাবলম্বী পৌণ্ড্ররা বিশ্বাস করেন পৌণ্ড্ররা আর্যজাতি সম্ভূত। কর্মের বিচারে তারা ক্ষত্রিয়। কিন্তু কালপ্রবাহে তারা অধুনা শূদ্র বলে পরিগণিত। পৌণ্ড্রদের সেই স্বীয় রাজকীয় ঐতিহ্য ও লুপ্ত মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য নানা সময়ে গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজের সঙ্গে রাইচরণ সর্দারের বিরোধ, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এর ফলে কোথাও কোথাও তিনি অপমানিতও হয়েছেন কিন্তু নিজের স্থির বিশ্বাস থেকে কখনও সরে আসেননি।

পৌণ্ড্র সমাজের প্রথম উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনী *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা* শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত ভূমিকাটির প্রয়োজন এই কারণেই যে, দলিত মানুষদের সম্মিলিত বিদ্রোহের 'বহুমুখী' ধারাগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা। এই বহুমুখী ধারাগুলিরই একটি অন্যতম ধারা আত্মজীবনী রচনা, যার সঙ্গে আত্মপরিচিতির নির্মাণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত নবীন। মূলত বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই সমস্ত দলিত লেখকরা

আত্মচরিত ও জীবনীমূলক রচনায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। এবং এই ধারার শুরু হয়েছিল মহাত্মা রাইচরণ সর্দারের আত্মজীবনী *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা* -র হাত ধরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে দলিত সাহিত্য বলতে আমরা যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা সাহিত্যকে বুঝে থাকি, অর্থাৎ যার মধ্যে দলিত জীবনের বেদনা, যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাস, নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, আছে ব্যথাদীর্ণ জীবনকে অস্বীকার করার জেহাদি মনোবৃত্তি – আলোচ্য আত্মজীবনীটির ভরকেন্দ্র কিন্তু তা নয়, বরং পৌন্ড্র জাতিসত্তা গঠনে এই আত্মকথনটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছে দীর্ঘকাল।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় যে প্রাথমিক পর্বের দলিত আত্মজীবনীগুলির মূল প্রবণতাই ছিল ভারতের নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির সম্মানজনক আত্মপরিচিতি নির্মাণের ইতিহাস বর্ণন।সমাজের নিম্নবর্ণের জাতিগুলি উচ্চবর্ণের রীতিনীতি অনুসরণ করে জাতিগত সামাজিক উর্ধ্বায়নের এই প্রচেষ্টাকে এম. এন. শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন পক্রিয়া' বলে অভিহিত করেছেন। এই একই পক্রিয়া আমরা পৌন্ড্র জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির মধ্যেও খুঁজে পাই।

এই সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে আমরা পড়তে পারি বাঙালি পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষ রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনী *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা* শীর্ষক আত্মকথনটিকে।

ভারতীয় সংবিধানে তফশিলি জাতি হিসেবে 'পৌন্ড্র' একটি সরকার স্বীকৃত কৌম গোষ্ঠী (Sub Caste)। তফশিলি তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে এই জাতির অবস্থান

ছিল ‘Depressed Caste’ বা ‘Depressed Class’-এর তালিকায়। ১৯৩৫-এ ভারত শাসন আইন গৃহীত হওয়ার পর ১৯৩৬-এর The Government of India (Schedule Caste) Order (1936) অনুসারে পৌন্ড্রেরা তফশিলি তালিকাভুক্ত হন। এই আইন অনুযায়ী বাংলার মোট ৭৬-টি নিম্নবর্ণীয় জাতিকে তফশিলি তালিকাভুক্ত করা হয়। যেখানে ৬৯ নং তালিকায় পোদ (পৌন্ড্র) জাতির উল্লেখ আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ বৃহত্তম তপশিলি জাতি হল পৌন্ড্র। ২০১১ সালের জনগননা অনুযায়ী এই জাতির জনসংখ্যা ২৪,৫০,২৬০, যা পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র তপশিলি জাতির মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ। পৌন্ড্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণায় এঁদের সংখ্যা সব থেকে বেশি (২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এঁদের জনসংখ্যা ১৯,৯৬,৭০১)।

জাতি বিন্যাসের যে ছক মধ্যযুগ থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত, সেখানে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় বা পোদ জাতি ‘জল-অচল শূদ্র’ বলে পরিগণিত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের *শিবায়ন* কিংবা ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-এ অনেক অন্ত্যজ জাতির সঙ্গে এদেরও নাম উচ্চারণ করা হয়েহে। উনিশ শতকের শেষপর্বে পৌন্ড্র নেতৃত্বরা সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য ঔপনিবেশি শাসকের কাছে দরবার করতে শুরু করেন এবং শাস্ত্র-পুরাণ সমর্থিত জাতি পরিচয় তুলে ধরে সম্মানজনক জাতি পরিচিতি (Respectable Social Identity) নির্মাণ করার জন্য জাতি আন্দোলন সংগঠিত করেন। ‘পোদ’ নামের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই সমাজের কয়েকজন গুণী সন্তান, যথা – বেণীমাধব হালদার (১৮৫৮-১৯২৩), শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ (১৮৬৩-১৯০৭), রাইচরণ সরদার (১৮৭৫-১৯৪১), মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (১৮৭৯-১৯৪৩), মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-

১৯২৮), হেমচন্দ্র নাথ সরকার (১৯০৯-১৯৭৯) প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা উনিশ শতকের শেষার্ধে সমাজ জাগরণ তথা ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

পৌন্ড্র সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলনে ১৮৯১ সালে একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। পৌন্ড্র দের এই জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রবর্তী নায়ক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন বেণীমাধব হালদার, তিনি পৌন্ড্র জাতির ইতিহাস প্রণয়নে সচেষ্ট হয়ে *জাতি বিবেক* (১৮৯৩) নামক একটি গ্রন্থ্ রচনা করেন। *জাতি বিবেক* ছিল সর্বজাতির ইতিবৃত্ত ও সমাচার সম্বলিত একটি গ্রন্থ্। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়রা উপনয়ন সংস্কারবিহীন হয়ে ব্রাত্য বা শূদ্রভাবাপন্ন হয়েছিল, শূদ্র হয় নি। এই উপনয়ন তথা উপবীত গ্রহণের আন্দোলন পরবর্তীকালের সমাজ নায়কদের প্রধান কৃত্য বলে গণ্য হয়েছিল। বেণীমাধব হালদারের সমকালে পৌন্ড্র সমাজে আর এক পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তিনি ছিলেন শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ। পৌন্ড্র সমাজ বিষয়ে শ্রীমন্তবাবু *জাতিচন্দ্রিকা* (১৮৯৩) এবং *ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পরিচয়* (১৮৯৩) নামে দুখানি মূল্যবান পুস্তক লেখেন। পৌন্ড্র জাতিসত্তা নির্মাণে *জাতচন্দ্রিকা*-র ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি এই গ্রন্থে বিভিন্ন শাস্ত্র পঠন পাঠন করে দেখলেন কোথাও *পোদ* নামের কোনও জাতির নাম নেই। আছে পৌন্ড্র , পৌন্ড্রক, পদ্মরাজ ইত্যাদি। তাঁর অন্যতম অবদান পৌন্ড্র সমাজে ক্ষত্রিয়দের আচরণযোগ্য ১২ দিনে শ্রাদ্ধ পদ্ধতি সমাপন অনুষ্ঠানের প্রচলন। বলা বাহুল্য, এযাবৎ পৌন্ড্র সমাজের লোকেরা *মনুসংহিতা*-র নিয়মে ৩০ দিনে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করত।

পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ১৯১০ খ্রি. *আর্য্য-পৌন্ড্রক* নামে জাতিতত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ লেখেন। এর সাত বছর পরে উনি লেখেন *আর্য্য-পৌণ্ড্রকের বৃত্তি বিচার*। পৌন্ড্র জাতিসত্তা নির্মাণে উক্ত দুটি গ্রন্থের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে তিনি শাস্ত্রবচনের সমর্থনে সর্বপ্রথম উচ্চশ্রেণিস্থ পোদ জাতিকে পৌন্ড্রক নামক ক্ষত্রিয় বংশ থেকে উদ্ভূত ও তাঁরা আর্য্যগোষ্ঠীর সদস্য এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হাওড়া জেলার শালকিয়া নিবাসী হরিপদ বর্মণ মণ্ডলও পৌন্ড্র জাগরণে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালে *জাতিবিবেক*-এর অনুসরণে লেখেন *জাতিবিরণ* নামক একটি গ্রন্থ। পৌন্ড্র পরিচিতি নির্মাণে গ্রন্থটির ভূমিকা আছে। পৌন্ড্রবংশ যে চন্দ্রবংশের সাখা তা রচনাটিতে উল্লেখিত। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ থেকে তথ্য আহরণ করে পৌন্ড্রদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থে।

এই প্রেক্ষাপটেই, পৌন্ড্র দের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনের পরিসরে, মগরাহাট থানার বনসুন্দরিয়া গ্রামের অধিবাসী রাইচরণ সরদারের আবির্ভাব। পৌন্ড্র সমাজের মধ্যে প্রথম বি.এ. পাশ করা (১৯০০ খ্রি.) ব্যক্তি ছিলেন তিনিই। রাইচরণ সরদার *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমস্যা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র আর্যপুণ্ড্র* নামে দুটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। পৌন্ড্র জাতির ইতিহাস ও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জানার জন্য গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মুর্শিদাবাদের পূর্ণচন্দ্র রায়ও পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতির জাগরণের নিমিত্তে

লেখেন *আর্য-পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ* (১৯১৭)। ১৯১৭ সালে পৌন্ড্র জাতির এই সমাজ জাগরণ আন্দলনে যোগ দিয়েছিলেন আর এক প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ মহেন্দ্রনাথ করণ (১৮৮৬-১৯২৮)। তিনি ছিলেন একাধারে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, সুলেখক, সুবক্তা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। পৌন্ড্র জাতির সার্বিক উন্নতি ঘটানোই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

১৯৩১ সালের জনগণনার সরকারি রিপোর্ট প্রকাশের আগেই সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জাতিপরিচয় সংক্রান্ত আলোচনায় পৌন্ড্র নেতারা তৎপরতা দেখান। ‘পোদ’ থেকে ‘পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়’ এই নামের পরিবর্তনের জন্য ১৯৩৭ সালে রাইচরণ সরদার বঙ্গীয় আইনসভার দ্বারস্থ হন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংশোধিত আইন অনুযায়ী Calcutta Gazette–র Extraordinary Issue–তে ‘পোদ’ সম্প্রদায়টি পোদ বা পৌন্ড্র – এই উভয় নামেই বিজ্ঞাপিত হয়।

পৌন্ড্র জাতির ‘সমাজপিতা’ বেণীমাধব হালদারের হাত ধরেই উত্থান ঘটে রাইচরণ সরদারের। বেণীমাধবের অসমাপ্ত কাজ স্বেচ্ছা নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন পৌন্ড্র সমাজের প্রথম উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৯০০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. ও ১৯০৬ সালে বি.এল. পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি আলিপুর রোড সেস বিভাগে ও পরবর্তীকালে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। একদম শেষ পর্বে তিনি উকিল হিসেবে ডায়মন্ড হারবার মুন্সেফ আদালতে যোগ দেন। আইনি বিষয়ের গভীর জ্ঞান থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পৌন্ড্র দের সামাজিক অস্তিত্ব কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে

প্রমাণ করলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে না। এর জন্য দরকার প্রাতিষ্ঠানিক শাসকবর্গের স্বীকৃতি।

জাতপাতের বজ্জাতি ও কৌশল দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পৌন্ড্র জাতিকে হেনস্থা, অপমান করার নানা নিদর্শন পৌন্ড্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কাণ্ডারীদের রচনায় একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে।

রাইচরণ সরদারের আত্মজীবনী *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা*-য় দেখি এমনই নানা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার বিবরণ। **১৮৯১** খ্রিস্টাব্দে রাইচরণ সরদার ধামুয়ায় অবস্থানকালে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে ইংরেজি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ভুবনমোহন চক্রবর্তী ধামুয়া গ্রামের গিরীশচন্দ্র পতিতুণ্ড মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দেশে রাইচরণ প্রতিদিন সকালে একজন নাপিত ছেলের সঙ্গে পড়তে যেতেন গিরীশবাবুর বাইরের ঘরে। তাঁদের কিছুটা দূরে বসতে দেওয়া হত একটি ছেঁড়া মাদুরে। এই মাদুরটাই একদিন পাততে গিয়ে ব্রাহ্মণ কুমারদের মাদুরের স্পর্শ লেগে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রাইচরণকে তীব্র ভর্ৎসনা শুনতে হয়।

> ৩রা ভাদ্র তারিখে (বাংলা ১২৯৮ সালের) ঘটনাক্রমে আমার ঐ আসন তাহাদের বাটীর ছেলেদের আসন স্পর্শ করিয়াছিল। ইহা তাঁহার বিধবা ভগিনীর (সম্ভবত তাঁহার নাম বামাসুন্দরী) তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইহা দেখিবামাত্র তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি কটু ভাষায় তিরস্কার করিলেন। লজ্জায় অবনত মস্তকে আমি তাহা শুনিলাম, কিন্তু আমার কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না; বরং ভগবানের দয়ায় জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব করিলাম।[১]

শেষের বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া বি.এ. পড়ার সময় তাঁকে 'পোদের ছেলে লেখাপড়া শিখলে দেশ জ্বালিয়ে মারবে', বর্ণহিন্দুদের এমন কটুক্তিও শুনতে হয়েছে। ১৯০১ সালে তিনি বি.এল পড়ার জন্য কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন এবং তৎসংলগ্ন স্থানে একটি বাসা খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।প্রথমে যে বাড়িতে বাসা স্থির করেছিলেন -

> ...সেই ঘরে চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল।সে পরিচয় দিল "আমি কৈবর্তের ব্রাহ্মণ,আমার বাড়ি বারুইপুরেএ নিকটবর্তী ধপধপি গ্রামে।"এক চৌবাচ্চার জল ব্যবহার উপলক্ষে তার সহিত আমার বিবাদ হইল।সুতরাং আমি অন্য এক বাসা স্থির করিতে লাগিলাম এবং ঐ লেনে আর একটি বাসা পাইলাম।কিন্তু তথায় দুই ব্যক্তি আমার পরিচয় লইয়া ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিল।আমি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা স্ব-গর্বে উত্তর করিল "আমরা উত্তর আড়ী-কৈবর্ত, আমাদের বাড়ি হাজিপুরের কাছে রামরামপুর।" তৎপর হাড়- কাটা গলিতে এক বাড়িতে যাইলাম।তথায় দক্ষিণ বারাসাত নিবাসী কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক এক রাঢ়ী শ্রেণির ব্রাহ্মণ,অমৃতলাল বসু এবং বোড়াল নিবাসী অমৃতলাল ঘোষ নামক দুইজন কায়স্থ ছিলেন।তাঁহারা আমার পরিচয় লইয়া বিনা আপত্তিতে পার্শ্ববর্তী একটি কামরায় আমার বাসা নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং আমাকে ভালোবাসিতে লাগিলেন।[২]

কর্মজীবনে প্রবেশ করেও রাইচরণকে নানা সংকটের মুখোমুখ হতে হয়েছে শুধুমাত্র জাতিপরিচয়ের জন্য। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে বিশদে বর্ণনা করেছেন। ১৯০২ সাল নাগাদ আলিপুর কালেক্টরিতে রোড সেশ বিভাগে কাজ করার সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অসঙ্গত দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি সাসপেন্ড হন। এই সময় আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি শিয়ালদহ ই. বি. রেলওয়ে (তৎকালীন নাম) অফিসের তৎকালীন এক বড়বাবু – হেডক্লার্ক, গড়িয়া নিবাসী রাঢ়ি শ্রেণিভুক্ত জনৈক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট একটি পদের প্রার্থনা

করিয়া আবেদন করেন। তিনি রাইচরণের প্রার্থনা ও জাতের পরিচয় শুনে তীব্র ভর্ৎসনা করে তাঁকে 'হাল চষে' জীবিকা নির্বাহ করার পরামর্শ দেন। নিজের জীবনের এই সমস্ত ঘটনা রাইচরণের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতি বাড়িয়ে দেয় এবং তিনি স্বজাতির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে সমাজ জাগরণ আন্দোলনের কাণ্ডারীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্ব-সমাজকে সর্ববিধ বিষয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে দীর্ঘদিনের চেপে বসা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করাই হবে প্রথম কাজ। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে কেবল শিক্ষকতা করার সূত্রেই নয়, একজন প্রকৃত শিক্ষিত সামাজিক হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষাই হল জাতির মেরুদণ্ড।

১৯০৮ সালে নিজের গ্রামে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি নিরক্ষর পৌন্ড্র সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বয়স্ক মানুষদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও তার বাবদ যাবতীয় খরচ তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। সেই সময় উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্রদের কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করার মত কোনো পৌন্ড্র প্রতিষ্ঠান ছিল না। এর অভাবে তিনি নিজেই ছিলেন ভুক্তভোগী। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ভিক্ষা যাত্রায় বের হন। পৌন্ড্র সমাজের ধনী ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে পরিকল্পনার কথা শুনে উৎসাহিত হন, অর্থদানের প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁদের শীতল প্রতিক্রিয়া রাইচরণকে বিস্মিত করে।

ইতিমধ্যে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের আগেই ১৯১৯ সালের ২৩ মার্চ তারিখে তিনি একক উদ্যোগে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের ১৪৪ নং বাড়িতে 'আর্যপৌণ্ড্রিক ব্রহ্মচর্য

আশ্রম’ নামে একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করেন। দীর্ঘ এক বছর আট মাস ভিক্ষা যাত্রায় প্রায় আড়াইশ’ মেইল পথ হেঁটে তিনি ২৩৬ টাকা ১২ আনা ১০ পয়সা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, যা তাঁর স্বপ্নকে পূরণ করার ক্ষেত্রে ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এতদ্‌সত্বেও শিক্ষাবিস্তারের স্বপ্ন তাঁর মরেনি। ১৯২৫ সালে তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ‘জগদীশপুর সিতিকণ্ঠ ইনস্টিটিউশন’ ও ১৯৩১ সালে গোবিন্দপুর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় নামে দুটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির পিছনে ছিলেন মন্দিরবাজার অঞ্চলের পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়শীল স্বজন-হিতৈষী মানুষ সিতিকণ্ঠ নস্কর। রাইচরণবাবু তাঁর সাহায্যে এই বিদ্যালয়টিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যান। গোবিন্দপুর স্কুলের ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি কালীচরণ কয়াল।

রাইচরণবাবু তাঁর সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কলমকে বানিয়েছিলেন অন্যতম আয়ুধ। আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তিনি অনেক বেশি যুক্তিবাদী ছিলেন। তাঁর গদ্য ছিল স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, কোথাও কোথাও কৌতুক ও বিদ্রূপের ছটায় রসদীপ্ত। পৌন্ড্র সমাজ পরিচালিত অনেকগুলি পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তাঁর সম্পাদিত *ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বান্ধব* (১৯১০) নামক পত্রিকাটি শতবর্ষ অতিক্রম করা এক দলিত পত্রিকার সম্মান অর্জন করেছে।

মহাত্মা রাইচরণের আর একটি বড় সামাজিক আন্দোলন হল উপনয়ন সংস্কার তথা উপবীত গ্রহণের আন্দোলন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মূলত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ ও

বেণীমাধব হালদারের অনুগামী। ১৯২৮ সালের জুন মাসে রাইচরণবাবু স্বগৃহে বিপুল প্রতিকূলতার মধ্যে 'ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ' করিয়ে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপারে পৌন্ড্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে উপবীত গ্রহণের পক্ষে জোরদার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

মহাত্মা রাইচরণ সরদার তাঁর জীবনকথা শুরু করেছিলেন জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার আঙ্গিকে নয়, এই আত্মকথন তাঁর সামগ্রিক জীবনের সংগ্রামের দলিল বলা চলে। সম্ভবত, ১৯৪০ সালে এর খসড়া তথা পাণ্ডুলিপিটি তিনি রচণা করেছিলেন। একটা দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা এই আত্মকথনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে। মোট চারটি খণ্ডে বইটি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জৈষ্ঠ পুত্র ক্যানিং থেকে রাইচরণের মৃত্যুর ১৭ বছর পরে, ১৯৫৯ সালে। সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষা- সংস্কারক, পৌন্ড্র সমাজের তৎকালীন প্রতিনিধি স্থানীয় কণ্ঠস্বর রাইচরণকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যায় এই আত্মজীবনী থেকে।

১৯৭০ সাল থেকে পৌন্ড্ররা বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়ার পরিসরগুলি ব্যাপ্ত করেন।পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ (১৯৭০),ভারতীয় পৌন্ড্র সোসাইটি (২০০৩),পৌন্ড্র মহাসংঘ (২০০৮) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পৌন্ড্রদের মূলনিবাসী পরিচিতি(ইন্ডেজিনাস আইডেন্টিটি) নির্মাণের চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে অনেক পৌন্ড্র বুদ্ধিজীবী হিন্দু ধর্মের বাইরে তাঁদের স্ব – ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম বলে দাবি করছেন।[৬]

এই ভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে পৌন্ড্র আন্দোলনের মধ্যে বেশ কয়েক পর্যায় বিরাজমান। সেটা কখনও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা তথা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি,কখনও

বা সামাজিক ও সম্মানার্থে পৌন্ড্র নেতৃত্বের রাজনৈতিক সংযোগের প্রচেষ্টা। আর এই বহুকৌণিক ও দীর্ঘ আন্দোলনের পটভূমিতে আলোচ্য আত্মজীবনীটি সবসময়ই প্রাসঙ্গিক।

বিশ শতকের সূচনায় বৃহত্তর পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল রাজেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রাজেন্দ্রনাথ সরকারের *জীবনকথা* (১৯৭৬) পৌন্ড্র সমাজের তরফ থেকে লেখা দ্বিতীয় আত্মজীবনী। বিশ শতকের প্রথমার্ধে পৌন্ড্রসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন কাদের দ্বারা ও কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল এই আত্মজীবনী তার সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরেছে। রাজেন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় দেড় দশক আগে থেকে সর্ববঙ্গীয় পৌন্ড্রসমাজে আত্মজাগরণের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব হালদার, রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ মণীষীরা বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলনের আয়োজন, জাতিতত্ত্বের গ্রন্থপ্রকাশ, স্বজাতি সেবক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনার মধ্য দিয়ে পৌণ্ডসমাজকে জাগাতে কিয়দ্দংশে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে রাজেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পৌন্ড্রসমাজের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণের। খুলনাতে অনুষ্ঠিত ১৯২০ সালে সর্ববঙ্গ পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রাজেন্দ্রনাথের যোগদান তাঁকে স্বসমাজ সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ১৯২২ সালে পৌন্ড্র ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয় ‘খুলনা পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্রসংঘ’। ১৯২৭ সালে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ছাত্র পরিষদ গঠিত হলে তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। দলিতদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ তালিকায় পৌন্ড্রসমাজের নাম নথিভুক্ত করণে রাজেন্দ্রনাথ অসামান্য

ভূমিকা পালন করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ করণের মৃত্যুর পর *পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার* পত্রিকা স্তিমিত হতে হতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে, ১৯৩৫ সালে রাজেন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পৌন্ড্র জনগোষ্ঠীর সংহতি নির্মাণের স্বার্থে 'সঙ্ঘ' নামের মাসিক পত্রিকা। গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে তোলা, দরিদ্র অন্ত্যজ পল্লীতে জলকষ্ট নিবারণের জন্য নলকূপ বসানো, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার মত একাধিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এটি যে একজন দলিত, অন্ত্যজ মানুষের আত্মজীবনী, তা তিনি 'মুখবন্ধ'-র গোড়াতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন-

> আমার জীবনকথা বর্ত্তমান শতকের প্রথমার্দ্ধের অধিককালের পল্লী বাংলার আংশিক সামাজিক চিত্র এবং আমার অন্তর্বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী ও সামাজিক অবিচারের ইতিহাস। ঐ সময়ে পল্লী বাংলার হিন্দু সমাজের অশিক্ষিত ও অনগ্রসর জনগণের প্রতি শিক্ষিত ও অগ্রসর তথা বর্ণহিন্দুর কিরূপ অসম, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ ছিল, তাহা আমি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্কিত করিয়াছি।[৩]

কর্মজীবনের নানা পর্বে তিনি বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন, পেয়েছেন অবহেলা ও বিদ্রূপ। অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটি বালককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে উঠলেও পুরুষাণুক্রমিক বৃত্তি অর্থাৎ কৃষক হয়ে থাকাই তার নির্ম্মম ভবিতব্য। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথকে কেউ দমাতে পারেনি। সব বিরোধীতাকে তিনি জয় করেছিলেন তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি ও প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। এন্ট্রান্স, আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার প্রতিটি স্তরে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন পড়ার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে পেশা হিসাবে ওকালতির পথকে বেছে নেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে। পর্যায়ক্রমে খুলনার লোকাল বোর্ড ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এমনকি চেয়ারম্যান হন।

অখণ্ড বঙ্গে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে খুলনা জেলা থেকে সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে মন্ত্রীপদ লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হলে সেই নবগঠিত সরকারেও তাঁর মন্ত্রীপদ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯৬৩ সালের শেষে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬৪-র জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হয় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শুরু হয় নির্বিচারে হিন্দু নিধন। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর বসবাস যে আর নিরাপদ নয় এই কথা বুঝতে পেরে তিনি চিরতরে জন্মস্থান খুলনা ত্যাগ করেন ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল। আর এভাবেই তাঁর *জীবনকথা* হয়ে ওঠে বিশ শতকের এক বিশেষ সময়পর্বের খুলনা তথা অবিভক্ত দক্ষিণবঙ্গের এক অসামান্য সামাজিক দলিল-

> খুলনা ডিস্ট্রিক্ট বারে যোগদানের (১৯২৯) প্রথম হইতেই আমি বার এসোসিয়েশনের সভ্য হইয়াছিলাম। প্রথম দিনেই একটি বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বার লাইব্রেরীতে জলের ঘর আছে এবং উকিলবাবুদের জল দেওয়ার জন্য চাকর আছে। দেখিলাম, উকিল সম্প্রদায়ও জাতি বিচার করিয়া চলিয়াছেন। বর্ণহিন্দু উকিলবাবুদিগকে জল দেওয়া হয় পিতল বা তামার ঘটিতে বা গ্লাসে, মুসলমান উকিলসাহেবদিগের জন্য বরাদ্দ আছে কাঁচের গ্লাস, আর অনুন্নত সম্প্রদায়ের উকিলবাবুদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এল্যুমিনিয়ামের গ্লাস।[৪]

রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সময় রাজবংশীদের অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় উপেন্দ্রনাথ বর্মনের আত্মচরিত *উত্তরবঙ্গের সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি* গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়-

> কলেজ হোস্টেলে প্রায় জনা ৫০ ছাত্র। ডাইনিং হল ২-টা। একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। আর একটি পরেটা হল, অর্থাৎ বিকালে এক ময়রা এসে ঐ ঘরে পরেটা বানাত। ডাইনিং হল দুটিতে ছেলেরা ইচ্ছামত যে কোনও ঘরে বসে খাবার

খেতো। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফণীভূষণ চ্যাটার্জী হঠাৎ একদিন নোটিশ দিলেন: 'The smaller dining hall is reserved for Brahmins, the bigger is Kayasthhas and Vaidyas, and the paretha hall is for others, for taking their meal.' হোস্টেলে কয়েকজন সোনার বেনে, সাহা ও আমরা জনা পাঁচেক রাজবংশী ছাত্র ছিলাম। আমরা নোটিশ বইতে স্বাক্ষর দিলাম না।[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যখন ভারতের পার্লামেন্ট 'The Untouchability Offence Act' তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির লোকসভার সাংসদ (১৯৫২-১৯৬২) উপেন্দ্রনাথ বর্মণ তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এই বিল আইনে পরিণত হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

বিশ শতকের প্রথম ভাগে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের দুটি আত্মজীবনী হল বনমালী গোস্বামীর *অবর বেলায় পাড়ি* আর সুধামুখী গোস্বামীর *আত্মজীবনীর মত* (যঃ)[৬]। আত্মজীবনী দুটি একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর জানুয়ারি মাসে বাণী আর্ট প্রেস থেকে।

'অবর' শব্দের অর্থ 'শেষ বেলায়'। জীবনের শেষ বেলায় বাহাত্তর বছরের বনমালী গোস্বামী নিজের জীবন ফিরে দেখেছেন। পুরো আত্মজীবনীটি ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বাল্যকাল, ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র, কান্মারির এক বছর; এরকম উপশিরোনামে পর্বভাগ করে তিনি প্রথাগত আত্মজীবনীর মতো পুরো জীবনটাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরুতেই প্রত্যক্ষ রাজনীতি কিংবা প্রতিবাদ করার বদলে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে নিম্নবর্ণের মানুষদের অগ্রসর হতে হবে। তিনি অত্যন্তব দক্ষতায় বিশ্লেষণ করে নমঃশূদ্র পরিচয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি নমঃশূদ্র সমাজ, তাদের দলাদলি, 'পরগণা ডাকা'র মতো কুপ্রথার প্রতিবাদ করেছেন। আবার

ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়মে অচ্ছুৎদের বিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধাদানের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষদের নিজেদের বিদ্যালয় গড়ে তুলে নিজেদের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গোপীনাথপুরের পূর্ণচন্দ্র মল্লিকের স্কুল কিংবা মাঝেরগতির দর্শন মল্লিকের স্কুলের কথা উল্লেখ করেছেন। ওড়াকান্দির ঠাকুরবাড়ির ও মতুয়াদের কথাও তাঁর আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে। মতুয়া সংস্কৃতি তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণাস্থল না হলেও তিনি মালিয়াট বিদ্যালয় নির্মাণ ও গ্রামের স্কুল তৈরির ক্ষেত্রে সাধুচরণ মল্লিকের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মত তিনিও বার বার বলতে চেয়েছেন নীচু জাতের মানুষের দুর্দশা, হেনস্থার মূলে শিক্ষার অভাব। অতছ, সেই শিক্ষাদান উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে। ১৮৯৪ সালে আধারকোটা গ্রামে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মানো একজন মানুষ অসংখ্য প্রতিকূলতা পার হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি কেবল নিজের স্বপ্ন সফল করে থেমে থাকেননি, স্ত্রী সুধামুখী গোস্বামীর শিক্ষিত হওয়ার পথের কান্ডারি হয়ে উঠেছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর আমরণ লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুহৃদ প্রিয়নাথ কাঞ্জিলালের দেওয়া *নিগ্রো জাতের কর্মবীর* বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াশিংটন বুকারের *Atlanta Compromise*-এর মতো তিনিও আজীবন শিক্ষার প্রসারই অবদমিত জাতির উন্নতির একমাত্র পথ বলে ভেবেছেন।[৭]

মনোহর মৌলি বিশ্বাসের আত্মকথা *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি* প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে ‘চতুর্থ দুনিয়া’ প্রকাশনা সংস্থা থেকে। পশ্চিমবঙ্গের দলিত আন্দোলনের পুরোধা বর্ষীয়ান এই মানুষটি উচ্চশিক্ষিত। অবসরপ্রাপ্ত টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে খুলনার বাগেরহাট মহকুমার প্রান্তিক অঞ্চলে নমঃশূদ্র

পরিবারে জন্ম নেওয়া এক দলিতের শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্য যাপনের বৃত্তান্ত। আত্মকথনের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

> আমার এ ভুবন দলিতদের নিরক্ষরতার ভুবন, আমার এ ভুবন দলিতদের দারিদ্রের ভুবন, দলিতদের হীন করে রাখার ভুবন, আমার এ ভুবন দলিতদের স্বাস্থ্যহীনতার ভুবন, অপুষ্টিতে শৈশব কাটানোর ভুবন, অপাংক্তেয়তার ভুবন, দ্বেষ-হিংসা-ঘৃণা-বঞ্চনার ভুবন, বহুজন মানুষের ধুকতে ধুকতে বেঁচে থাকার ভুবন। একটা দেশ স্বাধীনতার ছয় দশক পার হয়ে যাওয়ার পরেও অস্পৃশ্যতার ক্লিষ্ট জোয়ালে একদা যারা এদেশে দৈন্য দশায় বন্দী হয়েছিল তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য হেরফের হয়নি – হয় না এমন এক বেদনার মধ্য দিয়ে লিখলাম এই আত্মচরিত 'আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি' বুকের যন্ত্রণা নিয়ে। এ যন্ত্রণা ছোট করে রাখার যন্ত্রণা – এ যন্ত্রণা অপাংক্তেয়তার যন্ত্রণা – এ যন্ত্রণা পরবশ্যতার যন্ত্রণা। এ থেকে বেরিয়ে এসে আমার মানুষ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, গৌরবের শিখর ছুঁতে পারে – এমন এক আশা, এমন এক প্রত্যাশার মধ্যে আমি বেঁচে থাকি।[৮]

মাত্র বারো বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে শুরু হয়েছিল তাঁর অভিভাবকহীন জীবনসংগ্রাম। খুলনা-যশোহর রেঞ্জের মধ্যে পড়াশুনায় তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানাধিকারী। পরবর্তীকালে আই.এস.সি. ও সবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে স্নাতক। লেখক তাঁর আত্মকথায় প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায়ের *দ্য গড অব স্মল থিংস* (১৯৯৭) উপন্যাসটির ভালুথা নামের কাঠমিস্ত্রির কথা উল্লেখ করেছেন। নামী-দামী ইঞ্জিনিয়াররা যেখানে কারখানার আচার নির্মাণ করার যন্ত্রটি সারাতে না পেরে নতুন কেনার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সামান্যই লেখাপড়া জানা কাঠমিস্ত্রি ভ্যালুথা নিজের চেষ্টায় যন্ত্রটি সারিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে লেখক কোনো একটি সাহিত্য সভায় উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

> ভ্যালুথা স্পষ্ট প্রমাণ করেছিল মেধা মানুষের জন্মগত অধিকার। মেধা মানুষের বর্ণগত অধিকার নয়। মেধাকে মেলে ধরার সুযোগ পেলে ইঞ্জিনীয়ার হওয়া যায়,

সুযোগ না পেলে কাঠমিস্ত্রিতে পরিণত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার জ্যাঠার কথাই মনে পড়েছিল।[৯]

লেখক মনোহর মৌলি বিশ্বাসের জেঠুও ছিলেন একজন নিরক্ষর কাঠমিস্ত্রি। তাঁদের গ্রামে চিরকাল নল ছেঁচা হত কাঠের ভারি মুগুর ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ায় কায়িক শ্রম প্রদান করতে হত অনেকখানি। লেখকের জ্যাঠা প্রথমবার নল ছেঁচার কাজে পাটা ঢেঁকির ব্যবহার করেছিলেন। পাটা ঢেঁকি বানালে তা দিয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে, যার ফলে অধিক শ্রমের কাজ সামান্য শ্রম প্রয়োগ করে পাওয়া যাবে। এমনটা একজন নিরক্ষর কাঠমিস্ত্রির নিজস্ব মেধার পরিচয়।

আলোচ্য বইটির ইংরেজি অনুবাদ *সারভাইভিং ইন মাই ওয়ার্ল্ড : গ্রোয়িং আপ দলিত ইন বেঙ্গল* নামে ইতিমধ্যে প্রকাশিত। মনোহরবাবু তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছেন – 'যারা শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার অঙ্গনে আনার কাজ করেছেন এবং করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে।'

আশির দশকের প্রথম থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত 'শ্রীধর' ছদ্মনামে *পথসংকেত* পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে মনোরঞ্জন বড়ালের আত্মকথা— *মনে পড়ে*। বেশ কিছু বছর পরে ২০১২ সালে 'প্রবাহ' প্রকাশনী থেকে এই আত্মজীবনীটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার এক সাধারণ কৃষিজীবী পরিবারে লেখক মনোরঞ্জন বড়ালের জন্ম হয়। মোট ছয়টি পর্বে বিভক্ত আত্মজীবনীটিতে উঠে এসেছে তাঁর জন্মের দিন থেকে তাঁর পত্রিকা *পথসংকেত*-এর জন্মকাল পর্যন্ত সময়পর্ব। *পথসংকেত* পত্রিকা তাঁর অন্যতম বড় অবদান। লিলি হালদারের মতো অনেক খ্যাতিমান দলিত লেখকের লেখক জীবনের শুরু এই

পথসংকেত পত্রিকার হাত ধরে। জীবনে মাত্র এক বছর তিনি চাকরি করেছিলেন। কলেজের ফাইনাল হয়ে গেলে নিজের জ্ঞাতির তৈরি স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পান। পরিবারের ঋণের দায়ে বন্ধকি হয়ে যাওয়া জমি ফেরত নিয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ততদিনে সমকালীন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত তাঁর আগামী দিনের গতিপথ নির্ধারণ করে ফেলেছে। সরকারি তাঁবেদার হওয়াকে তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ১৯৪০-এর ২৬ জানুয়ারি সবার চোখ এড়িয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন, এবং ১৯৪০-এর ঝালকাঠিতে নমঃশূদ্র সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মতো নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' আর 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দেন। একসময় কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগদান করেন।[১০]

আত্মজীবনীতে তিনি গুরুবাদ, জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সাম্যবাদের পথ ধরে এই বৈষম্য দূরীকরণের স্বপ্নের কথাই তাঁর আত্মকথা। তিনি একথা জানাতে ভোলেননি যে, তাঁর তপশিলি জাতি পরিচয়, জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাম্যবাদকে হাতিয়ার করার পথ অনেকেরই পছন্দ ছিল না। বাঁধা গতের বাইরে ভিন্ন এই মতজ্ঞাপক আত্মকথা বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনীর ধারায় স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবি রাখে।

জগবন্ধু বিশ্বাসের লেখা *স্মৃতির পাতা থেকে* আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হয় 'শিল্পনগরী' প্রকাশনা থেকে ২০১৪ সালের ১০ মে, লেখকের একাশিতম জন্মদিনে। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান

বিলেতবাসী অধ্যাপক জে. এম. টার্নারকে। যিনি একান্ত দুর্দিনে লেখককে চল্লিশ টাকা দান করেছিলেন। যা দিয়ে লেখক পদার্থবিদ্যায় এম.এস.সি.- তে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। ১৯৩৪ সালে পূর্ববঙ্গের যশোর জেলার মুশড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লেখক জগবন্ধু বিশ্বাস। নিতান্ত দারিদ্র্যের সংসারে পঞ্চম শ্রেণি থেকেই স্কুলের মাহিনা জোগাড় করার জন্য তিনি অন্যের জমিতে কাজ করতেন। ১৯৪৬ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীন গান্ধিজি ও আম্বেদকরের মধ্যে সম্পাদিত পুণা চুক্তির শর্তানুসারে বারো মাসের মাহিনা বাবদ ছত্রিশ টাকা পান। লেখক তাঁর ছেঁড়া হাফ প্যান্টের পকেটে সেই টাকা মুঠো করে বিলের ভিতর দিয়ে দু'মাইল পথ একদৌড়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে ধাউ হাউ করে কেঁদে বলেছিলেন, 'মা আমাকে মানুষ করার জন্য আম্বেদকর টাকা পাঠিয়েছেন।' ১৯৬১ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংক ও সংস্কৃতে লেটার নিয়ে তিনি প্রথম বিভাগে পাশ করেন এবং সেকেন্ড গ্রেড জুনিয়র স্কলারশিপ বাবদ প্রতিমাসে দশ টাকা পান। এবং তাঁর মাসিক মাহিনা মকুব হয়। মধ্যবর্তী সময়ে অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১৯৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন সার্ভিসে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।

তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নমঃশূদ্রদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি 'গাসি' বা 'ঘাসি'র কথা বলেছেন, যেখানে ধানগাছকে গর্ভবতী মেয়ের মতো সাধ খাওয়ানো হয়। এছাড়া বাস্তুপূজা, গো-ফাগুনে, মাঘী পূর্ণিমা, কলুইসলুই হ্যাচড়ার পূজা, বিভিন্ন খেলা যেমন সড়কি, গরু দাবড়, নৌকা বাইচ ইত্যাদির কথাও বলেছেন।

১৯৪৫ সালের তেভাগা আন্দোলন আরও অনেকের মতো তাঁকেও রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৭৭ সালের 'এস.এস.টি. স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন', ১৯৮৭-তে 'বহুজন সমাজ পার্টি'র স্টেট কমিটির সদস্য এবং বহুজন সমাজ পার্টি সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে পাই যে ঐতিহাসিক গোলাম মর্তুজাকে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে-

> ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে শূদ্র আর মুসলমান সমাজকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চাইছে, সেই জন্য ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়ে শূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে সারা ভারতে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা কেউ আরব দেশ থেকে আসেনি, এ দেশের নিম্নবর্ণের শূদ্রসমাজ ওই ব্রাহ্মণ্যবাদী অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইসলামের ছায়াশীতল নীড়ে আশ্রয় নিয়েছে।[১১]

কথকের সাধের সৃষ্টি হল তাঁর 'মুর্শিদাবাদ আম্বেদকর মিশন' ও 'PAPPADHIN' (Poverty Alleviation Project For Poor And Denied Humanity In Need)। তাঁর দুই খণ্ডের আত্মজীবনীতে বার বার এই মিশনের খুঁটিনাটি উঠে এসেছে। এই মিশনের মাধ্যমে তাঁর শিশুকালে দেখা নীচু জাতির মানুষদের দারিদ্র্য মোচন ও তাদের শিক্ষার প্রতিকূলতা দূরীকরণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল।

রাজু দাসের *এক রিকশাওয়ালার আত্মকথা* ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই 'জনমন' প্রকাশনা থেকে গ্রন্থাকারে বের হয়। লেখক, নাট্যকার রাজু দাসের জন্ম ১১ এপ্রিল, ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামে। পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার ঘোড়াকান্দি গ্রামে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-

> গত ৪৫ বছর যাবৎ যে শতাধিক ছোট গল্প ও নাটক লিখেছি এবং যত নাটক অভিনয় করেছি তার পটভূমিকায় দলিত মূলনিবাসী মানুষের কথাই ছিল বেশি। ফলে নিজেকে দলিত আন্দোলনের একজন নগণ্য কর্মী হিসাবে ভাবতে ভালো লাগে। আমার ভাবনায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধেই দলিত আন্দোলন। তথাকথিত সকল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নয়।[১২]

এর কয়েকটি লাইন পরেই উনি অকপটে লিখেছেন-

> আমি এবং আমার পরিবার বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। যাঁরা নিজেরাও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী।[১৩]

তিনি জানাতে দ্বিধা করেননি-

> এলিট দলিতদের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণবিরোধী বা মৌলবাদীরা রয়েছেন তাঁরা কি দলিতদের ঘরশত্রু নয়; ভাবতে হবে মতুয়াবাদী এবং আম্বেদকরবাদীরা সত্যিই সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী অথবা মানবতাবাদী কি না। ভাবতে হবে দু নৌকায় পা রেখে দলিত আন্দোলন সম্ভব কিনা।[১৪]

তাঁর লেখা পড়ে জানতে পারি ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা কপর্দকশূন্য এই লেখক রিকশা চালিয়ে, পেপার বিক্রি করে, নাইট গার্ডের কাজ করে, স্ত্রী নমিতা দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের সাহচর্যে তিনটি মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। বড়ো মেয়ে সীমা ও জামাই অনন্যর USA বাসায় থাকার সময়কার অভিজ্ঞতা এই আত্মজীবনীটির অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। নমিতা দেবী দলিত মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র মহিলা, যিনি নাটকের দল, দৃষ্টিহীনদের নাট্য অ্যাকাডেমি পরিচালনা, পত্রিকা প্রকাশনা, সম্পাদনা, স্বল্প সংখ্যক হলেও ছোটগল্প, আত্মকথা, ছোটো ছোটো নাটক ও কবিতা লেখা, সর্বোপরি অভিনেত্রী ও নির্দেশক হিসাবে বহুমুখী সৃজনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জীবনে বেশিরভাগ সময় সংসার ও সন্তানের সুষ্ঠু প্রতিপালনের জন্য তিনি সেলাই মেশিনে রেডিমেড সালোয়ার কামিজ, ফ্যান্সি ফ্রক সেলাই করে অর্থ

উপার্জনও করেছেন। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা এই দম্পতি, যাঁরা আর্থিক অনটনে নিজেরা হাইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি, তাঁরা মনে প্রাণে পালন করেছেন দলিতমুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাণী— 'খাও বা না খাও —ছেলে মেয়েকে শিক্ষা দাও— বিদেশে পাঠাও— উচ্চশিক্ষিত বানাও।' তাই, লেখকের বড়ো মেয়ে সীমা ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে ব্রুকিংস শহরে আমেরিকার অ্যাসোসিয়েশন অফ ভেটিনারি ল্যাবরেটরি ডায়াগনিস্টদের সভাতে যেদিন শতাধিক প্রাণীবিজ্ঞানীর সামনে দৃঢ় গলায় নিজের গবেষণাপত্র পাঠ করছিলেন, তখন গর্বিত লেখকের মনে হয়েছিল-

> অতগুলো সাদামুখো সাহেব-মেমদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সে, মাত্র ২৭ বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের সুন্দরী তথাকথিত চণ্ডাল, নমোশূদ্র প্রতিনিধিত্ব করল।[১৫]

১৯৬০-৭০-এর সেই অস্থির সময়, অপরিসীম দারিদ্র্য লেখককে সেইভাবে থিতু হতে দেয়নি কোথাও। লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। কখনও খবরের কাগজ বিলি করেছেন। হাটে বাজারে কখনো সরিষা, কখনো আবার হাটে হাতে বানানো ছোটদের প্যান্ট বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কোর্টে দৌড়েছেন। কখনো আবার বিনা টিকিটে বোম্বাইয়ে হিরো হতে গিয়ে বন্ধু প্রবীর ঘোষের সঙ্গে খড়্গপুরে চেকারের হাতে ধরা পড়ে পাঁচ দিন হাজতবাস করেছেন। কখনো নকশাল সন্দেহে হওয়ায় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামে পালিয়ে গেছেন। ওপার বাংলায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন। শরণার্থী শিবিরে বাস করেছেন। উদ্বাস্তু শিবিরে অসহায় মানুষদের সাহায্য করেছেন, আবার সেসব ফেলে এসে দমদমে রিকশা চালানোকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দেখেছেন ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন। মুক্তি ফৌজের ট্রেনিংয়ে

থাকাকালীন অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন *অতৃপ্ত হৃদয়* নামের উপন্যাস, *ফিরে দেখা* নামের ছোটগল্প। ১৯৭৩ সালে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য বিভাগে মশা মারার জন্য 'গ্রুপ ডি' কর্মচারী হিসাবে যোগদান করার পাশপাশি ১৯৭৫ সালে গুরুদাস কলেজে ভর্তি হওয়া। এরই ফাঁকে চলতে থাকে নাটক রচনা, নির্দেশনা, 'দেওয়াল' পত্রিকা, কলেজ-ম্যাগাজিনে লেখালেখি। গড়ে তুলেছেন 'শান্তিকুঞ্জ ব্লাইন্ড নাট্য অ্যাকাডেমি'। কলমের তুলিতে জনা দশেক দৃষ্টিহীন নারীকে নিয়ে লিখেছেন 'গল্প'। নির্দেশনা করেছেন নাটক। সমাজের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে যাওয়া এইসব বোবা, দৃষ্টিহীন, বিধবা, যৌনকর্মী, অসহায় জীবনসংগ্রামী মেয়েরা বার বার তাঁর সাহিত্যে, নাটকে ঘুরেফিরে এসেছে। ব্যক্তিজীবনের প্রেম, ভালোবাসা, দাম্পত্য, সন্তান, সংসার নিয়ে হালকা চালে গল্পের ছলে বর্ণনা করার পাশাপাশি আলোচ্য আত্মজীবনীটিতে উঠে এসেছে সারা বিশ্বের দলিত মানুষদের অবিরাম সংগ্রামের বাস্তব চালচিত্র। আলোচ্য আত্মজীবনীটির সার্থকতা এখানেই।

শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মজীবনী *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত* ১৩৮৫ সনের ভাদ্র মাসে 'করুণা প্রকাশনী' থেকে বই আকারে বের হয়েছিল।

বরিশালে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করার পর দেবব্রত বিশ্বাসের ছোটবেলা কাটে ময়মনসিংহ জেয়ার কিশোরগঞ্জে। পিতামহ কালীকিশোর বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কথক লিখেছেন-

> শৈশবের কথা স্পষ্টভাবে আমার কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু বাল্যকালেই আমার একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিশোরগঞ্জ শহরের হিন্দু বাসিন্দাদের কাছে আমি ছিলাম 'ম্লেচ্ছ'। বাল্যকালে প্রথম স্কুলে ভর্তি হবার পর ওখানকার হিন্দু ছেলেদের দ্বারা আমি 'ম্লেচ্ছ' বলে অভিহিত হতাম— এমনকি প্রথম আমি যে বেঞ্চিতে বসতাম সেই বেঞ্চিতেও কোনো হিন্দু ছেলে বসত না।[১৬]

কান্তি বিশ্বাসের আত্মকথন *আমার জীবন : কিছু কথা* ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে 'একুশ শতক' প্রকাশনা থেকে বই আকারে প্রকাশিত হয়। কান্তি বিশ্বাসের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশিয়ানি থানার অন্তর্গত বুকরাইল নামের এক অখ্যাত গ্রামে। এর পাশের গ্রামই ছিল ওড়াকান্দি, গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাস। শৈশবের দিনগুলি ছিল অভাবের। জন্মের আগেই বাবার মৃত্যু তাঁর জীবনকে আরও কাঠিন্যে ভরে তুলেছিল। জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষের কাজ থেকে ভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন গ্রামের পথে প্রান্তে। তিনি লিখেছেন-

> ধান কাটার সময় পাকা ধানের শিস ভেঙে জমিতে পড়ত, আমি ঐ সময় প্রতিদিন সকালে পান্তাভাত খেয়ে বা না খেয়ে একটা বেতের ঝুড়ি যাকে আমরা বলতাম ধামা, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম মাঠ থেকে আমন ধান সংগ্রহ করতে। ধামা ভর্তি হয়ে গেলে বাড়িতে এসে সেগুলো জমা দিয়ে আবার মাঠে চলে যেতাম।[১৭]

১৯৫০ সালে কায়েদ-ই-আজম মেমোরিয়াল থেকে পড়াশোনা শেষ করে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.কম.এ স্নাতক হন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন তাঁরই ফেলে আসা কয়েদ-ই-আজম মেমোরিয়াল কলেজে। ছাত্রজীবনে তিনি ঢাকার অরুণ কুটির নমঃশূদ্র কলেজ হোস্টেল থেকেই পড়াশোনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তাঁর কমিউনিজমের প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়েছিল। একজন সাধারণ ছাত্র থেকে অধ্যাপক হওয়ার কারণে ছাত্র পড়ানোর দিনগুলির কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে নিপুণ ভাবে উল্লেখ করেছেন। এরপর ১৯৬০-এর দশকে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট নেতারা তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বলেন। তিনি স্টিমারে করে খুলনা দিয়ে বেনাপোল হয়ে বনগাঁর উদ্দেশে

পাড়ি দেন। পিছনে ফেলে এলেন শৈশব, কৈশোর, নিজের মা, অধ্যাপক জীবন, ভালোবাসার ছাত্র-ছাত্রী সবকিছু। পশ্চিমবঙ্গে শুরুর দিনগুলিতে তিনি বনগাঁ দিনবন্ধু কলজের অধ্যাপক মনীন্দ্রভূষণের সান্নিধ্যে শিক্ষকতা শুরু করেন। কান্তি বিশ্বাসের প্রচেষ্টাতেই ওই নাহাটাতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কলেজ। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল।

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি উদ্বাস্তু পুনর্গঠনের জন্য একটি সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। যার নাম ছিল ‘সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ’। পরবর্তীকালে এই ‘সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ’। পরবর্তীকালে এই ‘সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ’ (UCRC)-এর শাখা বনগাঁয় স্থাপিত হলে কান্তি বিশ্বাস সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দু’ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার পর কান্তি বিশ্বাস যুক্ত হন (মার্ক্সবাদী) কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং ১৯৬৭ সালে সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে নিম্নবর্ণের মানুষদের মন্ত্রিত্বে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

> কোনও সরকারে যদি সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তাহলে সমস্যা। কারণ সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ সমাজের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিদের কাছে অন্তরের জ্বালা ব্যক্ত করতে পারেন না। সুতরাং পার্টির সংগঠনের মধ্য থেকেই নিম্নবর্ণের কাউকে তুলে আনতে পারলে এই ধরনের সমস্যার সমাধান হয়।[১৮]

পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালে গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কান্তি বিশ্বাস জয়লাভ করলে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পদে নিয়োগের প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। প্রায় শ’চারেক চিঠি এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিরোধিতার কারণ যতই মেধাসম্পন্ন

ব্যক্তি হোক না কেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী একজন 'চণ্ডালপুত্র' হতে পারেন না। চণ্ডালপুত্রের হাতে যদি শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব চলে যায়, তবে শিক্ষার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *The Namasudras of Bengal* গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২০০৬ সাল পর্যন্ত কান্তি বিশ্বাস বিদ্যালয় শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৬ সাল থেকে পাঁচ বছর বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন; পাশাপাশি ছিলেন পার্টির 'গণশক্তি' পত্রিকার সহ সম্পাদক ও তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন চালু করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। জাতিগত পরিচয়ের জন্য প্রশাসন, তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত এই অক্লান্ত যোদ্ধার আত্মজীবনী নিম্নবর্ণের মানুষদের লড়াইয়ের বাস্তব দলিল।

সাহিত্যিক মহীতোষ বিশ্বাসের আত্মজীবনী *দিন এল দিন গেল* ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মাঙ্গলিক' প্রকাশনা থেকে বই আকারে বের হয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে প্রায় ৬টি উপন্যাস, কবিতার বই, সমালোচনা গ্রন্থ, আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্তি *মাটি এক মায়া জানে* উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর মৈত্রেয়ী দেবী, ভবতোষ দত্তের মতো মানুষদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। তাঁর সাংসারিক জীবন, সন্তানলাভ, তাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে উপন্যাসের গড়ে ওঠা ইত্যাদি একসঙ্গে ধরা পড়েছে তাঁর আত্মজীবনীতে। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলিতেও উদ্বাস্তু জীবন, তার মধ্যে জাতিগত সমস্যা, আবার নীচু

জাতের উদ্বাস্তু মেয়ের উপর ত্রিস্তরীয় অত্যাচারের বাস্তবতা, নমঃশূদ্র সমাজে হরিচাঁদ গুরুচাঁদের প্রভাব, শিক্ষা সম্পর্কিত চেতনা ইত্যাদি ধরা পড়ে। মহীতোষ বিশ্বাস একে আত্মজীবনী বলতে রাজি নন। তিনি একে বলেছেন 'আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস'। জীবনের শুরুর দিকে ঘটা তেভাগা আন্দোলন ও চাষিদের জাগরণে কমিউনিস্ট নেতাদের প্রভাব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পুরো আত্মজীবনীতে দেখি একবারই জাতিগত পরিচয় বড়ো হয়ে ওঠে, যখন তিনি ব্রাহ্মণের মেয়েকে প্রেম নিবেদন করে বিয়ে করেন। মেয়ের বাড়ি মানে না। তিনি লিখেছেন, 'একটা নমঃশূদ্র বাড়ির ছেলেকে ছেলে ভাবা যায় কিন্তু জামাই? নৈব নৈব চ।'[১৯]

বিভূতিভূষণ বিশ্বাসের *গেঁয়ো ভূতের আত্মকথা* ২০১৬ সালে 'কল্পতরু' প্রকাশনা সংস্থা থেকে বই আকারে বের হয়। আত্মকথাটিতে স্মৃতিকে গল্পের মত বিবৃত না করে জীবনকে দুই পর্ব এবং তার মধ্যে বিভিন্ন শিরোনামে তিনি তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। আত্মজীবনীটিতে তিনি আগাগোড়া শহুরে সভ্যতার বাইরে থাকা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বিবাহবাসরে শহুরে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর শার্ট পরা নিয়ে বিদ্রূপ হিসাবে তাঁকে 'গেঁয়োভূত' বলা হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বে জীবনের নানা ঘটনার পাশাপাশি গ্রামের নমঃশূদ্রদের ব্রতকথা, গারসি উৎসব, তাঁর জন্মস্থান বেদগ্রামের ভৌগলিক, সামাজিক পরিচয় উঠে এসেছে। পরের পর্বেও 'বিশাখাপত্তনমের জীবন', 'কোচিনের আবহাওয়া' এই ধরনের শিরোনামে কোনো জায়গার সামাজিক, ভৌগলিক পরিচয় তিনি দিতে চেয়েছেন। তিনি ধারাবাহিক ভাবে ক্যাম্পে না থাকলেও, আত্মজীবনীতে রিফিউজি ক্যাম্পের বর্ণনা আমরা পাই। চাকরি জীবনে তিনি I.A.S Assistant Grade–এর মতো কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি

করেছেন। পুরো আত্মজীবনীটিতে লেখক বার বার নিজের অস্তিত্বের ওপর গর্ববোধ করেছেন। তাঁর নিজের গ্রামের সংস্কৃতি, নমঃশূদ্র জাতির কথা, গেঁয়ো মানুষের উদার, প্রসারিত মানসিকতার কথা ঘুরে ফিরে এসেছে।[২০]

'বাঙলা দলিত সাহিত্য' সংস্থার উনিশ বছরের বর্ষপূর্তিতে 'চতুর্থ দুনিয়া'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *শতবর্ষের বাঙলা দলিত সাহিত্য* শিরোনামে একখানি গ্রন্থ্। সমগ্র দলিত সমাজের সৃজন ভাণ্ডারকে ছয়টি পর্বে ভাগ করেছিলেন সম্পাদকত্রয়ী মনোহর মৌলি বিশ্বাস, শ্যামল কুমার প্রামাণিক ও অসিত বিশ্বাস। পর্বগুলি হল যথাক্রমে প্রবন্ধ, আত্মকথন, কবিতা, ছোটগল্প, নাটক ও উপন্যাস। এই সম্পর্কে সম্পাদকদের একটি মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ —

> এদের মধ্যে আত্মকথনই দলিত সমাজের প্রকৃত বাস্তব অবস্থার পরিচয় বহন করে। এটি দলিত সাহিত্যে সবথেকে জোরালো দিক।[২১]

ড. অনিল বিশ্বাসের আত্মজীবনী *রঙ বেরঙের দিনগুলি* গ্রন্থ্ থেকে অতি সংক্ষিপ্ত অংশ 'কাল প্রাঙ্গণে' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে আলোচ্য সংকলনে। মূলত এই অংশটিতে লেখকের ছাত্রজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায়। শিক্ষাজীবনে একাধিক জ্ঞানী, দরদি অধ্যাপকদের সান্নিধ্যের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। এরই পাশাপাশি তাঁর আরেকটি অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত পরিস্থিতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে।

> ...বঙ্কুবাবুর আর একটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। হিন্দু আকাদেমীর বিবরণ পত্রে (prospectus) ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আই.এ. ও আই.এস.সি ছাত্রদের মধ্যে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় যারা প্রথম ও দ্বিতীয় হবে, তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে একটি বিশেষ বৃত্তি দিয়ে। আমি ঐ পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিলাম এবং

দ্বিতীয় ছেলে সুবোধ চক্রবর্তীর চেয়ে দু'শো নম্বর বেশি পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস যে, বৃত্তি জুটল চক্রবর্তীর ভাগ্যে, কেননা সে ছিল ভট্টাচার্য গোত্রীয়। কাজেই বিশ্বাসের যোগ্যতা সত্ত্বেও সে হল বঞ্চিত এই বৃত্তি থেকে। এখানে কলেজের prospectus বা ন্যায় নীতির কোন বালাই ছিল না। বরাবরই এদেশে এই-ই নিয়ম এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিদের এই বোঝানো হয়েছে যে, এইসব সুযোগ-সুবিধা শুধু ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্য। এই ব্যাপারে মানব ধর্ম শাস্ত্রের রচয়িতা মনুও এই নির্দেশ দিয়েছেন।[২২]

ড. মনোরঞ্জন সরকারের লেখা *একজন দলিতের আত্মকথা* গ্রন্থের অংশবিশেষ 'প্রাথমিক জীবন ও পরিবেশ' শিরোনামে স্থান পেয়েছে আলোচ্য সংকলনে। লেখক ১৯৩৪ সালে অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার ধামরাই থানার বাইশকান্দা ইউনিয়নের তেরদানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখকের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল মানিকগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার সাটুরিয়া থানার গাঙ্গুলিয়া গ্রামে। লেখকের ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তাঁর বাবা ঐ গ্রাম ছেড়ে লেখকের মামার বাড়ির গ্রাম তেরদানার দিকে চলে যান। এই চলে যাওয়া ছিল অনেকটাই পালিয়ে যাওয়া। কারণ—

গান্দুলিয়া গ্রামটি স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদারদের গ্রামের পাশেই থাকায় সরাসরি তাদের নানা প্রকার অত্যাচার অবিচারের শিকার হতে হত। সবচেয়ে বড় অবিচার ছিল স্কুলে পড়তে দিত না এবং পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল নমঃশূদ্রগণ। ব্রাহ্মণ জমিদারগণ শূদ্র নারীদের প্রতি অবিচার করত। বিনা পয়সায় শ্রম দিতে বাধ্য করত, ভাল কাঠের গাছপালা কেটে নিয়ে যেত। এই সব অবিচার, নির্যাতন, শিক্ষার সুযোগের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেই পৈত্রিক জমি বিক্রির ও নতুন গ্রামে জমি কেনার ঝক্কি নিয়েও চলে যান আজাদাদের গ্রামে, যেখানে স্বজাতি মানুষের সংখ্যা বেশি এবং শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে পরবর্তী বংশধরদের জন্য। ব্রাহ্মণ জমিদারদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে থাকতে পারলে তাদের সরাসরি অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। শৈশবে যা শুনেছি, গান্দুলিয়া গ্রাম ছেড়ে ৭/৮ মেইল দূরে তেরদানা গ্রামে বাড়ি করার এই কারণসমূহই প্রধান।[২৩]

লেখকের গ্রামের সব ঘরই ছিল তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় জাতির। নমঃশূদ্র, মুচি, ঝাড়ুদার, মেথর, জেলে, কৈবর্ত, ধুবি, নমঃশূদ্রের নাপিত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেদের। এইসব মানুষেরা ছিল সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্য। লেখকের ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা এই চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ—

> আমাদের উপর অস্পৃশ্যতার নমুনা হিসাবে দু'একটি উদাহরণ না দিলে নতুন প্রজন্মের নিকট ইহা সহজে বোধগম্য হবে না। একবার আমি সাপ্তাহিক হাট ধানতারা গিয়ে চুল কাটানোর জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলে, উচ্চবর্ণীয়দের নাপিত, যে সমস্ত বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানদের চুল-দাড়ি হাট বাজারে বসে কাটত, সে আমার চুল কাটতে অস্বীকার করে। গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করেই ধরে নেয় যে আমি একজন নমঃশূদ্র এবং ছোঁয়ার অযোগ্য।[২৪]

এই সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে সংগ্রাম করেই লেখক ১৯৪০ সালে বেরশ হাই স্কুলে ভর্তি হন। বেরশ শিবনাথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল দলিত লোকদের ব্যস্থাপনায় অনুন্নত শ্রেণির উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত। নমঃশূদ্রদের শিক্ষার প্রয়োজনে তাঁদের চিন্তাবিদ্‌গণ চাঁদা আদায়, মুষ্টি চাল সংগ্রহ, বিভিন্ন ফসল সংগ্রহ করে টাকা জোগাড় করে স্কুল চালাতেন। দূর দূরান্ত থেকে নমঃশূদ্র ও অন্যান্য দলিত মানুষরা তাদের ছেলেদের এই স্কুলে পড়তে পাঠাতেন। পরবর্তীকালে স্বজাতি নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি স্বসম্মানে পড়াশোনা শেষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই সংকলনের আরেকটি আত্মজীবনীর নাম 'আমি দলিত'। কথক মহীতোষ মণ্ডল। জন্মেছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামে। মেধাবী এই মানুষটি মাস্টার্স পড়ার সময় বিদেশে রিসার্চের জন্য আবেদন করেন। সেই সূত্রে রেকমেণ্ডেশনের জন্য

একজন শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি সহপাঠীদের সামনেই লেখককে বলেন যে তার মতো একজন ছাত্র বিদেশে অ্যাপ্লাই করার স্বপ্ন দেখে কোন সাহসে?

পরিপার্শ্বের এই নির্যাতন সুতীব্র হয়েছিল যখন তিনি একটি নামজাদা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে বিস্তারিতভাবে তিনি জানিয়েছেন সেই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা—

> ...চাকরিটি পাই পুরোপুরি নিজের যোগ্যতায়। মাধ্যমিক থেকে এম ফিল পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাস করেছি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রচুর ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ পেয়েছি। প্রচুর গবেষণাপত্র লিখেছি এবং এই চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে একটি কলেজে কৃতিত্বের সঙ্গে দু'বছর পড়িয়েছি। ভারতের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পূর্ণ যোগ্যতা আমার আছে।[২৫]

এসব সত্ত্বেও চাকরির পাওয়ার পরপরই নানা জাতপাত ভিত্তিক ডিস্‌ক্রিমিনেশন্-এর অভিজ্ঞতা শুরু হয়। ক'জন হঠাৎ বলতে শুরু করল, ওর তো 'সংরক্ষণ' আছে, তাই চাকরিটা পেয়েছে। অনেকে আবার হঠাৎ করে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। 'শিক্ষিত মহলের অনেকে, যারা আমাকে আদপে চেনেই না, তারা বলতে শুরু করল, এই প্রতিষ্ঠানটা বেশ ঠিকঠাক চলছিল, তারপর সুন্দরবন থেকে কে একটা এল, এবার এটা নিশ্চিত ডুববে। একটি ছাত্রী পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘটা করে লিখল, একজন তপশিলি জাতিভুক্ত গণ্ডমূর্খ তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ফুটবল খেলছে! যদিও তার কম নম্বর পাওয়া ব্যাপারে আমার কোনই হাত ছিল না। কয়েকজন ছাত্র শুরু করল, এই লোকটি এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য নষ্ট করছে।'[২৬]

পরবর্তীকালে ক্যাম্পাসে ক্লাস নিতে যাওয়াকালীন একদিন একটি অসুস্থ কুকুর লেখককে কামড়ায়। লেখক সকলের নিরাপত্তার কথা ভেবে কর্তৃপক্ষকে জানালে ঘটনাটি আরও জটিল আকার ধারণ কর। তিনি অ্যানিম্যাল রাইটস কমিশন থেকে একটি চিঠি পান এই মর্মে যে তিনি কুকুরগুলিকে খাঁচায় বন্দি করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এই কারণে তাঁকে অ্যারেস্ট করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় এবং ক্যাম্পাসের মধ্যেই কয়েকদিন পর পুলিশ এসে লেখককে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত এই পরিস্থিতিতেই তিনি জানতে পারেন যে তাঁর কিছু ছাত্রছাত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টিকে নিয়ে মুখোরোচক আলোচনায় মেতেছে। তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু অনেকটা এইরকম—

> ...আমি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ দূষণ করছি। বলে আমার মতো মানুষকে নাকি কুকুরে কামড়ানোই উচিত। বলতে থাকে, তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তরা কুকুরের থেকেও নিকৃষ্ট।
> কিন্তু আমার জন্য আরও আরও অপমান অবশিষ্ট ছিল এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে। কিছু দিন আগেই জানতে পারি, যে কুকুরটা আমাকে কামড়েছিল, সেই কুকুরটির নামে আমাকে ডাকা হচ্ছে — আবার অনেক ছাত্রছাত্রী সেই কুকুরটাকে আমার নামে ডাকছে। একজন শিক্ষকের পক্ষে, সংগ্রাম করতে করতে কেন্দ্রে উঠে আসা একজন প্রান্তিক মানুষের পক্ষে এর থেকে নিকৃষ্ট অপমান আর কী হতে পারে![২৭]

এই পর্যায়ে এসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনও চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলাতঙ্কের যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসা, কর্মজীবনে লাঞ্ছনা, ব্যক্তিগত বিচ্ছেদ— এইসব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণায় তাঁর বার বার রোহিত ভেমুলার কথা মনে পড়ত। এই সময় তাঁর হাতে এসে পড়ে বাবাসাহেব আম্বেদকরের *Annihilation of Caste* ও অন্যান্য লেখা।

...বুঝতে পারি এ লড়াই শুধু আমার নিজের অস্তিত্বের জন্য নয়, এ লড়াই কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে তাদেরই পাশে দাঁড়ানোর লড়াই। আর তখনই রোহিতের মত আমিও 'দলিত' হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা শুরু করি 'দলিত' মানুষের অধিকার আদায় করতে।[২৮]

অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরের এই আত্মকথনটি শেষ হয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে—

আজ যখন আমি নিজের অপমানের কথা, আমাদের অপমানের কথা লিখতে দলিত বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত হচ্ছি, তখন ভয় হয় কখনও কি মানুষ পুরোপুরি আমার নাম পদবি সংরক্ষণের বাইরে বেরিয়ে আমাকে দেখবে, আমি কখনও পুরোপুরি আমার দলিত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে, আর পাঁচজন মানুষের মত বাঁচতে পারব?[২৯]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের (১৯৫৩, ৩ মে) আত্মজীবনীর নাম *নোনাজলে ডুবসাঁতার*। চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লির এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মে অভাবনীয় জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন একাধিক উপন্যাস, গল্প, আত্মকাহিনিমূলক গদ্যের বিচিত্র, সমৃদ্ধ সম্ভার। তিনি মূলত প্রান্তজনের জীবনের রূপকার। জেলে, মেথর, পতিতা, ধোপা, মুচি, ব্যাধ, কোটনা তাঁর কথাসাহিত্যের কুশীলব। আত্মকথনের ভূমিকা অংশে তিনি লিখেছেন—

নোনাজলের জীবন আমার। জন্ম আমার নোনা জলধি বঙ্গোপসাগরের কূলে। জীবনের যতটুকু পথ হাঁটা হলো, তার বাঁকে বাঁকে নোনা, তিতা অভিজ্ঞতার ছড়াছড়ি। ওগুলো পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না-ও পেয়ে পারে। আর যাঁদের নিয়ে লিখব, তাদের জিব তো তেতোতে ভরে যাবে। তারপরও আমার মনে হলো- কাম-ঘাম-রক্ত-পুঁজ-ভালোতে-কালোতে ভরা আমার পঁয়ষট্টি বছরের যে জীবন, তার ইতিহাস লিখলে পাঠক খুব বেশি ঠকবেন না। তাই *নোনাজলে ডুবসাঁতার* লিখতে বসা।[৩০]

২০১৮ সালে প্রকাশিত এই আত্মজীবনীটি নানা দিক থেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহাভারতের আদিপর্বের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে আত্মজীবনীটির প্রথম অধ্যায় শুরু হয়। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে থাকা উদ্ধৃতাংশগুলি যেন অধ্যায়টির মুখবন্ধ। প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই পাই আদিপর্বের সেই শ্লোক, যার অর্থ অনেকটা এইরকম—

> দুর্যোধন হলেন মনুময় মহাবৃক্ষ এবং যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ। মন্যু মানে ঈর্ষা। 'মহাভারত'-এর মুল কাহিনি ঈর্ষার সঙ্গে ন্যায়সংগত অধিকারের সংঘর্ষ। 'রামায়ণ'-এর সংঘর্ষের কারণ নারী আর 'মহাভারত'-এর সংঘর্ষের কারণ জমি।[৩১]

শুরু থেকেই লেখক তাঁর ব্যক্তিগত যাপন, ছেলেবেলা, প্রতিবেশ আর তাঁর সাহিত্য জীবন যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে তা বুঝিয়ে দেন। পূর্বপুরুষদের জীবনসংগ্রামের কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন—

> আমার কর্ণফুলীনামের লেখাটিতে এই জগৎহরিকে নিয়ে সামান্য কিছু লিখেছি আমি। তার প্রতি আমার গোটা জীবনের যে ধান, তার অতি সামান্য অংশ এই লেখায় শোধ হয়েছে। *একজন জলদাসীর গল্প* নামে আমার একটি ছোটগল্প আছে। ঐ গল্পের কেন্দ্র চরিত্র জগৎহরি এবং তার স্ত্রী জগতেশ্বরী। ঐ দুজনের কাছে আমার অনেক ঋণ, অনেক কৃতজ্ঞতা।[৩২]

আত্মকথনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি জানান, তাঁর প্রথম উপন্যাস *জলপুত্র* প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বপুরুষদের জীবন কাহিনি। আবার তিন মাস ব্যাপী গহীন সমুদ্রে জাল ফেলে কীভাবে লাক্ষা মাছ ধরে জেলেরা, পরিবার-বিচ্ছিন্ন এই আট-দশ জেলে কীরকমভাবে সমুদ্রে জীবনযাপন করে এবং শেষের দিকে নিকটাত্মীয়দের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য গভীরভাবে উতলা হয়ে ওঠে, তার কাহিনি বিধৃত হয়েছে *দহনকাল* উপন্যাসটিতে। লেখকের প্রপিতামহ চন্দ্রমণি নিজ জন্মভূমি উত্তর পাতেঙ্গা ছেড়ে, বিত্তসির সুইপারের চাকরি ছেড়ে, বুড়ো বাপের হাহাকার, স্ত্রীর আকুতিকে অগ্রাহ্য করে,

সন্তান যুধিষ্ঠিরের মায়া অগ্রাহ্য করে নীল জলের তীব্র আকর্ষণে তিন মাসের জন্য সমুদ্রে চলে যান মাছ ধরতে। তিনি আর ফিরে আসেননি। আশ্বিনের আচমকা ঝড়ে পাঁচকড়ির কালিদইজ্যার নৌকাটি ডুবেছিল, সলিল সমাধি হয়েছিল নৌকারোহী সকল জেলের। চন্দ্রমণিও ছিলেন সেই জেলেদের একজন।

এই দুর্ঘটনায় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল পরিবারের বাকিদের ভাগ্য। অতি অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে শিশুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে শুরু হয় পরানেশ্বরীর জীবনসংগ্রাম। স্বামীর অবর্তমানে আত্মীয় প্রতিবেশীর চক্রান্তে ভিটে, জমি বেদখল হয়ে গেলে নিরুপায় পরাণেশ্বরী সন্তানের মুখের গ্রাস জোগাড়ের জন্য পথ হিসাবে বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে হাটে বাজারে বিক্রি করা শুরু করে। অসম্ভব প্রতিকূল পরিবেশে, অভাবনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও পরাণেশ্বরী যুধিষ্ঠিরের *বাল্যশিক্ষা* পড়া শেষ হলে পতেঙ্গা বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। জেলে সমাজের পরিবেশে এ ছিল এক অভূতপূর্ব উদ্যোগ। এই পর্বে উঠে এসেছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অশান্ত ইতিহাস। তিনি লিখেছেন—

> ...আইয়ুবি শাসনে হিন্দু উচ্ছেদের একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। বেছে বেছে হিন্দু পাড়াগুলোতে বড় বড় কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আশেপাশে বিরান জমি থাকা সত্ত্বেও কেন হিন্দুপাড়াগুলোতে কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তা সেই সময়ের হিন্দুদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। তাদের বুকে বেদনার ঝড় উঠেছিল, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছিল আইয়ুবি শাসনের চেলাচামুণ্ডারা। দুটো বড় কারখানার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একটি উত্তর পতেঙ্গার জি.এম প্ল্যান্ট, অন্যটি নরসিংদীর ঘোড়াশাল সার কারখানা। জি.এম প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পতেঙ্গার বহু শত বছরের পুরনো হিন্দু পাড়াটিকে বেছে নিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা।[৩৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)-এর প্রত্যক্ষ ঢেউ উত্তর পতেঙ্গায় আছড়ে পড়েনি, কিন্তু সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয় এই সময়ে। স্বাভাবিক নিয়মে চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে এই উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়াতেও আমেরিকান সৈন্যরা ঘাঁটি গাড়লে উপকূলবর্তী ছেলেদের প্রায় শূন্য হাতেই ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কেউ হালিশহর, কেউ কাট্টলি, কেউ ররুমচড়া, কেউ জুলধাতে পালিয়ে আপাত মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করেছিল। অনেক বছর পরে যুদ্ধের উত্তেজনা ফুরোলে তারা আবার তাদের স্বভূমি, উত্তর পতেঙ্গার সেই জেলেপাড়ায় ফিরে এসেছিল। জেলেদের মধ্যে এইরকম দেশান্তরের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। প্রবাদ আছে, যেখানে ভাত, সেইখানেই জাত। কোনো কোনো জেলেপল্লীতে অভাব দেখা দিলে জেলেরা ভিটেমাটি ফেলে গ্রামান্তরে চলে যায়। যে গ্রামে অভাব কম, সেই গাঁয়েই আস্তানা গড়ে তোলে তারা। কেমন ছিল এই জেলে পাড়াটি?

> ...জেলেপাড়াটি ছিল সভ্য-সংস্কৃত জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই পাড়ার নিজস্ব একটা জলহাওয়া ছিল। গ্রামের ভব্য শিক্ষিত মানুষরা বাস করত উঁচু ভূমিতে। জেলেপাড়াটি ছিল জলবেষ্টিত নিচু জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের প্রতিটি জেলেপাড়ার গঠন বৈশিষ্ট্য, অবস্থান, বাতাবরণ একই রকম।
> ...এসব কিছুর পরও, এত সংকীর্ণতা, ঠাসাঠাসি – ঘেঁষাঘেঁষির পরও, এত দারিদ্র্য, এত অনুদারতার পরও জেলেপাড়ার আলাদা নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো সম্প্রদায়ের পাড়ায় পাওয়া যাবে না। জেলেরা যতই মারামারি, রেষারেষি করুক না কেন, জীবনসংকটে ওরা সর্বদা এককাট্টা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে প্রতিনিয়ত ওরা আক্রান্ত হয়, এই দুর্মর দুর্যোগের সময় ওরা পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়।[৩৪]

কর্মজীবনে ১৯৮২-তে বি.সি.এস পাশ করে লেখকের প্রথম পোস্টিং হয় নীলফামারী সরকারি কলেজে। পরে একাধিকবার কর্মক্ষেত্র বদলেছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে

জাত বৈষম্যবাদী চিন্তার শিকার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম-বেশি হতে হয়েছে তাঁকে। সহকর্মীর অনুরোধে একবার শাড়ি এনে দিয়ে আড়ালে শুনেছিলেন, "জাইল্যার পোলার রুচি আর কদ্দুর হইব। কী রকম একখানা বিশ্রী শাড়ি আইন্যে!"

কখনো বা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে পরিস্থিতির চাপে পড়ে পদত্যাগ করেছেন, কারণ, বাকি সহকর্মীদের পক্ষে একজন 'জাইল্যার পোলা' হেডমাস্টারকে রোজ রোজ আদাব, সালাম দেওয়া ছিল অপমানজনক।

লেখক হরিশংকর জলদাস জীবনে বহু বিখ্যাত লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে এসেছেন। আত্মজীবনীতে সেই সব আলাপ, ঘনিষ্ঠতার বিস্তারিত বিবরণ আছে। একজন প্রান্তিক সমাজের মানুষ তার পূর্বপুরুষের চিরাচরিত পেশা মাছ ধরা ছেড়ে অধ্যাপনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন ঈর্ষণীয় সাহিত্য সম্ভার। এই পথ খুব সহজ ছিল না। আত্মজীবনীটিতে অসংখ্য রক্তক্ষরণের মুহূর্তের কথা বলেছেন তিনি। পরিপার্শ্বের অবজ্ঞা, হিংস্র অপমানের কথা বিস্তারে বলতে তিনি কোনো দ্বিধা করেননি।

জলপুত্র উপন্যাসটিতে ছিল জলসংগ্রামের কাহিনি, পরেরটিতে জলসংগ্রাম থেকে মুক্তির বৃত্তান্ত, *দহনকাল*। লেখকের ভাষায়—

> একটি যদি আঁধার জীবনের কাহিনি হয়, অন্যটা তো 'আলোক-আকাঙ্খী মানুষের উপাখ্যান।' মূলত আমি চেয়েছিলাম পূর্বপুরুষ, তাঁদের সমুদ্রসংগ্রামী জীবন, তাঁদের সমাজ ও আমার জীবন নিয়ে তিনটি উপন্যাস লিখতে। জলপুত্র পিতামহের, দহনকাল পিতার এবং অলিখিত উপন্যাসটিতে আমার কাহিনি থাকবে। দহনকালের শেষাংশে সেরকম একটা ইঙ্গিত আছে। রাধানাথ চেয়েছে, সমুদ্র অভিশাপ থেকে তার পুত্র হরিদাস মুক্তি পাক। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাধানাথ বুঝেছিল মুক্তির একমাত্র পথ

শিক্ষিত হওয়া। তাই পুত্রকে সকল কিছুর বিনিময়ে পড়ালেখা শেখাতে চেয়েছিল রাধানাথ।[৩৫]

পরবর্তী উপন্যাসের নাম *কসবি,* মাদার বাড়ির সাহেবপাড়ার দেহপোজীবীনীদের কেন্দ্র করে লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলি পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ার পাশাপাশি আক্রান্তও হয়েছে রীতিমত। কারো কারো মনে হয়েছে—

> হরিশংকরবাবু জেলে সমাজের শত্রু। ভয়ানক ক্ষতি করেছেন তিনি আমাদের সমাজের। ভেতরের খবরগুলো টেনে টেনে বের করেছেন। উঁচু বর্ণের হিন্দুদের বিরোধিতা করেছেন। জেলেসমাজের ঝগড়াঝাঁটি, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা-প্রতারণা — এসব কথা লেখার কি শংকরবাবুর, আবার লিখেছেন *কসবি* নামের উপন্যাস। মাদারবাড়ির সাহেবপাড়াকে নিয়ে এত কিস্‌সা গাওয়ার দরকার কী?[৩৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য *কসবি* উপন্যাসটিতে আছে চট্টগ্রাম শহরের তিনশত বছরের ইতিহাস। একটা জেলেপল্লী কীভাবে কালক্রমে পতিতাপল্লিতে রূপান্তরিত হল তারও কাহিনি আছে *কসবি*-তে। এরপর মেথরদের নিয়ে লিখেছেন *রামগোলাম* উপন্যাসটি। আত্মজীবনীতে লেখকের নিজের বর্ণনায় তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের হয়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণিত। চট্টগ্রাম শহরে চারটি মেথরপট্টি আছে। পূর্ব মাদারিবাড়ি, ফিরিঙ্গিবাজার, বান্দেল রোড আর ঝাউকতলা, এই চারটিতে কয়েক হাজার মেথরের বসবাস। তারাই *রামগোলাম*-এর চরিত্র।

আলোচ্য আত্মজীবনীটির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক সত্যলগ্নতা। সত্য যতই কঠিন বা রূঢ় হোক, কথক তা অকপটে বর্ণনা করেছেন। একাধিকবার সামাজিক অসম্মানের বিপন্নতার মর্মান্তিক ঘটনা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি আছে কিছু কিছু মানুষের মানবিকতার স্পর্শের আন্তরিক বিবরণ। আছে অপার প্রাপ্তির উল্লাস। হরিশংকর

জলদাসের ব্যক্তি ও লেখক জীবনের এক সম্পূর্ণ আখ্যানই বলা যায় এই আত্মজীবনীটিকে।

কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক শ্যামল কুমার প্রামাণিকের আত্মজীবনীর নাম *প্রান্তজনের আত্মকথা*। ২০২২ সালে প্রকাশিত এই আত্মজীবনীটির ভূমিকাতে পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এই লেখক দলিত মানুষদের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে 'আত্মকথন' নামের সংরূপটার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভূমিকাটি শুরু হচ্ছে—

> আত্মপরিচয়ের ধারাটি ইতিহাস ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তির আত্মপরিচয় দিয়ে শুধুমাত্র পারিবারিক এবং গোষ্ঠীগত পরিচয় পাওয়া যায় না, দেশ ও কালের সঙ্গেও তার গভীর সম্পর্ক আছে। আত্মপরিচয় কখনও হয়ে ওঠে বিদ্রোহ, কখনও তা শান্তির বার্তা শোনায়। এই ধারা সমাজ ইতিহাসের এক শাশ্বত বিষয়...
> আফ্রো-আমেরিকার কালো মানুষের সাহিত্য (Black Literature) ও ভারতীয় দলিত সাহিত্যের (Dalit Literature) মধ্যে রয়েছে এক সাযুজ্য। আমেরিকার নিগ্রো লেখকরা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন ব্ল্যাক প্যান্থার নামে একটি সংগঠন। ভারতেও দলিত লেখকরা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই মুম্বইয়ে গড়ে তোলেন দলিত প্যান্থার গোষ্ঠী। ভারতের দলিত লেখকরা তাঁদের জীবনের কথা অভিব্যক্ত করে রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন দলিত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। দলিত সাহিত্য তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই সাহিত্যের অঙ্গণে উজ্জ্বল।[৩৭]

এই ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিসরেই তিনি সামগ্রিক দলিত সাহিত্যচর্চার অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দৃষ্টিকোণকে নিয়ে কথা বলেছেন। এমনি একটি অংশ নিম্নরূপ—

> আত্মপরিচয়ের সংকট বিভিন্ন সময়ে তার ইতিহাস বদলেছে। আত্মপরিচয়ের যে লড়াই দলিতরা করছেন, তা দলিত সাহিত্যের এক অন্যতম ধারা। দলিত সাহিত্য রূঢ় সত্যের ভার বহন করে। অন্যদিকে এক প্রত্যয়ের বোধও তার মধ্যে বিদ্যমান। ভারতীয় লেখকরা আত্মস্মৃতির রচনাকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন। দলিত সাহিত্য হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র লেখকের আত্মকথা নয়, এক আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের দলিল।

> দলিত আত্মকথা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রকরণও বটে। এই প্রকরণোটি(?) একান্তই তাঁর নিজস্ব, দলিত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত।[৩৮]

অল্প কয়েকটি কথায় আত্মকথার ভূমিকাতেই লেখক স্পষ্টত জানিয়ে দেন তাঁর আত্মকথন স্মৃতিমেদুরতা দিয়ে মোড়া কোনো সুখ স্মৃতি নয়।

> আমার এই আত্মকথার নামকরণ করেছি 'প্রান্তজনের আত্মকথন'। শৈশব থেকেই দুঃখ-কষ্ট, আর্থ-সামাজিক দৈন্যদশা, চরম দারিদ্র, কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে নিজের মতো করে আমি নিজেকে গড়েছি। জীবন থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার জীবন, যে জীবন বহুবার মরে যেতে যেতে বেঁচেছে। ক্ষুধা, অপমান, ঘৃণা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শাসন, শোষণ দেখেছে।[৩৯]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নীলা গ্রামে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে লেখক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একসময় এই অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের অংশবিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে লেখকের পূর্বপুরুষেরা হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী বাগাণ্ডা এলাকা থেকে ফলতার নিকটবর্তী এই অঞ্চলে এসে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে নীলা গ্রামের পত্তন করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে এই নীলা গ্রাম লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই লবণ আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নীলা গ্রামে বিপ্লবীদের একটি জনসভায় ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আশুতোষ দলুই নামে এক যুবক নিহত হয়েছিলেন। লেখক জানিয়েছেন বাগদি সম্প্রদায়ের যুবক এই আশুতোষ দলুই ভারতের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম শহীদ। পরবর্তী জীবনে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাস নিয়ে পড়াকালীন গভীর ক্ষোভের সঙ্গে দেখেন অন্ত্যজ বর্ণের এই বিপ্লবীটির নাম ইতিহাসের পাতায় অনুল্লিখিত। লেখকের পিসেমশায় ললিতমোহন মিদ্যা, যিনি মিদ্যা পদবী পরিবর্তন করে 'দেবশর্মা' পদবী গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এই নীলা গ্রামের লবণ আইন

অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। আশুতোষ দলুই শহিদ হওয়ার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নীলা গ্রামের বিপ্লবীদের উদ্দেশে ললিতমোহনবাবুর ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আন্দোলনের এই সময় লেখকের পিতা কিশোর ছিলেন। কিন্তু কিশোর বয়সেই তিনি নীলার আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বাংলা মুলুক ত্যাগ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সেবাদলের কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় তিনি ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দি হয়ে পাটনা জেলে দু'বছরের জন্য কারাবরণ করেছিলেন। কোনদিন স্কুলে না যাওয়া এই মানুষটা নিজের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাড়িতে ফিরে পরবর্তী জীবনে শ্রমিক হিসাবে কায়িক পরিশ্রম করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। এই পারিবারিক পরিবেশ যে লেখককে তাঁর বাল্যকালেই বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলিম পরিবারে। সেই আমির আলির বাড়িতে তাঁর ছেলেদের পড়াতেন সরোজকুমার দাস নামে এক ব্যক্তি। একটা সময়ে অর্থের অভাবে যখন লেখকের বাবা তাঁকে এই পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নিজের সঙ্গে টালির কারখানায় নিয়ে যেতে শুরু করেন, তখন এই সরোজকুমার দাসই তাঁকে বিনামূল্যে পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠশালায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এই মাস্টারমশাই অন্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের দৃষ্টি ছিল প্রখর। এই স্যারের সঙ্গে পথ চলতে চলতেই কথক ছেলেবেলায় প্রকৃতিকে চিনতে শিখেছিলেন। লতা-পাতা, পুকুর-ডোবা, সেই পুকুর-ডোবায় কত ধরনের জলজ উদ্ভিদ, মাছ, পাখি, গাছপালা তাঁকে চিনিয়েছিলেন বাল্যকালের এই মাস্টারমশাই।

শৈশব থেকেই দারিদ্র্য, খাদ্য সংকট তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছিল। লেখকের বাবা খেতমজুরের কাজ করতেন। খেতের কাজ শেষ হলে টালির কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। এত অল্প মজুরি পেতেন যে, তাতে তাঁর পরিবারে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থানও ঠিক মতো হত না। তিনি বর্ষায় নদীতে ইলিশ মাছ ধরতে যেতেন কখনও কখনও। কিন্তু সেখানেও ছিল অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকা। টালির কারখানা একসময় বন্ধ হয়ে যায়, তখন লেখকের জ্যেঠু-জ্যেঠিমারা বিড়ির পাতা ও বিড়ির মশলা কিনে এনে বিড়ি তৈরি করতেন। অভাব আর অনিশ্চয়তা তাঁদের নিত্যসঙ্গী ছিল। গ্রামের অধিকাংশ গরীব চাষি বর্ষায় চাষের কাজ শেষ হলে বর্ষা শেষে ইঁটভাটায় কাজ করত। এই ইঁটভাটায় বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি প্রতিবেশী রাজ্য থেকে দালাল মারফত বহু মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মজুরের কাজ করতে আসত অল্প ক'টা টাকার বিনিময়ে। এই কারণেই নিম্নবর্গীয় এই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা খুব অল্প বয়স থেকে কায়িক শ্রমের পেশায় নিযুক্ত হয়ে পড়ত। অনেক অল্পবয়সী ছেলে টালির কারখানায় কাজ করত। কেউ খালে-বিলে মাছ ধরত, মেয়েরা বাড়ির বাইরে পুকুর পাড়ে, ডাঙায়, শাক তুলত। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বানিয়ে বিক্রি করত। অল্প ক'টা ধানের খোঁজে লেখক এবং তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা প্রায়শই জমির আলে ইঁদুরের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ধানের শিষ বের করতেন। এই করতে গিয়ে অনেকসময়ই বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। কারণ, ইঁদুরের গর্তে কেবল ইঁদুরই থাকে না, অনেক গর্তে ইঁদুরকে তাড়িয়ে সেখানে সাপও আশ্রয় নেয়।

অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় লেখক প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় পড়া ছেড়ে টালির কারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর পাশের গ্রাম

শুকদেবপুরে পৌন্ড্র জনসমাজের একজন জমিদার কালীচরণ কয়াল ১৯৩১ সালে তাঁর নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ১৯১৯ সালে কালীচরণবাবুর বাড়িতে পৌন্ড্র সমাজের এক সামাজিক সম্মেলনে পৌন্ড্র সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা আন্দোলনের হোতা রাইচরণ সর্দারের অনুরোধক্রমে নিম্নবর্গীয়দের এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালীচরণবাবু প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন। বিদ্যালয় শিক্ষার কোনো সুযোগ পাননি। কিন্তু নিজ অধ্যাবসায়, পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তাবলে বিশাল জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র অমূল্য কয়াল মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসার বিজ্ঞানী ছিলেন। মার্কিন মহাকাশযান লুনা'র ডিজ়াইনার ছিলেন তিনি। অপর দুই সন্তান পরেশ কয়াল ব্যারিস্টার ও প্রফুল্ল কয়াল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন। গোবিন্দপুরের এই কয়াল পরিবার উচ্চবর্ণীয়দের একচেটিয়া মেধার গর্বকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর কাছে এক আদর্শস্বরূপ আহয়ে ওঠেন। এই স্কুলেরই এক পৌন্ড্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষক অমৃত সরদারের সাহায্যে লেখক পুনরায় নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা শুরু করেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লেখক লিখছেন-

> নিম্নবর্গের সন্তান আমি। এই স্কুলও নিম্নবর্গের। তারা এত যত্ন করে আমাদের পড়াতেন, নিম্নবর্গের ছাত্রদের প্রতি তাদের এত ভালোবাসা, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।... অত্যন্ত দারিদ্র্যতার মধ্যে স্কুলজীবন কাটিয়েছিলাম কিন্তু কোনদিন হীনমন্যতায় ভুগিনি। শুনেছি আমাদের মতো নিম্নবর্গীয় পরিবারের ছেলেমেয়েরা ক্রমেই হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। কিন্তু আমাদের নিম্নবর্গীয়দের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। এখানে উচ্চবর্গীয় ছাত্ররা কখনও নিম্নবর্গীয় ছাত্রদের অপমান করতে সাহস পেত না। ফলে আমরা হতদরিদ্র অবস্থা নিয়েও আমার স্কুলে সম্মানের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি।[৪০]

পৌণ্ড্র সমাজভুক্ত বঙ্কিম সরদার নামে একজন ব্যক্তি নিম্নবর্গীয় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার কথা মাথায় রেখে ক্যানিং শহরের নিকটবর্তী ট্যাংরাখালি গ্রামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ছাত্রাবাস সহ। এছাড়াও ধ্রুবচাঁদ হালদার নামে একজন নিম্নবর্গীয়দের হিতৈষী ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কলেজও ছিল। লেখক এই কলেজেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি.এ. পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন। স্কুলজীবনে যে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় হয়নি, কলেজে এসে প্রথমেই টের পেলেন। তাঁদের অন্ত্যজ বর্ণের, নিম্নবর্গীয় সমাজের ছেলেদের প্রতি উচ্চবর্গীয়দের তাচ্ছিল্যসূচক, এড়িয়ে চলার মনোভাব। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন লেখক এই সময় একাধিকবার গ্রামে-গঞ্জে নিম্নবর্গীয় ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলতেন। শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একটা কথা বেশ ভালো মত অনুধাবন করেছিলেন যে, অন্ত্যজবর্গীয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রধান অন্তরায় হল তাদের পরিবারের চরম দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। আর এই অশিক্ষার ফাঁদে তাদের ফেলেই চলতে থাকে উচ্চবর্গীয়দের সুকৌশলী শোষণ-পীড়ন। একটা অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে—

> বিডিও অ্যাডমিট, মার্কসিট দেখলেন, কপিগুলি অ্যাটেস্টেড করলেন। এরপর কাস্ট সার্টিফিকেটের কপিটি দেখে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন – “আমার অনেক কাজ থাকে, তুমি আমার কাছে আর কখনও অ্যাটেস্টেড করাতে আসবে না।”... হয়তো বিডিও সাহেবের আমার প্রতি এই মনোভাবে অন্ত্যজবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের ঘৃণা অপমান, শোষণ, শাসন লুকিয়ে আছে।[৪১]

পরবর্তী জীবনে যখন তিনি উদয়ন হোস্টেলে থেকেছেন, তখন খুব অন্তরঙ্গভাবে সিডিউল কাস্ট–সিডিউলড ট্রাইব জনগোষ্ঠীর ছাত্রদের জীবনের কাহিনি শুনেছেন। সেই

কাহিনি ছিল দারিদ্র্য, অপমান, ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকার কাহিনি। উদয়ন হোস্টেল ছিল এস.সি/ এস.টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অধ্যয়নরত ছাত্রদের থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি ছাত্রাবাস।

এরপর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে এবং পরবর্তীকালে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় বর্ণময় কর্মজীবন যাপন করেছেন।

আত্মকথনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখে গেছেন বাংলা ও ভারতের নিম্নবর্গীয়দের উত্তরণের ধারাবাহিক ইতিহাস। ইতিহাস সচেতনতা ছিল তাঁর মজ্জায়। এরই পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়েও তিনি ছিলেন আগ্রহী গবেষক। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পার্শ্ববর্তী মুসলমান পল্লীর মাটির গভীর থেকে বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার হওয়ার ঘটনার তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরি কালীন এক সহকর্মীর অহেতুক জাতি বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রতিবাদে একাধিক উচ্চবর্গীয় গলা মেলালেও আহত বিস্ময়ে খেয়াল করেছিলেন নিম্নবর্ণের কেউ প্রতিবাদে শামিল হয়নি। এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখছেন—

> সেই প্রথম বুঝতে পারলাম, বিহারে উচ্চবর্গীয়রা নিম্নবর্গীয়দের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে তার অধিকাংশই ডাইরেক্ট অ্যাকশন। শারীরিকভাবে তারা অত্যাচার করে এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবর্গীয়রা নিম্নবর্গীয়দের মানসিক নিপীড়ণ চালায় তীব্রভাবে। সেই নিপীড়ণ তারা চালিয়ে এসেছে বহুকাল ধরে। এমনকি লক্ষ্য করতাম পূর্ব বঙ্গীয় সাহা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সাহা সমাজ সিডিউল্ড কাস্ট (শুঁড়ি)। আবার পশ্চিমবঙ্গের মাহিষ্য সম্প্রদায় যারা চাষি - কৈবর্ত্য, তারা জেলে কৈবর্ত্যদের ঘৃণা করছে, কারণ তারা সিডিউলড্ কাস্ট। সিডিউল্ড কাস্টের বিরুদ্ধে উচ্চবর্গীয়দের লেলিয়ে দিয়েছে এরা। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে নিম্নবর্গীয়রা নিম্নবর্গীয়দের শত্রু।[৪২]

আত্মজীবনী জুড়ে এসেছে লেখকের সহকর্মী একাধিক উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা। এইরকমই এক সহকর্মীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রে গিয়ে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন ওখানকার উদ্বাস্তু বাঙালি ক্যাম্প। স্থানীয় একটি মন্দিরে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামগান শুনে বুঝতে পারেন বাসিন্দারা সবাই বাংলাদেশের নিম্নবর্গের এবং অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের।

এই রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই লেখকের সহকর্মী ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। রণজিৎ হীরা, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, লেখক ও সমমনস্ক কিছু মানুষ মিলে এই সময় প্রকাশ করেন 'জাগরণ' পত্রিকা। মহারাষ্ট্রের দলিত প্যান্থার আন্দোলন, কাশীরামজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে দলিত আন্দোলন প্রমুখ ঘটনাবলী লেখককে আলোড়িত করেছিল স্বভাবতই। ১৯৯১ সালে 'জাগরণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শ্যামল কুমার প্রামাণিক *মনুসংহিতা*-র উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। দলিত রাজনীতির পাশাপাশি দলিত সংস্কৃতিকে লেখক সবসময় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। পরবর্তীকালে এই ভাবনা থেকেই তিনি পৌন্ড্র জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক ইতিহাস লেখেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে *পৌন্ড্র দেশ ও জাতির ইতিহাস* নামে একটি গ্রন্থ বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা প্রকাশ করে। পরবর্তী সময়কালে তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, যা দলিত সাহিত্যকে অভাবনীয়ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আত্মকথার শেষ পর্বগুলিতে তিনি তাঁর বিদেশ ভ্রমণ, ভারত ও পৃথিবী পর্যটনের অভিজ্ঞতাগুলি ভাগ করে নিয়েছেন।

অবিভক্ত বাংলার কবিগানের অন্যতম শিল্পী বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন (দেশভাগের পর বর্তমানের নড়াইল জেলার ডুমুদি গ্রাম)। মহসিন হোসাইন সম্পাদিত তাঁর আত্মকথা *নদী চলে সাগর সন্ধানে* তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদেশে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে কবিগান, আখড়াই, খ্যামটা ইত্যাদি সংগীতের ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল কবিগানে। তাতে সংগীতের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। কবিগানে শালীনতা ও রুচি রক্ষা করে তাকে অন্যতর মাত্রা প্রদান করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হরিচরণ আচার্য তারক গোঁসাই, মনোহর সরকার প্রমুখ কবিরা। মনে পড়ে লালন ফকিরের কথা, পাশাপাশি কর্তাভজা ধর্মগুরু রামদুলাল অথবা লালশশী ধর্মীয় তত্ত্বকথা প্রকাশার্থে আশ্রয় নিয়েছিলেন সংগীতের।

কবি বিজয় সরকার এই ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন সংগীতের তথা কবিগানের ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন আঠারোশোর বেশি লোকগানের গীতিকার যে গানগুলির ছত্রে ছত্রে আছে বিচ্ছেদ, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে জাতিভেদ ও শোষণের বিরুদ্ধে অন্তরস্পর্শী আবেদন। 'আধুনিক কবিগান' শব্দবন্ধটি সরকার স্বয়ং ব্যবহার করতেন।

বিজয় সরকারের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে পল্লীর বুকে, খাল-বিল-জলা পরিবেষ্টিত এক শ্যামল পরিবেশে। পরবর্তী জীবনে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন করেছেন। সেখানে কবিগান ও সংগীত পরিবেশন করেছেন। কিন্তু

পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কটি কোনোদিনই ছিন্ন হয়নি। শস্য শ্যামলা বঙ্গ প্রকৃতির বিচিত্র রূপটি তাঁর লেখা গানে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

বিজয় সরকার যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে যৌবনে উপনীত হয়ে কবিগানের দলনায়ক হয়েছিলেন, তা ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর গ্রামীণ নমঃশূদ্র সমাজের অন্তর্গত। বর্ণবিভেদ অধ্যুষিত এবং অর্থনৈতিক ভেদ-বৈষম্যে বিভক্ত বঙ্গসমাজে এঁরা যথার্থ অর্থেই ছিলেন উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। আশেপাশের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলির মানুষদেরও ছিল প্রায় একই অবস্থা।

বিজয় সরকারের পিতা ছিলেন কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর কারণে বিজয় সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও বিত্তের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই অনগ্রসর সমাজের মানুষদের প্রতি অবহেলা এবং শোষণের বহু ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতাকে তিনি ভুলতে পারেননি। সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে। তবে সেই প্রতিবাদে আক্রোশ বা বিদ্বেষ নেই, আছে ভ্রান্ত জীবনবোধ থেকে মুক্ত করে মানুষকে মানবতার কাঙ্ক্ষিত পথে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস।

জীবনের নানা পর্বে, বহু ঘটনায় ধর্মের নামে সংকীর্ণতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আত্মকথায় গ্রামের জমিদারের অত্যাচার, তথাকথিত জাতপাতজনিত কুসংস্কার সম্পর্কে তিনি নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের বাড়ির

পশ্চিমদিকে গোপালনগর গ্রামে দাম্ভিক জমিদার জিতেনবাবুর কাছারি ছিল। নায়েবের নাম জানকীনাথ দত্ত। এঁদের অত্যাচারে প্রজাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হত। জমিদারের নির্দেশ পালনে সামান্যটুকু বিচ্যুতি ঘটলেই পেয়াদা পাঠিয়ে প্রজাদের ধরে এনে তাদের উপর নির্যাতন করা হত। কথক এইরকম একটি শাস্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, মাথার উপর একখণ্ড ভারী কাঠ চাপিয়ে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে জমিদার পৈশাচিক আনন্দে হাসতেন।

খাজনা আদায়ের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ খাজনা আদায় করা হত। লক্ষণীয়, আত্মকথক এই পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন 'জমিদারের জমতাড়না' শব্দবন্ধটি। তাঁর একটি অভিজ্ঞতা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার এক নিখুঁত দলিল, ঘটনাটি নিম্নরূপ—

> একবার জমিদারের দুই পুত্র চৈত্র মাসে আমাদের গ্রামে এলেন। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য আমাদের বিলের মাঝে ফোটা পদ্মফুলের গাছের গোড়া থেকে গজানো সুস্বাদু পদ্মনালের মধুর স্বাদ গ্রহণ, যে স্বাদের আকর্ষণ তাঁদের প্রাচুর্যভরা অট্টালিকার মোহনীয় আবেষ্টনীতে ধরে রাখতে পারেননি। তাঁরা আমাদের বাড়িতে এসে বড়দাকে বললেন, 'আমরা পদ্মনাল খেতে চাই'। সহাস্যবদনে বড়দা পদ্মনাল আনতে রওনা হলেন। জমিদারের তনয়দ্বয় ছাতা মাথায় দিয়ে বিকেলবেলায় বড়দার পিছে পিছে পদ্মবিলের কিনারায় গিয়ে বসলেন। কৌতূহলবশত আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। আমার দাদা বিল থেকে কচি কচি পদ্মনাল তুলে পরিষ্কার করে পদ্মপাতায় জড়িয়ে এনে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা পরম আনন্দে খেতে লাগলেন।... আনন্দে দুলে দুলে চর্বণ করতে করতে একজন পাশে বসা আমাকে ছুঁয়ে দিল। তার শরীর স্পর্শ করা মাত্রই স্পর্শদোষে তার গালের চর্বিত পদ্মনাল অখাদ্য হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ মুখের ভিতর থেকে থু থু করে বাইরে ফেলে দিল। ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। বড়দা আমার পিঠে চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন, বাবুর খাবার সময় ছুঁয়ে দিলি কেন? এ তুই কি করলি? আমি অপ্রস্তুত হয়ে ভাবতে লাগলাম হায়রে কুসংস্কার। আমার দাদা স্বহস্তে যে জিনিস তুলে এনে দিলেন জমিদার তনয়ের তা

> খেতে অসুবিধা হল না। যত দোষ আমাকে স্পর্শ করায়। আমার ছোঁয়াতে তার খাদ্য অপবিত্র হয়ে গেল।[৪৩]

বিজয় সরকারের বিবরণ থেকে জানা যায় সেসময় দরিদ্র প্রজারা জুতো পরে জমিদারের কাছারিতে যেতে পারতেন না। তাঁদের যেতে হত খালি পায়ে। পরিণত বয়সে কবিগানের গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পরেও তাঁকে এমন অনেক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশালের অধিকাংশ এলাকাতেই নমঃশূদ্র সমাজের বাস। প্রসঙ্গত কবি জসীমউদ্দিনের একটি অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। *সোজন বাদিয়ার ঘাট* গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

> আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে বহু চাষী মুসলমান ও নমশূদ্রের বাস। তাহাদের মধ্যে সামান্য ঘটনা লইয়া প্রায়ই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এইসব বিবাদে ধনী হিন্দু-মুসলমানেরা উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে আগাইয়া দেয়। মহাজন ও জমিদারদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। শোষণকারীরা পৃথিবীতে সকলেই এক জাতের। ইহাদের প্ররোচনায় হতভাগা নমশূদ্র ও মুসলমানদের যে অবস্থা হয়, তাহা চোখে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।[৪৪]

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রেণুকা বিশ্বাস সম্পাদিত *বাঙ্‌লার লোককবি সরকার বিজয় অধিকারীর গীতিমালা* গ্রন্থে বিজয় সরকারের সঙ্গে সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও মতিলাল বিশ্বাসের সাক্ষাতকার অংশটি *কবির সঙ্গে কিছুক্ষণ* শিরোনামে বিধৃত। এই অংশে তিনি তাঁর নিজ জীবন থেকে একাধিকবার জাতপাত নিয়ে মানুষের কুসংস্কারের পরিণতিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। খুলনা জেলার ব্রাহ্মণহাট স্টেশনের পাশে অবস্থিত ফকিরহাটে একবার কথক ও রাজেন্দ্র সরকার বায়না নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের ‘এঁটো ফেলে খেতে হবে’ শর্ত দিলে তাঁরা গান না গেয়েই চলে আসেন।

এই কবির সঙ্গে কিছুক্ষণ নামের গ্রন্থে তাঁর যে সাক্ষাৎকারটি রয়েছে তার থেকে আরেক একটি অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি। খুলনা জেলার বাগেরহাট সাবডিভিশনের সণ্ডিয়া গ্রামে তাঁরা একবার গান গাইতে গিয়েছিলেন। কবিগানের দলের সদস্যদের বিভিন্ন বাড়িতে ভাগ করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজয় সরকার ও নিশিকান্ত সরকারকে খাওয়ানোর দায়িত্ব পরল আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ নামের এক ব্যক্তির উপর। তিনি বর্ধমানের রাজপণ্ডিত। তাঁদেরকে পিতলের গ্লাসে জল দেওয়া হয়, কাঁসার গ্লাসে না দিয়ে, এর কারণ জানতে চাইলে গৃহস্বামী বলেন—

> বিজয়-নিশি, তোমরা জান কি না জানি না, কাঁসা হল গিয়ে মিশ্র ধাতু। মৌলিক ধাতুতে কোন জার্ম প্রবেশ করলে দুর্বা বালি দিয়ে মাজলে চলে যায়, কিন্তু মিশ্র ধাতুতে কোন জার্ম প্রবেশ করলে তা না পোড়ানো পর্যন্ত যায় না। এইজন্য পিতলের গ্লাসে জল দিয়েছি।[৪৫]

তাঁর এই ব্যাখ্যা শুনে খাওয়ার মাঝখান থেকেই সেদিন উঠে চলে যান। জাতিভেদের নামে সামাজিক কুসংস্কার কীভাবে বিবিধ প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল, তার দৃষ্টান্ত পণ্ডিত আশুতোষ ন্যায়তীর্থের আচরণ। আরও একটি দিক থেকে এই ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেই দিন আশুতোষ স্মৃতিতীর্থের সঙ্গে বিজয় সরকারের যুক্তিজাল বিস্তারের ঘটনাটি দৃষ্টান্তমূলক। কবির আসরে পাল্লা দেওয়ার সময়ে এইভাবেই যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন বিজয় সরকার। এরপরেই পরিস্থিতির বদল হয়। আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছুটে এসে বিজয় ও নিশিকান্ত সরকারকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অনুতাপের সঙ্গে তিনি বলেন—

> ...তোরা ফিরে আয়, আমি অন্যায় করেছি। তোদের কাছে মাপ চাচ্ছি, ফিরে আয়। আমারে এমন ধাক্কা কেউ কোনোদিন দেয়নি, দিলে আমার সংশোধন হয়ে যেত। তোরা আমারে এই ধাক্কা দিলি।[৪৬]

কথিত আছে বল্লালি কৌলীন্য প্রথার চাপেই নমঃশূদ্র সমাজের লোকেরা দেশের দক্ষিণ এলাকায় প্রায় জনমানবহীন পরিবেশে ডুমুদি গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বিজয় সরকারের পূর্বপুরুষেরাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কবি বিজয় সরকার একাধিক আসরে গীত পরিবেশনের সময়ে তাঁর প্রধান অস্ত্র সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই প্রতিবাদকে ব্যক্ত করেছিলেন। কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামি মানুষকে ধর্মের মূল তাৎপর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তখন ধর্মের নামে বড়ো হয়ে ওঠে আচার সর্বস্বতা। তাই তিনি গানের মাধ্যমে 'লোকভুলানো গোঁসাইগিরির' সমালোচনা করেছেন। জাতপাতের বৈষম্য, মানুষ মানুষে বিরোধ ঈশ্বরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তাই তিনি গানের মাধ্যমে মানুষকে শিখিয়েছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেহ বৃহৎ, কেহ ক্ষুদ্র। আচরণে ইতর-ভদ্র গুণ কর্ম অনুযায়ী।

দেশের যে অঞ্চলগুলিতে বিজয় সরকার কবিগান পরিবেশ করেছেন, সেই সব অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে জাতধর্মের পার্থক্য থাকলেও মোটের উপর এঁরা অধিকাংশই ছিলেন শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ। সারাদিনের কাজকর্মের পরে পরিশ্রান্ত এই মানুষরা ভিড় জমাতেন কবিগানের আসরে বিনোদনের প্রত্যাশায়। তিনি আত্মকথার একটি অংশে বলেছেন—

> ...আমার চিন্তা এই যে নমশূদ্র সমাজ নির্যাতিত, অবহেলিত। তাকে তুলে ধরার বান্ধব নেই সমাজে। তাদের কথা কেউ বলেনি বা শোনেনি। অবহেলায় পড়লে একটা ব্যথা বেদনা জাগে। কবিগানের মাধ্যমে এই ব্যথার কথা প্রকাশ হতো। তখন কবিগান মাঠে ঘাটে হ্যারিকেন, কুপি নিয়েই হতো। কবিগান তাই নমশূদ্র সমাজ সমর্থন করেছে। অসরে তাদের কথা বলবার সুযোগ হয়েছে।[৪৭]

সুদর্শন, সুকণ্ঠী গায়ক বিজয় সরকার তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। আত্মকথা *নদী চলে সাগর সন্ধানে*-র একটি অংশে তাঁর ওড়াকান্দির গুরুচাঁদ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জসীমুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ বিস্তারে বর্ণিত। আলোচ্য আত্মকথনটি বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি অমূল্য দলিল স্বরূপ।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত হরিপদ রায়ের আত্মকথন *সংগ্রামের জীবন* ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে 'জয়ঢাক' প্রকাশনা থেকে বের হয়েছে। কথকের জীবনের প্রথম দিকটি কেটেছিল পূর্ববাংলার বরিশালে, পরবর্তী দিনগুলি এপার বাংলায়। তাই বইটিতে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী কালের দুটো ছবিই পাওয়া যায়। বইটির মূল প্রসঙ্গ জাতব্যবস্থা, যা লেখকের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে ছিল। তিনটি পর্বে বইটি ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আছে তাঁর ছেলেবেলা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় আসার আগের সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী। দ্বিতীয় পর্বে বিধৃত তাঁর ডাক্তার হয়ে ওঠার কাহিনির সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ। তৃতীয় পর্বটিতে তিনি লিখেছেন রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি, সংরক্ষণ নিয়ে উচ্চবর্গের বিরোধিতা, নাগরিকত্ব বিলের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষদের আতঙ্কিত করে তোলা, মরিচঝাঁপি ঘটনার কারণে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিরূপতা ইত্যাদি নানা বিষয়।

প্রথম পর্বে তাঁর পারিবারিক জীবন, পড়াশোনা, গ্রামের অবস্থা, জাতপাতের পাশাপাশি ওই সময়ে ঘটে যাওয়া তৎকালীন সমাজের কিছু চিত্র, যেমন জমিদারদের

অত্যাচারের কাহিনি, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ছেলেবেলার নানা স্মৃতি।

গ্রামের এক মাইলের মধ্যে কোনো স্থায়ী বিদ্যালয় না থাকায় গুরুমশাই জোগাড় করে পাঠশালা চলত চতুর্থ শ্রেণি অবধি। সমস্যা হত তারপর পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে। উচ্চপ্রাথমিকে পড়তে হলে যেতে হত তিরিশ মাইল দূরে। সেই বাধা অতিক্রম করেও লেখক ভর্তি হন একটি বিদ্যালয়ে। থাকতেন রায়েরকাঠির জমিদারের বাড়িতে। নীচু জাত হওয়ার জন্য খেতে দেওয়া হত রান্নাঘরের চাতালে। বিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোতে বর্ণহিন্দু ছাড়া কাউকে মণ্ডপে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। তিনি আন্দোলন করে তা বন্ধ করেন। ছোটো থেকেই এইভাবে তাঁর মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বে তাঁর ডাক্তারি পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। কলকাতায় পড়তে এসে ভারত সেবাশ্রমে থাকার সুযোগ পান। ওই সময়েই তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সংস্পর্শে আসেন এবং যুক্ত হন 'শিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন'-এর সঙ্গে। এই পর্বেই শুরু হয় তাঁর অনগ্রসর, দলিত জাতির নানা কর্মকাণ্ডে যোগদান। এই সময় তাঁর যোগাযোগ হয় অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে। যা তাঁর ডাক্তার হওয়ার সংগ্রামে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। ইংরেজি ভাষা ছিল একটা প্রধান বাধা। তবে, স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়াতে তাঁর সুবিধা হয়েছিল। কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন যথেষ্ট, বুদ্ধিমত্তার জন্য সুনাম জুটেছিল প্রখ্যাত ডা. চুনিলাল মুখার্জির

কাছ থেকে। রাতে ডিউটি এবং দিনে ক্লাস, ডিগ্রি পাওয়ার আগে পর্যন্ত নানা ঘটনাবলী তিনি উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে আছে তৎকালীন নানা ধরনের অসুখ বিসুখের বর্ণনা। যেগুলি মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। জনস্বাস্থ্যের আলোচনাতে তাঁর এই স্মৃতিচারণা এখনও খুব প্রাসঙ্গিক।

আত্মকথনের তৃতীয় পর্বে আছে পদবি সংক্রান্ত সমস্যা। যা সমাজে আজও দৃশ্যমান। তাঁর পৈতৃক পদবি ছিল 'মৃধা'। পরবর্তীকালে তিনি পদবি বদলে 'রায়' করে নেন। পদবি বদল করার আগে অনেক ক্ষেত্রেই তার অনেক রোগী হাতছাড়া হয়েছিল। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বন্ধু বা সহকর্মী ডাক্তাররা অনেকেই রোগীর পদবি মণ্ডল, নস্কর কিংবা বাগদি শুনলেই অবজ্ঞা বা উষ্মা দেখায়।

তিনি পোর্টের চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৫৪ সালে। হিন্দু মহাসভাতে প্রথমে যুক্ত হলেও পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। যদিও তার সদস্যপদ নেননি। সরকার কথিত ১৯৩৫ সালের সংরক্ষণ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার প্রতিবাদে তিনি নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ছোটো থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ও তপশিলি জাতির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের আন্দোলনে তিনি এক অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছিলেন, এই বইটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।[৪৮]

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের এক নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারের মানুষ ছিলেন নির্মল গায়েন। পৌন্ড্র সম্প্রদায়ভুক্ত এই মানুষটির আত্মজীবনী *লাঙল কলম,* ২০২১ সালে 'পালক' পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। হিঙ্গলগঞ্জের মানুষ, কৃষক পরিবারের সন্তান। বংশের প্রথম প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত

এই মানুষটি জীবনের বেশিরভাগ সময় সুন্দরবনের কৃষকদের অধিকার অর্জনের পথে ঐক্যবদ্ধ করার পিছনে ব্যয় করেছেন। বর্তমানে আছেন সি.পি.আই পার্টির বারাসাত আঞ্চলিক পরিষদে সম্পাদকের পদের দায়িত্বে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া তাঁর শিশুমনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। একদিন যোগেশগঞ্জ বাজারে দিনের বেলায় অঞ্চলপ্রধান স্বপন মণ্ডল মাদার নামে এক মুচিকে বেদম লাঠিপেটা করেন কেবলমাত্র গোরুকে বিষ খাইয়ে মারার সন্দেহের ভিত্তিতে। ঐ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পরও মাদার বেঁচে ছিলেন এবং অন্য গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

> ...মাদার বাকশূন্য, মনে হল যেন জ্ঞান হারিয়েছে। আমরা দু'জন এগিয়ে গেলাম। বললাম আর মারবেন না। লোকটা মরে যাবে। অঞ্চলের বিত্তশালী মণ্ডল বাড়ির ছোটবাবু, যোগেশগঞ্জের বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তি। যোগেশগঞ্জ হাইস্কুলের সম্পাদক, যোগেশগঞ্জ বাজারটা তাঁদেরই। সুতরাং এহেন ক্ষমতাবান অঞ্চল প্রধান ছোটবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করার সাধ্য নেই কারও বরং বাবুর প্রসাদভাগী অনুগত জনেরা বাবুর বীরত্বের ও শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার কথা শুনে বাবু রেগে গেলেন। ওখানে না থেকে চলে যেতে বললেন। সেদিন প্রতিবাদ করবার সাহস পেলাম না, কিন্তু নিষ্ঠুর গ্রামীন ভূস্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। ...এই ধরনের মুচি পেটানোর ঘটনা ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। আমাদের গ্রামের পুলিন ঋষি, তাকে পুলিনদা বলে ডাকতাম। গরুকে বিষ খাওয়ানোর মিথ্যা অপরাধে দুলদুলির অঞ্চলপ্রধানের নির্মম আঘাতে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এসকল দলিত পরিবারগুলো পরিবেশকে দূষনের হাত থেকে রক্ষা করলেও সামাজিক স্বীকৃতির বদলে লাঞ্ছনা, উৎপীড়নের শিকার হয়।[৪৯]

এর পরেই তিনি লিখেছেন ডাক্তার পায়েল তাড়ভি, সেন্থিল কুমার, মাদারই ভেঙ্কটেশ, পুল্লালা রাজু, রোহিত ভেমুলা, বাল মুকুন্দ ভারতী, অনিল কুমার মীনা প্রমুখদের ধারাবাহিক মৃত্যু-ইতিহাস ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয়

সংস্কৃতির অশনি সংকেত। প্রবল হতাশায় রোহিত ভেমুলা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ‘My birth is my fatal accident?’ আখলাক, জুনেইদিন প্রভৃতির খুন ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় অত্যাচারের নিকৃষ্ট নিদর্শন। জন্মকালীন দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পেতে, ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে প্রয়োজন সামগ্রিক লড়াইয়ের। ব্যক্তিমানুষ এই লড়াইতে পরাজিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই হতাশা ক্রমে তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। একক লড়াই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। একার লড়াইকে বহুর লড়াইয়ে নিয়ে যেতে দাভোলকর, গোবিন্দ পানসারে পথ দেখিয়েছেন।

আলোচ্য আত্মজীবনীটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ইতিহাস সংলগ্নতা। সেই ইতিহাস কখনও আর্থ-সামাজিক, কখনও আবার রাজনৈতিক। তিনি নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত আকারে আর্যদের ইতিহাস, ভারতবর্ষের জাত-সম্প্রদায় ভিত্তিক ইতিহাস, পুরাকালীন তথ্যের অনুসন্ধান করে সিন্ধু সভ্যতা ও ভারতীয় উপমহাদেশের যুগ বিভাজন ভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন — ব্যক্তিজীবন ও সমষ্টির ইতিহাস এইখানে হাত ধরাধরি করে চলে প্রায়শই। আর এই ইতিহাস চেতনার হাত ধরেই আছে আত্মবিশ্লেষণ, প্রয়োজনে আত্মসমালোচনা। বর্তমানে শোষিত শ্রেণির কাছে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস হারিয়েছে তা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। উঠে এসেছে দেশভাগ-বাংলাভাগ, তেভাগার দ্বিতীয় পর্যায়, দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ। দেশভাগের পর ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের সংগ্রামী কৃষকরা ভাগ হয়ে যান দুই দেশে। পরবর্তী সময়ে নতুন করে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি গঠিত হয়। এই পর্যায়ে লেখক তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহের কথাও আলোচনা করেছেন। এসেছে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির একাধিক

সংগ্রামের বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত এই অংশে তাঁর বিশ্লেষণ, যা বর্তমান সময়ের বামপন্থী রাজনীতির আদর্শভিত্তিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

> ...চিন বিপ্লব, বিশ্ব জনগণের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রাম, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুক্তির সংগ্রাম আমাদেরকেও অনুপ্রাণিত করল। এক্ষেত্রে আমাদের দেশেও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলন বা শ্রেণিসংগ্রামের সূত্রপাত। কিন্তু আমাদের দেশে এই আন্দোলনের পিছনে ছিল বহুবিধ সমস্যা যা ভারতের কমিউনিস্টদের কাজকর্মে ধরা পড়ল না। চিনের সমস্যা ছিল দ্বিবিধ। জারতন্ত্র থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাদ্বয়কে সামনে রেখে চিনের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী মার্কবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ অস্ত্রকে প্রয়োগ করে চিন সফলতা অর্জন করল। চিনের সামন্তবাদী ভূস্বামী ও কৃষকরা ছিলেন ৯০ শতাংশ হান জাতির মানুষ। অপরদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় সমাজ ছিল স্তর বিভক্ত। সবচেয়ে উপরের স্তরে ছিল ব্রাহ্মণ ও অন্য দ্বিজবর্ণগুলির অবস্থান। সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল অস্পৃশ্য জাতিগুলি। মধ্যে ছিল অনেকগুলি কৃষক ও হস্তশিল্পী জাতি। এই ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি সামাজিক উৎপাদনে কোন ভূমিকা পালন করবেন এবং ফলত সামাজিক উৎপন্ন কতটুকু অংশ ভোগ করবেন তা প্রধানত নির্ধারিত হত তার সামাজিক অবস্থান দিয়ে। নিম্নবর্ণের মানুষদের ছিল না শিক্ষার অধিকার বা সম্পত্তি অর্জনের অধিকার। যেমন পাঞ্জাবে দলিতরা জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। সমগ্র দেশের সম্পত্তির মালিকানা ২.৮ শতাংশ জমি, সমগ্র দেশের সম্পত্তির মালিকানা, শিক্ষার অধিকার, আধুনিক এবং উচ্চস্তরের সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া প্রাধান্যের জোরে উচ্চবর্ণগুলি নিম্নবর্ণের মানুষদের, বিশেষত দলিতদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে। এই নিপীড়ণই উদ্বৃত্ত আহরণের হাতিয়ার। ভারতের কমিউনিস্টরা এই দিকটা উপেক্ষা করলেন।[৫০]

আলোচ্য দলিত মানুষটির আত্মজীবনীর বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণভিত্তিক একমুখী গতিপথটিই তাকে সমাজতাত্ত্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে এবং সামাজিক ও ব্যক্তির অস্তিত্বগত অবস্থার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করেছে। এই পথেই দলিত আত্মজীবনীতে

সামাজিক বাস্তবতাটি তুলে ধরা হয়ে থাকে। সেখানে বিভিন্ন বর্ণের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বাস্তব রূপটিকে পরিবর্তন না করে, আখ্যানভঙ্গির মধ্যে সৃজনশীল কল্পনা জুড়ে দেওয়া হয়। এইখানে আখ্যানটি এমনভাবে নির্মিত হয় যে, সাহিত্য হিসাবে সেটি অনন্য পরিচয়ের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই সাহিত্যে লেখক, আখ্যান এবং বিষয়বস্তু সাধারণভাবে সামাজিক বাস্তবতায় একত্র হয়ে যায়। দলিত সাহিত্য কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক স্তরেই নয়, সাংস্কৃতিক স্তরেও একটি অবিরাম সংগ্রামের অসাধারণ সম্ভাবনার কথা বলে— আন্দোলন এবং সৃজনশীল কল্পনার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

---

১. সরদার, রাইচরণ, *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা,* রাধারানি প্রেস, ক্যানিং টাউন, ১৩৬৬, পুনর্মুদ্রণ সনৎ কুমার নাম নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র-মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২, পৃ. ২৫৮

২. সরদার, রাইচরণ, *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা,* রাধারানি প্রেস, ক্যানিং টাউন, ১৩৬৬, পুনর্মুদ্রণ সনৎ কুমার নাম নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র-মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২, পৃ. ২৭২

৩. সরদার, রাইচরণ, *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা,* রাধারানি প্রেস, ক্যানিং টাউন, ১৩৬৬, পুনর্মুদ্রণ সনৎ কুমার নাম নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র-মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২, পৃ. ৫

৪. সরকার, রাজেন্দ্রনাথ, *জীবনকথা,* সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র-মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২, পৃ. ৪৭

৫. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ, *উত্তর বাংলা সেকালে ও আমার জীবনস্মৃতি,* জলপাইগুড়ি, বিজয়চন্দ্র বর্মন, ১৯৮৫, পৃ. ৫৩

৬. গোস্বামী, সুধামুখী, *আত্মজীবনীর মতো,* বানী আর্ট প্রেস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৬

৭. গোস্বামী, বনমালী, *অবর বেলায় পাড়ি,* বানী আর্ট প্রেস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭

৮. বিশ্বাস, মনোহর মৌলী, *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৩

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১০. বড়াল, মনোরঞ্জন, *আত্মকথা,* প্রবাহ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৪

১১. বিশ্বাস, জগবন্ধু, *স্মৃতির পাতা থেকে,* শিল্পনগরী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৫৭

১২. দাস, রাজু, *একজন রিক্সাওয়ালার আত্মকথা,* জনমন প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

১৬. বিশ্বাস, দেবব্রত, *ব্রত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৪

১৭. বিশ্বাস, কান্তি, *আমার জীবন: কিছু কথা,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৩৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

১৯. বিশ্বাস, মহীতোষ, *দিল এল দিল গেল,* মাঙ্গলিক, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃ. ২০

২০. বিশ্বাস, বিভুতিভূষণ, *গেঁয়ো ভূতের আত্মকথা,* কল্পতরু প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩১

২১. বিশ্বাস, মনোহর মৌলী, প্রামানিক, শ্যামলকুমার ও বিশ্বাস, অসিত (সম্পাদিত), *শতবর্ষে বাঙলা দলিত সাহিত্য,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২১

২২. বিশ্বাস, অনিল রঞ্জন, 'কলেজ প্রাঙ্গনে', *শতবর্ষে বাঙলা দলিত সাহিত্য,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭৫

২৩. সরকার, মনরঞ্জন, 'প্রাথমিক জীবন ও পরিবেশ', *শতবর্ষে বাঙলা দলিত সাহিত্য,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮১

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

২৫. মণ্ডল, মহীতোষ, 'আমি দলিত', *শতবর্ষে বাঙলা দলিত সাহিত্য,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৩০. জলদাস, হরিশংকর, *নোনাজলে ডুবসাঁতার,* প্রথমা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৯

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৩৭. প্রামানিক, শ্যামল, *প্রান্তজনের আত্মকথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৮

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৪৩. সরকার, বিজয়, *নদী চলে সাগর সন্ধানে,* মহসিন হোসাইন (সম্পাদিত), ৪৪. নন্দী, রতন কুমার, *লোককবি বিজয় সরকার,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৫৬

৪৫. সরকার, বিজয়, *নদী চলে সাগর সন্ধানে,* মহসিন হোসাইন (সম্পাদিত), মনন প্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৫৭

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৪৮. রায়, হরিপদ, *সংগ্রামের জীবন,* জয়ঢাক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ১৬

৪৯. গায়েন, নির্মল, *লাঙল কলম,* পালক পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৫৩

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

নারী এবং দলিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্বালোকন

পঞ্চম অধ্যায়

নারী এবং দলিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পূর্বালোকন

বর্ণভেদ প্রথার অন্যতম বিষময় ফল সমাজে নারীর অবস্থানগত অবমূল্যায়ন। হিন্দু সমাজে পিছিয়ে থাকা অংশ নারী এবং দলিত। যদিও দুইয়ের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত ফারাক রয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিক বিবেচনায় মনে হয় উচ্চবর্ণের নারীদের অবস্থান দলিতদের চাইতে খানিক উন্নত। ফলে যখন আমরা দলিত নারীর কথা ভাবতে চাই, তখন বুঝতে পারি দলিত নারীর জীবন নারী ও দলিত এই দুই অবলম্বহীন সত্তার যোগফল। আমরা যখন দলিত নারীর আত্মজীবনী অংশে দৃষ্টি ফেরাই, তখন সেই অভিজ্ঞতা আরও ভয়ংকর এক পাঠ অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। তাই সার্বিকভাবে দলিত নারীর আত্মকথার সরূপ বুঝে নিতে আমাদের জেনে নিতে হয় ১) হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান, ২) সেই বৃত্তের মধ্যে দলিত নারীর অবস্থান।

বৈদিক যুগে নারী

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের বিষয় ভাবনা নিয়ে এই অংশের আলোচনা শুরু করা যায়। যেমন— অগ্নি মানুষের স্তুতি তেমন ভাবেই উপভোগ করেন, যেমন ভাবে প্রেমিক পতি তার স্ত্রীকে উপভোগ করে। কিংবা আমাদের স্তুতি তোমাকে তেমন ভাবে স্পর্শ করুক, যেমন ভাবে স্বামীর স্পর্শে স্ত্রীর কামনা জেগে ওঠে। অথবা, অগ্নি স্বামীর দ্বারা সম্মানিতা স্ত্রীর

মতোই পবিত্র। লক্ষ করা যেতে পারে দেবতার পবিত্রতা এখানে মর্ত্যে নারীর পবিত্রতার সঙ্গে তুলনীয়। এভাবে একের-পর-এক চিত্রকল্পে নারীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারী পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ভক্তের ইষ্টদেবতার প্রতি প্রার্থনায়।

সূর্য ঊষার পিছন পিছন যান, যেমন পুরুষ যায় নারীর পিছন পিছন। সূর্য ঊষার উপপতি; 'জারোন' করে করে ব্যবহৃত এই অংশটির মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে। পিতা – কন্যার মধ্যেকার সম্পর্ক ঋগ্বেদের নাভানেদিষ্ঠ সূক্তের বিষয়। ভাই-বোনের মধ্যে অজাচারী সম্পর্কের ওপর বর্ণিত আখ্যান যম-যমী সংবাদ অন্য একটি সূক্তের বিষয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত থেকে জানতে পারা যায় অবিবাহিতা নারী তার স্বামী বেছে নিতে পারে। মনে রাখতে হবে এসবই উচ্চবংশীয় (দেবযোনি) সমাজের ব্যতিক্রমী কাহিনি। এর পাশাপাশি সাধারণ গৃহস্থ নারীর কী কর্তব্য, সে সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্যে কোনো নির্দেশিকা কিংবা সূক্ত নেই। শুধু এটুকু বলা আছে যে, তারা নদী বা দিঘি থেকে জল আনতে পারে, আর ক্ষেতের দেখভাল করতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণে আবার নারীর পশম পাকানোর কথা বলা হয়েছে। গৃহস্থ নারীর এই কর্তব্য (সন্তান ধারণ ছাড়া) শূদ্র সমাজ থেকে নেওয়া, যে সমাজে নারী ফসল ফলাতো। আর পশুচারী আর্যদের নারীকুল পশম পাকাতো বস্ত্র তৈরির জন্য। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, সেই প্রাচীন সময় থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের অন্দরমহল আছে, দলিত নারীদের নেই। সামাজিক অবস্থানগত কারণে তাদের জীবনে প্রায় কোনো আড়াল নেই। আমরা যখন

দলিত নারীর আত্মজীবনী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব, তখন এই তথ্যটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

আমরা অতীত অনুসন্ধান অংশের আলোচনায় উল্লেখ করেছি সেকালে শূদ্রারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। কথাটা সমর্থন মেলে ঋগ্বেদে। সেখানে নারীর যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার সাক্ষ্য আছে। মুদ্ গলিনীর যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্তের পাশাপাশি দশম মণ্ডলে বিশ্পলা নামের একজন নারী যুদ্ধে একটি পা, আর বধ্রিমতী একটি হাত হারান। বধ্রিমতি এবং শশীয়সী তাঁদের বীরত্বের জন্য ঋগ্বেদে উল্লেখিত হয়েছেন।

দেবগণ ও পিতৃগণকে দৈনন্দিন জল দেওয়ার প্রসঙ্গে এমন চার নারীর নাম পাওয়া যায়, যাঁদের উদ্দেশেও জল দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই চার নারী হলেন গার্গী, বাচক্মবী, বাড়বা আত্রেয়ী এবং সুলভা মৈত্রেয়ী। এছাড়া বেদের ছয় অধ্যয়নের অন্তে উৎসর্গ দিবসে একটি অনুষ্ঠান হত; অন্যান্য শ্রদ্ধার্হদের মধ্যে সেখানে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীকেও আসন দেওয়া হত। এখানে এসে তাই সংশয় তৈরি হয় কবে, কেমনভাবে এবং কেন নারী তার মানবিক এবং সামাজিক সম্মান হারাল?

বৈদিক যুগের প্রারাম্ভে যেখানে ঋগ্বেদে ঊষাকে সূর্যের পত্নী বলা হচ্ছে। যে স্বামীর আগে আগে যায়, এ নিশ্চিতভাবে সেই সময়ের এবং সমাজের প্রতিচ্ছবি, যখনও ‘ইন্দ্রপ্রথা’র চল হয়নি। সমাজ নিয়ন্ত্রিত ছিল মিত্র-বরুণ আর সোম দেবতার সূক্তিতে। প্রায় তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতভাবেই গৃহকর্মে নারীর নির্বাসন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর

পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধার্মীয়, সাংস্কৃতিক কী কী শক্তি কাজ করেছিল, তা বুঝতে গেলে আমাদের বৈদিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তনের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে হবে। আদি বৈদিক যুগের মানুষেরা যখন যাযাবর ও পশুপালক থেকে কৃষিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থিত হচ্ছিল, তখন উন্নততর প্রযুক্তি আর লোহার লাঙলের ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদনে আশ্চর্য রকমের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল, আর তারই অনুসারে মধ্যপ্রাচ্য, গ্রিস, রোমের সঙ্গে নৌ-বাণিজ্যের সূত্রে সাফল্য আসায়, সমাজে সংখ্যালঘু একটি অংশের হাতে অপরিমিত অর্থ ও সম্পদ উদ্বৃত্ত হল। এই সংখ্যালঘু শ্রেণির তখন আকাঙ্ক্ষা হল তাদের অর্জিত উদ্বৃত্ত ধন-সম্পদ তাদের প্রকৃত সন্তান-সন্ততির হাতে অর্থাৎ, যে পুত্রদের তারা তাদের পত্নীদের গর্ভে উৎপন্ন করেছে, তাদের হাতে দিয়ে যাওয়ার। সন্তান পরম্পরা নির্দিষ্ট করতে এবং পুত্রদের তাদের ঔরসজাত পুত্র বলে চিহ্নিত করতে স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গ নিবৃত্ত করা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। একটি আনুষ্ঠানিক আপাতচুক্তি অবরোধের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যার সারার্থ পত্নীকে পুরুষসঙ্গ থেকে নিরুদ্ধ করতে হবে। কারণ পরলোকে শুধুমাত্র জন্মদাতাই পিণ্ড-তর্পণাদি লাভ করে; স্বামী নয়। প্রকৃত কারণ অবশ্যই ইহলৌকিক। পিতা পুত্রকে সম্পত্তি দান করার আগে অবশ্যই নিঃসন্দেহে জানাবে, সে তার নিজেরই পুত্র, অপর কারও নয়। এরই ফলে নারী বন্দি হল অবরোধে, যেখানে অনাত্মীয় পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। এই পথেই উচ্চতর শ্রেণির নারীরা খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই উৎপাদন মূলক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। যে শ্রমকে ধনমূল্যে পরিণত করা যায়। এইভাবে উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে নারীকে

সরিয়ে দিয়ে তার অর্থনৈতিক, যা একাধারে শিক্ষাগত বিভেদের সঙ্গেও যুক্ত তা নারীর সামাজিক অবস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করেছিল। আর তারই নিদর্শন পাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের স্ত্রী, স্বামীর অনুগামী হবে এমন একটি ভাবনার। এই মতের সমর্থন কিংবা পুনরাবৃত্তি মেলে শতপথ ব্রাহ্মণ, মৈত্রায়নী সংহিতায়। যার সারমর্ম নারী তার স্বামীর পথ অনুসরণ করবে; অর্থাৎ ছায়াগামিণী হবে। মৈত্রায়নী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাই সেই অমোঘ বচন— নারীকে শৈশবে পিতা রক্ষা করবে, যৌবনে স্বামী রক্ষা করবে, আর বার্ধক্যে রক্ষা করবে পুত্র। স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'অগ্নিপত্নীবৎ' অনুষ্ঠানে যেমন হবিকে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়, ঠিক তেমন ভাবেই পত্নীকে প্রহার করা উচিত, যাতে তার নিজের শরীরের ওপর বা সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার না জন্মায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, স্ত্রী যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী প্রথমে কোমল ভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে, তারপর উপহার দিয়ে তাকে কিনে নিতে চেষ্টা করবে (অবক্রীনীয়াৎ) এবং তার পরেও স্ত্রী রাজি না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বাধ্য করতে হবে। মৈত্রায়নী সংহিতায় বলা হয়েছে নারী মিথ্যা, আর তারা দুর্ভাগ্য আনে পুরুষের জীবনে। তৈত্তরীয় সংহিতায় আবার বলা হয়েছে নারীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম মদ বা জুয়ার মতো ব্যসন মাত্র। অর্থাৎ, নারী শরীরসর্বস্ব কামনার আধার। বৈয়াকরণ যস্ক বলেছেন, যা থেকে কাম উৎপন্ন হয়, তাই কামনা। কামনা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কাম কেন্দ্রিক। আর যৌনতা শব্দটি যোনি বিষয়ক, যার সঙ্গে বিবাহ প্রসঙ্গ জুড়ে আছে। এখানে আর একটি প্রাসঙ্গিক

তথ্যের উল্লেখ করা যায়। সেকালে নারীকে যে মেধাহীন শরীর সর্বস্ব যৌনতার প্রতীক মানা হত, তার অন্যতম উদ্দেশ্য সুস্থ-সবল পুত্র উৎপাদন। এই কারণে যোনি এবং যোনি পীঠের বিভিন্ন আকার, আকৃতি এবং তাদের ফলাফল নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। যোনিকে মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এবং আরও বলা হয়েছে যোনির বাম ভাগ উন্নত হলে স্ত্রী কন্যার জন্ম দেবে, আর দক্ষিণ ভাগ উন্নত হলে পুত্র। পুরুষের কাছে নিজের বিবাহিত স্ত্রী কেবলমাত্র পুত্র উৎপাদক। আর তার যৌন লালসা মেটানোর দায় নগরনটী কিংবা বারবিলাসিনীদের।

এই সময় থেকেই পুরুষের বহুবিবাহ সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষের দুটি বিবাহের সমর্থনে তৈত্তরীয় সংহিতা ও তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে একটি যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের ছদ্মযুক্তি দেওয়া হয়েছে। যুক্তিটি প্রতিতুলনামূলক। যেহেতু দুটি বস্ত্রখণ্ড একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে, বিপরীতটি হয় না, অতএব নারীর দুই স্বামী থাকতে পারে না। কিন্তু পুরুষের দুই স্ত্রী শাস্ত্রসম্মত (এক্ষেত্রে নারীকে কাপড়ের সঙ্গে আর পুরুষকে লাঠির সঙ্গে প্রতিতুলনা করা হয়েছে)। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যে আর্যরা কৃষিসমাজে রপ্ত হয়ে ওঠে। এর দরুন জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। যে কারণে নারীকে ক্ষেত্র (কৃষি ক্ষেত) কল্পনা করে কবিরা বলেছেন সেই ক্ষেতে পুরুষ তার বীজ (বীর্য) বপন করবে। স্পষ্টতই এই কল্পনা পুরুষতান্ত্রিক। কারণ বীজ আর ক্ষেত্র দুইয়ের অধিকারী পুরুষ, তাই উৎপন্ন ফসলের (এক্ষেত্রে পুত্র সন্তান) অধিকারী একমাত্র পুরুষ, নারীর

এখানে অবদান থাকলেও কোনো অধিকার নেই। এই কারণে গর্ভাধান নামের অনুষ্ঠানে পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা আছে। অথর্ববেদেও সেই একই পুত্র সন্তানের জন্য অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য থেকেই আমাদের সমাজে পুত্র সন্তানের প্রতি সমাজের পক্ষপাত অত্যন্ত প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে স্পষ্ট ভাবে পুত্রকে জীবনের আশীর্বাদ আর কন্যা সন্তানকে অভিশাপ বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞরা বিধান দিয়ে গেছেন যে পুরুষের পুত্র নেই, তার গতি পূত নরকে। এজন্যে স্বয়ংজাত পুত্র ছাড়াও আরও এগারো রকমের পুত্রের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে 'হীনযোনিধৃতা' পুত্র, যে শূদ্রার গর্ভের জন্মেছে সে ছাড়া বাকি সব পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী। এর মধ্যে 'স্বৈরিণীজ' (স্বৈরিণী স্ত্রীর গর্ভে অন্য কোনো সমানজাতীয় বা উত্তমজাতীয় পুরুষ যে পুত্র উৎপন্ন করে) বা 'কৃত্রিম' পুত্রও (যদি কোনো বালক স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাউকে পিতা সম্বোধন করে) মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী। এর পাশাপাশি শতপথ ব্রাহ্মণে (সম্ভবত অষ্টম-সপ্তম খ্রিস্টপূর্ব শতক) বলা হয়েছে স্বামীর সম্পত্তির ওপরে স্ত্রীর কোনো অধিকার নেই। এমনকি নিজের শরীরের ওপরেও নয়। তৈত্তরীয় সংহিতায় স্পষ্ট বলা হয়েছে নারী কেবলমাত্র যৌন সম্ভোগের বস্তু। গোরু, জমি, নারীকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করা ঠিক নয়। অন্যথায় তারা হয় মরবে, নয়তো রুগ্‌ণ হয়ে পড়বে। এখানে যে কথাটা বলার 'সতী' শব্দের কোনো পুরুষ বাচক শব্দ সংস্কৃত অভিধানে নেই।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে গণিকাবৃত্তির নিদর্শন রয়েছে। বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে, রাজগৃহে সালাবতী প্রতি রাতে একশো কার্যাপন দাবি করতেন। আবার আম্রপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। গণিকা থাকত প্রাসাদে, প্রাচুর্যের মধ্যে। তার ছিল বহু দাস-দাসী, কুট্টনি, বিট, পীঠমর্দ, পুরুষ সেবক ও সঙ্গীতকারী। অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় গণিকারা প্রায় স্বাধীনভাবে ধনী হত। ধম্মপদের টীকায় সালাবতীর কন্যা সিরিমার প্রতিরাতে হাজার পণ উপার্জন করার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বেশ্যালয়ের গণিকারাই হোক, কিংবা মন্দিরের দেবদাসী, কোনো বারাঙ্গানাই নিজস্ব নিরাপত্তা পায়নি। গৌতম বুদ্ধের ধর্মসূত্রে স্পষ্টত বলা হয়েছে বেশ্যা হত্যা অপরাধ নয়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল, যার আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব বারোশো থেকে হাজার বছরের মধ্যে, সেখানে কয়েকজন নারী কবির নাম পাওয়া যায়। যেমন ঘোষা, শাশ্বতী, রোমশা, লোপামুদ্রা, অপলা, বিশ্ববারা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঋগ্বেদে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌ (অর্থাৎ বাণী) তিনি যাবতীয় প্রধান দেবতাদের যথার্থ মূর্ত রূপ হিসেবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় বেদান্ত দর্শনের ভিত্তিভূমিতে যে সোহম্‌ (অর্থাৎ আমি সেই) তত্ত্ব আছে তিনি তাই উচ্চারণ করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের যুগে অবশ্য কোনো সৃজনশীল কাজে মেয়েদের যোগদানের প্রসঙ্গ নেই। ইতোমধ্যে মেয়েরা উপনয়নের অধিকার হারিয়েছে, তার ফলে শাস্ত্রজ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত হল। উপনিষদে মেয়েরা কদাচিৎ কোনো কথা বলেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীর মধ্যে সম্পদের বাঁটোয়ারা করে দিতে চেয়েছিলেন। মৈত্রেয়ী দৃঢ় কণ্ঠে সেই ঐহিক সম্পদ প্রত্যাখ্যান করেন। অন্য দিকে গার্গীর সঙ্গে বিতর্কে পুরোপুরি কোনঠাসা হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন আর কথা বাড়িও না। নাহলে তোমার মাথা খসে পড়বে। প্রায় একই ঘটনার উল্লেখ আছে মহাভারতে। সেখানে সুলভা নামে এক প্রবীণা নারী এসেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করতে। তাঁর চরিত্র, যৌন মতলব আর উদ্দেশ্য নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য এমন অপমানকর ইঙ্গিত করেন যে, সেই নারী স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে মহাকাব্যে ভার্গব সংযোজিত অংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নারীর সামাজিক অবনমন। ভার্গব অংশে নারীকে বশ্যতা স্বীকার করানোর উদ্দেশ্যে অসংখ্য উপাখ্যান আর নীতিমূলক কাহিনি রচনা করা হয়। সমসাময়িক গুপ্তযুগে একটি দৃশ্যে দেখা প্রথমবার দেখানো হয়েছে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন।

মৈত্রায়নী সংহিতা-য় যেখানে বলছে নারী অশুভ (৩।৮।৩), *তৈত্তরীয় সংহিতা*-তেও একই কথা বলা হয়েছে (৬।৫।৮।২)। যার সারমর্ম যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না। আর *শতপথ ব্রাহ্মণ* বলছে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কী? 'স্ত্রী', শূদ্র, কুকুর, কাক এদের দেখো না, নইলে শ্রী ও পাপ, জ্যোতি ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা মিশে যাবে। স্ত্রী দাস ও শূদ্র খাবে এঁটো, উচ্ছিষ্ট খাবার। সবচেয়ে স্পষ্ট করে বলা আছে আপস্তম্ব ধর্মসূত্রতে। কাক, শকুন, নেউল, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়,

নারীহত্যা, ও শূদ্র হত্যাতেও সেই একই পায়শ্চিত্ত; অর্থাৎ মাত্র এক দিনের কৃচ্ছসাধনের বিধান দেওয়া আছে।[১]

মহাকাব্যে নারী

রচনাকালের দিক থেকে *রামায়ণ* খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত। *মহাভারত*-এর রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন'শো বছরের মধ্যে এই দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে *রামায়ণ* লেখা শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*, *শ্রীমদ্ভগবতগীতা* এবং *মনুস্মৃতি* এই ক্রান্তিকালের মধ্যে রচিত। এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলি রচনা। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ পরবর্তীকালে সংযোজিত অংশগুলিতে যে শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের রমরমা দেখা যায় তারই বিবর্তিত রূপ ক্রমে হিন্দুধর্ম বলে প্রচারিত হয়। এদিকে *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর মূল কাহিনি দুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকালে থেকেই গাথায় ও আখ্যানে জনমানসে সঞ্চরণ করেছিল। ফলে মহাকাব্য দুটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দুটি ছবি পাওয়া যায়। একটি মূল কাহিনি, অন্যটি সংযোজিত অংশ। নারীর অবস্থান এই দুটি পর্যায়ে স্পষ্টতই আলাদা।

রামায়ণ-এ কৈকেয়ীয় শাসন হল রাজা দশরথকে পূর্ণ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করা। লক্ষ্মণ বনগমন করলেও উর্মিলা তার সঙ্গে না গিয়ে প্রাসাদেই থেকে যান; কোনো নিয়মে নয়।

অন্য দিকে রামের সঙ্গ চেয়ে সীতা বনবাসে যান স্বাধীন ইচ্ছায়। মন্দোদরী তাঁর স্বামী রাবণের রূপ, গুণ, শৌর্য, চরিত্রের প্রশংসা করা সত্বেও রাবণেকে তাঁর অবিবেচক সিদ্ধান্তে রাক্ষসকুলকে অনাথ করার জন্য দায়ী করতে ছাড়েননি। যে সীতা প্রাচীনতর উপাখ্যানের নায়িকা, যিনি পতিব্রতা বলে নয়, রামকে ভালোবাসতেন বলে স্বেচ্ছায়, সানন্দে তাঁর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, কর্তব্য বা পতিব্রতা ধর্ম পালন করার জন্য নয়। পরবর্তীকালে ভার্গব সংযোজন একে পতিব্রতা ধর্মে বলে দেগে দিয়ে ম্লান করে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের মহিমাকে। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সীতা তাঁকে যে শুধুমাত্র পতিব্রতা ধর্ম থেকে নয়, বরং প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে বলছেন, যে তুমি রামের প্রিয় বধূকে চাইছো রাক্ষস। পরবর্তীকালে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান যত্রতত্র প্রক্ষিপ্তভাবে মিশে একটি ক্ষত্রিয় বীরের কাহিনিকে কীভাবে ধর্মগ্রন্থে পরিণত করে আর ক্ষত্রিয়বীরকে কীভাবে অবতারে পরিণত করার পাশাপাশি নারীকে স্বামীর পদচ্ছায়ায় ঠেলে দেয়, তা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

মহাভারত-এর বনপর্বে যে *রামায়ণ*-এর কাহিনি পাই সেখানে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করে আনা সীতাকে রাম স্পষ্ট জানিয়ে দেন— সীতা সচ্চরিত্রই হোক, আর দুশ্চরিত্র, রাম আর তাঁকে ভোগ করতে পারেন না। কারণ সীতা এখন সেই ঘিয়ের মতো, যা কুকুর লেহন করেছে। এরপরই রাম একথাও জানিয়ে দেন যে, তাঁর যুদ্ধ করার আসল কারণ

সীতার সুরক্ষা নয়, ঈক্ষ্বাকু বংশের মর্যাদা রক্ষা করা। পাশাপাশি রামের স্ত্রী হয়ে সীতা রাবণের প্রাসাদে জরাপ্রাপ্ত হলে তা রামের শৌর্যের হানি ঘটায়; সেটাই এই যুদ্ধের কারণ।

অর্থাৎ লোকাপবাদের কথা ওঠবার আগেই রাম নিজেই সর্বপ্রথম সীতাকে অপবাদ দিয়েছিলেন। অসহায় নারীকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এই হল তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ। সীতা প্রত্যুত্তরে বললেন— ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি, তুমি কি চেননি আমাকে? মনে পড়ে যাবে গৌতমের অহল্যাকে মর্মান্তিক শাপ দেওয়ার বৃত্তান্ত। মনের শুচিতা ও দেহের শুচিতাকে সেদিনও সমাজ পৃথক বলে বিবেচনা করেনি, আজও করে না। রামের এই নৈতিক আত্মতুষ্টি ও দুষ্কৃতকারীর শাস্তিবিধানের ভূমিকাটি এসেছিল তৎকালীন সমাজের স্ত্রী-পুরুষের আপেক্ষিক মূল্যবোধ থেকে, যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

মহাভারত-এর প্রসঙ্গ এলে দেখা যায় এর আদিমতম অংশ থেকে শেষতম অংশের ব্যবধান অন্তত আটশো বছর। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সমাজ একই অবস্থায় থাকেনি। ফলে বিবর্তনের ছবিও *মহাভারত*-এ স্পষ্টতর। এর শেষতম অর্থাৎ দ্বিতীয় সংযোজনের কর্তা ভৃগুবংশীয় ঋষিরা। ব্রাহ্মণ্য সংযোজন নামে অভিহিত অংশের মূল বৈশিষ্ট্য নারী ও শূদ্রের অবনমন। আদি ক্ষত্রিয় কাহিনি যখন গাথা হিসেবে রচিত হয়, সেই প্রাচীন যুগে নারীর স্বাধীন আচরণের কিছু কিছু চিহ্ন মহাভারতে রয়ে গেছে। গান্ধারী বারে বারে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুযোগ করছেন, ধিক্কার দিচ্ছেন, বলছেন দুর্যোধনকে শাসন করতে। শাসন না মানলে তাঁকে ত্যাগ করতে। ধৃতরাষ্ট্রের কাপুরুষতা ও অন্ধ পুত্রস্নেহের কারণে প্রকাশ্য

রাজসভায় স্বামীকে ভৎর্সনা করে সমস্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য তাঁকে দায়ী করেছেন। নারী হয়ে কৃষ্ণকে প্রকাশ্যে অভিশাপ দিচ্ছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নিরাবণ করতে পারতেন, অথচ করেননি বলে সর্বংশে নিধনের শাপ দিলেন তাঁকে। কুন্তী প্রচলিত অর্থে স্নেহময়ী জননী, কিন্তু যখন দেখলেন যে তাঁর পুত্ররা ক্ষত্রিয়োচিত আচরণ করছেন না, তখন তিনি বিদুলার উপখ্যানটি কৃষ্ণের মুখে বলে পাঠালেন। যে উপখ্যানে বিদুলা তাঁর পুত্র সঞ্জয়কে ক্লীবোচিত নিষ্ক্রিয়তার জন্য ধিক্কার দিচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে কুন্তী যখন অরণ্যবাসের বাসনা জ্ঞাপন করলেন, তখন পুত্রদের কোনো যুক্তি ও অনুরোধ তিনি মানেননি। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে চলে যাওয়ার কয়েক বছর পরে শকুন্তলা বালক পুত্রটিকে নিয়ে রাজসভায় এলে যখন দুষ্যন্ত তাঁর পূর্ব প্রণয় সম্বন্ধ অস্বীকার করেন, তখন শকুন্তলার ভৎর্সনা পুরুষের প্রতি এত কঠিন ধিক্কার বচন যা, পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে অকল্পনীয়।

মহাভারত-এ নারী সোম পান করেন, প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন, এবং নিজেদের সম্বন্ধে বহু সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেন। পিতৃমতী কন্যা পিতার অনুমতি ব্যতীত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হন (শকুন্তলা, সত্যবতী এমন অনেকেই)। প্রয়োজনে তাঁরা প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়িয়ে ঈপ্সিত পুরুষটিকে পাওয়ার জন্য নিজের পিতার সঙ্গে তর্ক করেছেন। যেমন সাবিত্রী। ভীষ্ম যখন অম্বা, অম্বালিকাকে বীর্যশূল্ক্যা করেন, তখন অম্বা তাঁকে জানান যে শাল্বরাজা তাঁর পাণিগ্রহণ করেছেন। শুনে ভীষ্ম তাঁকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন।

আবার পাণ্ডু কুন্তীকে বলেন ঋতুকালীন নারী যে কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে, তাতে কোনো দোষ হয় না। তাই কুন্তী পর্যায়ক্রমে তিন ভিন্ন দেবতার সঙ্গে মিলিত হন। দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করে নল যখন চলে গেলেন, এবং দীর্ঘকাল যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বয়ঃপ্রাপ্ত দুটি সন্তানের জননী দময়ন্তী অসংকোচে মাকে বলেন, নলের বিরহে তাঁর পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। অতএব পুনর্বার যেন দময়ন্তীর স্বয়ম্বর আহবান করা হয়। পরবর্তী যুগে এমন উদাহরণ অকল্পনীয় হয়ে যায়।

কচ দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে দেবযানী তাঁকে শাপ দেন। এই আখ্যানের মধ্যে দিয়ে মহাভারতকার যেন বলতে চেয়েছেন এমন শাপ দেওয়ার অধিকার দেবযানীর ছিল। পরে শর্মিষ্ঠার বিয়ের যৌতুক হিসেবে দেবযানী রাজা যযাতির প্রাসাদে যান, এবং সেখানে নিজের অনুরোধে ক্রমে যযাতির গোপন প্রেমিকা ও তাঁর সন্তানের জননী হন। পরে সেই দেবযানী রাজা যযাতিকে মুর্খ ও মিথ্যেবাদী বলে তিরস্কার করেন। একই ভাবে রুরুর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে প্রমদ্বরা তাঁকে বিয়ে করেন। হিড়িম্বা ভীমসেনকে তেমনভাবেই রাজি করান তাঁর প্রেম গ্রহণ করে বিয়ে করতে। উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদাও উপযাচিকা হয়েই অর্জুনকে প্রেম নিবেদন করেন। এইসব বিয়েতে নারী স্বয়ং প্রেমপ্রার্থিনী হয়ে পুরুষকে যুক্তি ও অনুরোধের বশীভূত করে বিয়েতে সম্মত করিয়েছেন। এমন ছবি পরের দিকে প্রায় বিরল হয়ে আসে। প্রথম যুগের রচনায় পুরুষও যখন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রেমের

প্রার্থনা জানিয়েছে, তখন নারী তার নিজের শক্তি আর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত স্থাপন করেছে এবং পুরুষ তা স্বীকারও করেছে। সত্যবতী, গঙ্গা, শকুন্তলা এর দৃষ্টান্ত।

অন্যত্র আবার দেখা যায় সৈরিন্ধ্রী রূপিণী দ্রৌপদী কামুক কীচককে পদাঘাত করেন। দ্রৌপদী অপরাধীর দণ্ডের জন্য অতি-প্রাকৃতিক কারও প্রতীক্ষা করেননি, চোখের জলও ফেলেননি। তখনকার দিনের নারীরা নিজেরাই উদ্যত ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে পুরুষের বিরুদ্ধে তর্ক করেছে। যুদ্ধ করেছে। অভিশাপ দিয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। মনে রাখা দরকার স্বেচ্ছা প্রণোদিত নরনারীর মিলনের ফলে *মহাভারত*-এ বহু মুখ্য নায়কের জন্ম হয়েছে। বেদব্যাস, ভীষ্ম, কর্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং বহু উপনায়ক এভাবেই জন্মেছেন। এত অসংকোচে এই ঘটনাগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা আশ্চর্যজনক। সবচেয়ে বড়ো কথা এমন মিলনের পেছনে ধর্মীয় প্রতিপাদ্যের সহায় নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। মনে হয় তখনকার দিনে এমন বহু ঘটনা লোক মুখে প্রচলিত ছিল এবং এমন ঘটনা যে ঘটে থাকে, তা নিয়েও সমাজ সে সময় অবগত ছিল। তাই এর সমর্থন বা নিন্দা কোনটাই সেকালে সমাজ কিংবা সাহিত্যে প্রকট ছিল না।

কৌরব দূত যখন অন্তঃপুরে দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলায় হারার সংবাদ দেয়, তখন মনস্বিনী নারী দ্রৌপদী দূতকে প্রশ্ন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির কি আগে নিজেকে বাজি রেখে হেরেছেন? না কি তার আগে আমাকে বাজি রেখেছে হারিয়ে তারপর নিজেকে হেরেছেন? অর্থাৎ আগে নিজেকে হারালে তো দ্রৌপদীর ওপর তাঁর কোনো অধিকার থাকে

না। তখন দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তি নন। এ প্রশ্নের মধ্যে দ্রৌপদীর স্বাধীন চিন্তার পরিচয় আছে। কিন্তু ওই তেজস্বিনী নারীও অবহিত ছিলেন যে, আগে অথবা পরে কোনো অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের তাঁকে বাজি রাখার কোনো আধিকার ছিল না। এই ধরনের যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে সমাজে ক্রমশ নারীর স্থানের অবনমন কীভাবে ঘটেছে। আর তারই ছবি ধরা পড়ে শান্তিপর্বে। যখন মুমূর্ষু ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন নারীর চেয়ে অশুভকর আর কিছুই নেই। বৎস, নারীর প্রতি পুরুষের কোনো স্নেহমমতা থাকা উচিত নয়। পূর্বজন্মে পাপের ফলে পুরুষকে এ জন্মে নারী হয়ে আসতে হয়। কিংবা নারী সাপের মতো, পুরুষের তাকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। ত্রিভুবনে এমন কোনো নারী নেই যে স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য। ভীষ্ম তাঁর বক্তব্য দৃঢ় করার জন্য দেবতার দোহাই পেড়ে বলেছিলেন, প্রজাপতির ইচ্ছা যে নারী স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য নয়। শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক যেমন তাঁর স্ত্রীকে অন্য পুরুষ পুত্রের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার পর রায় দেন: সকল স্ত্রীই গাভীর মতো স্বাধীন, অনাবৃত ও স্বৈরাচারিণী।

লক্ষণীয় যে *রামায়ণ* কিংবা *মহাভারত*-এর মূল অংশে অবশ্য কিছু নারী চরিত্র আছে, যাঁরা সরব থেকেছেন। যেমন অরণ্যবাসে রামের সঙ্গী হওয়ার অনুমতি পাওয়ার জন্য সীতা তাঁর সঙ্গে যুক্তিতর্ক করেছিলেন। সাবিত্রী প্রকাশ্য রাজসভায় নিজের পছন্দের স্বামী নির্বাচনের জন্য নিজের পিতার সঙ্গে তর্ক করেছেন। নীতি প্রসঙ্গে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তর্ক জুড়েছেন। সুতরাং বলা যায় মহাকাব্যের মূল ভাগে এমন এক যুগের স্মৃতিচিহ্ন রয়ে

গেছে যখন নারীর মানুষ হিসেবে প্রকাশ্যে কথা বলার অধিকার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতেই নারীর সামাজিক অধিকারগুলি নির্মম ভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। এবং এইসব অধিকারগুলির মধ্যে আছে কথা বলার অধিকারও। মহাকাব্যের কোনো-কোনো নারী চরিত্র যাঁরা আগের পর্যায় যথেষ্ট সরব ছিলেন, প্রক্ষিপ্ত পর্যায়ে তাঁরা পর্যন্ত নীরবে দীনহীন ভাবে পুরুষের অধীনস্থ হয়ে পড়েছেন। যেমন বনপর্বে সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কীভাবে তাঁর পাঁচজন স্বামীকে খুশি রাখেন? উত্তরে দ্রৌপদী নানা বিষয়ের সঙ্গে এও জানান যে, তিনি কদাচ কোনো বিষয়ে পাঁচজনের কারও কথার বিরুদ্ধাচারণ করেন না। তিনি সেই নারী, যিনি এক সময় তাঁর স্বামীদের নামের আগে 'কাপুরুষ' কিংবা 'ক্ষত্রিয় নামের অযোগ্য' এমন সব নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি এক সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে তর্ক করেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কৃষ্ণকে নিষ্ক্রিয়তার জন্য নিন্দা করেছেন। কিন্তু এই দ্রৌপদী যখন সত্যভামার কৌতুহলের নিরসন করছেন, তখন তিনি নারীর নীরবতার সমর্থক। এসব মহাভারতে প্রক্ষেপকারী ভার্গব কবিদের দুর্বল সৃষ্টিমাত্র। পূর্ববর্তীকালের তৈত্তরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে একজন শিক্ষিত নারী বস্তুত পুরুষের সমতুল্য। উপার্জনশীল নারীও উপার্জনশীল পুরুষের সমকক্ষ। অথচ প্রক্ষিপ্ত মহাভারত প্রশংসা করেছে সেই নারীর যে তার শাশুড়ি মায়ের সেবা করে আর তার মুখের ওপর কথা বলে না। এখানেই উঠে আসে মহাভারতে রাজকন্যার মাধবীর আখ্যান। তাঁর পিতা গালবের হাতে তাঁকে নির্দ্বিধায় তুলে দিয়েছিলেন, যাতে তিনজন

রাজার কাছে পর্যায়ক্রমে তাঁকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত করা যায়। আর এইভাবে গালবের প্রার্থিত ধন সঞ্চয়ের ব্যবস্থা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।[২]

বৌদ্ধধর্মে নারী

জাতকের গল্পগুলোতে এমন একটি সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে, যা মূলত মেয়েদের প্রতি নির্মমতা। এর বেশিরভাগ গল্পেই আছে শারীরিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত। কয়েকটিতে মানসিক নিপীড়নের ছবিও আছে। যেমন একটি তরুণীকে প্রেমে পড়ার অপরাধে অগ্নিপরীক্ষায় বাধ্য করা হয়েছিল। সে যে একটি কৌশলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে তা একজন ব্রাহ্মণ দেখে ফেলে এবং তাকে ধাক্কা মেরে প্রেমিকের কাছ থেকে সরিয়ে আগুনে ফেলে দেয়। আরেকটি গল্পে দেখি এক বণিকের এক বদমেজাজী কন্যা ছিল। তার দাসেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তারা তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। বুদ্ধ তাকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে বাস করছিলেন। একদিন চোরের দল তাকে তাদের সর্দারের বউ করবে বলে চুরি করে নিয়ে যায়। বুদ্ধ উপস্থিত হলে চোরদের সর্দার তাঁকে আঘাত করে। বুদ্ধ তাকে নারী হরণের অপরাধের কথা শোনান। সর্দার তখন মেয়েটিকে দু’ টুকরো করে কেটে ফেলে। আরেকটি কাহিনি হল— কোনো এক জন্মে বুদ্ধ চোর হয়েছিলেন। শ্যামা তাঁর প্রেমে পড়েন। তাঁর আর একজন প্রেমিক বুদ্ধের জন্য নিজের জীবন দেয়। তিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। বুদ্ধের কাছে ভৃত্যদের

মাধ্যমে তিনি বলে পাঠান- 'শ্যামা তোমার জন্য কাতর হয়ে প্রতীক্ষায় রত'। কিন্তু বুদ্ধ আর আসেননি।

অন্য একটি গল্পের সারার্থ, বিপন্ন অবস্থায় এক রাজদম্পতি ঘরে ফিরছিলেন, ব্যাধের দল তাঁদের একটা পোড়া গিরগিটি দিলে রাজা তাই খেয়ে ফেলেন। রাজার বিদূষক বুদ্ধ ভিক্ষাদানে নারীর কুণ্ঠার অভিযোগ করলে তিনি তার কারণ বুঝিয়ে দিলেন। বুদ্ধ বলেন— তাঁকে ত্যাগ করুন। তখন রাজার অনুশোচনা জন্মায়। আরেক জায়গায় দেখি একজন ক্রীতদাস কন্যা দেখে ফেলে যে রাজপুত্র তার পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত। রাজপুত্র তখন তাকে দুই টুকরো করে কেটে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। রাজা স্বয়ং তা খুঁজে পান। তবে রাজুপুত্র অনুশোচনা করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

নামসিদ্ধিক জাতকে দাসী ধনপালীকে অন্যের বাড়িতে খাটিয়ে তার মালিক ও মালকিন উপার্জন করাত এবং অবশ্যই তা নিয়ে নিত। কোনও একদিন সেই দাসী কাজে যেতে পারেনি বলে তাকে মাটিতে ফেলে পিটিয়েছিল তারা। বৌদ্ধ সাহিত্যে আম্বপালী (আম্রপালীর) দেখা পাই। ডাকসাইটে সুন্দরী এই নারী একজনের স্ত্রী হলে বাকি পুরুষদের প্রতি চরম অবিচার হয়, তাই দেশের আইন মোতাবেক আম্বপালীকে নগরে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল। তিনি হলেন 'নগরবধূ', 'জনকল্যানী'। পঞ্চাশ কহাপণ (কর্ষাপণ) দর্শণী দিয়ে কোনো পুরুষ এক রাতের জন্য তাঁর সঙ্গ পেতেন।

সংঘে নারীদের যোগদানে বুদ্ধদেবের প্রতিবন্ধকতার কথা মনে রাখতে হবে এই প্রসঙ্গে। যদিও পরে তিনি তা মেনে নেন। থেরীগাথা খিস্ট্রপূর্ব ছয় শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মুখে মুখে রচিত গান। ভারতে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যত্র বিচারেও সম্ভবত, নারী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এটি। ভিক্ষুনী মুত্তা একটি গানে তারঁ মৃত্যু থেকে পুর্নজন্মের কথা বলছেন। পিতৃতন্ত্রের পরাক্রম বৌদ্ধধর্মে যদিও কিছু কম ছিল না। জাতকের বিভিন্ন গল্পে তার প্রতিফলনও সুপ্রচুর। তবুও সংসার জর্জরিত অনেক অসহায় নারী বৌদ্ধ সংঘারামের নিরাপদ আশ্রয়কে সন্ন্যাসিনী জীবনের ক্লেশ-কৃচ্ছতার ভ্রূকুটি সত্ত্বেও এক সময় মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে দেখেছিলেন। তারই কিছু উচ্ছাসময় সাক্ষ্য থেকে গেছে কারো-কারো আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কবিতায়, গানে। মুত্তার মতো সুমঙ্গলমাতাও সংঘজীবনের প্রথম প্রাপ্তি হিসেবে, রান্নাঘরের একঘেঁয়ে দাসীবৃত্তি থেকে তাঁর নবলব্ধ অব্যাহতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, কীভাবে নিত্যদিনের ঝুলকালির মলিনতা, ক্ষুধা, শূন্য হাঁড়ি কড়াই ও নিষ্ঠুর দারিদ্র থেকে রেহাই মিলেছে এখানে। রেহাই মিলেছে নির্দয়, বিবেকহীন স্বামীর হাত থেকেও, যার মনে তাঁর জন্য সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না। আছে সোনা নামের আর এক ভিক্ষুণীর আত্মবিবৃতি। স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিজের পুত্র–পুত্রবধূদের সংসারে তাঁর অশেষ অবমাননা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তিনি সংসারে অপ্রাসঙ্গিক। ফলে আত্মসম্মান নিয়ে তাই তাঁর প্রশ্ন: যে সংসারে মর্যাদার কোনও আসন তাঁর জন্য নেই, সেখানে থেকে তিনি কী করবেন? পিতৃতন্ত্রের শাসন-পীড়িত নিরুপায় সংসার বিরাগী নারীদের একাংশ

এই ভাবে তাঁদের ক্ষতবিক্ষত দুর্বহ জীবনে কিছু নিরাময় পেতে চেয়েছিলেন ধর্মের আশ্রয়ে।[৩]

বেদ পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থান

ঋগ্বেদ পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বিধবাকে দেখান হয়েছে অশুচি ও অশুভ হিসেবে। তার বেঁচে থাকার অধিকার হয়েছে বিতর্কের বিষয়। *ঋগ্বেদ*-এর একাধিক সূক্ত থেকে জানা যায় যে, *ঋগ্বেদ*-এর যুগে বিধবারা বেঁচে থেকে দেবরকে পুনঃবিবাহ করত। অথর্ব বেদে অবশ্য দু'বার সহমরণের উল্লেখ আছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর মূল অংশে সতীদাহের কোনো ঘটনা নেই। মাদ্রী অনুতাপে আত্মহনন করেন, তিনি পাণ্ডুর কামনায় বশ্যতা স্বীকার করে স্বামীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন বলে নিজেকে এই শাস্তি দেন। কিন্তু রামায়ণে দশরথের তিন স্ত্রী, তারা, মন্দোদরী, ইন্দ্রজিৎ পত্নী অথবা কুম্ভকর্ণের বিধবারা কেউই স্বামীর সঙ্গে চিতায় সহমৃতা হননি। মহাভারত-এ সত্যবতী, কুন্তী, অম্বিকা, অম্বালিকা, দুঃশলা কিংবা দ্রৌপদী তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে উত্তর ভারতে বিদেশি অভিযানের মিছিল চলছিল। কুষান, শক, মুরুন্দ, পহ্লব, হুন এবং পারদদের বার বার আক্রমণের ফলে নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়েছিল। এর ফলে সামাজিক পরিমণ্ডলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ভাগবদ গীতা আনুমানিক প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকের রচনা, এই গ্রন্থে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন— এতে

বংশক্রম বিনষ্ট হয়, এবং এর ফলে পরম্পরাগত ধর্ম লয় হয়। এমন ঘটনা ঘটলে সমস্ত পরিবার অপবিত্র হয়, অভিজাত কুলনারীরাও দুষ্ট ব্যবহার করে। বর্ণসংকর ঘটে। অন্য ভাবে বলতে গেলে যদি স্বামীর মৃত্যু পরও বিধবা জীবিত থাকে, তাহলে সে অন্য স্বামী বরণ করতে পারে আর তারই ফলে ঘটে যায় ভয়াবহ বিপদ; বর্ণসংকর। তখন পরিবার ও তার ধ্বংসকারী উভয়েরই নরকে গতি হয়। পিতৃপুরুষের সৎকার ঠিক মতো হয় না এবং তারা নরকে পতিত হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই অনাসৃষ্টি রোধ করার জন্যই সতীদাহ প্রথা উজ্জীবিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। বেদ পরবর্তী যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত কুড়িজন শাস্ত্রকার তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। বহু বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, কিন্তু নারী এবং শূদ্রের প্রতি নিপীড়নের প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বিমত নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ বিধান দিয়েছেন সতীদাহ, কেউ বলেছেন কঠোর সংযম। সারা জীবন নীরবে স্বামীর সেবা করে যাওয়ার পর তার মৃত্যুতে আত্মহত্যা করা। নারীর এই বিধানের পাশে শাস্ত্র বিধান দিয়েছে স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামীর শোক পালন ও অশৌচ মাত্র একদিনের। তারপর তার পুনরায় বিয়ে করা উচিত। যে দেশে 'সতী' শব্দের কোনো পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ নেই, সে দেশের সমাজে অন্য কিছু আশা করা অন্যায়।

নারীর সতীত্ব ও শূদ্রের আনুগত্য স্বীকার উভয়কেই অবদমিত করে রাখার জন্য তৈরি। তাই বৌধায়ন, ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ও মনুসংহিতায় স্ত্রী প্রধান প্রয়োজন হল সন্তানের জননী আর তার প্রধান কর্তব্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র

অনুসারে নিঃসন্তান বধূকে বিয়ের দশ বছর পরে ত্যাগ করা যায়। যে স্ত্রী শুধুমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তাকে বারো বছর পরে, আর মৃতবৎসকে পনেরো বছর পরে এবং ঝগড়ুটে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায়। লক্ষ করার বিষয়, পুত্র সন্তানের জন্ম না দিতে পারলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিধান বহু প্রাচীন।

রামায়ণ, মহাভারত-এর কাহিনিগুলি বৈদিক যুগের অল্প পরের, তারা তখনকার ছবিই এঁকেছে। সেখানে কিংবা পরবর্তী পুরাণগুলিতে অসংখ্যবার অতিথি সৎকারে, উৎসবে, যুদ্ধে, যজ্ঞে, যৌতুকে, দানে ও দক্ষিণায় গাভী, স্বর্ণ-শস্য, রথ, গজ-অশ্বের সঙ্গেই অগণ্য নারী দান করার নিয়ম ছিল। নারী সম্পত্তি, তাই নারীকে জুয়া খেলায় পণ রাখতে দেখা যায় সেই ঋগ্বেদের (অক্ষসূক্ত ১০।৩৪।৪) সময় থেকে মহাভারত পর্যন্ত।[৪]

কৌলীন্য যুগে নারী

আদিতে সংঘে নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও পরে সংঘের মধ্যে নারীর প্রবেশ অবাধ হয়ে ওঠে। যাঁরা রাজ ক্ষমতায়, তাঁরা যেমন তাঁদের মেয়েদের সংঘে দান করেছেন (সম্রাট অশোক তাঁর কন্যা সংঘামিত্রাকে দান করেছিলেন), তেমন কখনও আবার সামাজিক প্রতিপত্তিতে নারীকে অধিকারের কদাচার দেখা গেছে সংঘগুলিতে। পাল রাজাদের অন্তিম সময় বৌদ্ধ সংঘগুলির ব্যভিচার সামাজিক উপদ্রবের মতো হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ সংঘগুলির মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজনে সহজযানিরা সংঘের বাইরে নিক্ষিপ্ত হন। নগরে তাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে প্রভূত প্রশ্ন উঠতে থাকে। এই সহজযানিরা নিম্নশ্রেণির বৃত্তিধারী

সমাজের মানুষ, মূলত কৈবর্ত কিংবা মাঝি-মাল্লা। নগরের বাইরে 'কামশূন্য' ধর্মাচারণে নারীকে যদিও তাঁরা অবধূতিকা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেখানে যৌনতার পরিসরই মুখর ছিল। চর্যাপদাবলিগুলিতে এর প্রচুর নির্দশন রয়েছে। বস্তুত বৌদ্ধ সংঘগুলির প্রতি সে সময় এই অভিযোগ ছিল যে, সেখানে অবাধ যৌন কদাচার পালন করা হয়।

চর্যাপদগুলি যখন লেখা হচ্ছিল, তখন গৌড় প্রদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে চলছিল। এর মধ্যে বিশেষত্ব ছিল দীর্ঘকালের পাল রাজত্বের অবসানে পুনরায় হিন্দুধর্মের উত্থান। পাল রাজাদের কারণ সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রায় কোনঠাসা অবস্থায় পড়েছিল। কৌনজ কিংবা কাশী-কাঞ্চীর ব্রাহ্মণ্য সমাজ বাংলার ব্রাহ্মণদের 'বৌদ্ধ পাষণ্ড'দের স্বগোত্রীয় মনে করত। প্রথমে বর্মণ রাজপরিবার হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের জন্য সক্রিয় হয়। পরের দিকে সেন রাজবংশ, বিশেষত বল্লালসেন এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড় বঙ্গের সমাজকে মনুস্মৃতির কালে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সফল হলেন। কৌলীন্য প্রথার সূত্রপাতের মধ্যে দিয়ে 'গৌরীদান' (আট বছর বয়স্ক বালিকাকে গৌরী বলা হয়। ওই বয়সের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না দিলে কন্যা চিরকালের জন্য অরক্ষণীয় হয়ে যেত। যে কারণে বিয়ের আর একটি নাম 'গৌরীদান') প্রথা এল। ঘটকালির মতো অভিনব এক বৃত্তি এল, যারা কুলজিপঞ্জি তৈরি করে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে কুলীন পাত্র সংগ্রহ করতে থাকে। সে সময় বিয়েতে কন্যাপক্ষকে বরপণ দিতে হত। মূলত বরপণের লোভে কুলীন ব্রাহ্মণরা একাদিক্রমে অগুনতি বিয়ে করত। কখনও কখনও এই সংখ্যা একশো পাড় করে যেত।

বালিকা বয়সে বিয়ে, বরের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য দু'প্রজন্ম। এমনকি কুলের মান রাখতে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা বালিকাকে মরণাপন্ন কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার অকালবৈধব্যের কারণ হত। বালিকা বয়সে বিধবাদের করুণ কাহিনি বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট ধারা হয়ে আছে। যেমন কল্যাণী দত্ত তাঁর *শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ* স্মৃতিকথায় তাঁর এক পিসিমার কথা বলেছেন, যাঁর নাম শিবমোহিনী। 'শিবমোহিনী যখন দশ বছরের বালিকা, তখন পিতা তাঁর বিবাহ দেন কিন্তু বিবাহের দুই বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।' সেই শিবমোহিনী একবার বলেছিলেন, 'আমার বড়ো ইচ্ছে, বিধবাভোজন করাই। হিন্দুদের কোনো ক্রিয়াকর্মে তাদের তো কোনো জায়গা নেই। মানুষ গোরুকে দেয়, কাককে দেয়, শিয়ালকে দেয়, গাছকেও দেয়, কিন্তু বিধবাদের কিছু পাওয়ার নেই।' এ কেবল অনামী পরিবারের মেয়েদের দুঃখকথা নয়। 'মাতৃভক্তি' শিরোনামায় কল্যাণী দত্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দাম্পত্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> সত্যেন্দ্রের স্ত্রী কনকলতা বিয়ের সময় খুব ছিপছিপে ও সুন্দরী ছিলেন। বিয়ের পর হাসিখুশিতে কটা দিন কাটিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান আর কিছুকাল পরে বেশ সুস্থ ও মোটাসোটা হয়ে ফিরে আসেন। শাশুড়ি দেখেই বলে ওঠেন — 'ওমা, কি ধুমসি মেয়েগো, আমার ছেলেকে যে পিষে মেরে ফেলবে।' তাই তারপর মাতৃভক্ত সত্যেন্দ্র মায়ের খোকা হয়েই চিরকাল কাটিয়ে দিলেন।[৫]

মেয়েদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক কোনো স্বীকৃতি এখনও কি আমাদের সমাজে দেওয়ার চল আছে? যে বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুর্দশা দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারতেন না, যিনি প্রায় একক দক্ষতায় বিধবা বিবাহের রীতি সমাজে চালু করে

আমাদের জীবনে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁর সম্বন্ধে কল্যাণী দত্তের ওই একই স্মৃতিকথায় মন্তব্য দেখে নেওয়া যেতে পারে—

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি তাঁর জীবনে একটি আলোকস্তম্ভের মতো। ভগবতী দেবীই ঈশ্বরচন্দ্রকে বহু যত্নে এমন কারুণ্য আর কোমলতায় মণ্ডিত করেছিলেন বলে শোনা যায়। কথাটি অসত্য নয়। কিন্তু পুত্রবধূ দিনময়ী দেবীর কোনো স্থান ওই বৃহৎ সংসারে ছিল না। রান্না আর ভাঁড়ার, যেখানে মেয়েদের জীবন কেটে যেত বলা চলে সেখানে তিনি আজ্ঞাবাহী মাত্র ছিলেন। তরকারি কুটতেন, মানে আলু-পটলের খোসা ছাড়াতেন— সেগুলো ডুমো-ডুমো হবে না ফালি-ফালি হবে, তা ভগবতী বলে দিতেন। থোড় আর মোচা দুটোর কোনটা রান্না হবে তাও তিনি এসে নিজে স্থির করতেন।[৬]

বাল-বিধবা সমস্যা নিম্নবর্গীয় সমাজের সমস্যা নয়, সেখানে কৌলীন্যের কঠোর অনুশাসন থাকার কথা নয়। তবু দেবী চণ্ডীকে দেখে ফুল্লরা যখন তার বারমাস্যের দুঃখকথা বলে কিংবা ছাগল চড়াতে গিয়ে খুল্লনা শোনায় তার দিনযাপনের অভিজ্ঞতার কাহিনি, তখন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের নিত্যদিনের যন্ত্রণা। মনসামঙ্গলে দেবী মনসা ফুলওলির ছদ্মবেশে কিংবা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে শঙ্কুর গড়ারীর কাছে যখন পসরা বেচতে যান, তখন ছদ্মবেশী দেবীর চরিত্র নিয়ে শঙ্কুর শিষ্যরা অকথা কুকথা বলে, তাঁকে উপহাস করে। সে সময় কৌলীন্য প্রথার নিগড়ে যারা ছিল না, সেইসব কুলীন সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে দাসী রাখার চল ছিল, যারা দাসীবৃত্তির পাশাপাশি গৃহস্থ বাড়ির পুরুষদের যৌন খিদে মেটাতো। আজও নিম্নবর্ণের পুরুষ, যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কিংবা দাস, তারা তাদের জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতার ঝাঁজ তাদের বউদের ওপর মেটায়। রাতে মাতাল হয়ে এসে বউ পেটানো তাদের জীবনের নিত্যকর্ম। এভাবেই সেই ঋগ্বেদের শুরুর

সময়কার অনুশাসনগুলি বিভিন্ন সূক্ত, শ্লোক, ধর্মীয় কৌশলে পাকাপাকিভাবে বসে গেছে সমাজের বুকের মধ্যে। যে কৌশলে পুরুষকে নারীর মন কিংবা শরীরকে অপমান করার অধিকার দেয় ধর্ম এবং রাষ্ট্র।

চর্যাপদে 'নারী'

২০ নং চর্যার কবি হলেন কুক্কুরীপাদ। তিনি নৈরাত্মধর্মাধগম চর্যার স্বরূপ পরিস্ফুট করতে গিয়ে তুলে আনলেন এক হতভাগিনী নারীর বিলাপকে, যে এক উদাসীন পুরুষের পত্নী। স্বামী তার ঘরের দিকে ফিরেও তাকায় না। কুঁড়ে ঘরে বধূটির জীবন কাটছে কষ্টেসৃষ্টে। সেই উপকরণহীন সংসারে সে তার প্রথম সন্তান প্রসব করতে চলেছে। তাই তার হৃদয়-বেদনার অন্ত নেই। ৪৯ নং চর্যায় দেখি পদ্মা খাল দিয়ে জলপথে আসবার সময় নির্দয় দস্যু কর্তৃক ভুসকুর পত্নী অপহৃতা হয়। ভুসুকুর আরেকটি পদ (৬ নং) হরিণী শিকারের আয়োজনের, চারিদিক থেকে হাঁক পেড়ে হরিণীকে জালে বন্দীর চেষ্টা চলছে তার সুস্বাদু মাংসের জন্য। অসামান্য এই রূপকটি আবহমানকালের।

আবার এইসব অন্ত্যবাসী নারী-পুরুষের জীবনকে উপভোগ করার ছবিও আঁকা হয়েছে চর্যার গানে। ২৮ নং চর্যায় দেখি শবর-শবরীর বন্যজীবনে কোথাও কোনও স্বচ্ছলতার স্পর্শ নেই। তবুও তাদের মিলিত দাম্পত্যজীবনের ছবি ঈর্ষণীয়। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামালায় ভূষিতা শর্বরী ত্রিধাতুর খাটে শবরের সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করে, আর উন্মত্ত শবর প্রেমিকাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করে দুর্দান্ত প্রেমঘন রাত্রি পোহায়। ৫০ নং পদে শবর

প্রেমিকার মিলনাভিসারকে আরও মোহময় করে তোলে কাপাসের কুন্দশুভ্র হাসি, পেকে ওঠা কঙ্গুচিনা তাদের মনে মত্ততা ছড়ায়। আচারসর্বস্ব উচ্চবর্ণের নারীদের অবরোধবাসিনী সত্ত্বার পাশে চর্যার অন্ত্যজ, অভাবী নারীদের জীবনের এই স্বাধীন উদ্‌যাপন আলাদা ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি অবৈধ প্রেমেও মেলে সাবলীলতা। তাইদিনের বেলায় যে বধূ নিজের ছায়া দেখে ভয়ার্ত, সেও রাত্রিতে শ্বশুরের নিদ্রার অবকাশে স্বচ্ছন্দ কামাভিসারিনী ('রাতি ভইলে কামরু জা অ')। ডোম রমণী তাই লোকচক্ষুর আড়ালে নয়, বরং দর্শকের সামনে কুশলী নৃত্য পরিবেশন করে। পদ্মদলে ডোম্বীর নৃত্য দেখে সমবেত দর্শকের হর্ষধ্বনি সেকালের বাঙালি সমাজে অভিনব। একই সঙ্গে পুরুষের নৃত্য আর নারীর সঙ্গীতে জমে উঠতে দেখা যায় বুদ্ধ নাটিকা—

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।

একদিকে অচল সংসারে নিত্য সন্তান-সন্ততির অনিচ্ছাকৃত জন্ম (বেঙ্গ সংসার বড়লি জা অ) অন্যদিকে হাভাতে পরিবারে নিত্য অতিথি সমাগম (হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী)-র প্রেক্ষাপটে চর্যার নারীরা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবিকামুখী।[৭]

মঙ্গলকাব্য, গীতিকা ও অনতি পরবর্তী কালে 'নারী'

মধ্যযুগের সমাজে নারীর শ্রমবৃত্তি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাদের কাব্যে যে সকল 'শ্রমজীবী' নারীদের উপস্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে নেতা, অনাম্নী

(সনকার দাসী), ফুল্লরা, খুল্লনা, শুঁড়িনী, দুর্বলা, ধাত্রী (ডাই), নটী (নাটনী), লখাই, ডোমিনী, কলিঙ্গা, নয়ানী, সুরিকা, কানড়া, ধুমসী, ঈশ্বরী পাটনী, হীরা মালিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে যুগের সমাজে নারী শুধু গৃহবধূই ছিল না, তারা পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ছিল স্বামীর সহকারি। নিম্নবর্গের নারী-পুরুষ একসঙ্গে ঘরে-বাইরে কাজ করত। অভাব এবং দারিদ্র্যের কারণে তাদের ভূমিকা ছিল বিশেষ অগ্রগণ্য। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ বলে তাদের মধ্যেকার সামাজিক-বিধিনিষেধ ছিল একটু শিথিল। বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় পরিচিত এই সব নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীরা সমাজে বেশিরভাগ সময় 'দাসীবৃত্তি' থেকে শুরু করে পতিতাবৃত্তি (শুঁড়িনী, নটী) পর্যন্ত করত। অন্যরা যারা স্বালম্বী হওয়ার চেষ্টা করত, তারা কেউ পশরা সাজিয়ে হাটে বাজারে গমন করত, কেউ বা নৌকার হালের পাশে দাঁড়িয়ে রোদ-বৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে খেয়া পারাপার করত, কেউ মাতাল-জুয়াড়িদের পাশে বসে নেশার সামগ্রী পরিবেশন করত, কেউ স্বামীর কথা মেনে দেহ বিক্রি করে সংসার চালাত, কেউ যোদ্ধা (কনৌজ, কলিঙ্গ, ধমসী) সেজে দেহ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করত — এমন দৃষ্টান্তও আছে। মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর এই যে শ্রম, ত্যাগ, সাহস — বিনিময়ে তার ভাগ্যে জুটত কেবল অবহেলা আর বদনাম। কেননা, এই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী কেবলমাত্র পুরুষের সম্ভোগ আর বিলাসিতার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তুর্কি আক্রমণ। পঞ্চদশ শতকের তুর্কি আক্রমনোত্তর মুসলিম শাসনাধীন সময়ে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রাধার কৌলীন্যরক্ষার্থে বাল্যবিবাহ ঘটে গেছে এক নপুংসক গোয়ালার সঙ্গে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনার উদ্দেশ্যে দধিদুগ্ধের পশরা সাজিয়ে রাধা মথুরার পথে যায় কিন্তু আইহনের মায়ের নির্দেশ বড়াই সঙ্গে যাবে। নপুংসক স্বামী, প্রেমহীন বন্দিশালায় শাশুড়ি-ননদের বাক্যশেল থেকে একদণ্ড মুক্তির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে পথেও রাধা সুরক্ষিত নয়। দুর্বার কৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য দেহকামনার বলি হতেই হয় তাকে। আর তারপর যতদিন কৃষ্ণের প্রতি তার প্রেমের জন্য স্বামী, সংসার, সমাজ, কুলধর্ম নস্যাৎ করে দেয়ার মতো জোর পায় সে ততদিনে কৃষ্ণ রাধার প্রতি তার পূর্বের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে।

ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনারা সংসার করতে চায়। স্বামীকে হারানোর ভয়ে ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে শোনাতে থাকে দুঃখের বারোমাস্যা। বর্ধিষ্ণু বণিক ধনপতি পায়রা ওড়াতে গিয়ে যুবতী খুল্লনাকে দেখে প্রথম স্ত্রী লহনাকে ভুলে দ্বিতীয় বিবাহ করে। অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে লহনা (ফুরাল্য যৌবনকাল হবে সতিনের জাল/ আপনারে তৃণ সমবাসি)। লহনা ধনপতিকে পুত্রসন্তান দিতে পারেনি। এই পুত্রের কারণেই ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের রঞ্জাবতীকে ‘শালেভর’ দিতে হয়েছে। উপাসনার চরম কঠিনতম পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রঞ্জাবতী জন্ম দিয়েছে লাউসেনের। ধনপতির অবর্তমানে জন্ম নিয়েছিল খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত। সমাজ এই অজুহাতে খুল্লনাকে অসতী বলে দেগে দিয়েছিল। জলপরীক্ষা, সর্প-ঘট, ঘৃত-কাঞ্চন,

অগ্নিদহন প্রভৃতি নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে খুল্লনা তার দৈহিক শুচিতা প্রমাণ করে। নারীদের পতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যগুলির অতি প্রথাবদ্ধ প্রসঙ্গ। নারীরা এই অংশে শুধু যে পতিনিন্দায় সরব তাই নয়, বরং পরপুরুষের প্রতি কাম-মত্ত। ঘনরাম চক্রবর্তীর ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের ‘জামতি’ পালায় লাউসেন ও কর্পূরকে দেখে বারুজীবী নারীদের লালসা, ‘অন্নদামঙ্গল’-এ সুন্দরকে দেখে কুলবতীগণ বিচলিত হয়ে সুন্দরের মাপে যাচাই করে নিচ্ছে নিজেদের স্বামীদের। এই অংশে নীতিবহির্ভূত সতীত্বের পরিপন্থী তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রেমহীন দাম্পত্য তাদের ভোগেচ্ছা আর ভোগাশ্রয়ের মধ্যে নিহিত শোচনীয় অসামঞ্জস্য এই উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলোতে ধরা পড়েছে। ভারতচন্দ্রের ‘অন্নপূর্ণা মঙ্গল’-এর ‘মানসিংহ’ অংশে ঘেঁসেড়ানীর মুখে পাই—

> বৎসর পনের ষোল বয়স আমার
> ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগারো ভাতার।[৮]

কন্যা পার্বতীকে দর্শন আকুলতায় ব্যাকুলা মা মেনকা স্পষ্ট ভাষায় গিরিরাজকে বলছেন— ‘নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে’।

ময়মনসিংহ গীতিকা-র পালাগুলিতে নারীচরিত্রগুলি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত, কেবলমাত্র পুরুষের সহচর রূপে নয়। কিন্তু পালাগুলিতে নারীদের পরিণতি অধিকাংশক্ষেত্রেই মিলনাত্মক নয়। মলুয়া-নদেরচাঁদের অপ্রতিরোধ্য প্রেম শেষাবধি মৃত্যুতে পর্যাবসান লাভ করে। চাঁদ বিনোদের সঙ্গে মলুয়ার প্রেম ও বিবাহের পরবর্তী অংশে বহির্সমাজের সমস্ত অত্যাচার একাই সহ্য করতে হয়েছে মলুয়াকে। কাজির অন্যায় প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান থেকে কাজিকে শূলে চড়ানো পর্যন্ত অজস্র ঘটনায় মলুয়ার তুখোড় বুদ্ধিমত্তার যে স্বীকৃতি অন্তত তার স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া কথা ছিল তা তো পায়-ই নি, উলটে 'সতীত্ব'-এর সংশয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নির্দেশে নিস্পৃহ চাঁদ বিনোদ প্রত্যাখ্যান করেছে মলুয়াকে। স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তি করে, সর্পদংশিত, মৃত্যুমুখে পতিত চাঁদের প্রাণভিক্ষা করে স্বামীগৃহে নিজের সামাজিক পুনর্বাসনটুকু ভিক্ষা করেছেন কিন্তু এত কিছুর পরেও চাঁদের কাছে শিরোধার্য হয়েছে ব্রাহ্মণ সমাজের নীতিবাদী সিদ্ধান্ত। মলুয়া অবশেষে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

> চন্দ্রাবতীর আবাল্য সঙ্গী, প্রেমাস্পদ জয়ানন্দ প্রাক্ বিবাহ মুহূর্তে ধর্মান্তরিত, পরনারীগামী। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দকে হারিয়ে নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে তার লেখনীধারণ। সৃজনের সুখে জীবনের গভীরতম বেদনাকে ভুলে থাকার প্রয়াস। প্রত্যাবৃত্ত জয়ানন্দকে পিতৃ আজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলেও জয়ানন্দের চিঠি পড়ে কেঁদে বুক ভাসায় সে। একদিকে জয়ানন্দের প্রতি গভীর প্রেম – অন্যদিকে পিতৃ আজ্ঞা, কুমারীব্রত পালন এবং শিবপূজায় মনস্থির করার সংকল্পজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব — এই দুইয়ের মাঝে নিষ্পেষিত হওয়া এক নারীচরিত্র চন্দ্রাবতী।[৯]

চন্দ্রাবতী স্বয়ং স্রষ্টা। চন্দ্রাবতীর মতো কয়েকজন বিদূষী রমণীর সন্ধান মেলে মধ্যযুগে। *গদামালিকাসম্বাদ* কাব্যের নায়িকা মল্লিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় এবং সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শিনী ছিল। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, যে পুরুষ সাহিত্য সংক্রান্ত বিতর্কে তাকে পরাভূত করতে পারবে তাকেই বরমাল্যে বরণ করবে। বহু বিদ্বান পুরুষ তার সঙ্গে তর্কে পরাজিত হতে থাকেন। অবশেষে আব্দুল হালিম গদা নামের একজন সুফি পণ্ডিত মল্লিকার হাজার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন। মল্লিকার কিছু

কিছু প্রশ্ন শাস্ত্র-বিষয়ক, আবার কোনো কোনোটি ভৌগোলিক, পৌরাণিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক। এছাড়া ধাঁধা, হেঁয়ালিও অজস্র। একজন নারীকে এই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিনী করে শেখ সাদী হয়তো আঠারো শতকে প্রথম নারী শিক্ষা প্রগতির সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

শেখ সাদীর মল্লিকা আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যা – দুজনেই বিদূষী, কিন্তু বিদ্যা সেই সঙ্গে প্রেমিকাও। তার আবেগ, তার প্রেম, তার লাস্যময় চাপল্য নিটোল পরিপূর্ণতা দিয়েছে তার বৈদগ্ধ্যকে। বিদ্যার প্রতিজ্ঞা সে প্রচলিত রাজকুমারী রীতিতে বীর্যশুল্কা হবে না, হবে বিদ্যাশুল্কা। অবশেষে সুন্দরের আবির্ভাব এবং বিদ্যার প্রায় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। সুন্দরের চিত্রকাব্যের উত্তরে বিদ্যার চিত্রকাব্যটি প্রেমোল্লাসে ভরপুর আত্মনিবেদনের পদ।

ঘনরাম চক্রবর্তীর *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের ব্যভিচারী সুরিক্ষা — জ্ঞানে, সৌন্দর্যে সে মল্লিকা কিংবা বিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সে সুপণ্ডিত লাউসেনকে রূপের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল এমন একটি প্রশ্ন করে যার মোকাবিলায় লাউসেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যতিক্রমী পথ ধরেই পরবর্তীকালে আনন্দময়ী দেবী, বৈজয়ন্তী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রহিমুন্নিসা হটি বিদ্যালঙ্কার বা হটু বিদ্যালঙ্কারদের কাব্যচর্যা এবং শাস্ত্রসাধনা মূলত প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এঁরা সবাই ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখিকা।

আনন্দময়ী দেবী অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। অথর্ববেদ থেকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বৃত্তান্ত এবং যজ্ঞকুণ্ডের ছবি এঁকে রাজা রাজবল্লভ সেনের যজ্ঞ-কর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন।

খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেনের *হরিলীলা* কাব্যে তাঁর রচিত অনেক পদ ও সঙ্গীত পাওয়া যায়। বৈজয়ন্তী দেবী স্বামীর সঙ্গে একত্রে *আনন্দলতিকা* নামের কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যাতে তাঁর স্বামী কৃষ্ণনাথ লিখেছেন 'যেনা কারি স্ত্রীয়া সহ'। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্র হয়ে এইরূপ শাস্ত্ররচনা ও গ্রন্থ আলোচনার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রিয়ম্বদা দেবী মীমাংসা দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। *মদালসা* উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বের মোক্ষধর্মের বিস্তৃত টীকা রচনা করেছিলেন। হটি বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি অন্ত্য-মধ্যযুগে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বালবিধবা এই নারী সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তার বিস্ময়কর ভূমিকা হল বারাণসীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং সেখানে অধ্যাপনা।[১০]

উনিশ-বিশ শতকে নারী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং পরে জাতীয়তাবাদের সৃজন — এই দুই সামাজিক প্রকরণেরই অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'নতুন নারী'র নির্মাণ। এই নির্মাণের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল শিক্ষা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলার নারীশিক্ষার শুরু। এখানে 'নারী' ও 'শিক্ষা' দুটি শব্দেরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণভাবে উনিশ শতকের নারী সংক্রান্ত আলোচনায় 'নারী' বলতে বোঝানো হত উচ্চবর্গীয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের আর শিক্ষা বলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। অবশ্য প্রাক্-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগে দেশজ ধারায় ও বৈষ্ণবী শিক্ষার ধারার হাত ধরে মেয়েদের জ্ঞানজগতের সঙ্গে

সংযোগ ঘটেছিল। মেয়েদের নিয়ে বাঙালি সমাজে নতুন-পুরানো চিন্তাভাবনার সংঘাত যখন শুরু হচ্ছে, সেই সময় বাংলা সংবাদ সাময়িক পত্রের জন্ম। মেয়েদের নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, করুণা-ভালোবাসা, ঘৃণা-অবিশ্বাসের চিহ্ন থেকে গেছে এইসব পত্রিকায় – যা থেকে তৎকালীন বাঙালি মানসিকতার একটা আভাস পাওয়া যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বাঙালি সমাজের একাংশ যখন উদ্‌গ্রীব, কৌলীণ্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে দলমত নির্বিশেষে পত্রিকাগুলি সচেষ্ট, তখন নবীনচন্দ্র আঢ্য তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা* (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫) পত্রিকায় মনুবাক্যে তাঁর অগাধ আস্থা রেখে স্ত্রী-দিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ বলে জানিয়েছেন। পত্রিকায় 'নারীচরিত্র' নামে যে লেখাটি বেরোয় সেটি এইরকম—

> নারী চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়, দেবতারাও তাহা বুঝিতে পারেন না, রমণীদিগের অন্তর গরলপূর্ণ অথচ মুখে মধুবর্ষণ করে তাহারদিগের প্রিয়াপ্রিয় নাই, গোসকল যেমন বনে যাইয়া নব নব তৃণান্বেষণ করে তদ্রূপ রমণীরা সর্ব্বদা নূতন নূতন পুরুষের প্রার্থনা করিয়া থাকে, মুখে প্রণয় প্রার্থনা করে মনে শঠতা পূর্ণ, রমণী হইতে পিতাপুত্রে এবং ভাই ভাই বিচ্ছেদ হয়,... রমণীরা দান, মান, সরলতা, সেবা, শীলতা, শাস্ত্র, শস্ত্র কিছুতেই বশ্যা হয় না, তাহাদের রমণাকাঙক্ষা কোন মতে তৃপ্ত হয় না, নারীদেহে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাম বিরাজমান থাকে, পুরুষাপেক্ষা তাহারদের কামভাগ অষ্টগুণ অধিক, তাহারদের স্বাভাবিক ক্ষীণতা কিছুতেই দূর হয় না, নারীদিগের চিত্ত অতিশয় দুর্বল, অতি সামান্য বিষয়ে তাহারদিগের রুষ্টি তুষ্টি জন্মে অকারণে কলহবিবাদে প্রবৃত্ত হয়, পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া পরের চাটুবাক্যে ভুলিয়া যায় এবং পিতৃ-মাতৃ ও স্বামীকূলে কালি দিয়া কুলটা হয়, উপপতির মনরক্ষার্থে অনায়াসে পতিপ্রাণ নাশ করে, লৌহ সিন্দুকে পুরিয়া রাখিলেও ভ্রষ্টাচারিনী হয়...।[১১]

মনুর মতের পুনরাবৃত্তি করে ১২৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা*-য় তিনি বলেন— 'নারীরা বাল্যকালে পিতা কর্তৃক রক্ষিতা হয়, যুবাকালে ভর্ত্তার শাসনাধীনে থাকে এবং বৃদ্ধবস্থায় পুত্রাদির পরতন্ত্রী হইয়া জীবন শেষ করে। কোনো কালে তাহাদিগের স্বাধীনতা নাই।'

শুধু *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা*-র সম্পাদকই নন, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার অনেক সম্পাদকই মনুর দোহাই দিয়েছেন। সেকালের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারদের উল্লেখ করে বার বার মেয়েদের স্বাধীনতা দানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধিতাই নয়, বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়েও অনেকে শাস্ত্রবাক্যর দোহাই দিয়েছেন। *অনুসন্ধান*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা – যার প্রাণপুরুষ ছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ির মতো বিদগ্ধজন, অক্লেশে লিখতে পেরেছেন—

> বর্তমান সময়ে তোমার আগে বালিকাবিবাহ সম্বন্ধে কেবল তর্ক করিতেছ, ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। বালিকাবিবাহে সন্তানের কি সমাজের কোন অনিষ্টই হইতেছে না, এবং বালিকাবিবাহে হিন্দুসমাজ অনেক পরিমাণ পবিত্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিবাহ ও সহবাস এবং পুরুষের নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণ যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে প্রতিপালন না করাতেই সমাজে নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে।[১২]

বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের প্রায়ই নিতান্ত কমবয়সে স্বামীর লালসার শিকার হতে হত। এর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য ১৯৮০-তে সরকার যখন সহবাস সম্মতির

বয়স বাড়িয়ে ১০ থেকে ১২ বছর করার প্রস্তাব করে, তখন সমাজে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। বারো বছরের কমবয়েসি কোনো মেয়ে ধাতুদর্শন করলেও স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না — এ কথা মেনে নিতে পারলেন না অনেক সম্পাদকই। শাস্ত্র অবমাননার আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। কী ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে চলেছে সবাইকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের *ধর্মপ্রচারক* লিখল—

> যদি 'সমাগম সম্মতিকাল' ১২শ বর্ষ স্থির হয়, আর কুলবধূ যদি তৎপূর্ব্বেই রজস্বলা হয়েন, তবে গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে গর্ভ যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, সে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মের, পিণ্ডদান, তর্পনাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না।[১৩]

লক্ষণীয়, শাস্ত্রে পরম আস্থাবান এই সব সম্পাদকেরা ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রবাক্যকে তেমন গুরুত্ব দেননি। প্রাচীন শাস্ত্রের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে অনুকূল যুক্তিগুলি তাঁরা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। হিন্দুশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন স্ত্রীশিক্ষার পরিণামের কথা চিন্তা করে শিউরে ওঠেন। নিজ পত্রিকা *নিত্যধর্মাণুরঞ্জিকা*-য় সবাইকে সাবধান করে দিয়ে তিনি লিখলেন—

> স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কদর্য্যা, তাহাতে বিদ্যাচাতুর্য্য প্রকাশ হইলে স্বাধীনা হইবে, তাহা হইলে পুরুষমাত্রকে তৃণতুল্যজ্ঞানে অনিষ্ট কর্ম্মকরণের অপেক্ষা রাখিবেক না।... স্ত্রীলোকের বিদ্যাপ্রদান সম্পর্কে দোষ দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর নিরস্ত্র হওয়াই কল্যাণ...।[১৪]

সমাজদীপিকা পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ বললেন— 'স্ত্রী শিক্ষা অস্বাভাবিক' ও 'ঈশ্বরের অনভিপ্রেত'। কেন স্ত্রীশিক্ষা 'অস্বাভাবিক' তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব

নিলেন *বেদব্যাস* সম্পাদক। বৈশাখ ১২৯৬ সংখ্যায় তিনি নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন— পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন নারী জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া যুক্তিগুলি কিছুটা এইরকম — বিদ্যাশিক্ষার ফলে নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস পায়। বিদূষী নারীদের বক্ষদেশ সমতল হয়ে যায়, তাদের স্তনে স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এছাড়াও তাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত আকার পায়। অতএব বিদ্যাশিক্ষা পুরুষজাতির মঙ্গলের কারণ হলেও নারীদের পরম শত্রু।

প্রায় এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে সমসাময়িক *অনুসন্ধান* পত্রিকায়। এইসব পত্র-পত্রিকার বেশিরভাগই আজ কালের গর্ভে তলিয়ে গেছে কিন্তু উনিশ শতকে নারীর সামাজিক অবস্থান বুঝতে গেলে এইসব সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এই সময় কিছু মানুষ কলম ধরেছিলেন মেয়েদের 'কামনা-বাসনা'কে স্বীকৃতি জানাতে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে বিদ্যাসাগর লিখলেন— তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।

কয়েকবছর পরে প্রায় এই একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কণ্ঠে। ১৮৬৭-র ২৪ জুন-এর *সোমপ্রকাশ*-এ তিনি লিখলেন 'যে রিপু আমরা

আপনারা এককালে দমন করতে পারি না, বিধবারা তাহা করিবে এই ভ্রম অদ্যপিও গেল না।'

কুলীন মেয়েদের প্রায় বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে লিখেছিলেন *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*-র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার—

> সহস্র সহস্র বিধবা ও অনূঢ়া ভগ্নীর আর্ত্তনাদ ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমরা এখুও স্থির অন্তঃকরণে রহিয়াছি, অতএব আমরা যদি পাষাণ-হৃদয় না হই, তবে আর কে হইবে? ধিক আমাদের জীবনধারণ, ধিক আমাদের বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধিক আমাদের সভাস্থাপন, ধিক আমাদের লেখনী সঞ্চালন! [১৫]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর *এডুকেশন গেজেট*-এ কুলীন মেয়েরা যে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই কেউ ব্যভিচারিণী হয়, কেউ বেশ্যার ভবনে আশ্রয় নেয়, 'অনেক অবিবাহিত কুলকন্যা রিপুশমতা করিতে না পারিয়া পিতৃদ্রোহিণী' হয়ে অতি অপাত্রেও আত্মসমর্পণ করে তা স্বীকার করেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সচেতন মানুষ যখন মেয়েদের সামাজিক শৃঙ্খল থেকে বের করতে চেয়েছেন তখন স্থিতাবস্থার পক্ষপাতীরা বিচলিত হয়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সেই পথ যেমন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তেমন অনেক পত্র-পত্রিকা সোচ্চার হয়েছিলেন নারীশিক্ষার সপক্ষে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে *সুলভ সমাচার*-এ কেশবচন্দ্র সেন বিবাহিতা স্ত্রীকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির সঙ্গে তুলনা করেন এবং পুরুষদের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা ও

বেশ্যাদের প্রতি আসক্তি নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেন। এই সময়েই *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যবস্থাকে ধিক্কার জানিয়ে লিখেছেন—

> স্ত্রী পুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য-পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ করিব কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিজরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভালো আছে, তাহার অধিকাংশই বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।
>
> এই প্রথার ন্যায় বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘণ করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ অমর্যাদা, ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে অন্যে চর্মচক্ষে দেখিবে। কি অপমান। কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশুশালে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? লজ্জা নাই? [১৬]

১২৮৬ বঙ্গাব্দে *ভারতী* পত্রিকায় 'ইউরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-শীর্ষক লেখায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের চিন্তারই পুনরাবৃত্তি করে লেখেন—

> পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মতো অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে।... এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তাঁর নামের অপমান করা হয়।[১৭]

এরই পাশাপাশি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর বিষয়াধিকার স্বীকৃতি পায়নি। পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার ছিল না বললেই চলে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। পুনর্বিবাহের পর বিধবা পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিচ্যুত হবেন—একথা বিধবা বিবাহ আইনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ ব্যতীত বিধবা যদি অন্য কারও প্রতি

আসক্ত হতেন তাহলে? অপুত্রক বিধবাকে ব্যভিচারিণী অপবাদ দিয়ে সম্পত্তি অধিকারচ্যুত করার মামলা হতে থাকে একের পর এক। কিছু কিছু মামলার রায় বিধবার পক্ষে যাওয়ায় সমাজপতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। অসতী বিধবার বিষয়াধিকার সম্পর্কে একটি মামলার রায় বিধবার পক্ষে গেলে সমাজে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতে আপিল করার জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়। সেই সময়ই *বঙ্গদর্শন*-এ বেরোয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত রচনা 'সাম্য'। তাতে তিনি লেখেন—

> স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী-ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকার পাইতে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত রাখিবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন, ধর্মভ্রষ্ট স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্মভ্রষ্ট পুরুষে বিষয় পাইবে। ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ – যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকল বিষয় পাইবে; কেননা সে পুরুষ, কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রী, ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি?[১৮]

সমাজে নারীর স্থান, তাদের অধিকার নিয়ে যেসব পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছে, তার মধ্যে *বঙ্গদর্শন, ভারতী*-র মতো বিখ্যাত পত্রিকার পাশে *রঙ্গপুর, দিক্ প্রকাশ, ঢাকা দর্পণ*-এর মতো প্রায় অপরিচিত পত্রিকাও আছে।

সেকালের নগরকেন্দ্রিক, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মেয়েদের এই দুরবস্থা স্বভাবতই বিচলিত করেছিল এবং হিন্দু ধর্মের এই চূড়ান্ত অমানবিক অংশগুলির দিকে সাহেবরাও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে্য তাদের শাসনের যথার্থতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

ঐতিহাসিক তনিকা সরকার তাঁর ‘In Late Nineteenth Century Bengal’ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অধীনতা শব্দটি তৎকালীন বাঙালি পুরুষের কাছে ছিল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক – প্রথম অর্থে তা ছিল গ্লানি, অর্থাৎ বহির্জীবনে প্রতিনিয়ত অধীনতাবোধের গ্লানি, এবং দ্বিতীয় অর্থে তা ছিল অপরাধবোধ, অর্থাৎ ঘরের ভেতর নিয়মের অনুশাসন মেয়েদের বন্দি রাখার অপরাধের উপলব্ধি। অনেক পুরুষ আবার দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ যোগও খুঁজে পেয়েছেন। ঘরের মেয়েদের প্রতি পুরুষরা যে পাশবিক আচরণ করে তা যেন তাদের বহির্জীবনে এই পাশবিকতার শিকার হওয়ারই প্রতিশোধ— এই রকমই ছিল প্রসাদদাস গোস্বামীর বিশ্বাস। ঠিক এইভাবে সাধারণ ব্যাখ্যা না করলেও এই অপরাধবোধ যে সমাজের পুরুষমহলের একাংশকে তাড়িত করেছিল তার অজস্র উদাহরণ মেলে। বিলেতে মেয়েদের অগ্রগতি দেখে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মসমালোচনা ধরা আছে তাঁর *A Visit to Europe* (১৯০২) গ্রন্থে। তুলনায় ‘য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি’-তে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির প্রতি ধিক্কার অনেক তীব্র।

পশ্চিম থেকে আধুনিকতার যে বার্তা এদেশে এসে পৌঁছেছিল তার কেন্দ্র ছিল শিক্ষার ধারণা। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ‘সভ্য’ ইংরেজদের যে অভিযোগগুলি ছিল– যেমন যুক্তিহীনতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, অবৈজ্ঞানিকতা– সব কটিই সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল শিক্ষার অভাবের সঙ্গে।

মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৮১৩ সালে চার্টার আইনে ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রবেশ অবাধ করে দিলে তাদের তোড়জোড়েই নারীশিক্ষার সূচনা হয় কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির উদ্যোগে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়িতে ১৮৯১ সালে প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল খোলে।

মিশনারিদের উদ্যোগে, উৎসাহে স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও 'ভদ্রলোক'রা এই ধরনের স্কুলে তাদের বাড়ির মেয়েদের পাঠাতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। সেকালে সমাজ সংস্কারের সবচাইতে উৎসাহী দল ব্রাহ্মযুবকেরা এই সমস্যার সমাধান হিসেবে চালু করলেন অন্তঃপুর শিক্ষা। কিন্তু কিছুদিন পরে এই শিক্ষার অসম্পূর্ণতা তাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৩০ সাল নাগাদ হিন্দু কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র যেমন রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যথাযথ Public Institution–এ মেয়েদের পড়ানোর কথা ভেবেছেন। ১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার বারাসাতে মেয়েদের জন্য একটি ফ্রি স্কুল খোলেন, পরবর্তীকালে এর নাম হয় কালীকৃষ্ণ হাইস্কুল। তবে তথাকথিত ভদ্র বাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার যথার্থ সম্ভাবনা তৈরি হয় বেথুন-এর ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরবর্তীতে বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠার পরে। কেবল জন ডিঙ্ক ওয়াটার বেথুন নয়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামও এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৮৫০ সালে এডুকেশন ডেসপ্যাচ মেয়েদের শিক্ষা খাতে অনুদান ধার্য করে।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দবালা ছিল এই বিদ্যালয়ের প্রথম দুই পড়ুয়া। ১৮৫০-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং তার প্রভাবে বেশ কিছু ভদ্রলোক নিজেদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন। এইসকল আনুষ্ঠানিক উদ্যম সত্ত্বেও দেখা যায় যে পড়ুয়ার সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ছে না এবং যে ক'জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে, তারা অধিকাংশই ব্রাহ্মঘরের মেয়ে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, পারিবারিক রক্ষণশীলতার পাশাপাশি মেয়েদের বিদ্যালয়ে আসার মতো উপযুক্ত পোশাক না থাকা এর কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ১৮৭০ সাল নাগাদ সুনীতি দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ব্রাহ্মিকা শাড়ির প্রবর্তন এই সমস্যাকে অনেকখানিই দূর করেছিল। ১৮৭৩ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয় – Annette Akroyd-এর 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। কিন্তু সাফল্য এসেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। দুই বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর Annette মাত্র চোদ্দজন পড়ুয়া জোগাড় হয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষ থেকে ক্রমশ পটপরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয়াতাবাদী মতাদর্শের বাতাবরণে নারীশিক্ষা অন্তত তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পায়। এই সময়ই কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন এবং তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বেথুন কলেজ এফ.এ, এবং স্নাতক বিভাগ চালু করে। ১৮৭৯ সালে চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী এই কলেজের প্রথম দুই স্নাতক হিসেবে সম্মানিত হন। মনে রাখতে হবে যে কেবল বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই এঁরা ছিলেন প্রথম মহিলা স্নাতক। *বামাবোধিনী,*

বঙ্গমহিলা, ভারত মহিলা, অন্তঃপুর, সাধারণী-র পাতায় নারীর নিজস্ব বিবৃতি ধরা দিচ্ছে। রাসসুন্দরী থেকে শিক্ষাপথে যে যাত্রা শুরু সেই যাত্রা পাচ্ছে এক নতুন উদ্যম, নতুন লক্ষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বায়নের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে প্রায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে ছকটি চোখে পড়ে তা হল সংস্কারক এবং প্রগতিবাদী বনাম তথাকথিত প্রথানুসারী এবং রক্ষণশীলদের লড়াইয়ের। একদিকে প্রগতিবাদীর (সিংহভাগ ব্রাহ্ম ধ্ররমাবলম্বী) নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে রক্ষণশীলদের মধ্যে যায় যায় রব। সত্তর দশকের শেষ থেকে এই তত্ত্বায়নের মোড় ঘুরতে থাকে এবং এই পর্বের কেন্দ্রে আসে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি বৈপরীত্যকে অবলম্বন করে – যেমন private/public, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, ঘর/বাহির, পুরুষ/নারী ইত্যাদি।

বহির্বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিসরে যেখানে শাসকের সঙ্গে নিয়মিত বিনিময়, বোঝাপড়া, সংঘাত এবং বহুলাংশে পশ্চিমী আদর্শ ও শাসকের প্রতি আনুগত্য জারি থেকেছে ঠিক এরই পাশাপাশি বহির্দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত এই পরাজয়ের গ্লানি লাঘব করার একমাত্র উপায় ছিল অন্তরের দুনিয়াকে ঔপনিবেশিক বোঝাপড়া থেকে সরিয়ে তার এক স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র নির্মাণ। ছিল নতুন নারীর নির্মাণ প্রকল্প। এইক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জাতীয় পরিচিতি সংযোগ নির্মাণের ক্ষেত্র।

রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন*, কৈলাসবাসিনীদেবীর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, সুকুমারী দত্তের অপূর্ব কৃতী ও মানকুমারী বসু – কামিনী রায় প্রমুখ একাধিক কবির সাহিত্যকর্মে আত্মজীবনী, কথাশিল্প, নাটক, প্রবন্ধে এই সময়পর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কলকাতার পাশাপাশি ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন ও সাহিত্যিক অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই। দুটো কারণে। প্রথমত, ১৮৬০ সালে ঢাকায় ছাপাখানা তৈরি হয়, এবং এর ফলে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা ও সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ খুলে যায় এবং ১৮৪৬ সালে ঢাকায় স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজ ছিল কলকাতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রহতম ব্রাহ্ম সংগঠন।

১৮৭০-এর দশকে ব্রাহ্ম সমাজের নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা' স্থাপিত হয় এবং এর ছত্রছায়াতে বেশ কয়েক বছর ধরে বহু বাঙালি মেয়ে লেখাপড়া শিখে নিজেরাই লেখালেখি করতে শুরু করেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভার বিবরণী ছাড়াও, ওই ছাপাখানা থেকে বার হয়েছিল ১৮৭৬ সালে *লক্ষ্মীমণি চরিত* নামে এক বারবণিতা কন্যার বিদ্যার্জন ও পারিপার্শ্বিক পাঁক থেকে মুক্তিলাভের দুঃসাহসিক কাহিনি। ওই বছরই ওখান থেকে প্রকাশিত হয় ফয়েতুন্নেসা চৌধুরানীর সুবৃহৎ উপাখ্যান *রূপজালাল* (১৮৭৬)।

মুসলমান সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে কলকাতায় যখন আমির আলি বা দেলওয়ার হোসেনের মতো চিন্তাবিদ্‌রা প্রয়াসী হয়েছেন, তখন দূর মফস্‌সলে নিজ সমাজের

উন্নতিকল্পে একের পর এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এই ফয়েজুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৩)-এর মতো ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৩ সালে নানা বাধা-নিষেধ পেরিয়ে সুদূর মফস্‌সলের অবরোধবাসিনী এই নারী সম্পূর্ণ নিজের খরচে স্থাপন করেন ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়। এর আগে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার মুসলমান মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল ভিন্ন ধারায়, অন্য প্রেক্ষিতে হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অনেক কটি দশক পেরিয়ে বনেদি মুসলমান পরিবারের কেউ কেউ পর্দার আড়াল থেকে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে লেখাপড়া শিখত। সে শিক্ষা আরবি-ফারসির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজি বা বাংলা শিক্ষা অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায়নি। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি ফয়েজুন্নেসা হোস্টেলে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। এর পাশাপাশি নিজের গ্রামে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলাই বাহুল্য যে ফয়েজুন্নেসার এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা সমাজপতিদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয় কিন্তু কোনও কিছুই তাঁকে হতোদ্যম করতে পারেনি।

১৮৯৭ সালের আগে কলকাতার মুসলমান মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন লেডি ম্যাকেঞ্জি, নাম 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। বাংলায় নারীশিক্ষা আন্দোলনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বেগম রোকেয়া সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন মেয়েদের অর্গলমুক্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাই অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তিনি কোরাণ-হাদিস-

শরিয়ত থেকেই খুঁজে বার করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যুক্তি। ঠিক যেভাবে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র হিন্দু শাস্ত্র থেকেই খুঁজে বার করেছিলেন বিদ্যাসাগর বা রামমোহন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মাধ্যমে মুসলমান নারীসমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারই ছিল রোকেয়ার অন্তরের একমাত্র কামনা। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'। মুসলিম নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন করতে এই সমিতি সচেষ্ট ছিল। সেই সময়ে হিন্দু সমাজে সখী সমিতি (১৯০৭), ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল (১৯১০) প্রভৃতি সংগঠন হিন্দু নারীর জাগরণ ও শিক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমান মেয়েদের এই ধরনের কোনও সংগঠন না থাকার অভাব পূরণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া তাঁর এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। রোকেয়ার আদর্শে সামিল হয়ে বাংলার মুসলিম মেয়েদের দুরাবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন আরো অনেকে। তেমনই একজন ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ করার সময় নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত হয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি বাংলার মুসলমান মহিলা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩০-এর দশকে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য পৃথক পর্দা-কলেজের দাবি ওঠে যার

ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। নজরুলকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *নজরুলকে যেমন দেখেছি*। ছোটদের জন্যও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন তিনি। রোকেয়ার জীবন ও আদর্শ যাতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করতে পারেই সেই উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন *রোকেয়া জীবনী*, যা আজও পর্যন্ত রোকেয়া চর্চার ক্ষেত্রে একটি অবশ্যপাঠ্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনই আরো একটি নাম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯)। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক পৃথিবী নিয়েও নিরন্তর ভাবতেন সুফিয়া। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে বর্ধমানে তৎকালীন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। সুফিয়া কামালই ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের প্রথম মুসলমান সদস্য। সুফিয়া কামালের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি *বেগম* পত্রিকা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই মহিলাদের সচিত্র পত্রিকা হিসাবে *বেগম* কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়বে *ভারতী* পত্রিকায় যখন স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন 'রমণীরস্ব দেশব্রত তার প্রায় একই সময়ে *নবনূর* পত্রিকায় 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। দুটি লেখারই মূল উপজীব্য ছিল নারী কীভাবে পুরুষের মঙ্গলের জন্য পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনোত্তর পর্বে যখন *জয়শ্রী*-র আবির্ভাব ঘটল, তখন মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিই হয়ে উঠল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। দেশকালগত পরিস্থিতির কারণে বিশ শতকের গোড়ায় ভারত-মহিলা আর্য নারীর মহিমা প্রচারে এবং আধুনিক নারীর

জাতীয়তাবাদী নব্য পুরুষের সুযোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এর পঁচিশ বছর পর যখন *জয়শ্রী* বেরোতে শুরু করল তখন সশস্ত্র বিপ্লবী মেয়েরা নিজেরাই আখড়ায় গিয়ে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা শিখতে শুরু করেছে। তাঁদের কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল প্রাচীন ভারতে নারীর গৌরবময় অতীত তুলে ধরার চেয়েও পৃথিবীর সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সম্পর্কে মেয়েদের অবহিত করা। সেই চাহিদা মেনেই রাশিয়ার সমাজতন্ত্র বা আইরিশ বিপ্লবের আলোচনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে *জয়শ্রী*-তে।

উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে তখন সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর কাছেও তাদের নারীসমাজের উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নিম্নবর্গীয় পত্র-পত্রিকাগুলি এই সব মানুষের আশা-আকাঙ্খার মুখপাত্র হয়ে ওঠে। যেমন *মাহিষ্য সমাজ* তাদের মুখপত্রে বলছে,

> অতীতে আমরা স্ত্রীলোদের অধীন করে রেখেছি... মানুষ হিসেবে নয় তাদের মেয়ে হিসেবে গৃহের অবরোধে বসিয়ে চরকা করিতে বাধ্য করিয়ে স্বরাজস্বরূপ এত বড়ো বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না।[১৯]

সদগোপ সমাজের একটি পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে সমাজে তাদের নারীর অবস্থানের উন্নতিতে স্ত্রীশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে একেবারে উচ্চবর্গের নারীমুক্তির ভাবধারায় আধারে। *সদগোপ পত্রিকা*, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যাটিতে লেখা হচ্ছে—

> নারী আর স্বামীর দাসী হতে চাইছে না — চাইছে সহধর্মিনী হতে; সহকর্মিনী বা সঙ্গিনী হতে। এই সঙ্গিনী হওয়া বা সহকর্মিনী হওয়া শুধু মুখেই হওয়া যায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

শিক্ষায়, ভাবে, চিন্তা করায় যেখানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ সেখানে নারীর প্রকৃত শিক্ষালাভ না হলে নূতন সমাজ গড়া যাবে না, সমাজের অশুভ শক্তিও নির্মূল হবে না।[২০]

অশুভ শক্তি বলতে এখানে স্পষ্টতই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির এই মানুষেরা বর্গীয় অসামঞ্জস্য উৎপাদনকারী সামাজিক রীতিনীতির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সমাজের উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোকগোষ্ঠী ঠিক যেভাবে স্ত্রীদের শিক্ষিত করতে গিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকতার সংস্পর্শে স্ত্রীজাতির উপর অধিকার হারানোর ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন সেই একই দুঃশ্চিন্তার ছাপ দেখা যায় সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যারা উনিশ শতকের শেষের দিকে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার আদর্শে সামিল হয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নেই ব্রতী হয়েছিলেন। যেমন, *মাহিষ্য মহিলা* নামের মাহিষ্য সমাজের নারী বিষয়ক পত্রিকা ১৩২১ বঙ্গাব্দে জানাচ্ছে—

> সমগ্র নারী সমাজের উন্নতি করতেই এই পত্রিকার অবতারণা, কেননা ভারত ললনা এক সময় সতীত্বের জন্য জগতের মধ্যে আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহার দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথি সেবায় জগৎবাসী মুগ্ধ হত, যাহার প্রেম-ভক্তিতে স্নেহ মমতায় সংসারে স্বর্গীয় সুখ প্রবাহিত হত, পরোপকার রূপ ব্রত পালনে যাহারা প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করত, সেই ললনা আজ বিলাস মদে মত্ত, কর্তব্য পথে ভ্রষ্ট।[২১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য *মাহিষ্য মহিলা*-সহ আরও অনেক নিম্নবর্গীয় পত্রিকায় নারীকে কোনও বিভাজন সূচক বিশেষণে চিহ্নিত না করে ‘হিন্দু নারী’ হিসেবে বর্ণনা হচ্ছে। *মাহিষ্য মহিলা*-র একটি লেখায় দেখব উচ্চবর্গীয় গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর অনুকরণে এক স্বামী-স্ত্রীর

কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় নারীসমাজকে উন্নততর করার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

তিলি সমাজের মুখপাত্র *তিলিবান্ধব* পত্রিকা ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় সদর্পে ঘোষণা করছে—

> সন্তান উৎপাদন ও তাদের সঠিক পালনই নারীর একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ নারীই এই সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ।[২২]

এই একই সংখ্যায় পত্রিকাটিতে বলা হচ্ছে সুস্থ, সবল পুত্রসন্তানের জন্ম ও সঠিক প্রতিপালনেই সেই গোষ্ঠীর সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন নিহিত রয়েছে। *সদগোপ পত্রিকা* আরও একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেছে,

> মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, সঠিক শিক্ষা-সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই আদর্শ মা ও আদর্শ নারী প্রতিটি সমাজের উন্নয়নের মূল সোপান।[২৩]

সুবর্ণবণিক সমাচার পত্রিকা – ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গবাদ সংখ্যায় বলেছেন যে, পুত্র সন্তানের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় তার মাতৃজঠরে।

গন্ধবনিক পত্রিকা-র ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় তাদের নারীদের সীতা-সাবিত্রী আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে বেহুলার আদর্শ অনুকরণ করতে বলেছে এই বলে যে,

> অন্য যে কোনও নারী তাহার সম্মুখে পতিভক্তিতে ছোট হইতে বাধ্য... যেভাবে স্ফীত, গলিত কীটকুলিত, পুতিগন্ধ, মৃত পতিকে কোলে লইয়া বেহুলার যাত্রা।[২৪]

এই পাতিব্রত্য আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদেরই নামান্তর, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের মহিলাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তিকরণ তারই পরিচায়ক। এরই অন্তিম পরিণতি, সম্ভবতঃ একমুখী ব্রাহ্মণ্যবাদ রঞ্জিত অনন্য এক আদর্শ নারীর ভাবনা, যা বর্গ নির্বিশেষে সব নারীর কাছেই হয়ে উঠেছিল অনুকুরণীয়। সুতরাং ‘মেয়েদের স্বাধীনতা’ বিষয়টি আপএক্ষিক, শর্ত নির্ভর এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে জটিল, সমস্ত দেশে, সকল সমাজের প্রেক্ষিতে উনিশ শতকে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কালে এই দোলাচলতা ছিল আরও অধিক মাত্রায়। কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচারে একই সঙ্গে একাধিক যুগ মানসিকতা সহাবস্থান করছিল সেই সময়ে। অধিকাংশ শিক্ষাদ্যোগীই মনে করতেন মেয়েদের পড়াশোনা শেখার প্রয়োজন কিন্তু তা হবে একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে। কেশবচন্দ্র সেনের মতো প্রগতিশীল মানুষও মনে করতেন মেয়েদের ‘জ্যামিতি’, ‘দর্শন’ প্রভৃতি ‘পুরুষালি’ বিষয় পড়া অনাবশ্যক। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়—

> ...আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি।... যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রী জাতি উৎকৃষ্ট গৃহিনী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য।[২৫]

অর্থাৎ শিক্ষিত পুরুষদের পরিবর্তিত জীবনধারার উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য কিছুটা লেখাপড়া শেখা প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তা ঠিক ততটাই – যতটা পুরুষেরা চাইবেন এবং তা হবে পিতৃতন্ত্রের কড়া অভিভাবকত্বে।

নারীদের নিজস্ব স্বর ও পিতৃতন্ত্রের বিপ্রতীপে স্বতন্ত্র ভাবে আত্মপ্রকাশের এই প্রারম্ভকালে বিশ্বের অন্যসব প্রান্তের নারীবাদী চিন্তার অনুশীলন ও নারীদের অধিকারের দাবীতে আন্দোলন গুলো কেমন ছিল, তারা কি আদৌও প্রভাবিত করেছিল সুদূর উপনিবেশের অধীনে থাকা তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলিকে, বিশ্বের নানা প্রান্তের নারীদের নিজস্ব ভুবন রচনার সেই শুরুর দিনগুলি এই প্রসঙ্গে আলোচনায় এনে দেখব।

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও নারী আত্মজীবনী

পাশ্চাত্যে নারীবাদের উৎপত্তির তারিখ হিসেবে আমরা কি আদৌ কোনও একটি বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করতে পারি? কিন্তু সুবিধার জন্য নারীবাদকেও কিছু ঐতিহাসিক যুগে-র এককে ভাগ করা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে আত্মসচেতন এবং সুসংবদ্ধ নারীবাদী চিন্তনের সূত্রপাত। তারপর উনবিংশ শতকে নারী আন্দোলন এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি ক্রমশ পরিপূর্ণ অবয়ব পেতে থাকে।

'নারীবাদ' কথাটি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ব্যবহার হতে শুরু করে, অক্সফোর্ড অভিধান ১৮৯৪ সাল থেকে শব্দটি গ্রহণ করে। ১৮৯৪ সালের আগেই অবশ্য 'নারীবাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হত। তা না হলে এর অভিধানে অন্তর্ভুক্তি ঘটত না। যদিও 'নারীর অধিকার' কথাটিই প্রচলিত ছিল বেশি। এই অধিকার অর্জনের লড়াই, নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ, নিজের শরীর ও যৌনচেতনা বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া ও অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া, পুরুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে নারীর নিজস্ব স্থান বোঝা, জানা আর

সেখানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের আর কর্মস্থলের আর দৈনন্দিন জীবনের দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত স্তরে লিঙ্গভেদ প্রসঙ্গে সামগ্রিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টাকে যদি নারীবাদী আন্দোলনের মূল ঝোঁক মনে করা হয়, তাহলে ঊনবিংশ শতককে নারী আন্দোলনের আরম্ভের সময় বলে মনে করা যেতে পারে। উনিশ শতকে নারীবাদ প্রসঙ্গে যে কোনও আলোচনা প্রসঙ্গে শুরুতেই আসবে মানবীবিদ্যার প্রথম দার্শনিক মেরি ওলস্টনক্রাফট-এর ১৭৯২ সালে প্রকাশিত *আ ভিনডিকেশন অব দ্য রাইটস অব উইমেন উইথ স্টিকচারস অন মর‍্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সাবজেক্টস* বইটির কথা। ফরাসী বিপ্লবকে আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের সমর্থনে এডমান্ড বার্কের বক্তব্যকে খণ্ডন করে এই বইতে মেরি কেবল প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতিকে সমর্থন করেন তাই নয়, তিনি এও স্পষ্ট বলেন, যে সামাজিক অসাম্যের প্রবক্তা বার্ক এবং তার ভিত্তিই হল নারীর সহায়হীন নিষ্ক্রিয়তা। তিনি স্পষ্টত এও জানিয়ে দেন যে এই তথাকথিত ‘মেয়েলিপনা’ বস্তুত একটি সামাজিক নির্মাণ যা নারীর মানসিকতা বিকলাঙ্গ করে রাখে। শিক্ষিত নারী যুক্তিনির্ভর স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবে, এই অধিকারের দাবি তোলা বোধ হয় *রাইটস অব উওম্যান* গ্রন্থের সব চাইতে বড় অবদান। মেরি চেয়েছিলেন, নারীর সামনে জীবিকা নির্বাহের বিবিধ পথ খুলে যাক, মেয়েদের যেন নিতান্ত বাঁচার তাগিদে বিবাহে বাধ্য হতে না হয়।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী, ভাবনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল ফরাসি দার্শনিক সেন্ট ফুরিয়ের ও ইংরেজ রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি

ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্টদের বক্তব্য। পরিবার নামক সামাজিক নির্মাণটিকে তাঁরা প্রবল আক্রমণ করে বলেন, এইখানেই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতাকেন্দ্র নিহিত থাকে। তথাকথিত পারিবারিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে তারা নারীর যৌন স্বাধীনতাকে মুক্তির অন্যতম শর্ত বলে চিহ্নিত করেন।

আমেরিকাতে ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দাসপ্রথা বিলোপের আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন দুই বোন অ্যাঞ্জেলিকা ও সারা গ্রিমকে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, দাসপ্রথা আর নারীর পুরুষ দাসত্ব একই শোষণের দুই রূপ। ১৮৩৮ সালে একটি জনসভায় অ্যাঞ্জিলিনা প্রদত্ত বক্তব্যের সারার্থ অনেকটা এইরকম যে পুরুষরা ক্রীতদাসদের শাসন করে তারাই দেশে কর্তৃত্ব করে। সেই তারাই নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আমাদের সরব হতে দেয় না। আলোড়ন ওঠে যখন তাঁরা ক্রীতদাসীদের উপরে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের যৌন নির্যাতনের কথা খোলাখুলি বলে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসী আর শ্বেতাঙ্গ নারীদের মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের দুটি বিশেষ পরিচিত বইয়ের নাম হল *লেটার্স অন দ্য ইকোয়ালিটি অব সেকসেস* (১৮৩৮) এবং *লেটারস টু ক্যাথারিন ই বীচার* (১৮৩৭)।

এই শতকেই ইংল্যাণ্ডের বারবারা লে কিমথ বোডিকন লিখেছিলেন *উইমেন অ্যান্ড ওয়ার্ক*। নারীর আইনি অধিকারের লড়াইয়ে *ম্যাট্রিমোনিয়াল কাজস অ্যাকট* প্রণয়নে

বিবাহবিচ্ছেদ সহজতর হয় এবং সম্পত্তির অধিকারে নারীর দাবি মান্যতা পায়। জোসেফাইন বাটলার লিখেছিলেন *দ্য এডুকেশন অব উইমেন* ও *ইউমেনস্ ওয়ার্ক অ্যান্ড উইমেন্স কালচার*। সেনাদলে যৌনরোগে ব্যাপকতা রোধ করতে প্রচলিত ছিল *দ্য কনটেজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট*। এই আইন অনুসারে সেনা ছাউনি অঞ্চলে বসবাসকারী যে কোনও নারীকেই যৌনরোগী বলে ধরে নিয়ে তার ডাক্তারী পরীক্ষা করানো যাবে। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তথাকথিত 'পতিতা' নারীর কোনও আইনি অধিকার থাকতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা হত অত্যন্ত অমানবিক এবং তাকে বলা হত ডাক্তারি ধর্ষণ। এই নারী বিরোধী আইন তুলে দেবার জন্য আন্দোলনে জোসেফাইন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৬ সালে এই আইন নাকচ হয়।

সার্বিকভাবে দেখলে এই শতকে নারীবাদী ভাবনার অজস্র ধারা নজরে আসবে। বলা বাহুল্য এরা কেউই কেবল গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন তা নয়, প্রত্যেকেই কোন না কোনও ভাবে সক্রিয় নারী আন্দোলনের শরিক ছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় নারীশিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নারীর বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা একটি সংঘবদ্ধ সম্মেলনের রূপ নেয় ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ঐ সময় কলকাতায় আয়োজিত হয় Women's Educational Conference। সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২৮ এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় প্রায় তিনশো নারী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গঠিত হয় বেঙ্গল উওমেন্স এডুকেশনাল লীগ। সম্মেলনের প্রথম সভাপতি হন লেডি অবলা বসু।

আমাদের মনে পড়বে পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী সম্মেলন সংগঠিত করার প্রেক্ষাপট। উনিশ শতকে ইংল্যান্ডের মতো আমেরিকাতেও স্ত্রীকে স্বামীর সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে হত কেননা বিবাহিত জীবনে দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের কোনও আইনি নিরাপত্তা ছিল না। নারীর সঙ্গে ক্রীতদাসের অবস্থানগত নৈকট্য ছিল খুব স্পষ্ট। এই সাযুজ্যবোধ থেকে বহু নারী ক্রীতদাস বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্ট্যানটন ও গ্রিম ভগিনীদ্বয়। কিন্তু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ স্ট্যানটন দেখলেন তাঁকে এবং অন্যান্য মহিলা আন্দোলনকারীদের বাদ দিয়েই ১৮৪০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দাসপ্রথা বিলোপ সম্মেলন। এই অপমান এবং স্ট্যানটনের ব্যক্তিগত পারিবারিক বীতরাগ থেকে জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী সম্মেলন সংগঠিত করার প্রেরণা। ১৮৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হল ‘সেনকো ফলস কনভেনশন’। স্ট্যানটন বলেছিলেন, এই সম্মেলন এমন এক বিদ্রোহের সূচনা ঘটাল যার সমতুল্য কোনও কিছু পৃথিবী দেখেনি। সম্মেনলনে নিমন্ত্রিত ছিলেন সমস্ত সাফ্রাজেট নারীরা এবং আগ্রহী পুরুষেরা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সব সাধারণ মানুষই যোগ দিতে পারবে এই ঘোষণা করা হয়। এই ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্কস-এঙ্গেলসের সাম্যবাদী ইস্তেহার *দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*।

প্রথম যুগের নারী আন্দোলনের কর্মী ও তাত্ত্বিকরা ছিলেন অভিজাত গৃহবধূ। শিক্ষা, চাকরি ও বিবাহে নারীর স্বার্থরক্ষা, শিশুপালনের পেশাদারী সংস্থা, বাবা ও বরের হেফাজত মুক্ত নারীর কাজে যোগ দেওয়ার ভিত্তি তৈরি করা ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ইতিহাসে এঁদের

পরিচয় বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক নারীবাদী হিসেবে। অন্যদিকে সা সিমী, রবার্ট আওয়েন, ফুরিয়ের-দের রচনার প্রভাবে সমাজতন্ত্রী নারীদের একটি ঘরানাও প্রস্তুত হচ্ছিল। এর পাশাপাশি নারীবাদীরা যুক্ত হচ্ছিল ক্রীতদাস বিরোধী আন্দোলনেও। ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেলরের *দ্য সাবজুগেশন অফ উইমেন* প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় মেয়েদের ভোটাধিকারের আন্দোলন। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় এঙ্গেলসের যুগান্তকারী গ্রন্থ *দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট*। এঙ্গেলস দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানান শ্রেণিবৈষম্য শুরুর আগে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতৃবংশধারা অনুসারে নির্ধারিত হত। মেয়েদের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটেছিল পরিবার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই। পরিবার স্থাপন মানেই স্ত্রীলিঙ্গের সতীত্বের ধারণা আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার একযোগী উত্থান। সমাধান হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণের কথা বলেন এঙ্গেলস। ব্যক্তিগত মালিকানার বিনাশ না ঘটলে মেয়েদের দুর্দশাও ঘুচবে না। এই ছিল তাঁর মত। অর্থাৎ বিপ্লবই মুক্তির পথ। সমাজতন্ত্রের তত্ত্বে অধিকন্তু হিসেবে যোগ হল মেয়েদের মুক্তির বিষয়টি। ঠিক এইখানেই সিমোন দ্য বোভায়া আপত্তি তোলেন। উনিশশো সত্তরের শেষ বছরগুলি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় — সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা দিক থেকে। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট* ভারতে নারী বিষয়ক আলোচনা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এই ক্ষেত্র সমীক্ষাটি করে ১৯৭২ সালে সরকার গঠিত কমিটি অন উইমেনস স্ট্যাটাস ইন ইন্ডিয়া। ভারতে লিঙ্গবৈষম্যের ভয়াবহ চিত্রটি এই রিপোর্ট তুলে

ধরে ও দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ লিঙ্গবৈষম্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। ভারতের সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ-এর সম্পাদক জে. পি. নায়েক ঐ কেন্দ্রে কর্মরত বীণা মজুমদারকে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে বলেন যে, সেখানে নারীবিদ্যা চর্চার শুরু করা প্রয়োজন কারণ ওই বিভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন মতপ্রকাশের একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। অচিরেই ভারতের বিভিন্ন কোণে গড়ে উঠতে থাকে নারীবিষয়ক আলোচনার গবেষণাকেন্দ্র। ভারতে বিংশ শতকের নারী আন্দোলন ও নারীবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাধা কুমার জানাচ্ছেন ১৯৭৩ সাল নাগাদ নকশালবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্ব স্তিমিত হয়ে আসে এবং অনেক নকশালবাদী ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সমাজের প্রান্তিক, অধিকারহীন গোষ্ঠীগুলিকে প্রথমে আলাদা আলাদা ভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন। আদিবাসী, দলিত, নারী এঁদের নিজস্ব সংগঠনগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠলে এঁদের একত্রিত করে বৃহত্তর আন্দলনে যাওয়া যেতে পারে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এদের শত্রু এক। কিন্তু অবিভাজিত একটি সামগ্রিক সংগঠন করতে গেলে অনেক সময়ই আবেদনকারীদের মধ্যে কিছুটা অজান্তেই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে মথুরা নামের একটি আদিবাসী মেয়েকে পুলিশি ধর্ষণের প্রতিবাদে যখন নারীবাদীদের নেতৃত্বে বেশ কিছু মানুষ পথে নামেন সে ঘটনাটিকে ভারতে নারী আন্দোলনের সূচনাবিন্দু বলে ধরা হয়। ১৯৭৯ সালে শুরু হওয়া আন্দোলন নারী শোষণের যে দিকগুলোর ওপর নজর দিয়েছিল, সেগুলো হল বধূহত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন। আন্দোলন ও চর্চার কেন্দ্রে থেকে যায়

নিপীড়িত নারী। অর্থাৎ উনিশ শতকে নারীহিতৈষী পুরুষতন্ত্র ক্রমপর্যায়ে বিশ শতকের শেষপাদে এসেও সেই নিপীড়িতা নারীকে লক্ষ্য করে যাবতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে নয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকে নারীবাদী পণ্ডিতরা, শিক্ষাবিদরা ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকেন যে লিঙ্গবৈষম্যের ইতিহাস, নারীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চর্চা ও নারীর যৌনতা নিয়ে চর্চা করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে জায়গা খুঁজে নিতে হবে। ১৯৮৬ সালে প্রথম স্বতন্ত্র নারী বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র খোলা শুরু হলেও একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নারীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করে এবং প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে সেই নির্দেশিকায় সংশোধন করা হয়ে থাকে। ২০১১-১২ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতে তিরিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র রয়েছে।[২৬]

দলিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সেনসাস অনুযায়ী ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায়ের মহিলাদের লিঙ্গ অনুপাত এখনও অনেক কম ৯৪৫। Indian Express (২০১৬)-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী দলিতদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের তালিকায় শীর্ষে আছে উত্তরপ্রদেশ (২৫.৬%), পর্যায়ক্রমে আসে বিহার (১৪%) এবং রাজস্থান (১২.৬%)-এর নাম। অপরাধের তালিকায় আছে মহিলাদের ওপর হওয়া নানান অন্যায়, সম্মানহানি, ধর্ষণ, দাঙ্গা আর প্রতিহিংসা। এই রাজ্যগুলির লিঙ্গ অনুপাত যথাক্রমে ৯০৮ (উত্তরপ্রদেশ), ৯২৫ (বিহার) ও ৯২৩ (রাজস্থান)। প্রত্যেকটি

ভারতবর্ষের সমগ্র দলিত সম্প্রদায়ের লিঙ্গ অনুপাতের তুলনায় কম। এই পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এর একটি কারণ ভ্রূণহত্যা এবং কন্যাসন্তানের মৃত্যু। UN রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে একজন দলিত মহিলার গড় আয়ু, একজন উঁচু জাতের মহিলার থেকে অন্তত ১৪ বছর কম। যদিও মরণশীলতা (mortality) সংক্রান্ত গুণকগুলো একই। দলিত নারীদের গড় আয়ু ৩৯.৫ বছর আর একজন উঁচু জাতের মহিলার গড় আয়ু ৫৪.১ বছর। মাত্র ২৭ শতাংশ দলিত নারী হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে সন্তানের জন্ম দেয়। রয়েছে অপুষ্টিজনিত সমস্যা। মায়েদের অপুষ্টি থাকায় সন্তানরাও অপুষ্টির শিকার। প্রতি ১০০০ জনে প্রায় ৮৩ জন শিশু তাদের প্রথম জন্মদিনের আগেই মারা যায়। যদিও গ্রামেগঞ্জে স্বাস্থ্য-পরিষেবা উন্নত হয়েছে অনেক, তবু দেখা যাচ্ছে, সন্তান জন্মের আগে যে যত্ন মায়েদের প্রয়োজন, তা দলিত নারীরা পাচ্ছে না। এই বৈষম্যের পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সচেতনতার অভাব, কাজের শর্ত, পরিবেশ ইত্যাদি (The Indian Express, 2019)। ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী দলিত নারীদের শিক্ষার হার ৫৬.৫ শতাংশ, যা ভারতবর্ষের সব মহিলাদের (৬৫.৫%) থেকে অনেকটাই কম। স্কুলছুট মেয়েদের সংখ্যাও বেশি এবং অশিক্ষার জন্যই তারা পিছিয়ে পড়ছে সব ক্ষেত্রে।

২০০০ সালের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী উঁচু জাতের মহিলাদের মজুরি ৫৬ টাকা আর দলিত মহিলাদের ৩৭ টাকা। NSSO (2009-10)-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৬০ শতাংশ দলিত মহিলা শ্রমজীবী।[২৭]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দলিত মহিলারা পেছনের সারিতে। কিছু মহিলা পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর জানা গেছে, তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ ছিল খুবই কম। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, মাত্র ১৪.৫ শতাংশ দলিত মহিলা উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পায়।[২৮]

ভারতবর্ষে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বেশিরভাগ বাস করে গ্রামে (৭৬.৩%)। এখনও ৩৭ শতাংশ দলিত দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। গ্রামে বসবাসকারী দলিত মহিলাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কিছু মৌলিক পরিষেবা এবং সম্পদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা ভূমির অধিকার। এ সবের সঙ্গেই সম্পর্ক দারিদ্রের। আর দারিদ্রের জন্যই বারবার দলিতদের শরণাপন্ন হতে হয় উঁচু জাতের মানুষের কাছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, জল, জীবিকা, সব ক্ষেত্রে তাদের নির্ভর করতে হয় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর। আর তখনই ঘটে সম্মানহানি। তারা শুধু জাতিভেদের শিকার নয়, তারা লিঙ্গ বৈষম্যেরও শিকার। স্কুলছুট মেয়েদের সংখ্যাও বেশি এবং অশিক্ষার জন্যই তারা পিছিয়ে পড়ছে সব ক্ষেত্রে। শুধু উঁচু জাতির মানুষ নয়, দলিত মহিলারা অত্যাচারিত হয় স্বজাতির পুরুষের দ্বারাও। তাদের ক্ষমতা নেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার। অধিকার নেই নিজের মতো করে বেঁচে থাকার।

সাধারণভাবে দেখলে, দলিত মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রকার নয় ধরনের। যেমন- শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, শব্দের অপব্যবহার, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, বলপূর্বক

পতিতাবৃত্তি, অপহরণ, গার্হস্থ্য হিংস্রতা এবং শিশুদের ওপর অত্যাচার, মৃত্যু বা ধর্ষণ। দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা অত্যাচারিত হয়েছে সর্বসমক্ষে রাস্তা, মাঠ, শৌচাগার, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল-এর একটি রিপোর্ট (২০০৬) অনুযায়ী দলিত মহিলাদের দায়ের করা কেসগুলির মধ্যে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে মাত্র ১% কেসে। ১৭.৪% কেসের ক্ষেত্রে পুলিশ মহিলাদের বাধা দিয়েছে। আর ২৬.৫% কেস অপরাধী এবং তাদের সমর্থকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ এ কথা ধরেই নেওয়া হয় যে, দলিত মহিলাদের ওপর অত্যাচার আইনসম্মত, আসলে যা নয়। পরিসংখ্যানমূলক তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে প্রতি ১৮ মিনিটে দলিতদের ওপর কোনও-না-কোনও অপরাধ হয়। প্রতিদিন প্রায় তিনজন দলিত মহিলা ধর্ষিত হয়। প্রতিদিন অন্তত ২ জন দলিতের হত্যা হয় এবং ঘর পোড়ানো তো হয় অন্তত দু'টি। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬ জনের অপহরণ হয়। SC/ST Prevention of Atrocities Act আওতায় দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে মাত্র ১৫.৭১%, যেখানে মূলতবি রয়েছে ৮৫.৩৭% কেস (ন্যাশনাল হিউমান রাইটস কমিশন)।

বারবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অত্যাচারের শিকার হয়েছে দলিত মহিলারা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৬-এর একটি ঘটনা, মহারাষ্ট্রের খাইরল্যানজি গ্রামে দুই দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই দু'জন ছিল একই পরিবারের মা ও মেয়ে। চাষের জমির ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরির প্রতিবাদ করেছিল এই মহিলারা। এটা ছিল উঁচু বর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফল।

১৯৯৫ সালে গঠিত হয় জাতীয় দলিত মহিলা সংঘ (The National Federation of Dalit Women-NFDW)। এই সংঘ প্রশ্ন তোলে জাতিভেদ নিয়ে। তার আগে উত্তরপ্রদেশে দলিত মহিলা সমিতি কাজ শুরু করে দলিত মহিলাদের জন্য। পরবর্তী সময় এই সমিতি বিস্তারলাভ করে অন্যান্য রাজ্যে (আন্ধেরিয়া, ২০০৮)। কিন্তু এখনও দলিতদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া অপরাধের শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। আইন করেও চিরতরে বাঁধা হয়নি অস্পৃশ্যতা। বাবাসাহেব আম্বেদকর সারাজীবন লড়াই করে গেছেন দলিতদের জন্য। সংরক্ষণ তারই একটি ফল। যে উন্নয়ন আম্বেদকর কল্পনা করেছিলেন, আজ দীর্ঘ ছয় দশক কেটে গেলেও তার প্রতিফলন দেখা যায় না ভারতবর্ষের গ্রামেগঞ্জে।[২৯]

প্রান্তিক নারী ও শিক্ষার অধিকার

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ভূখন্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি সচেতনভাবে উঠে আসার আগেই সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির মধ্যে মানুষের সামাজিক – সাংস্কৃতিক চেতনা নিমার্ণের মাধ্যমে মুক্তির কথা সর্বপ্রথম যিনি সামনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন জ্যোতিরাও ফুলে। মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার লালগুণ গ্রামে একটি নিম্নবর্ণীয় মালি পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন। ব্রাহ্মণ বন্ধুদের পরিবার দ্বারা অপমানিত হওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল তার। তার ঠাকুরদা এক ব্রাহ্মণ শুল্ক অফিসারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে হত্যা করে পুনে চলে যান, ফলে নিজের জীবন থেকে জাতপাত বিভাজনের কদর্য দিকগুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন জ্যোতিরাও ফুলে। হিন্দু সমাজে জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার কঠোর

সমালোচনা করে সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি তৃতীয় রত্ন নামে একটি নাটক লিখে মেহনতী মানুষ তার অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে কিভাবে ব্রাহ্মণ বর্গের দ্বারা শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। জ্যোতিবা ফুলের স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন তাঁর যোগ্য সহযোদ্ধা, ১৮৪২ থেকে ১৮৫২ এই দশ বছর সময়কালে তাঁরা দুজনে মিলে সমাজের নিপীড়িত অংশের মানুষ ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে পুনায় কয়েকটি স্কুল খোলেন। সমাজে জাত পাত অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার অবসানের জন্য শূদ্রাতিশূদ্র বলে চিহ্নিত মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন তারা। জ্যোতিবা ফুলে ও সাবিত্রীবাই ফুলের কাছে স্বাধীনতা শব্দের অর্থ শুধুই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। একটি স্বাধীন সমাজ বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, মানুষ নিপীড়িত মানুষ যখন প্রকৃতই স্বাধীন হবে তখন সে স্পষ্ট চোখে মুক্তভাবে নিজের কথা ও অন্য মানুষের কথা বলতে বা লিখে প্রকাশ করতে পারবে কিন্তু তার যদি সে স্বাধীনতা না থাকে তাহলে সে কখনোই নিজের চিন্তা ভাবনা বিনিময় করতে পারবে না এবং এর ফলে অন্যরা লাভবান হলেও সে নিশ্চিতভাবেই বাতাসে বাষ্পের মতো বাঁচতে থাকবে। জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন ব্রিটিশ আমেরিকান দার্শনিক রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক টমাস স্পেনের মানবাধিকার বাস্তববাদ ও কার্যকারণবাদ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও ফুলে টমাস পেইনের লেখা *রাইটস অফ ম্যান* পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং সামাজিক ন্যায়ের

ধারণা সম্পর্কে অবগত হন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টমাস পেইনের এই বইটি ১৭৭৫ সালে আমেরিকায় স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সাবিত্রীবাঈ একাধারে ছিলেন নীচু শূদ্র জাতিভুক্ত এবং নারী। ফলে তাঁর অবস্থান ছিল প্রান্তিকের মধ্যে প্রান্তিকতর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নীচু জাতির মানুষ আর মেয়েদের লেখাপড়ার প্রশ্নটা সামনে আসে। এই ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ছিল মিশনারি উদ্যোগ। এক দিকে গড়ে ওঠে মিশনারি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল। ধীরে ধীরে আক্ষরিক শিক্ষার থেকে বঞ্চিত মানুষজনের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। মেয়েদের এবং নীচু জাতের ছেলেদের – যাদের ভারতীয় সমাজ দীর্ঘকাল শিক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে রেখেছিল, তাদের পঠন পাঠনের পথ উন্মুক্ত হতে থাকল।

১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতরার নীচু জাতির, সীমিত বিত্তের এক চাষি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সাবিত্রীবাঈ। জাতিতে তাঁদের পরিবার ছিল মালি। পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মালিরা অস্পৃশ্য না হলেও নীচু জাতি বলে বিবেচিত হত। বাপের বাড়িতে সাবিত্রীকে কোনো লেখাপড়া শেখানো হয়নি। একে নীচু জাত, তায় আবার মেয়ে— স্বাভাবিকভাবেই সে ছিল নিরক্ষর। ১৮৪০ সালে সাবিত্রীর যখন মাত্র ৯ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে। রীতি মোতাবেক জ্যোতিরাও ফুলেও ছিলেন সাবিত্রীর মতো একই জাতির মালি ঘরের সন্তান। শুরু হল

জ্যোতিরাও-এর হাত ধরে যথার্থ নতুন এক জীবন। শুরু হল একেবারে আলাদা ব্যতিক্রমী এক দাম্পত্য সম্পর্ক।

নিজের মতো করে নিজের হাতে জ্যোতিরাও তাঁকে গড়ে নিতে উদ্যোগী হলেন। এর ফলে অল্প দিনেই সাবিত্রী জ্যোতিরাও-এর স্ত্রী শুধু নন, তাঁর সহযোদ্ধা হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে জ্যোতিরাও কিছুদিন নিজেই সাবিত্রীকে পড়ালেন। তবে সে কাজটা তাঁকে করতে হত অতি গোপনে, কারণ বাড়ির লোকের তাতে মত ছিল না। চাপ বাড়তেই থাকে ক্রমশ। ব্রাহ্মণরা জ্যোতিরাও-এর বাবার উপর চাপ বাড়াতেই থাকে এবং পাশাপাশি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ছেলে বিপথে যাচ্ছে। একটা সময় পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিরাও-এর বাবা তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন। ওঁরা যখন বাস্তুচ্যুত হন তখন জ্যোতিরাও-এর বয়স বাইশ বছর, সাবিত্রীর আঠারো। বাড়ি ছেড়ে ফুলে দম্পতি আশ্রয় নেন জ্যোতিরাও-এর এক বন্ধু উসমান শেখ-এর বাড়িতে। সেখানেই সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হয় উসমানের বোন, ফতিমা বেগম শেখ-এর সঙ্গে। চিন্তা-চেতনায় প্রগতিশীল ফতিমা লিখতে পড়তে জানতেন। উভয়ের মধ্যে এমন এক বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হয় যা আগামী দিনে দুজনকে সহযোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পরবর্তীকালে পুণেতে মিসেস মিচেল-এর নর্মাল স্কুল ও তারপর আহমেদনগরে মার্কিন মিশনারি স্কুল মিসেস ফারহার-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাবিত্রী শিক্ষিকা হওয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করেন। হ’ন ভারতের প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা।

সাবিত্রীর এক বছর প্রশিক্ষণ লাভের পর, ১৮৪৮-এ জ্যোতিরাও পুণেয় বিশ্রামবাগ ওয়াদায় তওশাহ ভিদে নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতিরাও ছিলেন প্রথম হিন্দু যিনি পুণেতে মেয়েদের জন্য বেসরকারি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল স্থাপন করে ফুলে দম্পতি খোলাখুলি ভাবেই ব্রাহ্মণ আধিপত্যকে, শিক্ষার উপর ব্রাহ্মণ আর পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেন। প্রথমে এই স্কুলে ভর্তি হয় নয় জন ছাত্রী। সকলেই শূদ্র – অতি-শূদ্র পরিবারের সন্তান, তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির। পরে সংখ্যাতি বেড়ে দাঁড়ায় ২৫-এ, এবং আরও পরে তা হয় ৭০। সেই স্কুল স্থাপনের পর থেকে তার প্রধান শিক্ষিকা হলেন সাবিত্রীবাঈ। স্কুলে তাঁর সঙ্গে পড়াতেন ফতিমা বিবি আর শগুনাবাঈ।

সাবিত্রীবাঈ ফুলের স্কুলে শিক্ষকতা তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের কাছে ঘোরতর আপত্তির ছিল। স্কুলে যাওয়ার পথে স্থানীয় ছেলেরা তাঁকে অনুসরণ করত, গালিগালাজ দিত, এমনকি পচা ডিম, গোবর, ইঁট-পাটকেল অবধি ছুঁড়ে মারত। প্রথম দিকে সাবিত্রীবাঈ শান্তভাবে দিনের পর দিন এই অত্যাচার সহ্য করে চলেন। তিনি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে আক্রমণকারীদের বোঝানোরও চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অনেক চিন্তা ভাবনা করে জ্যোতিরাও একটা পথ বের করেন। তিনি সাবিত্রীবাঈকে দুটি শাড়ি এনে দিয়েছিলেন। তুলনামূলক মোটা শাড়িটা সাবিত্রীবাঈ স্কুলে যাওয়ার পথে পরে যেতেন। সমাজের বিক্ষিপ্ত সব ময়লা তাতে এসে পড়লে স্কুলে গিয়ে সেটি পালটে পরিষ্কার

শাড়িটা পরে শ্রেণিকক্ষে যেতেন। ছাত্রদের পড়ানো হয়ে গেলে ফেরার সময় আবার শাড়ি পাল্টে ময়লা শাড়ি পরে ফিরতেন।

১৮৫২-র মধ্যেই সাবিত্রীবাঈ ও জ্যোতিরাও-এর উদ্যোগে পুণেতে তিনটি আলাদা আলাদা মেয়েদের বিদ্যালয় চলছিল। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো ছাত্রী ছিল সেখানে। ধীরে ধীরে স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে সাবিত্রী ও তাঁর স্বামীর প্রচেষ্টায় মেয়েদের জন্য অন্তত ১৮-টি স্কুল স্থাপিত হয়। শুধু মেয়েদের শিক্ষা নয়, মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার পর, সাবিত্রীবাঈ ফুলে ও জ্যোতিরাও ফুলে অস্পৃশ্য। নীচু মাহার ও মাং জাতির ছেলে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৪-তে সাবিত্রীর প্রথম কবিতার বই *কাব্যফুলে* প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর।

১৮৫০-এ সাবিত্রী আর জ্যোতিরাও দুটি শিক্ষা সংক্রান্ত ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলির নাম ছিল দি নেটিভ ফিমেল স্কুল, পুণে (The Native Female School - Pune) ও সোসাইটি ফর প্রোমটিং দি এডুকেশন অফ মাহারস অ্যান্ড মাঙস (Society for Promoting the Education of Mahars and Mangs)। যে বহু স্কুল সাবিত্রীবাঈ ও ফতিমা চালাতেন সেইগুলিকে ক্রমে এই ট্রাস্টে আওতায় আনা হয়। সাবিত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা ছিল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতোই মৌলিক চাহিদা।

সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৮৭৩-এ জ্যোতিরাও ফুলে মহারাষ্ট্রে ‘সত্যশোধক সমাজ’ নামে এক সংগঠন তৈরি করেন। এই সত্যশোধক সমাজের একটি মহিলা শাখা গঠিত

হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন সাবিত্রীবাঈ। পুণেতে এই সংস্থার সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হত। সেখানে শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হত। ১৯৯০-এ জ্যোতিরাও-এর মৃত্যুর পর, সাবিত্রী সত্যশোধক সমাজের সভাপতি হন এবং এই আন্দোলনের সার্বিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমৃত্যু সেই দায়িত্ব পালন করেন। সেই সুবাদে ১৮৯৩-এ তিনি মাসওয়াড়ের সত্যশোধক সমাজের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সত্যশোধক সমাজের নীতি অনুসারে পুরোহিত বর্জিত, পণ বর্জিত, ন্যূণতম ব্যয়ের বিবাহ হয় ১৮৭৩-এ, ২৫ ডিসেম্বর, সমাজ প্রতিষ্ঠার দুই মাসের মাথায়। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের সমস্ত খরচ সাবিত্রী নিজে বহন করেন। এই ধরনের বিয়ের বিরোধিতায় গোটা দেশ জুড়ে পুরোহিতরা সরব হন। বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়। ১৮৮৯-এ সাবিত্রী, জ্যোতিরাও তাঁদের ছেলের বিবাহ ঐ একই ভাবে দেন। সত্যশোধক সমাজের বিয়েতে পাত্রকে অঙ্গীকার করতে হত পাত্রীকে সে লেখাপড়া শেখাবে আর সমমর্যাদা দেবে।

১৮৯২-তে প্রকাশিত হয় *বাভন্নকাশি সুবোধ রত্নাকর* নামে সাবিত্রীবাঈয়ের আরো একটি কবিতা গ্রন্থ। নামের অর্থ 'খাঁটি মাণিক্যের সমুদ্র'। মারাঠি সাহিত্যের জগতে এটিও বিশেষভাবে সমাদৃত একটি বই। এটিতে ছিল ছন্দে লেখা জ্যোতিরাও-এর জীবনী এবং মহারাষ্ট্রের বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তার উপস্থাপনা, সর্বমোট বাহান্নটি রচনার সমষ্টি। এইগুলি জ্যোতিরাও-এর মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালে সাবিত্রীবাঈ রচনা করেন এবং বই হিসেবে এর পরের বছর প্রকাশ পায়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন শাস্ত্রী নর বাবাজি মহাধত

পানসারে পাটিল এবং প্রকাশ করে বরোদার বাতসল প্রেস। এছাড়াও, ১৮৫৬ সালে সাবিত্রীবাঈ জ্যোতিরাও-এর প্রদত্ত ভাষণের একটি সংকলন প্রকাশ করেন 'জ্যোতিবাথিদ ভাষণে' নামে।

কুড়ি বছরের সময়কালে সাবিত্রীবাঈ তাঁর স্বামী জ্যোতিরাওকে খান তিনেক অত্যন্ত মূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার, তাঁদের শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন। চিঠিগুলি সাবিত্রী মারাঠিতে লেখেন। পরে সেগুলি ইংরেজিতে অনূদিত হয়। চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় সাবিত্রীবাঈ ও জ্যোতিরাও-এর চিন্তাভাবনার অপূর্ব মেলবন্ধন। এর মধ্যে দ্বিতীয় চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিটিতে সাবিত্রীবাঈ শিক্ষা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনার কথা বলেন। কীভাবে ব্রাহ্মণরা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তাও তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন অস্পৃশ্য মাহার এবং মাং-দের জন্য জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাঈ যে শিক্ষামূলক উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা কীভাবে সাবিত্রীর ভাইয়ের সমালোচনার মুখে পড়ে। সাবিত্রী ঠাণ্ডা মাথায়, যুক্তি সহকারে তাঁর ভাইকে তাঁদের কাজের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেন। সফলও হন। শুধু ভাই নয়, সাবিত্রীর মা-ও তাঁর কথায় অভিভূত হন। সাবিত্রী চিঠিতে এই কথোপকথনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন জ্যোতিরাওকে। সাবিত্রীর অপর একটি চিঠিতে পাই তাঁদের গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ছেলে ও

অস্পৃশ্য মেয়ের প্রেমকে কেন্দ্র করে নৃশংস সামাজিক অত্যাচারের যে পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল তার বিবরণ। সাবিত্রী জানান মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে গ্রামবাসী ছেলে ও মেয়েটিকে মারতে উদ্যত হয়। খবর পেয়ে সাবিত্রী ছুটে গিয়ে গ্রামবাসী ও ছেলে-মেয়ে দুটির মাঝে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ আইনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ছেলে-মেয়েদুটি কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে। ওদের হত্যা করলে যে হত্যাকারীদের শাস্তি পেতে হবে গ্রামবাসীদের মনে সেই ভয়ের সঞ্চার করতে সাবিত্রীবাঈ সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তাদেরকে জ্যোতিরাও ফুলের কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি।

সাবিত্রীবাঈ-এর চিঠিগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার সম্বন্ধটা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। সেই জন্যই নারী ও শূদ্রদের জ্ঞান আহরণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি ছিল তাঁর লড়াইয়ের প্রথম ও অন্যতম হাতিয়ার। সাবিত্রীর জীবন ও লড়াই মহারাষ্ট্রে অনেক সমাজ সংস্কারককে অনুপ্রাণিত করে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দীবাঈ, পণ্ডিত রমাবাঈ, তারাবাঈ শিণ্ডে, রমাবাঈ রানাদে প্রমুখ আরো অনেকে। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে নারীবাদের যে চর্চা হয় তা সাবিত্রীবাঈ-এর অবদানকে স্বীকার করে এগোয়। তাঁর সামাজিক অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁর নামে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সাবিত্রীবাঈ ফুলে পুণে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়। পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এই প্রচেষ্টার ফলে দেখা যায় তাঁদের স্কুলের তেরো বছর বয়সী একটি মাং জাতির মেয়ে মুক্তাবাঈ অতি স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় জাতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সমালোচনা করে একটি

নিবন্ধ রচনা করতে সক্ষম হয়। মুক্তাবাঈ ফুলেদের স্কুলে প্রায় তিন বছর পড়ার পর এই নিবন্ধটি সে লেখে। সংক্ষিপ্ত রচনাটির শিরোনাম ছিল *মাং মাহারাচ্য দুঃখ ভিষিয়ে*। মুক্তাবাঈ তার নিবন্ধে তুলে ধরে কী ধরনের অন্যায় অত্যাচারের মুখে পড়তে হয় তাদের জাতির মানুষদের। মুক্তাবাঈ বিশেষত তাদের সমাজের মেয়েদের কথা, শিশুদের কথা বলে। ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে বলে, "তোমাদের ফাঁপা বকবকানি থামিয়ে আমার কথা শোন।" যখন আমাদের ঘরের মেয়েরা সন্তান প্রসব করে তাদের মাথার উপরে ছাদ থাকে না। কী ভাবে তারা শীতে বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। তোমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাবার চেষ্টা করো। মেয়েরা যদি কোন স্ত্রীরোগে ভোগে, ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কেনার টাকা কোথায় পাবে? তোমাদের মধ্যে কী কোনদিন কোন এমন মানবিক ডাক্তার ছিল যে বিনা পয়সায় এদের চিকিৎসা করেছে?" মুক্তাবাঈ আরও লেখে, মাং মাহার শিশুদের দিকে ব্রাহ্মণ ছেলে-মেয়েরা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লেও, এমন কি তাতে জখম করে দিলেও, তারা কিছু বলবে না। সে তীক্ষ্ণ ভাষায় বলে, 'যে ধর্ম শুধু একজনকে সুযোগ দেয় আর অন্য সবাইকে বঞ্চিত করে সে ধর্ম পৃথিবী থেকে মুছে যাক। আমাদের মনে যেন সে ধর্মের জন্য কোনদিন গর্ব না হয়।'

মাত্র তেরো বছর বয়সের একটি অস্পৃশ্য মাং মেয়ে শিক্ষার জোরে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী ক্ষমতার এই তীব্র সমালোচনা করতে সক্ষম হয়। যে সমালোচনা সমাজের

অন্যরা করতে পারেনি, তা মুক্তাবাঈ করে। জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে মুক্তাবাঈ একইসঙ্গে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির জ্ঞান ও আধিপত্যের অধিকারকে।

মুক্তাবাঈ ১৮৫৫-য় রচিত তার আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে লেখে, এই লাড্ডুখোর ব্রাহ্মণরা বলে যে বেদ একমাত্র তাদের। অব্রাহ্মণদের তা পড়ার অধিকার নেই। এর মানে কি এই দাঁড়ায় না যে আমাদের কোন ধর্ম নেই কারণ আমরা ধর্মগ্রন্থগুলি দেখতেও পাই না। হে ভগবান, আমাএর বলবে আমরা তোমার কাছ থেকে আসা কোন ধর্মকে অবলম্বন করব যাতে আমরা সেই মতো ব্যবস্থা নিতে পারি?

এই নিবন্ধের কথা শুনে *ধ্যানোদয়* পত্রিকার সম্পাদক বিশেষভাবে অবিভূত হন। তিনি আহমদনগর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার দুটি সংখ্যায় এই লেখাটি দু'ভাগে প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় ভাগ ১ মার্চ ১৮৫৫-তে। লেখাটি ঐ বছরের বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সরকারের শিক্ষা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষার প্রসারের জন্য ফুলেদের এই প্রচেষ্টা খুবই কঠিন ছিল। স্কুলগুলো ঠিক মতো চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অভাব ছিল, আর তার সঙ্গে অভাব ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুযোগ্য শিক্ষিকার। ব্রাহ্মণদের তীব্র বিরোধিতা তো ছিলই। সব থেকে আশ্চর্যের আর দুঃখের বিষয় ছিল অনেক নীচু জাতির মানুষের বিরোধিতা। তারা উঁচু জাতির প্ররোচনায় জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীর মেয়েদের আর নীচু জাতিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকে অশুভ মনে করত। এতদ্‌সত্ত্বেও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যে অগ্রগতির পরিচয় দেয় তা উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতিরাও আর সাবিত্রীর প্রচেষ্টায় সাফল্যের কথা উঠে আসে ১৯৫২-র, ২৯ মে *পুণা অবজারভার* পত্রিকার প্রতিবেদনে। তাতে লেখা হয়, সরকারি স্কুলের ছাত্র সংখ্যার তুলনায় এদের স্কুলগুলোয় ছাত্রীসংখ্যা দশগুণ বেশি। কারণ হিসেবে বলা হয়, এই স্কুলগুলিতে মেয়েদের পড়ানোর পদ্ধতি সরকারি স্কুলে পড়ানোর পদ্ধতির চেয়ে বহুগুণ ভালো। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্কুলছুট না হয় তার জন্য সাবিত্রীবাঈয়ের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য আর্থিক অনুদান থেকে শুরু করে, ছেলেমেয়েদের আগ্রহ সৃষ্টি করার মতো করে সিলেবাস তৈরি করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

ফুলে দম্পতির এই সাহসিকতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৮২ সালে তারাবাঈ সিন্ধে লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *স্ত্রী-পুরুষ তুলনা* পুস্তিকা।

১৯২৮ সালে আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে নারী আন্দোলনের সূচনা হয়, সেই আন্দোলনে শুধু মহিলারাই যোগদান করেন। ফলস্বরূপ উঠে আসেন শান্তাবাঈ, রাধাবাঈ কাম্বলে, এম. শিবরাজ ও সুলোচন ডাংরের মতো মহিলা নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলন থেকে দাবী উঠেছিল, নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, বিধানসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব, আত্মরক্ষার কলাকৌশল শিক্ষা, তৎকালীন চলিত বিবাহ প্রথার সংস্কার ও নাবালিকা বিবাহ প্রথা রদ প্রভৃতি। লক্ষণীয়, এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে বিশেষ রূপে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা পরবর্তীকালে দলিত মানুষদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[৩০]

ধর্ম, বর্ণ ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য যে 'কালচারাল হেজিমনি' যুগপৎ শসাকশ্রেনি ও ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্গের মানুষদের চেতনায়- চিন্তাধারায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন সুকৌশলে, তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সংগ্রামই যথেষ্ট ছিল না।দরকার ছিল জোরালো প্রতি আখ্যানের। দত্তডাঙার স্বজাতি সম্মেলনে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'শিক্ষা' বিষয়ক বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।ফলস্বরূপ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পল্লিতে -পল্লিতে নিজেদের প্রচেষ্টায় পাঠশালা গড়ে ওঠে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন-

নমঃশূদ্র জাতি যদি বাঁচিবারে চাও
যাক প্রাণ সেও ভালো বিদ্যা শিখে লও
বিদ্যা ছাড়া কথা নেই বিদ্যা কর সার
বিদ্যা ধর্ম্ম, বিদ্যা কর্ম্ম,অন্য সব ছার।[৩১]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাড়ি সংলগ্ন ভিটায় ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে নারীশিক্ষার জন্য শান্তি সত্যভামা বালিকা বিদ্যালয় এবং ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়িতে নারী ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে কৃষক ও বর্গাচাষীদের স্বার্থে যে তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এই সমস্ত এলাকায়, অধিকার আদায়ের দাবীতে, প্রতিরোধের সেই স্ফুলিঙ্গে মেয়েদের অংশগ্রহন ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় নিম্নবর্ণের মানুষদের মুখপত্র হিসেবে প্রথম পত্রিকা ছিল *নমঃশূদ্র সুহৃদ*(১৯০৭)। এটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি থেকে

প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে দেখা যাবে ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০) পুনের ভিজ্জীর বাড়িতে প্রথম বালিকা স্থাপন করেন।জ্যোতিরাও ফুলে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিম্নবর্নের নারীর সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছেন। তাঁর শেষ সংগ্রাম ছিল বিধবাদের মস্তক মুন্ডনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ।বাবাসাহেব আম্বেদকর নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি, সমমজুরি, হিন্দু কোড বিলের মধ্য দিয়ে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারের দাবী তোলেন। দলিত নারীকে তার প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য তিন হাজার অস্পৃশ্য নারীদের সমাবেশে নারীর প্রকৃত অধিকার নিয়ে দেওয়া আম্বেদকরের বক্তৃতা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

দলিতদের শিক্ষাগত বঞ্চনার দিকটা লোকগণনার তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে। ২০১১ লোকগণনার তথ্য অনুসারে ভারতে দলিতদের সাক্ষরতার হার ৬৬ শতাংশ যা দেশের গড় হার ৭৪ শতাংশর থেকে ৮ শতাংশ কম কিন্তু এর মধ্যেও আবার রাজ্যের বিপুল তারতম্য। বিহার, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশে দলিত সাক্ষরতার হার সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির গড় সাক্ষরতার হার থেকে যথাক্রমে ১৫, ১২, ১২, ১০ ও ৯ শতাংশ পিছিয়ে। অন্যদিকে অসম, ত্রিপুরা, ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে দলিত সাক্ষরতার হার জাতীয় গড় অপেক্ষা যথাক্রমে ৪, ২ ও ১ শতাংশ এগিয়ে। সাক্ষরতার হারে এই সাধারণ পার্থক্য দলিত নারীদের সাক্ষরতার উপরেও প্রভাব ফেলে।যেমন,দেশে দলিত নারীরা সাক্ষরতার

হারে দলিত পুরুষদের থেকে ১৯ শতাংশ পিছিয়ে কিন্তু রাজস্থানে এই পার্থক্য ২৯ শতাংশ। ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, বিহার ও উত্তরাখণ্ডে এই পার্থক্য যথাক্রমে ২৩, ২৩, ২২, ২০ ও ২০ শতাংশ।[৩২]

১৯৯২ সালে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোধা জনজাতির ছাত্রী চুনি কোটাল উচ্চবর্ণের সহপাঠীদের অত্যাচারে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিছু সংগঠন, সংবাদপত্র এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে, জন্ম হয় বাঙালি দলিতদের কণ্ঠস্বর 'চতুর্থ দুনিয়া' (১৯৯৪) নামের পত্রিকা। পরবর্তীকালে কল্যানী ঠাকুর চাঁড়ালের হাত ধরে এই *চতুর্থ দুনিয়া* পত্রিকাটি দলিত নারীদেরও কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। স্বস্তি আচার্যের সঙ্গে মিলে কল্যানী ঠাকুর শুরু করেন *নীড়* নামের দলিত নারীকেন্দ্রিক পত্রিকা। যা অবিরামভাবে দলিত নারীর কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছে বিগত সাত-আট বছর ধরে। বিখ্যাত দলিত তাত্ত্বিক গোপাল গুরু তাঁর ১৯৯৫ সালে রচিত Women Talk Differently প্রবন্ধে দলিত 'না'র এই পৃথক বা স্বতন্ত্র ভাবে কথা বলার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশকে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই আত্মকথন নামক সংরূপটির মধ্যে দিয়ে দলিত নারীর স্বতন্ত্র প্রতিরোধের খুঁটিনাটি বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষ্য।

তথ্যসূত্র:

---

১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ', *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৮৬

২. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘নারীর স্থান রামায়নে ও মহাভারতে’, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৩২০

৩. ঘোষ, স্বাতী, *প্রথম মানবীর স্বর: থেরীগাথা,* সিগনেট প্রেস, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৪, পৃ. ১২

৪. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, ‘সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চিত্রঃ পঞ্চম থেকে একাদশ শতক’, *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪, পৃ. ৪৪২

৫. সুর, নিখিল, *বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৪, পৃ. ৪০

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৭. দাশ, নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১০৫

৮. রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত), *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭

৯. সেন, দিনেশচন্দ্র, *মৈমনসিংহ গীতিকা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ২৩০

১০. সুর, নিখিল, *বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৪, পৃ. ১৩৫

১১. চন্দ, পুলক (সম্পাদিত), *নারীবিশ্ব,* গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৯৩

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪০

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১

২৬. চৌধুরী, ঋতু সেন (সম্পাদিত), *নারীবাদের নানা পাঠ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৩৬২

২৭. Sabharwal, Nidhi Sadana and Sonalkar, Wandana. ‘Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Caste and Class’, *Researchgate*. 2015

২৮. Rai, Bina. ‘Dalit Women in India: An Overview of their Status’, *International Journal of Economic and Business Review*. Vol. 4, Issue. 1, 2016

২৯. চৌধুরী, শুচিস্মিতা সেন, ‘দলিত নারীর দলিত আকাশ’, *পত্রিকা*, দলিত সংখ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ১৮০-৮২

৩০. চ্যাটার্জি, দেবী, *সমাজ রাষ্ট্র ও প্রান্তিকতা*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫, পৃ. ৯০

৩১. প্রামানিক, মৃন্ময়, *দলিত সাহিত্য চর্চা*, গাঙচিল, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৭৮

৩২. রাণা, সন্তোষ ও রাণা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী*, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

দলিত নারীর আত্মজীবনী: অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

ষষ্ঠ অধ্যায়

দলিত নারীর আত্মজীবনী: অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মতো। দুনিয়া জুড়ে এই ফারাক সর্বত্র, এমনকি তথাকথিত আধুনিক সমাজেও দেখা যায়। আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা সমাজে সেই নারী যদি দলিত হয়, তবে তার আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার প্রায় কিছুই থাকে না। স্বাধীনতা অনেক দূরের বিষয়। আমাদের সমাজে এমনিতেই জাতপাতের বিভাজনে নিপীড়িত এবং অবমানিত দলিত সমাজ কখনও খিস্ট্র বা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখিয়েছে, কখনও আবার মনু নির্দেশিত পথকে অগ্রাহ্য করে যাবতীয় ধর্ম অনুশীলন ত্যাগ করে আউল-বাউল-ফকির-দরবেশ ইত্যাদি সহজিয়া পথে মুক্তি খুঁজেছে। কিন্তু দলিত নারীরা জাত, শ্রেণি,ক্ষমতার ত্রিস্তরীয় শোষণের পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য জনিত শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে কি? এর উত্তরে অন্তহীন নীরবতা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশিত নয়। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে কয়েকজন দলিত নারীর আত্মকথন, যেখান থেকে দলিত নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানটি খানিক বুঝে নেওয়া যাবে।

আদিম মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় মায়ের পরিচয়েই সন্তান পরিচিত হত। নারী-পুরুষ একত্রে শিকারে যেত। খাদ্যে ছিল সবার সমান অধিকার। নারী ছিল না কারোর নিজস্ব সম্পত্তি। প্রস্তর যুগের অবসান ঘটিয়ে লৌহ যুগের সূচনা, কৃষিক্ষেত্রে লোহার যন্ত্রপাতি

ও পশুশক্তির যৌথ ব্যবহার উৎপাদন ব্যবস্থায় অগ্রগতির সূচনা করে। ফসলের বর্ধিত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত ও মালিকানার প্রশ্ন উঠে আসে। জমি ও বাড়তি ফসলের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে চালু হয় এক বিবাহ প্রথা। সন্তানের পরিচয় হিসাবে পিতৃপরিচয়ের একাধিপত্য, মাতৃত্ব ধারণ ও দৈহিক ক্ষমতার তুল্যমূল্য বিচারে নারীরা ক্রমে কোণঠাসা হতে থাকে। ক্রমে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা, ভোগী পুরোহিততন্ত্র ও রাজশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নারীদের ঠেলে দেয় পর্দানসীন অন্ধকার অন্দরমহলে। তার জীবনের সার্থকতা রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর, কখনও সেবাদাসীর, দেবদাসীর ভূমিকার ভিতর দিয়ে নির্ণীত হতে থাকে। মধ্যযুগে বর্ণহিন্দু নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষের ভোগ জারি রাখতেই চালু হয়েছিল মর্মান্তিক সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহের মতো নিয়মকানুন। নারীকে অজ্ঞান ও নিরক্ষর করে রাখা শাস্ত্রসম্মত ভাবে বিধিবদ্ধ হয় শোষণ জারি রাখার স্বার্থে। ব্যতিক্রমী বিদূষী নারীদের উপর যেরতেন প্রকারে শুরু হয় দমন-পীড়নের অন্তহীন প্রকল্প।

বৈদিক সভ্যতার শুরুর অংশটা বোধহয় এমনটা ছিল না। অবরোধের কথা বেদে পাওয়া যায় না। সমাজে নারীরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন এবং যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতেন। বেশ কয়েকজন নারী যেমন ঘোষা, অপালা, অদিতি, লোপামুদ্রা বেদমন্ত্র রচনা করেছেন — এঁদের বলা হত 'ব্রহ্মবাদিনী'। বিনা দ্বিধায় নারী-পুরুষ একত্রে গুরুগৃহে পাঠ নিতেন। অনেক মেয়ে শিক্ষিকা বা আচার্যা, উপাধ্যায় ও উপাধ্যায়ী ছিলেন।

যজুর্বেদ-এ থেকেই শুরু হয়েছিল অসাম্যের সূচনা। পরবর্তীকালে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে শিক্ষা, বেদ অধ্যয়ন এবং উপনয়ন সবক্ষেত্রেই নারীর অধিকার ক্রমে ক্রমে বিলীন

হতে থাকে। এর কারণ হিসাবে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর *প্রাচীন ভারতে নারী* গ্রন্থে জাতিভেদ প্রথাকে দায়ী করেছেন। ক্ষমতার নিয়মই এই যে, ক্ষমতা সব সময় অপরকে বঞ্চিত করে আত্মপ্রসাদের খোঁজ করে। নৈয়ায়িকরা যখন নারীর ওপর বিবিধ নিয়মের বিধান দিতেন, তখন তাঁরা মনে করতেন না তাঁরা কোনো নারীর পুত্র, কোনো স্ত্রীর স্বামী বা কোনো বোনের সহোদর। তাঁরা তখন ক্ষমতালিপ্সু এক গোষ্ঠী।

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন এদেশে প্রবেশকারী আর্যদের সঙ্গে ভারতের মূলনিবাসী প্রাগার্য গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই বর্ণাশ্রম প্রথার জন্ম হয়েছিল। বিগত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে এই বর্ণাশ্রম প্রথাই হয়ে ওঠে শূদ্র ও দলিত শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। সমগ্র *মনুসংহিতা* [রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের শাসনকালে রচিত (১৭০ খ্রি.পূর্বাব্দ—১৫০ খ্রি.পূ.)] জুড়ে শূদ্র দলনের নানান অমানবিক প্রক্রিয়ার পাশে স্থান পেয়েছে দলিতদের মধ্যেও দলিততম নারীদের নিপীড়নের নানান প্রক্রিয়া। *মনুস্মৃতি* অনুযায়ী নারীর নিয়তিই হল দাসত্ব আর পরাধীনতার ঘৃণিত জীবন। তারা শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্র সন্তানের মুখাপেক্ষী জীবনেরই অধিকারী। পুরুষ কর্তৃক শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, বলপূর্বক অধিগ্রহণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, গার্হস্থ্য হিংসা সহ্য করাই তাদের নারীত্বের একমাত্র পরিচয়।

এই সময়ে বহির্বিশ্বে পুঁজিবাদের উত্থান শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে যে আন্দোলনের বীজ বপন করেছিল, সেই ভাবনাই জন্ম দিয়েছিল নারীদের স্বাধিকারের প্রশ্নকে। এই চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্লারা জেটকিন (১৮৫৭-১৯৩৩), নাজ়েদহা ক্রুপস্কায়া (১৮৬৯-

১৯৩৯), রোজা লুক্সেমবার্গ (১৮৭১-১৯১৯), আলেকজান্ডার কলোনতাই (১৮৭২-১৯৫২), ও অন্যান্যরা। নারীর প্রতি বৈষম্য থেকে গড়ে ওঠা নারীমুক্তি আন্দোলনের এই ধারাটির মূলে ছিল কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের বিখ্যাত *The Communist Manifesto* (১৮৪৮), যে ইস্তাহারে তাঁরা বলেন নতুন দুনিয়া গড়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণিকেই দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ শৃঙ্খল ছাড়া তাদের হারাবার কিছুই নেই। অথচ, জয় করার জন্য আছে সারা দুনিয়া। যদিও শ্রেণির ধারণা ইউরোপের ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করলেও ভারতীয় সমাজে বর্ণব্যবস্থা কোথাও কোথাও শ্রেণির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, পরবর্তী কালে নারীবাদের বৈশ্বিক ইতিহাসের নানা পটপরিবর্তন হয়েছে। যার সঙ্গে যোগ হয়ে চলছে ভিন্ন চিন্তার বহুস্বর।[১]

ভারতীয় সাহিত্যে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতায় লেখালেখির ইতিহাস দীর্ঘদিনের। উদাহরণস্বরূপ, রাসসুন্দরী দাসীর লেখা তাঁর আত্মকথা *আমার জীবন* (১৮৭৬)। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক এক পরিবেশ, যেখানে তাঁর গতিবিধি কেবল রান্নাঘর ও ঠাকুরঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে কীভাবে পড়া ও লেখার মাধ্যমে রাসসুন্দরী একটা নিজস্ব পরিসর খুঁজে পেলেন, তার আখ্যান এই বই। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ করার যে, আলোচ্য আত্মজীবনীটিতে রাসসুন্দরী দাসী তাঁর বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা, শ্বশুরবাড়ির অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আবেগের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বর প্রসঙ্গ। পুরো আত্মজীবনীটি জুড়ে বার বার ঘুরেফিরে আসে হিন্দুধর্ম ও আচার-বিচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা তাঁর নারীজীবন। এমনকি পড়া-লেখার যে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, তার পিছনেও ছিল তাঁর অবিচল ভক্তিধর্ম।

এভাবেই উচ্চবর্ণের মহিলাদের রক্তমাংসের শরীর সমেত দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল পিতৃতান্ত্রিক অন্দরমহলেরর কড়া চোখরাঙানি।

এরই অপর পিঠে নিজেদের কথা বলতে গিয়ে দলিত মহিলারা অন্দর থেকে খোলাখুলি বাইরে আসেন। কারণ দলিত নারীর কোনো অন্দরমহল নেই। নিজেদের দুনিয়াটা যে রকম, তারা ঠিক সে রকমই বর্ণনা দেন। কোনভাবেই শোধন করেন না। কটু বাক্য, হিংসার স্মৃতি, যৌন ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা, যৌন লাঞ্ছনা, গার্হস্থ্য হিংসা, পারিপার্শ্বিকেরর অবদমন লাগামহীন বয়ানে বার বার উঠে আসে তাঁদের লেখায়। এর পাশাপাশি চলতে থাকে সেই নির্ধারিত ভাষার কাঠামোর সঙ্গে ক্রমাগত মোকাবিলা, যে ভাষার সমস্ত উপাদান নারীকে পুরুষের 'অপর' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। বলা বাহুল্য, পিতৃতন্ত্র/পুংবাদ/নারীবিদ্বেষ সমাজের সব কয়টি স্তরে (চিহ্ন-সংস্কৃতি, ক্ষমতা-রাজনীতি, আকাঙক্ষা-মনন, মালিকানা-অর্থনীতি, প্রতিনিধিত্ব-প্রতিষ্ঠান) নানা অছিলায় অনন্তকাল পরাধীন করে রাখতে চেয়েছে নারীকে। আবার নারীও যে এক নয়। শুধুমাত্র নারী হওয়ার জন্য নানা শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, জাত নির্বিশেষে মেয়েদের কিছু অভিজ্ঞতার মিল যেমন আছে তেমনই তার মধ্যেও আছে বৈষম্য আর ক্ষমতার লড়াই। গরীব নারী, দলিত নারী, অশিক্ষিত নারী, কুইয়ার নারী, তৃতীয় বিশ্বের নারী, অ-শ্বেতাঙ্গ নারী বা মুসলমান নারী এদের প্রত্যেকের অবস্থান এবং স্বার্থ একেক রকম। তার সঙ্গে মিশেছে উচ্চবর্গীয় নারীদের বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর। যা অনেক ক্ষেত্রেই অবরুদ্ধ করেছে পিছিয়ে-পড়া মেয়েদের নিজেদের কথা বলতে চাওয়ার প্রচেষ্টাকে। কারণ সবার কথা বলতে চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছে উচ্চশ্রেণির বয়ান। এই প্রেক্ষাপটেই নয়ের দশক জুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকল দলিত, মুসলমান, জনজাতি, সমকামী বা ভিন্ন যৌন অভিমুখী নারীবাদের বহু স্বর।

ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের নিপীড়ক পরিকাঠামোয় শ্রেণি, জাতপাত ও লিঙ্গ পরিস্থিতির কারণে দলিত মহিলারা মূলত ত্রিস্তরীয় হিংসার শিকার। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য, শোষণ আর হিংস্রতার নির্দিষ্ট ধরনগুলি কীভাবে তাদের অন্য সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত, কিংবা নারী-পুরুষ ক্ষমতার ধরনগুলি কীভাবে অন্য সম্পর্কগুলিকে তৈরী করতে থাকে, এবং নিজেরাও তৈরী হয়; সেই টানাপোড়েন আলোচ্য আত্মকথনগুলিতে উঠে এসেছে। দলিত আন্দোলনের পরিসরে নিজেদের কথা বলার জন্য আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকেই যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে চলেছেন দলিত মেয়েরা। কখনও উচ্চবর্ণের পুরুষের হাতে নির্যাতন, যৌন হিংসার শিকার, কখনও নিজেদের গোষ্ঠীর ভেতরেও দলিত মহিলাদের মনুষ্যেতর হিসাবে রেখে দেওয়া, গৃহহিংসা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নিরক্ষরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকা লড়াকু এই মেয়েররা গড়ে তোলেন বিকল্প ইতিহাস। শর্মিলা রেগে মহারাষ্ট্রের দলিত মহিলাদের লেখা 'আত্মজীবনী'র বিকল্প হিসাবে 'বয়ান' (Testimonies) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্র এবং দলিত পিতৃতন্ত্র উভয়েরই বিরুদ্ধে দৃঢ় হাতে কলম তুলে নিয়েছেন দলিত নারীরা। হিংসার সঙ্গে বিস্মৃতির গভীর সম্পর্ক আছে। মিলান কুন্দেরা তাঁর *The Book of Laughter and Forgetting* (১৯৯২) বইতে এই 'বিস্মৃতির রাজনীতি' নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে এমন এক টোটালিটারিয়ান শাসনের কথা বলেন, যা গণ-বিস্মৃতি তৈরি করার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিকৃত করতে

চায়। এই পরিস্থিতিতে খোদ স্মৃতিই হয়ে ওঠে প্রতিরোধের একটি উপায়। হিংসার স্মৃতির ধরনটাই এরকম যে অনেক সময়ই যিনি যন্ত্রণা পেয়েছেন স্বেচ্ছায় তিনি তা বিস্মৃত হয়ে একধরনের উপশম পেয়ে থাকেন। বিস্মৃতি নিজেই এই ক্ষেত্রে একধরনের হিংসা, যার সঙ্গে লড়াই চলে স্মৃতির। এখান থেকেই আসে দলিত মহিলাদের নিজস্ব স্মৃতি লিপিবদ্ধ করার তাগিদ।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত নারীর আত্মজীবনী :

পেশোয়াদের শাসন চলে গেল
ইংরাজি মাতা এসেছে
আমাদের এই করুণ সময়ে
এসো ইংরাজি মাতা, এটাই তোমার সময়
তুমিই গরিবের ত্রাতা।
মনুবাদের মৃত্যু হয়েছে। ইংরাজি মাতার দরজায়
গরিবের আশ্রয় একমাত্র জ্ঞানই
এ যেন মায়ের স্নেহচ্ছায়া।

১৮৫৪ সালে এই গীতিকবিতা লিখেছেন সাবিত্রী বাঈ ফুলে। তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? তিনি স্পষ্ট করতে চাইলেন ইতিহাসের সেসব অধ্যায়গুলিকে, যেখানে যুগ যুগ ধরে গরিব দলিতদের শোষণ আর অত্যাচার করে দমিয়ে রাখা হয়েছে। সেই দমন পীড়নের কারণ শিক্ষার অভাব। এখন এসেছে ইংরেজ জাতি। তারা যে ভাষা নিয়ে এসেছ্ সেই ভাষা দুনিয়ার জ্ঞানের আলো আমাদের সামনে খুলে দিক। আমাদের তো মনুবাদী শিক্ষা আর সংস্কৃতি সবরকমের জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অতএব

এখন একমাত্র ভরসা এই ইংরেজি ভাষা। এসো হে ইংরেজি মাতা। আমাদেরর শিক্ষিত করো। আমাদের রক্ষা করো। আমাদের উত্তীর্ণ করো অন্য জীবনে।

১৮৫৪ সালের এই আর্তির পর পেরিয়ে গেছে অনেকগুলি বছর। ১৯৯২ সালে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লোধা জনজাতির ছাত্রী চুনী কোটাল উচ্চবর্ণের সহপাঠীদের অত্যাচারে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিছু সংগঠন, সংবাদপত্র এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে, জন্ম হয় বাঙালি দলিতদের কণ্ঠস্বর *চতুর্থ দুনিয়া* (১৯৯৪) নামের পত্রিকা। পরবর্তীকালে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের হাত ধরে *চতুর্থ দুনিয়া* এই দলিত নারীদেরও কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। তাঁর শুরু করা *নীড়* পত্রিকা। গত সাত-আট বছর ধরে *নীড়* একমাত্র নারীকেন্দ্রিক পত্রিকা, যা দলিত নারীর কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরে চলছে। গোপাল গুরু তাঁর ১৯৯৫ সালে রচিত 'দলিত উইমেন টক ডিফারেন্টলি' প্রবন্ধে দলিত নারীর এই পৃথক বা স্বতন্ত্রভাবে কথা বা আত্মপ্রকাশকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন।

দলিত মেয়েদের আত্মজীবনী কি দলিত পুরুষদের আত্মকাহিনির মতনই নাকি অন্য রকম, ইংরেজি ভাষায় মেয়ে ও পুরুষের আত্মকথনের পার্থক্যগুলি একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরে দেখার চেষ্টা শুরু হয় এস্টেল সি জেলিনেক (সম্পা.) *উইমেন্স অটোবায়োগ্রাফি : এসেজ ইন ক্রিটিসিজম্* নামক গ্রন্থটি থেকে। ঐতিহাসিক ঘটনার তুলনায় ব্যক্তিগত বিবরণের উপর ঝোঁক, বহির্জগতের তুলনায় পারিবারিক বর্ণনা, কালানুক্রম বহির্ভূত এলোমেলো গদ্য। পার্থক্যের বিষয়টিতে বেশি জোর দিতে মেয়েদের আত্মকথার জন্য ডমনা সি স্ট্যানটন তাঁর *দ্য ফিমেল অটোগ্রাফ : থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব অটোবায়োগ্রাফি ফ্রম দ্য টেনথ তু দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি* বইতে তৈরি করেছেন

নতুন একটি শব্দ অটোবায়োগ্রাফির বদলে ‘অটো গাইনোগ্রাফি’ (১৯৮৭)। লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে যাঁরা সাহিত্য সমালোচনার নতুন মাত্রা এনেছেন তাঁদের মধ্যে সিডনি স্মিথ তাঁর *এ পোয়েটিক্স অব উইমেন্স অটোবায়োগ্রাফি : মার্জিনালিটি অ্যান্ড দ্য ফিকশন্স অব সেল্ফ রিপ্রেজেন্টেশন* নামক বইতে বলেছেন আত্মজীবনী নামে সাহিত্যিক ধারাটি বিশেষ ভাবে পুরুষালি। তাঁর মতে, ‘আমি’ শব্দটি মেয়েদের মুখে অপ্রত্যাশিত কারণ লিঙ্গ মতাদর্শে মেয়েদের জীবনকাহিনি মূল্যহীন, পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তা একটি ছেদ বা শূন্যস্থান। আদর্শ নারী নিজেকে মেলে না ধরে নিজেকে মুছে ফেলতে সচেষ্ট হবে।[২]

আমাদের মনে পড়ে মহারাস্ট্রের নারী দলিত লেখিকা বেবি কাম্বলের আত্মজীবনী *The Prisons We Broke* এর কথা :

> I hid everything I wrote in the most ignored and dusty corners. My son had started going to school when I started to write. So for me he was a knowledgeable, learned man. I used to be scared both my son and my husband, scared of their reaction.[৩]

লিঙ্গ রাজনীতির শিকার হিসাবে দেখিয়ে মেয়েদের আত্মকাহিনিকে এহেন একমাত্রিক ছকে বেঁধে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে ডরিস সামনার তার *নট জাস্ট আ পার্সোনাল স্টোরি : উইমেন্স টেস্টিমনিজ অ্যান্ড দ্য পপুলার সেল্ফ* গ্রন্থের ‘লাইফ/ লাইনস : থিওরাইজিং উইমেন্স অটোবায়োগ্রাফি’ (১৯৮৮) প্রবন্ধে লাতিন আমেরিকার মেয়েদের নিজ জীবনের সাক্ষ্য আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন, মেয়েলি আত্মকথার কোনো একমাত্রিক সংজ্ঞা হয় না। সামনায় আলোচিত মেয়েরা তাদের অতি ব্যক্তিগত

যন্ত্রণার, রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিবরণ দিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। তাদের বচনে 'আমি' শব্দটি এসেছে 'আমরা' বোঝাতে। আত্মকথনে ব্যক্তি-মেয়ে সব সময়েই মনে রেখেছে সে এক গোষ্ঠীর সদস্য।

ডরিস সামনার-এর ভাবনা বিশ্ব থেকে বেশ অনেকটা দূরে মহারাষ্ট্রের এক দলিত নারী Baby Kamble যখন তাঁর আত্মজীবনী *Jina Amucha* (১৯৮৬)-মারাঠিতে, পরে ইংরেজিতে অনূদিত *The Prisons We Broke* (২০০৮)-এ বলেন—'And therefore Jina Amucha was the Autobiography was the autobiography of my entire community', তখন কোথাও গিয়ে একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হয়।

বেবি কাম্বলে মহারাষ্ট্রের সাঁতরা জেলার ফালতান গ্রামের অস্পৃশ্য মাহার শ্রেণির একজন নারী, তাঁর আত্মজীবনী *Jina Amucha* মারাঠী মহিলা পত্রিকা 'Stree'-তে ধারাবাহিকভাবে (১৯৮২-৮৪) প্রকাশিত হয়। তাঁর সমগ্র আত্মকথন জুড়ে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকামিতার বিরুদ্ধে তিনি বার বার চাবুক চালিয়েছেন নির্দ্বিধায়। একটি অংশে তিনি মুম্বাইয়ে কাজের খোঁজে বাসে করে যাওয়ার পথের একটি ঘটনার কথা বলেছেন। ঐ বাসেই কয়েকজন কলেজ ছাত্র তাদের নিজেদের মধ্যে কথকতার সূত্রে হাসাহাসি করছিল। বেবি কাম্বলে শাড়ি নিয়ে তাঁর মুখ ঢেকে বসেছিলেন। লোনাভালায় নেমে তাঁর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী তাঁকে বড়ো পাথর ছুড়ে মারেন, এই ঘটনার জন্য তাঁকে দায়ী করে। যন্ত্রণাদগ্ধ বেবি আর স্বামী যখন বেবির বোনের বাড়িতে যান, তখন ভগ্নীপতি তাদের থাকতে দিতে পারবে না জানিয়ে বেবির হাতে দশটাকা ধরিয়ে দেয়। বোনের

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর স্বামী আবার তাঁকে চটি খুলে মারতে শুরু করে। 'মারছ কেন' জানতে চাওয়ায় তাঁর স্বামী বলেন, 'তোমার জামাইবাবু তোমাকে দশ টাকা দিল কেন?'[৪] তাঁর এই আত্মকথনটি যতটা না তাঁর ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক, তার থেকে অনেক বেশি সমাজের নিম্নবর্গের নারীদের উপর পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার মর্মন্তুদ কাহিনি। সারা জীবন তিনি অকারণ গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন। একটি অংশে তিনি বলছেন-

> Look, husbands then did not have anything else to do. No education, no jobs, even food they had to beg for. Their male ego gave them some sense of identity, "I am a man, I am superior to women, I am somebody". If the whole village tortures us, we will torture our women. Fathers used to teach their sons to treat their wives as footwear.[8]

মারাঠি ভাষায় রচিত শান্তাবাঈ কাম্বলের *মাজ্যা জলমচি চিত্তারকথা*-র অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন নীতা সেন সমর্থ। দেবেশ রায় সম্পাদিত *দলিত* নামের গ্রন্থটিতে এই অংশটির নাম 'নজার স্কুলে পড়া আর না পড়ার কথা'। আত্মকথায় শান্তাবাঈ লিখেছেন তিনি যখন ক্লাস সিক্সে পড়েন তখন থেকেই তিনি জলপানি পেতে শুরু করেন। ক্লাসের একমাত্র বামুনের মেয়ে শুকুকে হেডমাস্টারের অনুরোধে ডাকতে গিয়ে দেখেন শুকুর বাড়ির বাইরে রঙ্গোলি দেওয়া হচ্ছে। তাকে দেখে শুকুর মা চেঁচিয়ে বলেন, 'এই মাহাড়দের মেয়েটা দাঁড়া ওখানে। রঙ্গোলি মাড়াবি না।' পর পর তিন মেয়ের জন্ম দিয়ে যখন শান্তাবাঈয়ের মা চতুর্থ কন্যা সন্তান হিসাবে শান্তাবাঈকে জন্ম দিয়েছিলেন, তখন নবজাতকের প্রথম কান্নার আওয়াজ শুনে তাঁর বাবা বলেছিলেন, 'শালা, আবার মেয়ে। দাও তো শাবল আর কোদালটা, মাটিতে পুঁতে দিয়ে আসি।'[৭]

আত্মজীবনীতে লেখিকা তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়ির নারকীয় অত্যাচারের নৃশংস কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর নিজের বিবাহিত জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন কেমন করে তাঁর স্বামী তাঁকে মারতেন, কীভাবে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে এসে বাড়িতে জোর করে থাকতে চেয়েছিলেন। শান্তাবাঈয়ের বাবা একসময় তাঁকে লক্ষ্মী বলতেন কারণ 'মা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ওর পরেই তো দুটো ছেলে এল।'[৮] আজন্ম এই অবহেলাই শান্তাবাঈকে কলম ধরতে বাধ্য করেছে। জন্ম দিয়েছে আত্মসচেতন এক স্বতন্ত্র জীবনচর্যার অধিকারিণীকে।[৫]

মারাঠি দলিত লেখিকা কুমুদ পাওড়ের 'অন্তঃস্ফোট'-এর অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছেন নীতা সেন সমর্থ আলোচ্য বইটতে। যার নাম 'আমার সংস্কৃত পড়ার গল্প', আদতে যা একটি বিপ্লবেরই ইশতেহার। তিনি লিখেছেন-

> আমার মতো নীচাতিনীচ জাতির স্ত্রীলোক সংস্কৃত যে কেবল শিখতেই পারে তাই নয়, শেখাতেও পারে, এযেন গতানুগতিক মানুষের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একটা ভয়ঙ্কর খাপছাড়া ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা দিল।[৬]

চাকরি জীবনে তাঁর সহকর্মীরা, কখনো কখনো স্বজাতির মানুষেরাও তাঁর উচ্চাশা, আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি নিয়ে অনেক সময়ই বিদ্রুপে মেতেছে। অধ্যাপনা জীবনের সম্মান পাওয়ার পরেও লেখিকাকে অহরহ পীড়া দেয় একটা কঠোর সত্য-

> এ চাকরি কুমুদ সোমকুয়ারের বরাতে জোটেনি - জুটেছে কুমুদ পাওড়ের ভাগ্যে। বিয়ের পর শুনেছি মেয়েদের পদবী ও জাত দুই-ই পাল্টায়। বিয়ের পর আমি কুমুদ পাওড়ে হয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা হলাম। কুমারী কুমুদসোম কুয়ার কিন্তু রয়ে গেল সেই নীচু জাতেরই বঞ্চিত অবহেলিত।[৭]

দলিত মহিলা লেখিকা বামা ফেস্টিনা সুসাইরাজ (১৯৫৮) ওরফে বামার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস *কারুক্কু* (১৯৯২) তামিল ভাষায় লেখা, যা oxford university press থেকে Lakhmi Holmstrom কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে *Karukku* নামে। তিনি হলেন একজন দলিত পারোয়া গোষ্ঠীর খ্রিস্টান নারী। এই আত্মকথনে তিনি দেখিয়েছেন ধর্মান্তরিত সন্ন্যাসীরাও এই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নন। কারুক্কু কথার অর্থ তালপাতার ডগার ধারালো অংশ। তিনি একসময় শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে একটি সমাজসেবামূলক সংগঠনের হয়ে অনুবাদমূলক কাজ করতে শুরু করেন। পাশে চলতে থাকে তাঁর নিজস্ব ধারালো লেখনী। এরই পরিণতি *কারুক্কু*। যখন বই আকারে প্রকাশিত হয়, তখন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া লেখিকাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে শুরু করে তাঁর নিজের দলিত সমাজ অবধি এই বইয়ের বিরোধিতা করে। আত্মকথনটিতে উঠে এসেছে পরোয়া গোষ্ঠীর মধ্যেকার অর্ন্তলীন এক পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ যেখানে নারীরা লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে অবদমিত। লেখিকার পিতামহের সময় থেকে তাঁদের পরিবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে শিক্ষিত হয়ে খ্রিস্টান আবাসিক স্কুলে ইংরেজিভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও সেবক (নান) হিসাবে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু সেখানে এসে দেখলেন উচ্চজাতির সঙ্গে নিম্নজাতির সেবকদের বিভাজন স্পষ্ট। চার্চে গিয়েও সেই অস্পৃশ্যতার স্বীকার শিকার হয়েছিলেন বামা। ফলে স্কুল ছাড়লেন। নিজে দলিতদের জন্য একটা স্কুল নির্মাণ করলেন। এভাবেই কথক তাঁর দলিত জীবনের যন্ত্রণাকে এই আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। যেমন করে তালপাতার দুই দিকেই থাকে শানিত ফলা

তেমনি এই আত্মজীবনতে বামা প্রতিবাদকে শান দিয়েছেন জাতিগত, শ্রেণিগত ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দলিত নারীর আখ্যান বয়ন করে।

প্রকাশের পর গ্রামে লেখিকার বাবা-মার উপর হামলা পর্যন্ত হয়েছিল। বামা প্রায় সাত আট মাস নিজের গ্রামের বাড়ি যেতে পারেননি। প্রাথমিক ভাবে দলিত সমাজের নিরক্ষর মানুষদের কাছে তাঁর লেখার ভুল ব্যাখ্যা করতে সমাজপতিদের খুব বেশি বেগ পেতে না হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয় একটা সময়, এই লেখা তাঁর সমাজের মানুষের কাছে গৃহীত ও আদৃত হয়। প্রথম দিকে লেখিকার বোনও এই লেখার বিরোধিতা করে বলেছিল, কে তোমাকে এইসব লিখতে বলেছে, কেন জগতের সকলের কাছে আমাদের সব খুলে বলেছে? *কারুক্কু*-র জন্মদাত্রী বামা এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

> অনেকেই আমার বোনের মতই ভাবত। কিন্তু এটা ছিল আমার কাছে উদারতার উৎসস্বরূপ। এটা ছিল আমার আত্মপরিচয় অর্জন। আমি এরকম সেই অনুভূতি।[৮]

প্রসঙ্গত, এই আত্মজীবনীতে ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা নেই। যখন যা মনে মনে হয়েছে, সেই কথাই বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে। উচ্চবর্গ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকরণের বিরুদ্ধেও এটি যেন একটি প্রতিবাদেরই নামান্তর।

কেরালার এক আরণ্যক আদিবাসী গোষ্ঠীর নেত্রী সি. কে. জানুর আত্মজীবনী *Mother Forest* (২০০৩)-এর অনুবাদ করেছেন জয়া মিত্র *বসত* নামে। আত্মজীবনীটি জুড়ে ভিড় করেছে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষেরা আর তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছেগুলি। যে ইচ্ছেশক্তিকে সম্বল করেই কঠিন পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা, সতের বছর বয়সে পড়তে শেখা জানু একদিন নিজেদের আদিয়ার

জনগোষ্ঠীর মানুষদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। আদিয়ার জনগোষ্ঠীর মানুষরা চিরকাল জঙ্গল থেকেই তাদের খাদ্য আর জ্বালানি সংগ্রহ করে জীবনযাপন করেছে। একটা সময় সরকার এই সমস্ত জমি জোর করে অধিগ্রহণ করতে শুরু করে উন্নয়নের নামে। জমিহীন এই অসহায় আদিবাসীরা বাইরে থেকে আসা অর্থবান লোকেদের দিনমজুরে পরিণত হতে থাকে। নতুন এই জমির মালিকেরা জমি থেকে খাবার নয়, লাভজনক চাষ (কফি বাগিচা বা হাইব্রিড ফল) অর্থাৎ কমার্শিয়াল ক্রপ উৎপাদন শুরু করে। নিরক্ষর, সাদাসিধে এই মানুষদের জীবনে হঠাৎই এসে পড়ল রেশন কার্ড, ভোটার নাম্বার, কুঁড়ে ঘরের নাম্বার ইত্যাদি ছদ্ম আধুনিকতা।

প্রথমত, দরিদ্র আদিবাসী এবং দ্বিতীয়ত, মেয়ে হিসাবে লড়াই জানুর আজন্ম সঙ্গী। জানুর বোনের জন্মের আগেই তাঁদের বাবা তাঁদেরকে ছেড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে নেন। তাই আট কি নয় বছর বয়সেই জানুকে অন্যের বাড়িতে কাজের মেয়ে হিসাবে নিজের ভাতের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। তাঁর গৃহস্বামী টিচারের ছেলেমেয়েরা যখন স্কুলে যেত তখন জানুরও মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে মন করত। কিন্তু তাঁর নিয়তি ছিল অন্নদাতা জেনমি (ভূস্বামী)-দের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা অবধিই সীমাবদ্ধ। লেখিকা বলছেন-

> ওয়ারিয়ার ছাড়া আরেকজন জেন্‌মি ছিল ভাল্লির জেন্‌মি স্বামী। পাহাড়ের ঢাল, বড়ো বড়ো পাহাড়, ক্ষেত, মাঠ, বাগান আরো যা কিছু – সবই ছিল জেন্‌মিদের। যতো জায়গা আমাদের আগেকার লোকেরা হাড়ভাঙা খাটনি খেটে, আগুন দিয়ে, ঝোপঝাড় কেটে চৌরস করে ভালো জমি করেছিল সবই জেনমিরা তাদের নিজেদের বলে নিয়ে নিয়েছিল। এরকম করেই আমাদের সব জমি ওদের হয়ে গেল। ফসল উঠে যাওয়ার পর আমরা কিছুটা করে শস্য পেতাম বেতনের অংশ হিসেবে।[৯]

তাদের মন্দিরে যাওয়ার অধিকারও ছিল না। চোক্কট গ্রামে আসা সাক্ষরতা বাহিনীর লোকেদের কাছ থেকেই জানুর অক্ষর শিক্ষা এবং পনের বছর বয়স ‘কর্ষক থোঝিলালি’ (কৃষক শ্রমিক) ইউনিয়নের সদস্য হওয়া জানুর দুনিয়ার পরিধিটাকে অনেকখানি বড়ো করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে এই কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্ন সম্বলিত পার্টির চরিত্রও তার কাছে পরিষ্কার হতে থাকে। মিছিল-মিটিংয়ে ভিড় করা আর ভোট বাড়ানো ছাড়া এই আদিবাসীদের পার্টির কাছে আর কোনো গুরুত্ব ছিল না। আর আদিবাসী মেয়েদের এর সাথে সাথে ছিল আরো একটি কর্তব্য পার্টির প্রতি। তাঁর কথায়- থ্রিস্সিলেরিতে এরকম বহু মেয়ে ছিল যাদেরকে একটি পুঁতির মালা আর দুই চিমটি তামাকের বদলে গর্ভিনী করা হয়। অথবা সামান্য কিছু খাবারের বিনিময়ে। অল্পবয়সে হওয়া বিবাহিত জীবন জানু ত্যাগ করে আরো তিনজন হতভাগিনী মেয়ে, পনেরোটা ছাগল আর একটা কুকুর নিয়ে তৈরি করেছিল নিজের দুনিয়া, যেখানে তাদের সমাজের পুরুষরা অল্প তামাক, এক গ্লাস চা কিংবা এক বোতল আরকের লোভে জমি বাইরের লোকেদের দিয়ে নিজেদের আলসেমির জীবনে আত্মসমর্পণ করেছে সেখানে ২০০১ সালে কেরালার ভূমিহীন আদিবাসীদের সংগঠিত করে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলে এই অসমসাহসী মেয়েটি। কেরালা সরকারের সেক্রেটেরিয়েট ভবনের সামনে ফাঁকা জায়গায় আদিবাসী কুটির তৈরি করে তারা চল্লিশ দিন ধরে ধর্মঘট চালায়, শেষ পর্যন্ত ১৬ অক্টোবর সরকার আদিবাসীদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি করেন জমি প্রত্যর্পণ বিষয়ে। ২০০৩ সালে সরকার নিজের লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ না করায় জানুর নেতৃত্বে আদিবাসীরা কেরালার ওয়ায়ইনাদ জেলার মুথাঙ্গার জঙ্গলের এক অংশে জোর করে বাস

করতে শুরু করে। পুলিশ তাদের জোর করে ওঠাবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষে একজন আদিবাসী ও একজন পুলিশের মৃত্যু হয়। জানু দীর্ঘদিন গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন বর্তমানে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। ১৯৯২ সালে তাঁর তৈরি 'আদিবাসী বিকাশনা প্রবর্তনা সমিতি' নানা রাজ্যের আদিবাসীদের হৃত জমি পুনরুদ্ধারের দাবির পক্ষে বারবার সরব হয়েছেন। এই সব প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ইতিমধ্যেই জানু নয়বার পুলিশের হাতে মার খেয়ে জেলে গিয়েছেন। ১৯৯৩-এ জানু কেরালা সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ তপশিলি সমাজকর্মী পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে সরকার আদিবাসী জনগণের তেরো দফা প্রাথমিক দাবি মেনে নেয়নি। এইভাবেই ক্ষমতার রাজনীতি তাঁর বশ্যতা আদায়ে বার বার শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছে।

সর্বভারতীয় সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে মাহার গোষ্ঠীর উর্মিলা পাওয়ারের লেখা আত্মজীবনী *আদ্যদান*, যা *The Weave of my Life: A Dalit Women's Memoirs* নামে অনুবাদ করেছেন মায়া পণ্ডিত। 'Aaydan' শব্দটির একটি অর্থ অস্ত্র (Weapon)। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর বোনের বিবাহিত জীবনে বোনের উপর হওয়া গার্হস্থ্য হিংসার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, দলিত বর্গের পুরুষরা মানবিকতার প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করে, কিন্তু মানবিকতা কি তা ওরাও জানে না। কারণ নিজেদের স্ত্রীর প্রতি কোনো মানবিকতা দেখায় না।[১০]

মারাঠি দলিত সাহিত্যের পরিসরে অন্যতম প্রথিতযশা লেখক নামদেও ধাসালের স্ত্রী মলিকা অমর শেখের আত্মজীবনীর নাম *I Want to Destroy Myself* (২০১৬)।

তিনি নিজেও বিশিষ্ট মারাঠি কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। প্রখ্যাত সমালোচকদের আলোচ্য আত্মকথনটির সম্পর্কে লেখা কয়েকটি বাক্য তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে-

> *I Want to Destroy Myself* is Malika's swearing, angry account of her life with Dhasal. The unvarnished story of a marriage, and of a woman and a writer seeking her space in a man's world, it is also a portrait of Bombay of poets, activists, prostitutes and fighters.[১১]

আত্মজীবনীতে একাধিক অধ্যায়ে গার্হস্থ্য হিংসা, পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে।

> I came home. Namdeo was in high spirits. He appeared to be very far away from me. Or had I moved away from him? My needs, my existence and its joys had been erased from his life. This hurt me deeply. Far more than a child, I needed a husband, a companion in those days. Namdeo had no enthusiasm for family life.[১২]

দলিত মহিলা লেখকরা এমন কিছু বিষয় সামনে আনতে সক্ষম হয়েছেন যা মূলত ব্রাহ্মণ্য ও উচ্চবর্ণের সাহিত্যচর্চা দ্বারা দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ হিসাবে বিবেচিত থেকেছে। তাদের লেখায় শরীর, যৌনতা এবং নারীদের উপর ঘটে চলা অত্যাচারের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে সামনে এসেছে। যেখানে, প্রসব, ঋতুস্রাব, যৌনমিলন ইত্যাদি বিষয় ইতিপূর্বে জনসমক্ষে অ-দলিত মহিলাদের দ্বারা খুব কমই আলোচিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি, উর্মিলা পাওয়ারের মতো লেখিকারা সর্বদা দলিত মহিলাদের নির্যাতিত হওয়ার এই চিত্রের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কথা বলেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে, দলিত মহিলারা প্রকৃতপক্ষে এই সমাজের জন্য শ্রম এবং জ্ঞান উৎপাদনের প্রায় সবটাই সরবরাহ করে। অনুরূপভাবে লরা ব্রুয়েক কুসুম মেঘওয়ালের ছোটগল্পের উদাহরণ নিয়ে আসেন

যেখানে 'তিনি আদর্শ ধর্ষণের বর্ণনার (যেখানে দলিত মহিলা তার আক্রমণকারীদের অসহায় শিকার) পুনর্লিখন করেছেন। এখানে তাঁকে পাল্টা শারীরিক আক্রমণকারী এবং বিজয়ী হিসাবে আঁকা হয়েছে'।[১৩]

তেলুগুতে গোন্ড শ্যামলার লেখনী সেই নারী দলিত লেখিকাদের একটি প্রধান কণ্ঠস্বর যারা জাতপাত এবং বস্তুগত সম্পদে দলিত মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বিখ্যাত লেখা, বাট হোয়াই শুডন্ট দ্য বাইন্দলা উইমেন আস্ক ফর হার ল্যান্ড?-এই প্রসঙ্গে গোন্ড শ্যামলা উচ্চবর্ণের প্রবীণ এবং মাদিগা সম্প্রদায়ের পুরুষ উভয়ের বিরোধিতা করে একটি দলিত মহিলার তার জমির অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন।

গোন্ড শ্যামালা (জন্ম. ১৯৬৯) একজন তেলুগু সাহিত্যিক। জন্মেছিলেন রাঙ্গা রেড্ডি জেলায়, বর্তমানে যা তেলেঙ্গনা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত পরিচয়ে তিনি ছিলেন মাদিগা নামের চর্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রে বসবাস করত। লেখকের বাবা-মা ছিলেন ছিলেন আঞ্চলিক ভূস্বামীর অধীন বেগার চাষি। শ্যামালা দেখেছিলেন তাঁর ভাই রামচন্দ্র কীভাবে বাধ্য হয়েছিলেন এই কৃষি- শ্রমিকে পরিণত হতে। কিন্তু গোগু শ্যামালা সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষার্জনের। ডক্টর বি.আর.আম্বেদকর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি দলিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরই লেখা উল্লেখযোগ্য দলিত ছোটগল্পগ্রন্থ *বাবা হয়তো এক হাতি এবং মা একটি ছোট্ট বাক্স কিন্তু...* প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এটি মাদিগা নামক দলিত নারীদের আত্মকথনমূলক রচনা। যা

গল্পকথনরীতিতে রচিত। দলিত নারীদের গার্হস্থ্য অত্যাচার, যৌননিগ্রহ, পুরুষতন্ত্রের নিষ্পেষণ এই গল্পগুলির মূল আখ্যানবস্তু। গোষ্ঠীর বাইরের ও ভেতরের লাঞ্ছনা ও অবদমনের দলিল হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি।

সংরূপগত বিচারেও এটি একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। যন্ত্রণার দলিলে জন্ম নেওয়া অন্তর্ঘাতের যে কোনো নির্দিষ্ট ধরন হয় না, হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতের সেই ইঙ্গিতই রয়েছে এইখানে ।

Against All Odds (২০০০) আত্মজীবনীর লেখিকা শান্তাবাঈ কালে, যিনি Kolhati সম্প্রদায়ের একজন বারনর্তকী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যসিকা দত্ত তাঁর *Coming Out as Dalit: A Memoir* (২০১৯), আত্মজীবনীটি উৎসর্গ অংশে লিখেছেন, 'Rohit Vemula, who lit a flame that made my silence impossible'। নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা এই সাংবাদিক দীর্ঘদিন তাঁর দলিত আত্মপরিচিতি গোপন রেখেছিলেন তাঁর পারিপার্শ্ব থেকে।

শিল্পা রাজের লেখা *The Elephant Chaser's Daughter* সাম্প্রতিক সময়ে লেখা এবং আলোচিত এমন একটি বই, যা ভারতের জঙ্গলবাসী দলিতদের জীবনকথাকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছে। মোট ১৮টি অধ্যায়ে ভাগ করা এই বইয়ের অধ্যায়-শিরোনামগুলিতে শিল্পার নিজের জীবনের এক একটি মোড়কে তুলে ধরেছেন। নিজের জীবনের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে শিল্পা সচেতনভাবে সৎ থেকেছেন, পাঠকের কাছে কোনো কিছু গোপন করেননি। ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে

আমাদের দেশের বর্ণভিত্তিক বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, সামাজিক কাঠামো, নারী সুরক্ষা এবং দাম্পত্য জীবন প্রতিপদে তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দলিত এবং নারী হিসাবে তাঁকে থাকতে হয়েছে অত্যাচারিতের দলে। যে অত্যাচার তাঁদের মতো দলিত মেয়েদের জন্ম থেকেই পাওয়া।

যেহেতু এটি স্মৃতিকথা, তাই এই বইয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্লট বা সাব-প্লট ইত্যাদি পাওয়া যায় না। আত্মপক্ষের বয়ানে লেখা এই স্মৃতিকথা মূলক বইটির মধ্যে নিজের ছাড়াও তাঁর বাবা, দাদু-ঠাকুমা এবং মায়ের স্মৃতি তিনি তুলে ধরেছেন। শিল্পা রাজ এই বইয়ের কথক এবং প্রধান চরিত্র। তাঁর সঙ্গে তাঁর মামার সম্পর্ক এবং পারিবারিকভাবে মামকে বিয়ে করার চাপ অস্বীকার করে তিনি শান্তি ভবনে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর এই একক সিদ্ধান্তটি নিয়ে তাঁকে যথেষ্ট অবমাননার মধ্যে পড়তে হয়। তবুও তাঁর এই দৃঢ়চেতা সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে বহু দলিত মেয়েকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। শিল্পা বাড়ির অমতে, সামাজিক যাবতীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাই *দ্য এলিফ্যান্ট চেজার'স ডটার* শুধু একজন শিল্পা রাজের গল্প নয়; এটি সেই সমস্ত সাহসী মেয়েদের গল্প যারা সামাজিক বৈষম্যগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করার স্পর্ধা রাখে। শিল্পা রাজের *দ্য এলিফ্যান্ট চেজার'স ডটার* প্রথম দলিত মহিলার স্মৃতিকথা যা একই সঙ্গে অত্যন্ত সাহসী এবং মর্মস্পর্শী।[১৪]

ভিরাম্মা: লাইফ অফ এন আনটাচেবল্ মুখে- মুখে বলে যাওয়া এক দলিত কন্যার জীবন কাহিনি। ভিরাম্মা, একজন দলিত ও অস্পৃশ্য 'পারিয়া' পরিবারের মেয়ে।

১৯৮০-৯০ টানা এক দশক তিনি গবেষক জোসিয়ান রেসিন'কে মুখে মুখে তাঁর জীবনকথা বলেছিলেন তামিলে। রেসিন শ্রুতিলিখনে ভিরাম্মার সেই জীবনকথা তামিলে প্রকাশ করার পরে ইংরাজিতে উইল হবসন তার তরজমা করেন। এই বইতে একজন দলিত নারীর জীবনের প্রায় প্রতিটা অধ্যায় তাঁর বয়ানে রচিত। যে জীবনে বিবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় পীড়ন ভয়ানক ছাপ রেখে গেছে। এই কাহিনি কেবলমাত্র ভিরাম্মা নাম্বী একজন দলিত কন্যার নয়, বরং বলা ভালো ভারতের বৃহত্তর জাতপাতের কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি দলিত এবং নিম্নবর্গের নারীর আত্মকথা। ভিরাম্মার দীর্ঘ এই জীবনকথা মোট পঁচিশটি অধ্যায়ে ভাগ করা, যার শুরুতে ভালকাপ্পান'এ তাঁর শৈশবের কথা লেখা আছে। এই অধ্যায়ে স্মৃতিকথা নির্ভর ভিরাম্মার শৈশবকাল সামাজিক এবং আর্থিক এক শোষণ-কাহিনি। নিতান্ত কিশোরী বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। এবং বছর ঘুরতেই ভিরাম্মা মেয়ে থেকে মহিলা হয়ে গেলেন। ভিরাম্মা নিজেকে দলিত মহিলা না বলে পারিয়া হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। কারণ 'পারিয়া' শব্দটি তিনি মনে করেছেন তাঁদের সমাজের জন্য বেশি প্রযোজ্য।

যেহেতু ভিরাম্মা ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রী, সেহেতু তাঁর পক্ষে তাঁর সমাজে নারীর মাতৃত্ব নিয়ে বিভিন্ন অনাচার এবং পুরুষতান্ত্রিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর এই জীবনকথায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। পারিয়া সমাজের বিভিন্ন মৃত্যু, বিয়ে, কিংবা অন্যান্য উৎসবে তিনি গান গাইবার ডাক পেতেন, এর দরুন প্রায় প্রতিটা পরিবারের অন্দরমহলের বিভিন্ন অনাচার তাঁর বর্ণনায় উঠে এসেছে। ভিরম্মার *লাইফ অফ অ্যান আনটাচেবল* একটি বহুমুখী এবং বহুমাত্রিক কাজ, যা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য একটি

বহু-বিভাগীয় পদ্ধতির প্রয়োজন। এটি নিছক একটি দলিত পাঠ্য নয়, বরং এটি নারীবাদী পাঠ্য, একটি লিঙ্গ অধ্যয়ন, একটি সাংস্কৃতিক আখ্যান, একটি ভাষাগত সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে পড়া উচিত। ভিরাম্মা একজন গল্পকার হিসাবে, তাঁর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথক হিসাবে এতটাই অনন্য যে, বইয়ের লেখক জোসিয়েন নৃতাত্ত্বিক সংগীতবিদ্যার উপর তাঁর গবেষণার জন্য ভিরাম্মার জীবনকথা বেছে নিয়েছিলেন। ভিরাম্মার ব্যক্তিত্ব তাঁর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমন প্রবলভাবে জড়িত যে, পারিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে এই বইটিকে আকর গ্রন্থ বলা যায়।

ভিরাম্মা একজন জন্মগত গল্পকার। তিনি যেভাবে তাঁর জীবন এবং গোষ্ঠীর যাপনের বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন বিশ্বস্ত, তেমনই অনন্য। ব্যক্তি জীবনে তাঁর শৈশব, স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন, তাঁদের সন্তান এবং তার পরবর্তী জীবন, জীবনের এই পর্বগুলি জুড়ে পারিয়া সমাজের আচার, তাদের বিশ্বাস, তাদের রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য, তাদের উদ্‌যাপনের পাশাপাশি শিক্ষার অভাবের কারণে তাদের কুসংস্কার এবং মানসিক পশ্চাদপদতার বিস্তারিত বিবরণ পাই। বিস্তৃত পরিসরে বলা যেতে পারে যে, আত্মজীবনীটির দুটি থিম রয়েছে— একটি যেখানে ভিরাম্মাকে তাঁর গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়, আত্ম-দৃঢ়চেতা একজন মহিলা হিসাবে আমরা দেখতে পাই। এরই পাশাপাশি দ্বিতীয় থিমটি হল তাঁর গান এবং গল্পগুলি পারিয়া গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে কীভাবে প্রকাশ করেছে তার চিত্র। তিনি যেভাবে এসব বিবরণ দিয়েছেন, তার ভঙ্গিমা এই বইটিকে দলিত সাহিত্যের পরিধির মধ্যে নিয়ে এসেছে। যেহেতু জোসিয়েন মূলত এথনোমিউজিকোলজি নিয়ে গবেষণার জন্য ভিরাম্মার কাছে এসেছিলেন এবং ভিরাম্মা লোকসংগীতের গুণী

শিল্পী ছিলেন, তাই এই স্মৃতিকথামূলক আত্মজীবনীটির একটি বড়ো অংশ গান, গল্প, আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের বর্ণনায় পূর্ণ। পারিয়া সম্প্রদায়ের সত্যিকারের চেতনা ভিরাম্মার গানের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। যে চেতনা কেবল তাঁদের জীবনের কষ্টগুলি সইতে সাহায্য করে না, বরং তাঁদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অন্যায় থেকে বাঁচতে সহায়তা করে। ভিরাম্মার জীবন কথা একটি অস্পৃশ্য সমাজের সৎ বর্ণনা, যা আমাদের সমাজের বঞ্চিত অংশের জীবন নিয়ে সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে বাধ্য করে।[১৫]

সুজাতা গিডলার আত্মজীবনীর নাম *অ্যান্টস অ্যামং এলিফ্যান্টস*। সুজাতা গিডলা কেন তাঁর বইয়ে ভারতের দলিত অস্তিত্বকে হস্তীরাজ্যে পিপীলিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন তা বুঝতে হলে আত্মজীবনীটির ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। বইটির সম্পূর্ণ শিরোনাম *অ্যান্টস অ্যামং এলিফ্যান্টস : অ্যান আনটাচেবল ফ্যামিলি অ্যাণ্ড দ্য মেকিং অব মডার্ন ইণ্ডিয়া*। গিডলার জন্ম এক অস্পৃশ্য পরিবারে। তাদের জাতের নাম মালা। ১৯৩০-এর দশকে তাঁরা ওয়ারাঙ্গল (অধুনা তেলেঙ্গানার বড় শহর) ও মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ুর রাজধানী শহর) কানাডিয়ান মিশনারিদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সে কারণে গিডলারের নামিদামি স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পেতে অসুবিধা হয় নি। ২৬ বছর বয়সে আমেরিকা চলে যান তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়েই তিনি তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের অভিনবত্ব আবিষ্কার করেন। সেই ইতিহাসই তিনি অনুসন্ধান করতে চান, দেশে ফিরে এসে নিজের মা-কাকা-বন্ধুদের জবানবন্দি নিতে শুরু করেন। হস্তী রাজ্যে পিপীলিকাদের সেই গল্পই তিনি এই বইতে শুনিয়েছেন।

গিডলার মা মজুলা আর দুই কাকা সত্যম ও কেরির জন্ম ব্রিটিশ শাসনের একেবারে শেষ দিকে। দারিদ্র্য আর অবিচারের এক বিশ্বে তাঁরা বড় হয়েছিলেন, যদিও সেখানে অনন্ত সম্ভাবনাও ছিল। কাকিনাড়ার (অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের বড় শহর) এলুয়িন পের্টা নামে যে জায়গায় তাঁরা থাকতেন, সেখানে সবারই এক রকম রাজনৈতিক ঝোঁক ছিল, সুতরাং মিছিল, জমায়েত, গ্রেফতারি কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারই ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল— বিদেশি শাসন থেকে। কিন্তু অস্পৃশ্য, গরীব, খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কিছুই বদলাল না। বড়োভাই সত্যম তাই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। গিডলার স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়, কীভাবে একজন ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন অসামান্য রূপান্তরে বিখ্যাত কবি ও পিপলস্ ওয়ার গ্রুপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হয়ে উঠল, যে গোষ্ঠী নকশালপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে সবচাইতে সফল। সুজাতা গিডলা তাঁর মায়ের জাতপাত নিয়ে লড়াই আর মেয়েদের উপর অত্যাচারের কথাও লেখেন। ক্রমে একটা জটিল আর ঘননিবদ্ধ পরিবারের মধ্যে পাঠক প্রবেশ করেন, যারা একটা সুস্থ জীবন ও ন্যায্য সমাজের জন্য ক্রমাগত লড়াই করছে। তাঁর ভাষাতে বললে এমনটা বলা যেতে পারে —

> আমার গল্প, আমার পরিবারের গল্প, ভারতের গল্প নয়। এগুলো শুধুই জীবন। আমি যখন তাকে ছেড়ে নতুন দেশে গিয়ে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে আমার পরিবারের সঙ্গে কী ঘটেছিল, আমরা কী করেছিলাম, সেগুলো গল্প হয়ে উঠল। সে গল্প বলার অর্থ আছে, সে গল্প লেখার অর্থ আছে।[১৬]

নিজের জন্মবৃত্তান্তের সূচনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

> আমি দক্ষিণ ভারতে জন্মেছিলাম। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের কাজিপেট নামে এক শহরে।
> আমি এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলাম। আমার বাবা-মা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক।
> আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছিলাম।[১৭]

এই পৃথিবীতে মানবজন্মের মতো আকস্মিক ঘটনা আর কিছু নেই। কে কখন কোথায় জন্মাবে, সেটা ব্যক্তির হাতে থাকে না। অথচ, তা দিয়েই সারা জীবন বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালাতে হয়। সুজাতা গিডলা এখানে তিনটি আপাতভাবে সম্পর্কহীন বাক্যকে জুড়ে দিয়ে নিজের পরিচিতিকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে দলিত জন্মকেও সম্ভবত তিনি দুর্ঘটনা বলেই দেখতে চাইছেন। কাজিপেটে জন্মের ব্যাপারে তাঁর যেমন কোনো হাত নেই, তেমনই অস্পৃশ্য হওয়ার পিছনেও। এই সূক্ষ্মতাতেই জাতপাতের অন্যায়টি চিনিয়ে দিয়ে তাঁর আত্মকথার শুরু।

কারও দলিত হওয়া কি শুধুই আকস্মিকতা বা দুর্ঘটনা, নাকি অনিবার্যতাও বটে? এই অনিবার্যতার প্রশ্ন থেকেই নিশ্চিতভাবে সুজাতার বড়োভাই সত্যমের (যিনি কে জি সত্যমূর্তি নামে বিশেষ পরিচিত) রাজনীতির কথা আসে। সুজাতা গিডলার এই আত্মজীবনী থেকেই জানা যায় নকশাল রাজনীতিতে এতখানি পথ দেখানোর পরেও শেষাবধি জাতের কারণেই সত্যমকে একপাশে সরে যেতে হল। এই বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেও জাতের প্রসঙ্গ এল। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট সংগ্রামী সত্যম চলে যায় বহুজন সমাজবাদী পার্টিতে, যারা দলিতদের পার্টি হলেও আদর্শের নিরিখে

নকশালদের থেকে ভিন্ন ভুবনের বাসিন্দা। আবার সত্যম একদিন ফিরেও আসেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

এই বই এভাবেই পরতে পরতে তুলে ধরে লিঙ্গ ও পারিবারিক রীতি-প্রথার ভিতরকার সমস্যাগুলিকেও, যে প্রশ্ন দলিতদের জীবনে আসলে জাতের সঙ্গেই জড়িত। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এমন ভয়াবহ সমালোচনা এবং নকশালপন্থী রাজনীতির মধ্যে এমন জাতপাতের অস্তিত্বের কথা আগে কেউ তুলে ধরেননি।

বাঙালি দলিত নারীর আত্মজীবনী:

প্রথম বাঙালি মেয়ে হিসাবে আত্মকথা রচনা করেছিলেন রাসসুন্দরী দাসী। তাঁর আত্মকথন *আমার জীবন* (১৮৭৬) থেকে জানা যায় শ্বশুর বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে নিজের চেষ্টায় অক্ষর চিনতে শিখেছিলেন *চৈতন্য ভাগবত* পড়বেন বলে। পরবর্তীকালে নব্য সংস্কারপন্থী, প্রধানত ব্রাহ্মণ পরিবারে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কবিতা, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নিজেদের কথা লেখার তাগিদ অনুভব করছিলেন। ১৮৫০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে কবিতা, উপন্যাস ও আত্মজীবনী মিলিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের রচিত অন্তত শ-চারেক সাহিত্য কর্ম ও তাদের সম্পাদিত একুশটি পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮০৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জন্ম এমন বাঙালি মেয়েদের অন্তত ষাট জন আত্মকথামূলক রচনা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ যে উনিশ শতকে বড় হয়ে ওঠা যে বাঙালি মেয়েরা আত্মকথা-স্মৃতিকথা লিখছেন তারা অবশ্য প্রায় সবাই সমাজের মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের, প্রধানত ব্রাহ্ম বা বর্ণহিন্দু।

নিম্নবর্ণের দলিত সম্প্রদায়ের বাঙালি নারীর আত্মজীবনী পেতে আমাদের সঙ্গত কারণেই অনেকটা দেরি হয়েছে। ২০১১ সালের লোক গণনার তথ্য অনুযায়ী ভারতে দলিতদের সাক্ষরতার হার ৬৬ শতাংশ যা দেশের গড় হার (৭৪ শতাংশ) থেকে ৮ শতাংশ কম। কিন্তু এর মধ্যেও আবার রাজ্যে রাজ্যে বিপুল তারতম্য আর দলিত-নারী সাক্ষরতার হারে দলিত পুরুষদের চেয়ে ১৯ শতাংশ পিছিয়ে।

এই অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্য থেকেই আমরা পেয়েছি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের *আমি কেন চাঁড়াল লিখি* (২০১৬)। বইটি ২০১৬ সালের ১৬ আগস্ট চুনী কোটাল দিবসে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্ববাংলা থেকে আসা এই সব তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিটি দিনই ছিল অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য লড়াই। এই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও লেখিকা বাবা গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে আত্মিক ভাবে পালন করতেন, কখনো কখনো তাঁর স্বরেই বলতেন, ‘ছেলেমেয়ে দিতে শিক্ষা প্রয়োজনে করবে ভিক্ষা’।

তাঁর এই আত্মকথা জুড়ে আছে পূর্ববাংলা থেকে আসা সহায় সম্বলহীন মানুষদের করুণ আর্তনাদ। অস্থির সেই সময় জুড়ে কালোবাজারি, চুরি, ছ্যাচড়ামি চলতে থাকে ক্রমান্বয়ে, এরই সঙ্গে কিছু মেয়ে বিক্রি হতে থাকে ভিন রাজ্যে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন-

> আমার মায়ের মাসতুতো বোন কান্দনি মাসির মেয়েকে কাজ দেবে বলে দিল্লি নিয়ে যায় আসলে যে তাকে বিক্রি করা হয়। সে জানত না, অপটু হাতে পোস্টকার্ড পাঠায়। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। দ্বিতীয় দিন আমি সেই পোস্টকার্ড দেখতে গেলে আমাকে আর দেখানো হয় না। মেসো বেশ রেগেমেগেই বলেন – হারিয়ে গেছে।[১৮]

প্রবল যৌন ও মানসিক নির্যাতনে এই ভাবেই মেয়েদের ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া আর শখ আহ্লাদগুলি হারিয়ে যায়। লেখিকার আত্মীয়রা সবাই পদবী পাল্টে ঠাকুর হয়ে যায়। এটাও একপ্রকার সামাজিক চাপ থেকে ও জাতিবাদী হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল এইখানে প্রশ্ন তুলেছেন-

> কিন্তু নাম পাল্টালেই কি অবস্থান বদলায়, তার পদ্ধতি আলাদা। অস্পৃশ্যের বদলে হরিজন বা অনুসূচিত বা দলিত যে শব্দই আনা হোক অবস্থান বদল তো এভাবে হয় না।[১৭]

তিনি কর্ম ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন। কখনও প্রশ্ন উঠেছে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে, কখনও তাঁর সহকর্মী মুখার্জীবাবু তাঁকে কমলা রঙের শাড়ি পরতে দেখে বলেছেন, 'তুইনা এসব রঙের শাড়ি পরবি না'[১৮], কারণ তার রঙ কালো। তিনি তাঁর আরেক সহকর্মীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আর এক বড়বাবু ছিলেন যিনি সারাক্ষণ বলতেন আমরা হলাম কুলীন কায়স্থ, সৌকালীন গোত্র, তাতে সে বারবার প্রমাণ করতে চাইত যে সে মোটেও গোয়ালা ঘোষ না'। এই অমানবিক পরিবেশেই তিনি পেয়েছিলেন গুহদাকে। যিনি রিটায়ারমেন্টের দিন লেখিকাকে সুকুমার সেনের দুখণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাস বই উপহার দিয়ে যান। এই মানুষটি একদিন লেখিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'প্রতিমার কাঠামো কি দিয়ে গড়া হল, তা জানার দরকার কি?'

কাজের মেয়ে বেবী হালদারের আত্মজীবনী *আলো-আঁধারি* (২০০৭) গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা হলেও বর্তমানে বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশি ভাষায় অনূদিত ও আন্তর্জাতিক ভাবে আলোচিত। অল্প বয়সে বেবীর মা তার ছোটছেলেকে নিয়ে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে চলে যায়। বাবা-মার এই দাম্পত্য কলহে ছারখার হয়ে যায় বেবী আর তার দিদির শৈশবকাল মাত্র পনের বছর বয়সে বেবীর দিদির বিয়ে হয়ে যায়। যে বিবাহের পরিণতি হিসাবে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে বাদ সাধার অপরাধে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। বেবীর বাবা এরপর দু'বার বিয়ে করেন কিন্তু বেবীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। মাত্র তেরো বছর বয়সে পড়াশোনা বন্ধ করে দ্বিগুণ বয়সী এক চালচুলোহীন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তাকে। শুরু হয় অত্যাচার আর একের পর এক গর্ভধারণ। অল্প কদিনের জন্য বাবার বাড়িতে গিয়েও বেবী দেখে বাবা আর তার স্ত্রীর মধ্যে তাকে নিয়ে ক্রমাগত অশান্তি। এইভাবে যখন দেওয়ালে পিঠ একবারে ঠেকে যায়, স্বামীর প্রতিনিয়ত মার আর অত্যাচারের সংসার ছেড়ে সে তার দুই ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে একা একাই বেরিয়ে পড়ে ফরিদাবাদের উদ্দেশ্যে। সেখানে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে করতে সে ছেলে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে। এই সময় সে ভাগ্যক্রমে গুরগাঁওয়ে একটি বাড়িতে কাজের সন্ধান পায়। ঘটনাচক্রে সেই গৃহকর্তা প্রবোধ কুমার, বহু পরিচিত লেখক প্রেমচাঁদের নাতি। তিনি আবিষ্কার করেন বেবীর লেখাপড়ায় অদম্য উৎসাহ। পিতৃসম এই মানুষটিকে বেবী তাতুষ নামে ডাকত। তিনি বেবীকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসায়, সম্মানে মেয়ের জায়গা দিয়েছিলেন। এই তাতুষ, তাঁর বন্ধু, দিল্লিতে থাকা তাদের আরেক বন্ধু রমেশবাবুর প্রতিনিয়ত উৎসাহেই বেবী তার জীবনের কথা লিখতে শুরু করে। তাতুষ তাকে আশাপূর্ণা দেবীর কথা বলতেন- যিনি ঘরের সব কাজকর্ম সেরে যখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়তেন তখন চুপিচুপি লিখতেন। কখনো বা পড়ে শোনাতেন অ্যানা ফ্রাংকের ডাইরি। এই জেঠুর বাড়িতেই

বেবীর আলাপ হয় শর্মিলাদির সঙ্গে যে বেবীর এই আত্মজীবনীর প্রতিনিয়ত উৎসাহদাতা ছিল, তার মধ্যেই বেবী জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব নামের অমূল্য সম্পর্কের স্বাদ পেয়েছিল। শৈশবের দুঃস্বপ্নের অধ্যায় পেরিয়ে এইভাবেই একদিন পত্রিকায় বের হয় তাঁর আত্মজীবনী 'আলো-আঁধারি' নাম দিয়ে। শুরু হয় এক জেদি মেয়ের বিশ্বজয়ের গল্প।[২০]

প্রান্তিক মানুষদের মাঝখান থেকে উঠে এসে লিলি হালদার লিখেছেন তাঁর বর্ণময় জীবনের আখ্যান *ভাঙা বেড়ার পাঁচালি* (২০১৯)। তিনি এই আত্মকথনের একটি অংশে বলেছেন-

> পরের দিন মাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন যারা তফসিলি হাত তোলো। কোনো সংকোচ না করে হাত তুললাম। আর আশেপাশে বন্ধু-বান্ধবীদের মুখ দেখতে লাগলাম। কী অপরাধ করেছি আমি, বুঝলাম না। অনেকেই কাছের বন্ধুরা অবজ্ঞার চোখে তাকাল — আমি কারণ বুঝলাম না।[২১]

পরবর্তীকালে এই কারণের অনুসন্ধানেই তিনি কলম ধরেন। আত্মকথার একদম শেষ অংশে গিয়ে তিনি লিখছেন-

> তবে জীবন দিয়ে বুঝেছি — গরীব ঘরসংসারে কালো মেয়ে হয়ে জন্মানো কত অভিশাপ আমার কাছে। আমি এও বুঝেছি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে হাঁটলে সব বাধা অতিক্রম করে এগোনো যায়।[২২]

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০০৩ সালের ১৮ জানুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতের শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য' প্রবন্ধে দলিতদের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> নিচু জাতিতে জন্মানোটা নিঃসন্দেহে বঞ্চনার একটি কারণ। কারণ নীচু জাতির লোকেরা যদি দরিদ্র হয়, জাতিগত বঞ্চনা ও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দলিত বা নিম্নবর্ণের লোকেরা অথবা তফশিলযুক্ত আদিবাসীরা যে বঞ্চনা ও বৈষম্যে ভোগেন তা অনেক বেশি রকম হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।[২৩]

ঐ একই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন-

> নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে শ্রেণিবঞ্চনা ও লিঙ্গবঞ্চনা এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে তাদের জীবন দুঃসহ করে তোলে। একদিকে নিম্নশ্রেণির অভিশাপ এবং তারই সঙ্গে মেয়ে হয়ে জন্মানোর বঞ্চনা — এই দুই দিক একত্রিত হওয়ার ফলে নিম্নশ্রেণির মেয়েরা নিদারুণ দৈন্য ও রিক্ততার মধ্যে পড়েন।[২৪]

কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল সম্পাদিত 'নীড়' পত্রিকার (অষ্টাদশ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ) বিষয়বস্তু 'দলিত মেয়েদের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী-সহ অন্যান্য রচনা'। আলোচ্য সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে চুনি কোটাল লিখেছেন শিক্ষাজগতে টিকে থাকার জন্য তাঁর অবর্ণনীয় সংগ্রামের কথা। স্বাধীনতা উত্তর ভারববর্ষে তাঁর শেষ পরিণতি যে বর্বরতার ইঙ্গিত দেয় তার সামনে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। মেরুনা মুর্মু, 'ভারতমাতার ইতর সন্তানের আপন কথা' শীর্ষক লেখায় বলেছেন কখনো তাঁকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে যে আদিবাসী হয়ে তিনি আদৌ মার্গীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের কাজ করতে যোগ্য কিনা, কখনো দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াকালীন হঠাৎই ক্লাসের মাঝে তাকে দাঁড় করিয়ে ক্লাস টিচার জিজ্ঞাসা করে বসেন যে তিনি এস.টি. কিনা। অধ্যাপনা জীবনেও তাঁকে প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'একদা এও কানে এসেছিল যে আমার কিছু ছাত্রছাত্রী মনে করে সে আমার থেকে শেখার কিছু নেই কারণ আমি কেমন আফ্রিকানদের মত দেখতে।'[২৫]

আমাদের মনে পড়ে নোবেলজয়ী আফ্রো-আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ লেখিকা টোনি মরিসনের কথা, মনে পড়ে যায় তাঁর নোবেল বক্তৃতার সময়কার উদ্ধৃতি – 'we die...but we do language. That may be the measure of our lives...language

alone is meditation.’ যে সমস্ত নারীরা বিশ্বের নানাপ্রান্তে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উদয়াস্ত পরিশ্রম আর দাঁতে দাঁত চিপে লড়ে যাচ্ছে, জীবনের প্রতি কোনো জেহাদ ঘোষণা না করে, এই অক্ষরমালা তাঁদের হয়ে গর্জে উঠুক।

এই *নীড়* সংখ্যাটিতে আমরা পাই কানন বড়ালের ‘আত্মকথা’, স্মৃতিকণা হাওলাদারের ‘লাঠির ভয়ে সাহস হয়’, ড. পুষ্প বৈরাগ্যের লেখা ‘ছিন্নমূল দরিদ্র দলিত পরিবারের মেয়ের বেড়ে ওঠে’, সুনীতা পোদ্দারের ‘ছোটবেলা ও আরো কিছু’, ইলা দাসের ‘জীবন চরিত’, সন্ধ্যা বিশ্বাস ও অলকানন্দা রায় তাঁদের কথা বলেছেন ‘আত্মকথা’ নামে। স্বল্প পরিসরে অল্প কথার নারীদের এই আত্মকথনগুলি ঘুরে ফিরে সেই অস্পৃশ্যতা ও পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার হওয়ার করুণ কাহিনিই শুনিয়ে যায়। গুরুচণ্ডালী প্রকাশনী থেকে টুকরো টুকরো আকারে পেয়েছি *তাহাদের কথা* সিরিজ, যেখানে তুলে ধরা হয়েছে নিম্নবর্গের মেয়েদের জীবিকার জন্য মরণপণ লড়াইয়ের কথা, তাদের কেউ কেউ সেলাই, কেউ রান্নার দিদি, কেউ আয়া, কেউ বা বিড়ি বাঁধার জীবনকে বেছে নিয়েছে। পেশায় প্রযুক্তিকর্মী নেশায় লেখিকা দময়ন্তী লিখেছেন *সিজিনস অফ বিট্রেয়াল*, দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি একসাথে যেন গড়ে তুলেছে গণস্মৃতির এক আর্কাইভ।

তৃষ্ণা করাতী তাঁর আত্মজীবনী *দলিত নারীর আত্মকথা*-র ভূমিকায় তাঁর এই আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেছেন—

> ...আমার ‘অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই’ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যই এই যে, এই লেখার মাধ্যমে পাঠক কোনও গল্পগাথা নয়, কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি যদি উপলব্ধি করতে

> পারেন। এখানে রয়েছে চরম দারিদ্রতার মধ্যেও একটি সুখী পরিকর কথা। সৎ পথে থেকে, কঠিন পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। রয়েছে স্বপ্ন দেখার কথা, প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কথা।[২৬]

লেখিকা তৃষ্ণা করাতী ও তাঁর দাদা কেনেরা পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত। সমগ্র আত্মজীবনী জুড়েই অসংখ্য প্রতিকূলতা পার করে সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার দলিল। তাঁর বাবা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই কাজটি তিনি হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের বাসা বদলের সঙ্গে এই কাজটি হারিয়ে ফেলার একটা অন্তর্লীন যোগ আছে। আত্মজীবনীতে মায়ের বয়ানে সেই সময়টিকে লেখিকা তুলে ধরেছেন —

> আমরা যে জায়গায় থাকতাম, তার পাশেই ছিল মুসলিম অধ্যুষিত জায়গা। কিছু সময় আগে ঘটে গিয়েছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা। তোর বাবা ভয় পেল ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটছিল — এই বুঝি কোনও অঘটন ঘটে যায়। এই সময় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে খুব দ্বন্দ্ব চলছিল। চারিদিকে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, ভাঙচুর করা, মানুষ খুন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। তোদের বাবা তখন থেকেই ভাবতে থাকে — এখনকার পিতৃভিটে ছেড়ে অন্য জায়গায়, যেখানে তোর অন্য পিসিরা থাকে, সেখানে চলে যাব। কিন্তু সহজে কি পিতৃভিটা কেউ ছাড়তে পারে?[২৭]

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে তাঁদের পুরো পরিবারকে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করে দেয়। লেখিকার ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রবল অশান্তি হয় এবং একটি মাত্র শোওয়ার ঘর, বেড়া দেওয়া রান্নাঘর ও চাষের অযোগ্য কিছু ধানিজমি দিয়ে তাঁদের প্রতারিত করে আলাদা করে দেওয়া হয়। যৌথ সংসারের সিংহভাগ খরচ চালানোর জন্য, ফসল কেনার জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর ঋণ ছিল, এর উপর ছয় জনের সংসারের দায়িত্ব, সঙ্গে অনিশ্চিত উপার্জন। ঋণ শোধ করতে না পারায় ঋণদানকারীরা

বাড়ি এসে অপমান করে যেত। পরিস্থিতি আরও খারাপ যখন হয় তখন তাদের পাড়াতে সদ্য আসা বন্ধন ব্যাঙ্কের রান্নার দায়িত্ব নেন তাঁর মা। কিন্তু অতি অল্প বেতনে তেমন সুরাহা হয়ে ওঠে না, তাই পাশাপাশি আরও কয়েকটি বাড়িতে রান্নার দায়িত্ব নেন তিনি। কেমন ছিল সেই মেয়েবেলার দিনগুলি—

> ...ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষ ইস্ত্রি করা ছাড়া জামা পরত না, তার শরীর আজ ধুলোমাখা! যার শরীরে আতরের গন্ধে মাখা থাকত, তা এখন অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের ঘামের গন্ধে ভরা। বাবা জোগালির কাজ করে যতটুকু টাকা উপার্জন করত, তাতে দু-বেলা ভাত জুটত না। কোনও না কোনও দিন একবেলা খেয়ে থাকতাম আমরা। এমনও দিন গেছে যে শুধু তেল-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাত মেখে খেয়ে থাকতাম। আমরা খুদ খেয়েও থেকেছি। পাড়ার একজনের কাছ থেকে রেশনের গম কিনে আটা বানিয়ে রুটি খেতে শুরু করি। ভেতো বাঙালির রুটি খেতে খুব কষ্ট হত। কিন্তু রুটি খাব না — তার বিকল্প আমাদের ছিল না। খেতেই হত, নয়তো না খেয়ে থাকতে হত। এভাবেই চলছিল দিন।[২৮]

আর এইখানেই আলাদা করে বলতে হয় লেখিকার মা প্রাণরানি করাতীর কথা। নিজে বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানই অনিশ্চয়তায় ভরা, সেই দুর্দিনেও নিজে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছেন যাতে ছেলেমেয়েরা অন্তত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

> ...মা চাইলেই এই হাড়ভাঙা কষ্ট নাও করতে পারত। অন্যান্য গরীবদের মতো আমাদেরও পড়াশোনা বাদ দিয়ে সংসার চালানোর জন্য কোনও না কোনও কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মা তা করেনি। মা ছিল প্রকৃতই শিক্ষানুরাগী, বাস্তবমুখী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দূরদর্শী। মা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে আমাদের জীবনে উন্নতির জন্য পড়াশোনা খুবই প্রয়োজনীয়। বিচক্ষণ মা বুঝতে পারে যে, আমাদের যেহেতু অর্থ নেই, তাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে পড়াশোনাকে অস্ত্র করে।[২৯]

একাধিক নিম্নবর্গীয় মানুষদের আত্মজীবনীতে এই শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের কিছু চিন্তার সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ছিল—

> নিম্নজাতীয় ব্যক্তিদের বলিতেছি-- ...উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই যে লেখালেখি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলিতেছে, উহা বৃথা; উহাতে কোনোরূপ কল্যাণ হয় না, হইবেও না। উহাতে... নানা ভাগে বিভক্ত জাতি ক্রমশঃ আরও বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ....জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।[৩০]

উপরিউক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হলেও তাঁর সামগ্রিক জীবন ও কর্মের মধ্যে একাধিকবার সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। নিদারুণ জীবনসংগ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া এই পরিবারটির পরিশ্রমী সত্ত্বা ও আত্মমর্যাদাবোধ পাড়া-প্রতিবেশীদের ঈর্ষান্বিত করত। 'নমশূদ্র', 'ছোট জাত', 'অন্যের বাড়ির ঝি', 'ভিখারি' ইত্যাদি কথা প্রায়শই শুনতে হত তাদের। পাশেই ছিলেন জ্ঞাতিভাগারিদের পরিবার। তাদের অমানবিক আচরণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। পরীক্ষার সময় জোরে জোরে টেপ রেকর্ডার চালানো থেকে শুরু করে আরো নানা রকম। বলা বাহুল্য, এই সবই ছিল নিতান্ত হতদরিদ্র নীচু জাতের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা শিখে আত্মপ্রতিষ্ঠা হওয়ার স্বপ্নকে যেভাবেই হোক থামিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত। এমনই একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> সেদিন অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই আমরা কতটা হিংসাপরায়ণ হলে মানুষ একটি পরিবারকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করতে পারে সেটা ভেবেই শিহরিত হই আমরা।[৩১]

সামান্য পারিবারিক অশান্তির জেরে লেখিকার বাবা-মাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতেও এরা দ্বিধা করেননি। পরে যুক্তিসংগত কোনো কারণ না থাকায় পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু কেসটি কোর্টে ওঠে। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের এই দুটি মানুষের যেদিন হিয়ারিং থাকত সেইদিন লেখিকা ও তাঁর ভাই-বোনেদের চূড়ান্ত অসহায়তার বোধ ঘিরে ধরত।

> কয়েক বছর পর যখন বউদি তার ভুল বুঝতে পারে, তখন সে নিজে মায়ের কাছে স্বীকার করেছিল ও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, অশান্তি করা আমাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে, যাতে দাদা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে না পারে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে।[৩২]

আলোচ্য আত্মকথন জুড়ে যেমন আছে পারিপার্শ্বিক হিংসা-প্রতিহিংসার বৃত্তান্ত, তেমনই আছে সহযোদ্ধা, শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা - আত্মজনের মৃত্যু, আর্থিক সংকট, কর্মজীবনে দুর্নীতির জটিল যন্ত্রণাময় সময়েও যাদের ভালোবাসা আর নির্ভেজাল আশ্রয় লেখিকা তৃষ্ণা করাতীকে হেরে যেতে দেয়নি।

প্রান্তিকের পড়াশোনার অধিকার আর সেই অধিকার আদায়ের জন্য মরণপণ সংগ্রামের দলিল হিসাবে চুনী কোটালের জীবনযুদ্ধ ও তার পরিনতি যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানবিক চৈতন্যকে স্তব্ধ করে দিতে বাধ্য। আত্মঘাতী চুনী কোটাল তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত আত্মকথন *আমার জীবন*-এ বলেন—

> কোন লগ্নে কোন তিথিতে যে এই মাটির পৃথিবীতে এসেছিলাম জানি না। নিশ্চয়ই সেই মুহূর্ত ভাল ছিল না। আর কিসের প্রয়োজনে যে আমাদের মতো ছেলেমেয়েরা আসে তার উত্তর আর খুঁজে পাই না। ...আমরা কয়েকটা লোধা ছেলেমেয়ে তখন স্কুলে যেতাম। আমাদের স্কুলে আসাটা মাস্টারমশাই পছন্দ করতেন না। তিনি

> কখনো আমাদের পড়া ধরতেন না, পড়া নিয়ে গেলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধরতেন। কোথাও একটু ভুল হলে সেখানে ওদের ছেলেমেয়েদের গায়ে মাথায় হাত বুলাতেন যেখানে আমাদের ভুল হলে পেতাম অকথ্য বেতের ঘা। বলতেন ভদ্র হবি বলে স্কুলে এসেছিস আর পড়া করতে পারিস নি। মাস্টারমশাই কি করে বুঝবেন স্কুল থেকে ফিরে রাস্তার জাম, কুল কুড়িয়ে খেয়ে যাদের দিন যায় তাদের ব্যথা; কোনো কিছু বলে বোঝাতে চাইলে বলতেন এমন লোকের স্কুলে না আসাই উচিত। ফলে নীরবে আমাদের ঘা খেতে হতো। কত অশ্রুই যে ঝরে পড়েছে তার আজ কোন সাক্ষী নেই।[৩৩]

এর সঙ্গে ছিল সহপাঠীদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, বই ছিঁড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে নানাবিধ অত্যাচার। দরিদ্র, অসহায় এই প্রান্তিক ছেলেমেয়েরা প্রায়শই অনাহারে দিন কাটাত, ছিল না বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চিত সংস্থান। চুনী কোটাল লিখেছেন তাঁরা ছেঁড়া জামা পড়ে স্কুলে গেলে মাস্টারমশাই চাবুকের ডগা সেই ছেঁড়া জামাতে গলিয়ে টান দিতেন। স্পষ্টতই তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হতো যে তাঁদের আসল কাজ মাঠে গরু চরানো, বিদ্যা শিক্ষা নয়। দিনের পর দিন এই মানসিক, শারীরিক অত্যাচার সহ্য করে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই পড়াশোনার স্বপন ত্যাগ করত। চুনী কোটাল আর তাঁর ছোড়দা এই সমস্ত কিছু সহ্য করেও স্কুলে টিকে যায় অসহনীয় প্রতিকূলতার মধ্যে। মেধাবী চুনী অন্য অনেকের থেকে বেশি নাম্বার পেত বলে ক্লাসের অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে কারণে-অকারণে ‘কামিনের ঝি’, ‘কটাতীর ঝি’, ‘ধান ভাঙানির ঝি’ ইত্যাদি নামে ডাকত।

দীর্ঘদিন অনাহার, অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রবল মানসিক চাপের কারণে এক সময় শরীর বিদ্রোহ করে। শুরু হয় অসহ্য মাথা-চোখের যন্ত্রণা। পারিবারিক অসহযোগিতা

তাঁর লেখাপড়ার পথকে আরও কষ্টকর করে তুলেছিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আগে তাঁর দাদা ফর্ম ফিলাপের টাকা দিতে পারবে না জানিয়ে দিলে চুনী বহু কষ্টে সেই টাকা জোগার করে লেট-ফি'র লাস্ট ডেটে ফর্ম ফিল আপ করেন। দাদার অমানবিক ব্যবহার আর শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেই তাঁর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়।

পরবর্তীকালে লোধা-শবর জনগোষ্ঠীর প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ছিলেন চুনী কোটাল। ভর্তি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পারিপার্শ্বিক নানাজনের কাছ থেকে শুরু হয় আবার সেই একই হিংস্র নির্যাতন। বরং এবার আরও তীব্র মাত্রায়। ১৯৯২ সালে তাঁর আত্মহননের মধ্য দিয়ে যার শেষ হয়।

উল্লেখ্য, কায়িক শ্রমে নিয়োজিত যে গোষ্ঠীগুলি হাজার হাজার বছর ধরে বৈষম্যের কারণে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে রয়েছে, যারা ন্যূনতম নাগরিক অধিকার ভোগ করে না এবং যারা রাষ্ট্রীয় হিংসা বা রাষ্ট্রের মদতে উচ্চবর্ণের হিংসার সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কোনো ভূমিকাই নেই কারণ সমগ্র আমলাতন্ত্র ও বিচারবিভাগ উচ্চবর্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা বা পেশাগত বৈচিত্র্যের বিকল্পগুলি কম-বেশি রুদ্ধই। এই অবস্থার মধ্যেই কৃষক ও হস্তশিল্পী ও অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য এবং শ্রম-শক্তি অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। ফলস্বরূপ আরও দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যায় তারা। আজ অবধি একজন মাত্র মুসহর রমণী 'সংসদীয় ব্যবস্থা' পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর নাম ভগবতী দেবী। ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার অনুপ্রেরণা

তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। পরে তিনি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জেতেন এবং লোকসভার সদস্য হন। 'দেশকাল সোসাইটি' প্রকাশিত *অ্যাসটিং ভয়েসেজ* সংগ্রহ থেকে ভগবতীদেবীর বক্তৃতা 'যে সমাজের মাথা নীচে পা ওপরে' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। বক্তব্যের শুরুই হচ্ছে মজুরির প্রশ্নে—

> জমিদাররা আমাদের যেসব গ্রামে থাকতে দিয়েছিলেন, সেই গ্রামগুলি ছেড়ে আমাদের পালিয়ে আসার কারণ কী? পারিশ্রমিকের কথা তুলবেন, সাথে সাথে তাঁদের উত্তর 'এত সাহস যে পারিশ্রমিক চাস?' তাঁরা আমাদের পারিশ্রমিক দেবেন না, আমাদের মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে যাবেন আর আমরা কিছুই বলব না, এটাই তাঁদের প্রত্যাশা ছিল। আমাদের কাছে 'সম্মান' শব্দটি কোন অর্থ বহন করে? সমাজ কি কোন দিনই আমাদের বাঁচার অধিকার দেবে? বা... সমাজ কি কোনদিনই আমাদের অর্থাৎ আদিবাসী, হরিজন, মুসহরদের নিজস্ব বাসভূমি দেবে? ধান রোয়া খুব দূরহ কাজ। কেবল মুসহর জাতির মানুষেরই এই ক্ষমতাগুলি আছে — ধানের বীজ কেনা, তার বাড় নজরে রাখা, ফসল ফলানো, সেই ফসলকে গোলায় নিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে খড় থেকে ধান আলাদা করা এবং সর্বশেষে তা কৃষকের ঘরে নিয়ে আসা। একজন মুসহরই এই কাজগুলি করতে সক্ষম। সমাজ দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার মাথা নীচে আর পা ওপরে, এই কথা যদি বলি, বেঁচে থাকার অধিকারই পেলাম না, তবু কি সমাজের জন্য সব কিছু করেই চলব?[৩৪]

ভগবতী দেবীর কথার এই আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ব্যতিক্রমী কিছু নয়। দলিত ভারতবর্ষ যখন কথা বলবে তখন এইভাবেই কথা বলবে। চুনী কোটাল তাঁর *আমার জীবন* শেষ করেছিলেন এই বলে যে—

> বর্তমানে আমি বেকার। এত কষ্ট করে পড়েও আজ পর্যন্ত কোন একটা লাইন করতে পারলাম না। এইরকম কষ্টের মধ্যেও কত টাকার যে পোস্টাল অর্ডার আর রেজিস্ট্রি খরচ করেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শুধু শুনেই আসছি। কাস্ট ট্রাইবের অনেক সিট। সেই সিটে কারা কাজ করে জানি না। এই আমার জীবন।[৩৫]

যে জীবন শেষমেশ পরিণতি লাভ করে আত্মহননে। যার মৃত্যুতে জন্ম নেয় 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা' ১৯৯২ সালে, সভাপতি জগবন্ধু বিশ্বাস ও অমর বিশ্বাস।

এই প্রেক্ষাপটেই উঠে আসবে নেহেরু সরকারের আমলে কালেলকর কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী না করা, সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আদালতের রায়, ভূমি সংস্কার আইনকে কার্যকরী না করার প্রচেষ্টা, দলিত ও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া অত্যাচারের শত শত ঘটনা। নেলি, মালিয়ানা ও ভাগলপুরের মুসলমান্দের গণনিধন, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সব শেষে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টারদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের কলম দ্বারা বিদ্বেষ ছড়ানো, মণ্ডল কমিশনের বিরোধী বিদ্বেষের হিংস্রতা, নগ্নতার মাত্রা বুঝতে গেলে বুঝতে হবে যে, মণ্ডল কমিশন যে সুপারিশ করে তা কেবল ওবিসিদের জন্য কয়েকটি চাকরি নয়, বরং তা হচ্ছে যে অবস্থায় কৃষক ও হস্তশিল্পী গোষ্ঠীগুলি নিজের উৎপন্ন দ্রব্য ও শ্রমশক্তি বিক্রয় করে সেই বিনিময় হারের একটা পুনর্বিন্যাস। নিপীড়িত পরিচিতির আত্মমর্যাদার আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমজীবীর আন্দোলনের যৌথতার প্রসঙ্গটি এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যৌথতা ছাড়া আর কোণও পথ নেই কারণ ভারতবর্ষে এই সমস্ত পরিচিতিভিত্তিক নিপীড়ন আসলে শ্রেণি শোষণের মূল হাতিয়ার। যে অক্টোপাসের কবলে ভারতীয় সমাজ বন্দি রয়েছে তার মাথাটা যদি বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি হয় তাহলে তার হাতগুলি দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী বা নারীর উপর একেকটি পরিচিতি ভিত্তিক শোষণ ও নিপীড়ন।

মৃণ্ময় প্রামাণিক ও আশিস হীরা সম্পাদিত *ব্রাত্য নারীর আত্মকথা,* বইটিতে কতিপয় বর্ণরিক্ত নারীর ভাঙা-গড়ার কাহিনি উঠে এসেছে তাঁদের নিজস্ব বয়ানে। অনেকেই প্রথমবার লিখছেন, কেউ কেউ নিয়মিত লেখার অভ্যাসের মধ্যে না থাকার কারণে তাঁদের কথা তাঁদের নিকটজন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে অনুলিখন করেছে। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে মূলত তাঁদের শিক্ষাচিন্তার অংশটুকু গুরুত্ব পেলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তাঁদের এই অকল্পনীয় সংগ্রাম আলাদা ভাবে আলোচনার জায়গা রাখে। 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' শীর্ষক আত্মকথাটি বৃদ্ধা বাদলি হালদারের, কৈবর্তপাড়ার বাদলি বলেছেন,

> আমারও তো ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে ওপারের গন্ধ মেখে আসি। স্কুলে গিয়ে সবার সামনে বসি। মাস্টারমশাইকে অবাক করে গিয়ে শুভঙ্করীর অঙ্ক কষি, দাদার হাত থেকে স্লেট-পেনসিল কেড়ে অ-আ লিখি। রবি ঠাকুরকে সিংহাসনে বসায়, কি যেন লাইনদুটো – জল পড়ে পাতা নড়ে। আমারও তো দুচোখ বেয়ে জল পড়ে, আমারও তো মনের প্রত্যেকটি পাতা নড়ে। বড় আফশোস হয় – কেন যে মেয়ে হলাম।[৩৬]

চোখের পাতায় এমন সব স্বপ্ন নিয়েই যথা নিয়মে অল্প বয়সে দোজবরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় বাদলির। একের পর এক সন্তান, সঙ্গে বাড়তে থাকা দারিদ্র। বাদলি বলেন,

> দিন কাটতে লাগল খেয়ে না খেয়ে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় এতেই আমার আনন্দ — তা হোক না খালি পেটে, হোক না খালি পায়ে, ছেঁড়া জামায়, পেটে শিক্ষা পড়লে একদিন ওসব জুটে যাবে।[৩৭]

'মৎস্যকর্তনকারী এক শ্রমজীবী নারীর আখ্যান' শীর্ষক লেখায় দেখি মধ্যমগ্রামের বসুনগর মাছবাজারের মাছ কাটে দীপালি বিশ্বাস। রাজনীতির তরজায় তাঁর স্বামী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর থেকে এই পেশা তাঁর সঙ্গী। ক্লাস নাইনে বিয়ে হয়ে

যাওয়ার পর স্বামীর ইচ্ছায় অল্প কিছুদিন পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লেখিকা বলছেন—

> ১৯৭১ সালে জন্ম আমার। বাবা-মা বাংলাদেশী। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা-মা এখানে চলে আসে। কল্যাণী ক্যাম্পে আমার জন্ম ওই বছরই। কত গল্প আর বলব। ক্লাসে ফার্স্ট হত্তাম একসময়। কিন্তু কী হল জীবনে?[৩৮]

নিজেরা পড়াশোনা শিখতে না পারা এই প্রজন্মের দলিত নারীরা কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়নি। দীপালি বিশ্বাসের ছোট মেয়ে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ডি.এল.এড পড়ছে আর বড় মেয়ে যাদবপুরে পি.এইচ.ডি করে।

শ্যামনগরের বাসিন্দা পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের 'সাবিত্রী নাইয়ার সংসার' লিখেছেন নাতনি কুমকুম নাইয়া। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে স্বামী প্রফুল্ল নাইয়ার অকাল মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরে সাবিত্রী। কোনোদিন বিদ্যালয়ে না যাওয়া নিরক্ষর সাবিত্রী মুদি দোকান খুলে নিজের পাঁচ ছেলেকে মাধ্যমিক পাস করিয়ে শিক্ষিত করেছেন।

সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম চিমটা, গোসাবার আমতলি অঞ্চলের অন্তর্গত। যোগমায়া রায় লিখেছেন তাঁর জীবনের কথা 'নোনাপরী' শীর্ষক লেখায়। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা বলতে গিয়ে লেখেন—

> বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পরাধীন ভারতের ইংরেজদের অত্যাচারে নিজের অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার যাযাবর পূর্বপুরুষ ছোটনাগপুরের মালভূমি, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষিণ দিকে আসতে থাকে। মূল ভারত ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী আমরা বেদিয়া নামক উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে।[৩৯]

লেখিকার পূর্ব পদবী ছিল 'সর্দার'।

মতুয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখিকার সুন্দরবনের বাড়িতে সদলবলে ঠাকুরনগর থেকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর আসেন। সুন্দরবনে মতুয়াদের পরিদর্শন করতে। প্রমথরঞ্জন ঠাকুরের নির্দেশে লেখিকার ঠাকুরদা বাড়িতে একটি পাঠশালা খুলে তাতে একজন শিক্ষক নিয়োগ করেন। লেখিকার বয়ান থেকেই জানতে পারি—

> শুধু বাবা-জেঠু নয় প্রতিবেশী সব বাচ্চারা পড়াশোনা করতো। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বাড়ির মেয়েরাও লেখাপড়া শুরু করে। যেখানে মেয়েদের ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো সেখানে আমার পিসিরা ক্লাস এইট-নাইন অবধি পড়েছে।[৪০]

লেখিকা তাঁর ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে—

> কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতো কটা বন্ধু হল তোমার। আমি বলতাম অনেক বন্ধু। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী। তাদের লেখনী হয়তো ওই ছোট বয়সে বুঝতাম না কিন্তু পড়ে যেতাম। যতো বড় হতে থাকি ওই বইগুলো আবার নতুন করে আমার কাছে নতুন মাত্রায় ধরা দিতে থাকে।[৪১]

লেখিকার জীবনে গুরুচাঁদ ঠাকুরের গভীর অনুপ্রেরণা ছিল।

উজ্জ্বলী সম্মাদারের কথাকে সাক্ষাৎকারের আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন অমিত কুমার বিশ্বাস। লেখাটির শিরোনাম '১৯৭১ : টানা সাতদিন হেঁটে হেঁটে ইণ্ডিয়ায় পা'। নমঃশূদ্র পরিবারের উজ্জলীর আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার ঘাঘর থানায়। ১৯৭১ সালের উত্তাল সময়ে সেই যে দেশছাড়া হন তাঁরা তারপর থেকে চলতে থাকে ক্রমাগত আশ্রয়ের সন্ধানে মর্মন্তুদ লড়াই ওই উদ্বাস্তু পরিবারের। আর এই ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি স্বাবলম্বী করে তুলেছেন তাঁর ছেলেকে।

আর এক উদ্বাস্তু প্রমীলা ঢালী হালদার লিখেছেন তাঁর কথা 'আমি নাগরিত্বহীন এক নাগরিক' শীর্ষক লেখায়। পাঠশালায় পড়তে পড়তেই যাঁর জীবনে হানা দেয় দেশভাগের অস্থির সময়, শেষ হয়ে যায় লেখাপড়ার স্বপ্ন।

স্বস্তি সরকার ভৌমিক লিখেছেন 'ইন্দুমতীর জীবনসংগ্রাম'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর থানার গুরুল্যাপুর গ্রামের পৌন্ড্র পরিবারের অবস্থাপন্ন চাষী মাখললাল নস্করের প্রথম আদরের সন্তান ইন্দুর পাকে চক্রে বিয়ে হয় স্বার্থপর, অকর্মন্য অরুণবাবুর সঙ্গে। নিরুপায় ইন্দুমতী নিজেই সংসারের ভার কাঁধে তুলে নেন, দু-মাসের সন্তানকে ছোট ছোট মেয়ের জিম্মায় রেখে মাঠে দিনমজুরির কাজ শুরু করেন সংসার চালানোর জন্য। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বলতেন,

> সময় থাকতে নিজের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরো না। ভালো করে পড়াশোনা কর। আমাদের জায়গা নেই, জমি নেই, চাল নেই, চুলো নেই। আমার মতো যাতে তোমাদের সারা জীবন লোকের মাঠে ঘাটে জীবন কাটাতে না হয় তার জন্য খুব ভালো করে পড়াশোনা কর। এমন ভালো করে পড় যে সবাই চাকরি করতে পারো।[৪২]

বর্তমানে আশি ছুঁই ছুঁই ইন্দুমতীর বড়ো মেয়ে নার্স, মেজো মেয়ে ডাক্তার, সেজো মেয়ে আশাকর্মী, ন' মেয়ে হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা, নসানো মেয়ে আশাকর্মী, বড় ছেলে হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক, ছোট ছেলে পুলিশ, ছোট মেয়ে নার্স।

সোনাগাছিতে বিক্রি হয়ে যাওয়া পদ্মা গুহ তাঁর 'আমার কথা'য় বলেছেন তাঁর মা চাইতেন তিনি যেন লেখাপড়া না ছাড়েন, কিন্তু তাঁর লেখাপড়া ভালো লাগতো না।

ভালো লাগতো পাড়ার দিলুদাকে। তাঁর লেখাটি শেষ হয় এই বলে— 'তেমন লেখাপড়া শিখিনি বটে কিন্ততু জীবন আমায় শিখিয়েছে অনেক কিছু।'[৪৩]

রবিপ্রভা সরকার তাঁর 'আমার জীবনসংগ্রাম'-এ জানাচ্ছেন গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার এক কৃষি পরিবারের গল্প। লেখিকার পিতা ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, মায়ের মামাবাড়ি ছিল ওড়াকান্দিতে ঠাকুরবাড়ির অদূরে। শিক্ষাদরদী গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় খ্রিস্টধর্মপ্রচারক ড. সি. এস. মীড সাহেব প্রতিষ্ঠিত মিশনের দিবা স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণি পাশ করেছিলেন লেখিকার মা ও হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর শৈলজা মাসি। লেখিকার বাবা ছিলেন ফরিদপুরের সুতালিয়া গ্রামের পাশের গ্রাম বনমালীপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিয়ের পর লেখিকা ও তাঁর স্বামী লেখক বাদল সরকার উভয়ে মিলেই পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। পরবর্তী জীবনে ওড়াকান্দিকে কেন্দ্র করে প্রথম মতুয়া সাহিত্য প্রকাশ হয় লেখিকা রবিপ্রভা সরকারের বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ মাঠে মতুয়া মহাধর্ম সম্মেলনের স্মরণিকায়। প্রবন্ধের শিরোনাম 'নারী শিক্ষা আন্দোলনে গুরুচাঁদ এবং ওড়াকান্দি ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা'। বর্তমানে ওই দম্পতি নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন।

অঞ্জনা রানী হালদার লিখছেন তাঁর জীবনের কথা 'শালুক পাখি নমস্কার' শীর্ষক লেখায়। ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যায় তাঁর।

এরপর লেখাপড়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন,

> শ্বশুরবাড়ি থেকে কখনও আমাকে পড়াশোনা করতে বারণ করেনি। স্বামীও না করেনি, ঠিকই। কিন্তু সংসারের সব কাজও সমানে করতে হবে। আমি আর আমার ননদ একসঙ্গে আমার ছোট দেওরের কাছে অঙ্কটা দেখিয়ে নিতাম।[৪৪]

গর্ভবতী অবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন লেখিকা। এর পরে অনেক লড়াই করে আইসিডিএস-এর চাকরি জোগাড় করেন তিনি।

মুসলিম ধর্মাবলম্বী মৌমিতা আলম লিখেছেন 'একটি সাইকেলের জীবনবৃত্তান্ত'। নব্বইয়ের দশকে বড় হয়ে ওঠা হলদিবাড়ির মৌমিতা দেখেছে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, দেখেছে ৯/১১-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এক মুসলিম স্যারের কাছে পড়তে যাওয়ার জন্য সহপাঠীর উক্তি ছিল – 'লাদেনের কাছে পড়তে যাচ্ছিস', লেখাটির শেষ অংশে লেখিকা জানান, তাঁর প্রথম বই *The Music of the Dark*-এর জন্মকথা। বলেন—

> ঘুমহীন, নিদ্রাহীন, আরামহীন চোখে না বলতে পারার কষ্ট নিয়ে লিখে চলি সময়কে। আমার, আমাদের আজকের বাস্তবতাকে। রোজ জিতি, রোজ হারি। তবুও আঁকড়ে ধরি কলমকে। যে কলমের খোঁচায় এক ভূখণ্ড কয়েদখানা হয়ে যায়, বিশ্বাস রাখি সেই কলম ভোরের বিউগেল হবে একদিন।[৪৫]

উমারানী সর্দার তাঁর কথা বলেছেন, 'রাতের জোনাকি' নাম দিয়ে। নমঃশূদ্র পরিবারের এই মেয়ের পিতা ছিলেন মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস, পেশায় শিক্ষক। তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরকারি উদ্যোগে তপশিলী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন। সরকারি কর্মসূচির অংশ হিসাবে এই মহেন্দ্রলাল বিশ্বাস ও তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কর্ণধার শ্রী তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তপশিলি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখিকার দাদা

বিভূতিভূষণ বিশ্বাস ছিলেন সাহিত্য ও শিক্ষা অনুরাগী, পরে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরি পান। লেখিকার স্বপ্ন ছিল বি.এ পাস করে শিক্ষিকা হওয়ার। কিন্তু তিনি লিখছেন—

> মেয়েদের লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হয়ে সংসার শুরু করার – স্বপ্নেরর সঙ্গে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা বুঝতে থাকলাম।[৪৬]

তিনি ১৯৮৫ সাল নাগাদ নিজেরর স্বপ্ন পূরণ করে সিন্তরণী সাবিত্রী স্কুলে শিক্ষিকা পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি তাঁর উপলব্ধি লিখতে বসে বলেন—

> মেয়েদের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই বলি – নিজের মধ্যে শৈশবের শিক্ষা সংসারের চাপে সুপ্ত থাকলেও শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করো – এই শিক্ষা সংসারের সঙ্গে সমাজকেও এগিয়ে দেবে।[৪৭]

লেখিকার সন্তানেরাও নিজ ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও উচ্চপদে কর্মরত।

শেফালি কর্মকার তাঁর কথা বলেছেন, 'বর্ডারের চড়ুই' শিরোনামে। তিনি জানান, কিভাবে লেখাপড়া না জানার কারণে তাঁর নিরক্ষর বাবাকে টিপ সই দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নেয় তাঁরই কাকারা। তাঁরই ফলে শেষ হয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

সাহিত্যিক ইলা দাস তাঁর 'জীবনচরিত' শিরোনামের লেখায় জানান সমস্ত অবমাননাকে পিছনে ফেলে তাঁর সাহিত্য রচনার ইতিবৃত্ত। ইতিমধ্যেই কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ, ছড়াগ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ৫-টির অধিক বই, পেয়েছেন বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা থেকে স্মারক, সম্মাননা। প্রকাশ করে চলেছেন ২০০৬ সাল থেকে 'শ্রীক্ষণ' নামের এক সাহিত্য পত্রিকা সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় বিনা বিজ্ঞাপনে ও বিনা অনুদানে।

পূজা বাল্মিকী লিখেছেন, ‘আমি মহাকবির বংশধর, দলন আমার নিত্যসঙ্গী’। পূজা গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে বি.কম পাশ করে ইউ.পি.এস.সি সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়াশোনা করছেন। আর এই শিক্ষাগত আত্মবিশ্বাসই তাঁকে সাহস জুগিয়েছে, প্রবল প্রতিবাদী করে তুলেছে। যখন তাঁরই এক শিক্ষক অবলীলায় হোয়াটস্অ্যাপ চ্যাটে অপমান করে তাঁকে বলে যে সে নাকি ‘perfect example of cheap SC mentality’ পূজা পুলিশ স্টেশনে যেতে পিছপা হয়নি, কারণ তাঁর শিক্ষা তাঁকে ইতিমধ্যে জানিয়েছে এই ধরনের আচরণকে Schedule Caste and Schedule Tribe Atrocities Act, 1947 অনুযায়ী criminal offence–এর তকমা দেওয়া হয়েছে।

‘বীণাপানির জীবনকথা’ শিরোনামে বীণাপানি সরকার জানাচ্ছেন তাঁর শিক্ষার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর একে একে পাঁচটি ভাই হয় বীণার। মা, বাবা, ভাই-বোন মিলে আট জনের সংসারে অভাব আর ক্ষুধা ছিল নিত্যসঙ্গী। বি.কম পাশ করে প্রথম বর্ষে ভর্তির পর পরই বিয়ে হয়ে যায় বীণার। শ্বশুরবাড়ির শারীরিক অত্যাচার চরমে উঠলে তিনি ফিরে বাপের বাড়িতে এসে পুনরায় বি.এ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে কলকাতার এক প্রাইভেট নার্সিং হোমে কাজ খুঁজে নেন। পরবর্তী জীবনে তিনি স্কুলের স্থায়ী শিক্ষিকার পদে আসীন হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন, স্বামীর ঘরের কাছ থেকে পাওয়া অপমান, অত্যাচার আর লাঞ্ছনার দিনেও তিনি নিজের সাহস হারাননি, গড়ে তুলেছেন নিজের স্বাবলম্বী পরিচয়। তিনি নিজেকে বলেন ‘মানুষ গড়ার কারিগর’।

সম্পূর্ণ অনামী এই সব দলিত মহিলাদেরর শিক্ষার জন্য লড়াই, তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কণ্ঠস্বরকে দৃঢ় করেছে বহুলাংশে। আরও বেশ কিছু লড়াকু দলিত নারীর আত্মজীবনী আলোচনার স্বল্প পরিসরের কারণে অনুল্লেখিত থেকে গেল। একটি প্রচলিত মতানুসারে খনার প্রজ্ঞার নিকট তাঁর শ্বশুর বরাহ পর্যুদস্ত হওয়ার ঈর্ষায় তিনি তাঁর পুত্র খনার স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খনার জিহ্বা কর্তন করতে। নারীকে অজ্ঞান ও নিরক্ষর রাখার এই শোষণযন্ত্রের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রান্তিক নারীদের নিজের কথা, উত্তম পুরুষের বয়ানে, জ্ঞানের কর্তৃত্ব নির্মাণের পথে একটি নিতান্ত জরুরি ও সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ।

প্রায় পাঁচ লক্ষ শব্দের উপন্যাস *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত*-র অন্ত্যপর্বের শেষ অনুচ্ছেদে লেখক দেবেশ রায় লিখেছেন-

> ভারতবর্ষে যারা কালি কলম ব্যবহার জানে, আমাদের মত, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে।[৪৮]

আর এইভাবেই বারবার চাপা পড়ে যায় প্রান্তিক মেয়েদের কণ্ঠস্বর কারণ তারা মুখ খুললেই জন্ম নেবে অনতিক্রম্য এক অস্বস্তির আবহাওয়া। তবুও এর মধ্যেই মাঝে মাঝে জন্ম নেয় স্ফুলিঙ্গরা, বহুস্বর চিৎকার করে বলে-

> আমি আমার খুশির আমেজকে
> বীজের মতো রোপণ করেছি
> মাটির নীচে
> রোপণ করেছি বলেই
> সেই কবে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে

প্রতিকারের জন্য প্রস্তুতি
...
হয়তো বা এই একটি দুটি বীজ থেকে
কথার জন্ম হতে পারে
কিন্তু সেই বীজ থেকে
একদিন অংকুরিত হবে
পিপুল গাছ।

(মীনা গজভিয়ের লেখা 'পিপুল গাছ', সূর্যের উত্তর পুরুষ (অনুবাদ ও সম্পাদনা – কমলেশ সেন)

তথ্যসূত্র:

---

১. বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ২৭

২. চক্রবর্তী, ঈশিতা, 'অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর: আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪), *নারীবিশ্ব,* পুলক চন্দ সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৩৫

৩. Kamble, Baby. *The Prison We Broke*. Orient Blackswan, 2009, p. 24.

8. Ibid, p.9

৫. কাম্বলে, শান্তাবাই, 'নজার স্কুলে পড়া আর না-পড়ার কথা', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৩৫

৬. পাওড়ে, কুমুদ, 'আমার সংস্কৃত পড়ার গল্প', *দলিত* (দেবেশ রায় সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ২৪৫

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬

৮. Bama. *Karukku*. Oxford University Press, 1992, p. 62.

৯. জানু, সি কে, *বসত*, জয়া মিত্র অনুবাদ, লোকনদী প্রকাশনা, আসানসোল, ২০১৬, পৃ. ৪০

১০. Pawar, Urmila. *The Weave of My Life*, Granthali, 2008, p. 43.

১১. Shaikh, Malika Amar. *I Want to Destroy Myself: A Memoir*, Speaking Tiger, 2016.

১২. Ibid, 113

১৩. Brueck, Laura. 'The Emerging Complexity of Dalit Consciousness', *Himal*. 2010, p. 56-57.

১৪. Raj, Shilpa. *The Elephant Chaser's Draughter*, Rupa Publications, 2017, p. 62.

১৫. Viramma. *Viramma: Life of an untouchable*. Translated by Will Hobson, Verso, 1997, p. 193.

১৬. Gidla, Sujata. *Ants among Elephnats: An untouchable Family and the Making of Modern India*. Harper Collins, New Delhi, 2017, p. 30.

১৭. Ibid, p. 45.

১৮. চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর, *আমি কেন চাঁড়াল লিখি*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৩

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২০. হালদার, বেবি, *আলো আঁধারি*, রোশনাই, কাঁচরাপাড়া, ২০০৭, পৃ. ৩৯

২১. হালদার, লিলি, *ভাঙা বেড়ার পাঁচালি*, পরম্পরা প্রকাশনী, ২০১৯, পৃ. ২৯

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২৩. সেন, অমর্ত্য, 'ভারতের শ্রেণিবিভাগের তাৎপর্য', *তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ* পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৮৯

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

২৫. মুর্ম্মু, মেরুনা, 'ভারত মাতার ইতর সন্তান', *নীড়,* কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল সম্পাদিত, অষ্টাদশ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ২০শে আগস্ট, ২০১৭, পৃ. ৩১

২৬. করাতি, তৃষ্ণা, *দলিত নারীর আত্মকথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ৩১

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

৩০. বিবেকানন্দ, স্বামী, 'ভারতের ভবিষ্যৎ', *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন প্রকাশন, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৮

৩১. করাতি, তৃষ্ণা, *দলিত নারীর আত্মকথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ১৭৫

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৩৩. কোটাল, চুনী, 'আমার জীবন', *দলিত সাহিত্য,* ড. চিত্ত মণ্ডল এবং ড. প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৪৮০

৩৪. দেবী, ভগবতী, 'যে সমাজের মাথা নীচে পা ওপরে', *দলিত ভারত,* অনুষ্টুপ, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৪, কলকাতা, ২০২৪, পৃ. ৭০২

৩৫. কোটাল, চুনী, 'আমার জীবন', *দলিত সাহিত্য,* ড. চিত্ত মণ্ডল এবং ড. প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৪৮০

৩৬. হীরা, আশিস ও প্রামাণিক, মৃন্ময় (সম্পাদিত), *ব্রাত্যনারীর আত্মকথা,* গাঙচিল, জানুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৬

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

৪৮. রায়, দেবেশ, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৫, পৃ. ৫০৪

সপ্তম অধ্যায়

উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী: একটি পর্যালোচনা

সপ্তম অধ্যায়

উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী: একটি পর্যালোচনা

১৭৫৭-র ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধ পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক পরাধীনতার সূচনা হয়েছিল, ১৯০ বছর পর ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রকে বিভাজিত করে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তার কাগজে কলমে মুক্তি ঘটে।

একটি রাষ্ট্র ইন্ডিয়া বা ভারত, অপরটি ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখণ্ড যার নাম পাকিস্তান। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আসাম থেকে সিলেটকে বাদ দিয়ে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানও পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়, নয়া নাম হয় বাংলাদেশ। দেশভাগ শুধুমাত্র একটি মানচিত্রকে ছিঁড়ে ফেলেনি, সমস্ত প্রাণকেই তার পরিচিত শেকড় থেকে করেছে অপরিচিত। দিয়েছে এক নতুন জুয়ার গুটি; হয় নতুন দেশে নতুন পরিচয় অথবা পুরনো ঠিকানার খোঁজে দেশছাড়া। ফলাফল?, বাস্তুহারা থেকে বাস্তু খোঁজের বা গঠনের দিকে যাত্রা।

বলা বাহুল্য, ভারত-ভাগ আর তার পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুহারা হয়ে যাওয়া কেবল একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়; একই সঙ্গে অতীত ইতিহাসের একটি অধ্যায় হিসাবেও কেবলমাত্র এই ঘটনাকে দেখলে এর যথাযথ মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে

যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নৃতত্ত্বে 'বাস্তুহারা'রা একটি স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী হয়ে উঠেছেন। জার্মানি-পোল্যাণ্ড-প্যালেস্তাইন, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ আর সাম্প্রতিক বসনিয়া-সার্বিয়া, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের ফলে গত পঞ্চাশ বছরে উদ্বাস্তু হয়েছে কোটি কোটি নরনারী। এই ভূ-গোলকের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে আছেন; কিন্তু তাঁরা আসলে একটি মানবগোষ্ঠী, যাঁরা উৎপাটিত হয়েছেন তাঁদের স্বভূমি থেকে, অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। এরা এমন এক গোষ্ঠী, যেখানে শিশুরা চোখের সামনে নিহত হতে দেখেছে পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুকে; ধর্ষিতা হতে দেখছে মা-বোনকে। এই শিশুদের স্মৃতিতে আছে রক্তবর্ণ আকাশ, সর্বগ্রাসী আগুন আর পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির দগ্ধাবশেষ। অভিজ্ঞতায় আছে আশ্রয়ের খোঁজে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার দুঃসহ ক্লেশ, প্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে আসার অশেষ যন্ত্রণা। আজ শুধুমাত্র দেশভাগ জনিত অথবা যুদ্ধজনিত উদ্বাসনই নয়, বরং বলপূর্ব উদ্বাসন, জাতিদাঙ্গা, রাজনৈতিক যুদ্ধ, রাষ্ট্রীয় সংকটের ফলে অগণিত উদ্বাস্তু নিজভূমি ছেড়ে নিরাশ্রয়ী জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের কারণে শরণার্থীদের সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ৫০ লক্ষ। আফগান শরণার্থী প্রায় ৩০ লক্ষ। তার উপরে আছে কয়েক দশকের গৃহযুদ্ধে অস্থির সোমালিয়ার উদ্বাস্তুরা। গভীর সংকটে আছে আমাদেরই মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলা মায়ানমারের বাঙ্গালি রোহিঙ্গারা। কয়েক'শ বছর আগে চট্টগ্রাম বা সিলেট বা নোয়াখালি থেকে তখনকার আরাকানে চলে যাওয়া বাঙালিরা আজ মায়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ বা ভারত দুই দেশের কাছেই অবাঞ্ছিত।

‘রিফিউজি’ শব্দটির দুটি বাংলা প্রতিশব্দ আছে। একটি হল শরণার্থী, যার আক্ষরিক অর্থ হল এমন কোন ব্যক্তি যিনি কোন ঊর্ধ্বতন শক্তির (তিনি ঈশ্বরও হতে পারেন) শরণ নিয়েছেন, অর্থাৎ আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন। অন্য প্রতিশব্দটি হল উদ্বাস্তু, যার অর্থ গৃহহীন। বৈদিক ঐতিহ্যে সংস্কৃত ‘বাস্তু’ (বাড়ি) শব্দটির একটি তাৎপর্য আছে। বাংলায় এই শব্দটিকে প্রায়ই ভিটা বা ভিটে শব্দের সঙ্গে জুড়ে উল্লেখ করা হয়, এই ভিটার সঙ্গে আবার সংস্কৃত ভিত্তি (যার অর্থ ভিত) শব্দের যোগ আছে। এই ভিত-এর সঙ্গে জুড়ে আছে পুরুষানুক্রমিক বংশধারার ইতিহাস। অর্থ অনুসন্ধানে পাই ‘উদ্বাস্তু’ শব্দটির উপসর্গ যোগে উৎখাত হওয়ার ইতিহাস। অর্থাৎ উদ্বাস্তু তিনিই, যাঁকে তাঁর ভিটে থেকে, ভিত্তিভূমি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৮২১ সালে যখন ভারত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন সেই সময়ই এক ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন এদেশে রাজনৈতিক অসামরিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ‘*devide et tempera*’ নীতি অনুসরণ করা উচিত। এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তদানীন্তন বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোন রাজকর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, রোমানদের মতোই ইংরেজদের ভারতবর্ষে ভেদনীতি অনুসরণ করেই দেশ শাসন করা উচিত। শুধু আজকে নয় বরং বহুদিন থেকেই এমন অগণিত নিরাশ্রয় মানুষদের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক আগ্রাসন,হানাহানি – দাঙ্গা, রাজনৈতিক সংঘর্ষ এক বিপুল পরিমাণ উদবাস্তু স্রোতের সৃষ্টি করেছে। বাঁচার তাগিদে, জীবনকে বিপন্ন করে, সেইসব মানুষ পাড়ি দিয়েছে দেশান্তরে। সর্বস্ব হারিয়ে তারা ভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে সামান্য আশ্রয় ভিক্ষা করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে 'উদ্বাস্তু চর্চার' ইতিহাস :

১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদবাস্তু সংকটকে কেন্দ্র করে, বিশ্বের সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের জন্য গঠিত হয় UNHCR বা United Nations High Commission for Refugees নামক সংগঠন। ১৯৫১ – এর রিফিউজি কনভেনশনে 'উদ্বাস্তু ' মানুষের সংজ্ঞা নিরূপণ করার একটা প্রচেষ্টা ছিল। বলা বাহুল্য, একটি নির্দিষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতিতে নির্ণীত এই সংজ্ঞা কখনোই সার্বিক রিফিউজি বা বাস্তুচ্যুত, স্থানচ্যুত মানুষের সামগ্রিকতাকে তুলে ধরতে পারেনি। তবুও বহুদিন পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই রিফিউজি মানুষের সাধারণ নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অর্থনৈতিক কারণে সদিচ্ছায় অভিবাসিত মানুষদেরকে এতে স্থান দেওয়া হয়নি। ১৪৬টি দেশের অংশগ্রহণে পরবর্তী কালে ১৯৬৭ সালের ৪ অক্টোবর Protocol Relating to the Status of Refugees – এর মাধ্যমে ১৯৫১ সালের কনভেনশন কৃত অস্থায়ী ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালের ১৯-২২ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কার্টেজনা ঘোষনা বা Cartagena Deceleration –কৃত পরিবর্ধিত 'উদ্বাস্তু' সংজ্ঞাটিতে উদ্বাস্তুরা কিভাবে নানান দ্বন্দ্বের কারণে, নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, তা দেখানো হয়েছে।

প্রায় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিদ্যায়তনিক ভাবে চর্চা শুরু হয়ে যায় সমাজতাত্ত্বিক মানবতাবাদী গবেষকদের হাত ধরে। রিফিউজি স্টাডিজ বা উদ্বান্ত চর্চা প্রথমদিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি তথা অর্থনীতির সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এটি নিজস্ব চর্চার একটি স্বতন্ত্র রুপ লাভ করে। পৃথিবীজুড়ে এখন রিফিউজি স্টাডিজ একটি বিশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়

হয়ে উঠেছে। ইউরোপে প্রথম Association for the study of the World Refugee Problem (AWR) গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্বাস্তু চর্চার সূত্রপাত হয়ে যায়। এরপর, একের পর এক সংস্থা এই চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এগুলির মতে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান হল- কানাডার ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে গঠিত হয় 'রিফিউজি ডকুমেন্টেশন প্রজেক্ট', যা পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে 'সেন্টার ফর রিফিউজি স্টাডিজ' এ পরিণত হয়। ১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয় 'রিফিউজি পলিসি গ্রুপ', ১৯৮৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তৈরি হয় 'রিফিউজি স্টাডিজ প্রোগ্রাম', যা ২০০০ সাল থেকে 'রিফিউজি স্টাডিজ সেন্টার' হয়ে যায়। ১৯৮৫-তে সুদানের ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল 'রিফিউজি স্টাডিজ প্রোগ্রাম', যাদের মুখপাত্র ছিল 'ওয়ার্ল্ড রিফিউজি সার্ভে' (USCR)। আফ্রিকাতে উদ্বান্ত চর্চা দেখা যায় ১৯৯২ তে কেনিয়ার মোই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর রিফিউজি স্টাডিজ'-এর মধ্যে দিয়ে। আবার উগান্ডার মাকেরিরি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস সেন্টার' (১৯৯৩) গড়ে ওঠার মাধ্যম, ১৯৯৫-এ তানজানিয়ার দার-উর-সালেম বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয় 'সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ ফোর্সড মাইগ্রেশন', এছাড়া ১৯৯৯ সালে UNSCO/UNITWIN নেটওয়ার্ক অক্সফোর্ড ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিফিউজি স্টাডিজ সেন্টার-কে একসঙ্গে কাজ করার লক্ষ্য স্থির করে দেয়। (মনন কুমার) আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু চর্চার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। উদ্বাস্তু মানুষের নীতি, অধিকার, আইন কানুন সবই উদ্বাস্তু গবেষণা ও কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু চর্চার তিনটি বড় দিক হলো-

১। দলবদ্ধভাবে উদ্বাসন বা Exodus Migration

২। বলপূর্বক উদ্বাসন বা Forced Migration

৩। আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা Internally displaced person

দলবদ্ধভাবে উদ্বাসন দেশভাগজনিত বা যুদ্ধ জনিত বা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হতে পারে, এছাড়াও জাতিদাঙ্গা, রাজনৈতিক দুর্বিপাক জনিত নানা কারণে যখন অগণিত মানুষকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়, তা হল বলপূর্বক উদ্বাসন। আবার কখনো বিভিন্ন কারণে, আন্তরাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ ভাবে, নিজের দেশের সীমানার মধ্যেই মানুষ স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে সেই মানুষদের বলা হয়- Internally displaced person (IDP) বা এই মানুষদেরও কেউ কেউ 'রিফিউজি' অভিধায় সামিল করতে চেয়েছেন। এমন ব্যক্তি নিজের দেশেই উদ্বাসিত হলেও, তারা শরণার্থীর আইনি সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

UNHCR অনুযায়ী ২০২১-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট বলপূর্বক উদ্বাসিত (Forcibly Displace) সংখ্যা প্রায় ৮৪ মিলিয়ন বা ৮.৪ কোটি। যার মধ্যে IDP মানুষের সংখ্যা ৪৮ মিলিয়ন বা ৪.৮ কোটি (IDMC, end-2020)। ২০০১ সাল থেকে UNHCR বিশ্বের প্রায় অন্যান্য ১০০ টি দেশ প্রতিবছর ২০ জুন দিনটিকে 'ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে' হিসাবে পালন করে আসছে। যুদ্ধ, সংঘর্ষ, জাতিদাঙ্গা, প্রান্তিক মানুষদের উপর নির্যাতন–নিপীড়নের কারণে সারা বিশ্ব প্রতি দুই সেকেন্ডে একজন করে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। এই বিপুল সংখ্যক শরাণার্থীদের প্রায় ৫১% এর বয়স ১৮ বছরের

নীচে। ২০১৭ তে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গারা উদ্বাসিত হয়ে, বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায়, কুতুপালং-এ এখনো পর্যন্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ উদ্বাস্তু ক্যাম্প গড়ে তুলেছে। প্রায় ৮০ লাখ উদ্বাসিত মানুষ আশ্রয় পেয়েছে কুতুপালং ক্যাম্পে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি উদ্বাসন হয়েছে সিরিয়াবাসীর, প্রায় ৬.৬ মিলিয়ন সিরিয়াবাসী বিশ্বের প্রায় ১২৬ টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষের মধ্যে লাখ লাখ মানুষ আজও রাষ্ট্রহীন। তাদের নিজস্ব কোন দেশের জাতীয়তা নেই; শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সেবা, কাজের সুযোগ ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার মৌলিক অধিকারগুলি থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। এই কারণেই উদ্বাস্তু অধিকারচর্চার মধ্য দিয়ে যে মানবাধিকারের স্বীকৃতি ঘটেছে, তাই হয়ে উঠেছে উদ্বাস্তু মানুষের নতুন পরিচয়ের প্রধান হাতিয়ার।[১]

১৯৪৭-এ দেশভাগের সাথে সাথেই ভারতীয় উপমহাদেশেও এক বিপুল গণউদ্বাসনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যাপক উদবাসনের চরিত্র ছিল যেমন জটিল তেমনিই বহুমাত্রিক। ঠিক কত সংখ্যক মানুষকে তখন উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল, পরিসংখ্যানে তার মাত্র একটি অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও ইতিহাসের অনুসন্ধানে এই পরিসংখ্যানগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখনকার রাজনীতি এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে অপাংক্তেয় বলে মনে করেছিল। সেই ভিটেহারা মানুষদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না; ইতিহাসের পাতায় চিরদিন তারা শুধুমাত্র সংখ্যা হয়েই থেকে গিয়েছে। ১৯৫১-এর সেনসাস অনুযায়ী, দেশভাগের তাৎক্ষণিক পরে, ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া মুসলমান উদ্বাস্তু সংখ্যা ৭.২২৬ মিলিয়ন আবার পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তু

সংখ্যা ছিল ৭.২৪৯ মিলিয়ন। এই তথ্যানুসারে প্রায় মোট ১৪.৫ মিলিয়ন মানুষ দেশভাগের পরে উদবাস্তু হয়েছিল।

বাংলায় বিপুল উদবাস্তু আগমনের সময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়ের *উদ্বাস্তু*, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর গবেষনামূলক অনুসন্ধান *প্রান্তিক মানব* ইত্যাদি গ্রন্থে বাঙালি উদ্বাস্তু মানুষদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য *উদ্বাস্তু* গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সময়ে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল মোট ২৬৬২৬০১।[২]

আবার প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর *প্রান্তিক মানব* বইতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন- "সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৫৮-র ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে ৪১.১৭ লক্ষ শরণার্থী আসে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসে ৩১.৪২ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থীদের অর্থনৈতিক পুর্নবাসনের জন্য মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ১৯৭৩ – এ শরনার্থী সংখ্যা ছিল ৫৮ লক্ষ।[৩]

জয়া চ্যাটার্জী তাঁর 'দেশভাগ ও দেশান্তরে গমন: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু, ১৯৪৬-৪৭' শীর্ষক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিসংখ্যানে দেখান,

> ১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় যায়। এই তিনটি জেলা হলো ২৪- পরগনা, কলকাতা ও নদীয়া। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে মোট ২০ লাখ ৯৯ হাজার উদ্বান্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। এরমধ্যে ১৩ লাখ ৮৭হাজার বা দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় এই তিনটি জেলায়।[৪]

যেখানে পাঞ্জাবে জনসংখ্যা ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৩৪৭ জন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ জন। পশ্চিমবাংলায় প্রতিনিয়ত উদ্বাস্তুদের ভিড় বেড়েই চলেছিল, বাসযোগ্য স্থান এর অভাবে স্থানীয় মানুষ ও আগত ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তে থাকে, শুরু হয় চিরকালীন ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্ব। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমনকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রেক্ষিতে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে-

১। প্রথম পর্যায়ঃ ১৯৬৪-১৯৪৯

২। দ্বিতীয় পর্যায়ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫০-১৯৫২

৩। তৃতীয় পর্যায়ঃ ১৫ অক্টোবর ১৯৫২-১৯৬০ (১৫ অক্টোবর ১৯৫২, পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়)

৪। চতুর্থ পর্যায়ঃ ১৯৬১-১৯৭০

এত পরিমান উদ্বাস্তু আগমনের পাশাপাশি, সমস্যা ছিল তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনা করা।

১৯৫০ সালে Bengal Rehabilitation Organisation এর হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ১৫ লক্ষ একর জমিতে পুনর্বাসন হতে পারে, তা কর্ষণযোগ্য। অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দেখলেন অসমে ১৭৩ লক্ষ একর, বিহারে ৬৫ লক্ষ একর, পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ একর জমি আছে যেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কৃষকদের পুনর্বাসিত করা যাবে। ১৯৫০-এ বাংলায় উদ্বাস্তু আগমনের দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই উদ্বাস্তু আশ্রয়শিবির গুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল।

প্রথম শ্রেণির শিবিরে পাঠানো হত যারা পুনর্বাসন এর উপযুক্ত সেইসব উদ্বাস্তু পরিবারকে, দ্বিতীয় শ্রেণির শিবিরে পাঠানো হতো সেইসব পরিবারকে যাদের অভিভাবক প্রধানত পঙ্গু বা বৃদ্ধ হওয়ায় পুনর্বাসনে অসমর্থ। আবার, তৃতীয় শ্রেণির শিবিরে থাকতো সেই সব পরিবার যেসব পরিবারের পুরুষ অভিভাবক নেই। বিধবা মা ও সন্তান নিয়ে গঠিত সেই পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের অযোগ্য মনে করা হতো।

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সমজাতীয় সম্প্রদায় ছিল না, এমনকি তাদের জনসংখ্যা সমানভাবে বিভাজিত ছিল না। পূর্ববঙ্গে তারা মূলত খুলনা, যশোর, উত্তর বরিশাল, দঃ ফরিদপুর, ঢাকা এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। হিন্দুদের মধ্যে অনেক বর্ণভেদ ছিল। সমগ্র পূর্ববঙ্গের ৪০ লাখের বেশি হিন্দু 'অনুন্নত' বা 'তপশিলি' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে নমঃশূদ্র, পোদ ও জালিয়া-কৈবর্তরা তাদের সাধারণ জীবিকা নির্বাহ করতো কৃষি, শ্রমিক ও মৎস্যজীবী হিসাবে। হিন্দুরা যখন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ভারতে এল, তখন প্রায় সমস্ত শ্রেণির মানুষই উদ্বাস্তু হয়েছিল। *প্রান্তিক মানব* গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে আসা প্রধানত এই তিন শ্রেণির উদ্বাস্তু মানুষের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণির মানুষরা মূলত উচ্চবিত্ত শ্রেণির এবং ভূমি অধিকারী, যাদের অধিকাংশেরই কলকাতায় বাড়ি ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা নিজেদের বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিতে পারত অথবা সরকারি ঋণের সাহায্যে বা নিজেদের অর্থে জমি-বাড়ি ব্যারাক দখল করতে সক্ষম ছিল, এরাই পরবর্তীতে জবর দখল কলোনি প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয় শ্রেণির মানুষ কৃষি কাজের সাথে যুক্ত, তারা মূলত ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ভূমিহীন নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষদের প্রথমে স্থান হয়েছিল- প্ল্যাটফর্ম, ভাঙ্গা মন্দির, মিলিটারিদের পরিতক্ত ছাউনি, রেলের জমি বা শহরের ফুটপাতে। সরকারি তরফে ক্যাম্পে আশ্রিত উদ্বাস্তু মানুষদেরই মূলত দণ্ডকারণ্য, আন্দামান, সুন্দরবনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয় আসাম এবং ত্রিপুরাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৫০ সালের মধ্যেই কলকাতায় চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলাতে সব মিলিয়ে প্রায় ১৪৯ টি জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে। এরপর শুরু হয় এক একটি কলোনির নিজস্ব সংগ্রামের ইতিহাস। নির্বাসিত এই মানুষেরা বাস্তু ত্যাগের সাথে সাথে হারিয়ে ফেলেছিল আত্মপরিচয়। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মূলত শহর শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে কলোনিগুলি গড়ে ওঠে। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই এই কলোনিরগুলির নির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবশেষে বহু আন্দোলনের পর কলোনিগুলি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পুলিশ তথা জমির অধিকর্তার গুন্ডাবাহিনী জবরদখল করা জমিগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের একত্রিত প্রতিরোধ ভাঙতে না পারায় তারা কলোনি উৎখাত করতে অক্ষম হয়েছিল। উৎখাত করার জন্য পুলিশ গুন্ডা বাহিনী এলে কলোনির মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে তাদের সতর্ক করত। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে দমদমে ও দক্ষিণ শহরতলীর কলোনিতে পুলিশি আক্রমণ হলে, পুরুষেরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন কলোনির মেয়েরা দলগতভাবে সতর্ক পাহারায় কলোনি রক্ষা করে। ক্যাম্প-কলোনিকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু অস্তিত্বের ঐতিহাসিক লড়াইয়ের চিহ্ন বাংলা সাহিত্যে খুব কম রয়েছে।[৫]

সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের মনে সঞ্চারিত আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসার অনুভূতি প্রায় একই রকম হলেও, বঙ্গ বিভাজন এবং পাঞ্জাব বিভাজনের সামগ্রিক রূপের তুলনা করলে, বেশকিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত: অনেকে মনে করেন, দেশভাগের বীভৎসতা বাংলার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে পাঞ্জাব সংলগ্ন অঞ্চলে দেখা যায়। তাই দেশভাগের অব্যাহতি পরে, মূলত পশ্চিমের হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই, সাহিত্যে দেশভাগের অনুরণন ধ্বনিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের কথা এসেছে অনেক পরে। দেশভাগের আকস্মিক অভিঘাত কিছুসময় পর্যন্ত বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যকে স্তব্ধ ও নীরব করে দিয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে বিভাজনের প্রভাবগত ভিন্নতাগুলি হল – পাঞ্জাব বিভাগ ছিল একটি এককালীন ঘটনা। মূলত ১৯৪৭-১৯৫০ এই তিনবছর বাদী সমায়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষেরা একপ্রকার দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মানুষের অভিবাসন ছিল একটি দীর্ঘ চলমান প্রক্রিয়া। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, দেশভাগের তাৎক্ষণিক পরে, প্রাথমিকভাবে দেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ৫.৩ মিলিয়ন মুসলিম এবং ৩.৪ মিলিয়ন হিন্দু ও শিখ দেশ বদল করেছিল, আবার পূর্ব প্রান্তে সেই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন হিন্দু ও মাত্র ০.৭ মিলিয়ন মুসলিম। কিন্তু প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান বা পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু মানুষ বহুদিন ধরে ভারতের শরণাপন্ন হয়েছে, এমনকি স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও এই ঘটনার বহমানতা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি, কিন্তু পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের উদ্বাস্তু স্রোত ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: ১৯৪৬-এর কলকাতা-নোয়াখালি দাঙ্গা বা ১৯৬২-এর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বীভৎসতা সত্ত্বেও মনে করা হয়, পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দাঙ্গা ও তার নারকীয় পরিণতি, বাংলার তুলনায় অনেক বেশি হিংস্র ছিল। পাঞ্জাবে দাঙ্গার তাৎক্ষণিক রক্তাক্ত স্মৃতি ছিল অনেক বেশি। অপরদিকে দাঙ্গার সন্ত্রাস বাংলার মানুষের মনে ধীরে কিন্তু এক দীর্ঘমেয়াদী মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী হত্যালীলা ও জনবিনিময়ের দ্বারা জন্মভূমি থেকে দুই বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠীকে স্বল্পকালের মধ্যে উপড়ে ফেলার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান- এই দুই মনুষ্যগোষ্ঠীর বিনিময় হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছিল শুধু হিন্দুদের। কিন্তু মুসলমানদের পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যেতে হয়নি। পাঞ্জাবের মতো কোনো মহাপ্রলয় হয়নি বাংলায়। পূর্ব-পাকিস্তানের সব হিন্দুদের একসঙ্গে একই সময়ে উপড়ে ভারতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি।[৬]

তৃতীয়ত: দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল ধারণা পশ্চিম ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মাধ্যমে আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয়েছিল। পশ্চিম প্রান্তে প্রথমদিকে হিংস্রতা হলেও পরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২-তে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, তাতে ধর্ম থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষ মাতৃভাষার মধ্যে আত্মসত্তা খুঁজে পায়। ধর্ম সেদিন প্রাধান্য পায় নি; বরং ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে সমধর্মের মানুষের মধ্যেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্বপাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম শাসন থেকে মুক্তি চায় পূর্বের সাধারণ জনগন। সেই থেকেই পূর্ব প্রান্তে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস

উথাল-পাথাল হতে থাকে। সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে বাহাত্তরে বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত এক নতুন বৃহত্তর ইতিহাস রচিত হতে থাকে।

চতুর্থত: পশ্চিমপ্রান্তে যতটা কঠোরভাবে সীমানা নির্ধারণ করে, ভারত-পশ্চিম পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছিল, পূর্ব প্রান্তে নির্ধারিত বাংলার সীমানা তুলনায় অনেক নমনীয় ছিল। তাই বাংলায় দীর্ঘসময় ধরে প্রতিনিয়ত উদ্বাস্তু মানুষের আগমন ঘটেছে। এমনকি আজও আইনের চোখ এড়িয়ে অবিরাম অভিবাসিত মানুষের দল পশ্চিমবাংলায় চলেছেন, যা জাতি-রাষ্ট্রের কঠোরভাবে চিহ্নিত পূর্বশর্তগুলিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই কারণগুলি সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও বাংলার নিপীড়িত, নির্দোষ মানুষের অভিবাসন যাত্রার অভিজ্ঞতার অনুভূতি, প্রায় এক হয়ে গেছে।[৭]

দেশভাগ ও প্রান্তিক নারী: 'দেহ' যখন 'দেশ'

পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় বিচরণ করলে দেখা যাবে, যখন যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্বের স্খলন ঘটেছে, ক্ষমতা-লিপ্সায়য় মেতে মানুষ যুদ্ধ ও ধ্বংসের উন্মাদনায় মেতে উঠেছে, সেখানেই অবর্ণনীয়ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে 'নারী'। সে তালিবান কর্তৃক আফগানিস্থান দখল, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা ফিলস্তিন সংকট; একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটেও এই নারী লাঞ্ছনার ঘটনা ততখানিই মর্মান্তিক বাস্তব।ভারতীয় উপমহাদেশে সাতচল্লিশের দাঙ্গাপরিস্থিতি জাত অবিশ্বাস ও অবিমিশ্র ঘৃণার সেই কদর্য কালপর্বেও জন্ম নিয়েছিল লাগামছাড়া 'নারী' অবমাননার এক নৃশংস খেলা। দুই সম্প্রদায়ের, দুই পারের অসংখ্য নিরীহ নারীদের মানসিক তথা শারীরিক সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল এই 'দেশভাগ'। শত-সহস্র ধর্ষণ, গণ-অপহরণ, জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তর, বলপূর্বক বিবাহ,

নারকীয় গণহত্যা এছাড়াও নানাভাবে পাশবিক যৌন নির্যাতনের জীবন্ত বলি হয়েছিল অগণিত নারী। পাঞ্জাব সংলগ্ন অঞ্চলে, দেশভাগের বীভৎস সময়ে, তৎকালীন নারীদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র বয়ান নিয়ে ঊর্বশী বুটালিয়ার অনবদ্য গ্রন্থ *The Other Side of Silence* (১৯৯৮)। নারীদের ওপর অত্যাচার শুধু ধর্ষণে থেমে থাকেনি, বহু পরিবার নিজেদের স্বাধীনতার বিনিময়ে নিজের মেয়েদের বিক্রি করেছিল আবার বহু নারী উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে অপহৃত হয়ে যায়। বহু নারী বারংবার ধর্ষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বহু মহিলা আবার আশ্রয় নেয় পতিতালয়ে। সমাজে প্রচলিত বহু বছরের ‘cultural taboo’-এর জন্য, কখনো পরিবারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে রাজি হয় না। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮-এর ২৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ১৩৯১২ জন অ-মুসলমান মহিলাকে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে এবং প্রায় ৭৪২৫ জন মুসলমান মহিলাকে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানে উদ্ধার হওয়া মহিলা ও শিশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০৭ ও ভারতে ২৫৮৫৬। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ই অপরের থেকে কম ছিল না।

সমাজের এমনই ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিগুলিতে, ঠিক কি পাওয়ার আশায় 'নারী নির্যাতন' খুব সাধারণ একটি ঘটনা হয়ে ওঠে, এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাবে- প্রাকৃতিক নিয়মে জৈবিক পার্থক্যের কারণে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'নারী' চিরকালীন একটি আধিপত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থেকেছে। 'অপরপক্ষ'কে বিধ্বস্ত করার একটি সহজ পন্থা হল- শত্রুপক্ষের তথাকথিত দুর্বল অংশ 'নারী'দেরকে যৌন নির্যাতনের দ্বারা, ভেতর থেকে

সেই সম্প্রদায়ের ভিত ভেঙে দেওয়া। সমাজের কোন সম্প্রদায়ের মর্যাদা, সম্মান তথা গর্ব যেন জুড়ে থাকে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত নারীর সতীত্ব, সম্ভ্রম ও যৌন শুচিতার ওপর। নারীকে আঘাত করা, যেন অপরপক্ষের পুরুষতান্ত্রিক দর্পের প্রতি এটা জাহির করা, যে তারা তাদের নারীদের রক্ষায় অসমর্থ। তাই দেশভাগের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অপমানিত করার প্রতীক ছিল নারী নির্যাতন। 'ধর্ষণ' ছিল আসলে একটি সিস্টেম; যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, অপর সম্প্রদায়ের মানুষের অসহায়ত্বকে উপহাস করা। তাই নারীর উপর শারীরিক উৎপীড়নের মধ্য দিয়েই লালসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করে এসেছে পুরুষশাসিত সমাজ। অশ্রুকুমার সিকদার এই সম্বন্ধে লিখেছেন-

> বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করবার চূড়ান্ত উপায় নারীধর্ষণ। সেই যৌন-নির্যাতনের চিহ্ন শরীরে মনে থেকে গেছে, নিজের পরিবার নির্যাতিতাকে ফিরিয়ে নেয়নি। মেয়েদের যৌন-শুচিতা আর সম্প্রদায়ের সম্মান সমার্থক, এই পিতৃতান্ত্রিক সমীকরণে ঘটেছিল যেমন ধর্ষন, তেমনি বহু আত্মহননের ঘটনা।

দেশভাগ – উদ্বাসন ও দলিত সমাজ:

সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ঔপনিবেশিক শাসকের সঙ্গে ক্রমাগত মানসিক দূরত্ব বাড়িয়েছে। পরাজিতের মানসিকতা মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮)-এর মতো মানুষেরা দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে ভালো মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভালো প্রজা হয়ে ওঠাটাও মুসলমান সমাজের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্যার সৈয়দ আহমদের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৭)।

১৯০৫ সালে নবাব মহসিন-উল-মুলক একটি প্রবন্ধে মুসলিমদের অধিকার অবদমনের অভিযোগের কথা তোলেন। প্রসঙ্গত, এর এক বছরের মাথায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ (১৯০৬) এবং ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে যে মুসলমান প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টো সমীপে যায় তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে নবাব মহসিন-উল-মুলকের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এর দুই বছর পরে ১৯০৮ সালে ১৮ মার্চ আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের সভায় আগা খানকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়।

বস্তুত এই ভাবেই ভারতের মুসলিম মানস বিবর্তিত হয়েছে। যে শিক্ষিত মুসলমান সমাজ শিক্ষার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথের সন্ধানী হয়েছিল, তা ক্রমশ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। মহম্মদ আলি ১৯২৬-এর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবি পেশ করেন যেখানে ৭, ১২ এবং ১৪ নম্বর দফা বাদ দিয়ে প্রায় সবই মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সঙ্গে জড়িত সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে, কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধি মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ করার প্রসঙ্গ, দেশের কোনো অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস করতে চাইলেও পাঞ্জাব-বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুন্ন না করা, বোম্বাইকে সিন্ধু প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো দাবি। বস্তুত জিন্নার এই চৌদ্দ দফা দাবি ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ছিল।

রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভাবনা শুধুমাত্র মুসলিম বৃত্তেই ঘোরাফেরা করে নি। ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু জাতীয়তাবাদেরও উত্থান ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার জন্মে একই বছরে, ১৯০৬ সালে।

১৯০৯ সালে 'মর্লে মিন্টো সংস্কারে' উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা। হিন্দুদের পৃথক কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব এই সংস্কার আইনে স্বীকার করা হয়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে সবদিক থেকে অসম অবস্থান সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরকে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে একই বন্ধনীভুক্ত করে রাখা হয়। পরবর্তী ১৯১৯ সালের 'মন্টেও চেমসফোর্ড সংস্কার'-এ মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সংস্কার আইনেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকার অবদমিত বা নির্যাতিত শ্রেণিকে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার চৌদ্দজন সদস্যর মধ্যে এই প্রথম একজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এই 'মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার'-এর পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার লর্ড সাউথ বরোর নেতৃত্বে একটি 'ভোটাধিকার কমিটি' গঠন করেন। 'সাউথ বরো কমিটি' নামে পরিচিত এই কমিটিতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সদস্য (১৮৮১-১৯৬৩) ছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪), মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) এই কমিটির কাছে নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। ড. বি.আর. আম্বেদকরও (১৮৯১-১৯৫৬) ওই কমিটির নিকট তাঁর পৃথক মতামত প্রস্তাব করেন। কিন্তু 'সাউথ বরো কমিটি' মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন মেনে নিলেও ড. আম্বেদকরের পেশ করা নিম্নবর্গের হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য মনোনয়ন পদ্ধতিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মর্মে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ করে। ড. আম্বেদকর 'সাউথ বরো কমিটি'র এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি অস্পৃশ্যদের দ্বারাই নির্বাচিত হবে তিনি তাঁর এই মতের প্রতি অবিচল থাকেন।

১৯২৭ সালের ২৬ নভেম্বর 'সাইমন কমিশন' গঠিত হয় কিন্তু এই কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় জাতীয় কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই কমিশন বাতিল করে দেয়। সমস্ত বিরূপ সমালোচনাকে উপেক্ষা করে ড. আম্বেদকর এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য বোম্বাই প্রদেশ আইনসভার সদস্যদের নিয়ে যে পৃথক কমিটি গঠিত হয় তার সদস্য হন। এই সময় বর্ণহিন্দু কর্তৃক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা সর্বোপরি তাদের অস্তিত্ব ও রাজনৈতিক অধিকারের অস্বীকৃতি বাবাসাহেবকে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও কংগ্রেসের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তিনি সাইমন কমিশনের কাছে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর দাবি পেশ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সর্বমোট ১৮টি সম্প্রদায় সাইমন কমিশনের কাছে তাদের সুপারিশ পেশ করে। এর মধ্যে ১৭টি সংগঠনেরই দাবি ছিল অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে। কিন্ত শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর 'সাইমন কমিশন' এর প্রস্তাবিত সুপারিশের সঙ্গে একমত হতে না পেরর অবশেষে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটা স্বতন্ত্র রিপোর্ট পেশ করেন।

সাইমন কমিশনের ব্যর্থতার পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করে। কংগ্রেস এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেও ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অনুন্নত সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই বৈঠকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ড. আম্বেদকর ও রায়বাহাদুর শ্রীনিবাস যোগদান করেন। ড. আম্বেদকর ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ তারিখে বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ

পান। এই বৈঠকের আবেদনপ্রাপ্তির পর তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেন যে এতদিনে ভারতের রাজনৈতিক বিষয়ে অনুন্নত শ্রেণির জনগণের মতামত দানের অধিকার স্বীকৃত হল। ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সাধারণ আলোচনার পর প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ৯টি সাব কমিটি গঠিত হয়। তার মধ্যে ড. আম্বেদকর ৩টি যথা সংখ্যালঘু সাবকমিটি, প্রাদেশিক সাবকমিটি এবং চাকরি সাবকমিটিতে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যতদিন সরকারি চাকরি, আইনসভা এবং মন্ত্রী পরিষদে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা না করা হবে ততদিন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হোক না কেন তা সমাজ দেহ থেকে দূরীভূত হবে না। কংগ্রেস প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে না বসায় এই বৈঠক কোনো স্থির সমাধানে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ‘গান্ধী-আরউইন চুক্তি’র (১৯৩১) মধ্য দিয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হয় এবং এই সমঝোতার ভিত্তিতেই ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয়। মহাত্মা গান্ধী এই বৈঠকে কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানই ছিল এই বৈঠকের প্রধান সমস্যা। বলাবাহুল্য এই বিষয়ে কোনো সর্বসম্মত সমাধানে আসা সম্ভব হয়নি। গান্ধীজীর বিরোধিতায় বাবাসাহেব আম্বেদকরের অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি গৃহীত হয় না এবং এমত অবস্থায় এই সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের সার্বিক দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর অর্পণ করেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়। অতঃপর, ১৯৩২ সালের ১৭ আগষ্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টন ব্যবস্থার জন্য এই ঘোষণাকে ‘সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা’ নামে অভিহিত করা হয়। মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮ আগষ্ট ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে জানান যতদিন অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক ভোটের ব্যবস্থা রহিত না হয় ততদিন তিনি আমৃত্যু অনশন পালন করবেন। ২০ সেপ্টেম্বর এই অনশন আরম্ভ হয়। অবশেষে ‘পুনা চুক্তি’র (১৯৩২) মধ্য দিয়ে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সমাপ্তি ঘটে।

ব্রিটিশ সরকার ‘পুনা চুক্তি’কে সামনে রেখে তদানুসারেই ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তনকরে। পুনা চুক্তিতে সাধারণ নির্বাচনে নির্যাতিত শ্রেণির জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ

মাদ্রাজ আইনসভা- ৩০টি আসন

সিন্ধুসহ বোম্বাই- ১৫টি

পাঞ্জাব - ৮টি

বিহার ও ওড়িষ্যা- ১৮টি

মধ্যপ্রদেশ- ২০টি

আসাম - ৭টি

বেঙ্গল আইনসভা - ৩০টি

উত্তরপ্রদেশ - ২০টি

মোট ১৪৮টি আসন সংরক্ষিত হয়। শর্তানুযায়ী স্থির হয় কেন্দ্রীয় আইনসভায় সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর মোট আসনের ১৮ শতাংশ আসন নির্যাতিত শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রত্যেক প্রদেশের শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ থেকে নির্যাতিত শ্রেণির

মানুষদের শিক্ষাগত সুবিধা লাভের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ আলাদাভাবে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যুক্তনির্বাচন কমিটির এই আপাত উদারনৈতিক প্রস্তাবে বর্ণহিন্দুদের ভোটের উপর নির্যাতিত শ্রেণির জয়-পরাজয় নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ৯টি শর্তসম্বলিত এই 'পুনা চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেন নির্যাতিত শ্রেণির পক্ষ থেকে ড. আম্বেদকর এবং বর্ণহিন্দুদের পদ থেকে মদনমোহন মালব্য। অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন জয়াকর, তেজবাহাদুর সাপ্রু, জি.ডি. বিড়লা, রাজা গোপালচারী, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেবদাস গান্ধী, ঠক্কর, ডছর সোলাপ্পী, কামান, রায়বাহাদুর শ্রীনিবাস, এম. সি রাজা রসিকলাল বিশ্বাস, পি. এন. রাজভোজ, পি. বালু প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ।

১৯৩৫ সালের এই 'ভারত শাসন আইনে'ই ভারতের অনুন্নত পশ্চাদপদ শ্রেণি সমূহকে তালিকাবদ্ধ করা হয়। ভারতশাসন আইনে তপশিলিদের এই তালিকাভুক্ত করার ফলেই অতঃপর ভারতের নির্যাতিত শ্রেণি তফসিলভুক্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় এক নতুন রাজনৈতিক পরিভাষা, তফসিলী জাতি বা সম্প্রদায়। ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন'-এর ভিত্তিতেই ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হল সাধারণ নির্বাচন। ড. আম্বেদকর 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি' নামক একটি দল গঠন করে এই নির্বাচনে কেবলমাত্র বম্বে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি অনুন্নত শ্রেনির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং এই বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন।[৮]

দেশভাগ ও নিম্নবর্ণ:

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠেছিল। ১৯০৬-০৭-এর ময়মনসিংহের দাঙ্গা, ১৯১৮ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যে কলকাতা, ঢাকা, পাবনার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তারই প্রমাণ।

১৯২৭ সালের আগে পর্যন্ত জিন্না ও তার মুসলিম লিগ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থা গঠনের কথাই বলে আসছিলেন, যা ভারতের রাজনীতিতে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। বেঙ্গল প্যাক্টে বাংলার আইনসভায় ৬০ : ৪০ অনুপাতে মুসলমান ও হিন্দু প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে। এমনকি কলকাতা করপোরেশনের চাকরিতেও ৮০ শতাংশ ও সরকারী চাকরিতে ৬০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। এই সময় চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু এই রাজনৈতিক সম্ভাবনার পরিসরটিকে অকালে বিনষ্ট করে।

জিন্না যখন কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড-নির্ভর রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন, তার কিছু আগেই ভারতে স্বশানের প্রস্তাব নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে চেয়ে মতিলাল-নেহেরু কমিটি গঠন হয়েছিল। জিন্না ও এই কমিটিতে ছিলেন। এই কমিটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ২২ শতাংশ সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেয়, যা কংগ্রেস বা লিগ কেউই মানতে চায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে হওয়ার পর পরই ব্রিটিশরা ভারত থেকে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরেই ভাইসরয় ওয়াভেল ক্ষমতা হাতবদলের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪৬-এর মার্চে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের এক প্রতিনিধি দলকে ভারতে পাঠানো হয় সেই বিষয়ে নীতি স্থির করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সে মাসে ক্যাবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি আর সংবিধান রচনার রীতি সম্পর্কে যে প্রস্তাব পেশ করেন, কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কেউই তা পছন্দ করেনি। তবে দুই দলই প্রস্তাবটিকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়ে অবশেষে সম্মতি জানিয়েছিল এবং একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও গঠিত হয়। কিন্তু এর জন্মের মধ্যেই বিবাদের বীজ লুকিয়ে ছিল। কংগ্রেস-লিগ কেউই তার জায়গা থেকে একপা-ও সরতে রাজি ছিল না। যার চূড়ান্ত প্রকাশ হয় ভয়ানক হিংসার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় ঘটে যায় 'বিরাট হত্যাকাণ্ড', যার শুরু মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নৃশংসতা দিয়ে, শেষ হয় হিন্দুদের পালটা আক্রমণে। এরপর অক্টোবরে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন আর নির্যাতন, প্রতিক্রিয়ায় বিহারে আর উত্তর প্রদেশের গড় মুক্তেশ্বরে মুসলমানদের ওপর পৈশাচিক আক্রমণ আর গণহত্যা।

এমন পরিস্থিতিতে ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করেন, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। পরের মাসেই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানো হয় নতুন ভাইসরয় হিসাবে। ভারতের মাটিতে তিনি পা দেন ২৪ মার্চ ১৯৪৭। ৩-রা জুন দেশভাগের ঘোষণা হয়, স্বাধীনতা আসে তার আড়াই মাস পরে ১৫ আগস্ট।

দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গচ্ছেদের পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৪০-এর মার্চে মুসলিম লিগের 'লাহোর প্রস্তাব'-এ 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে 'স্বতন্ত্র রাষ্ট্র'-র কথা বলা হয়েছিল।

১৯৪৭-এর ৮-ই জুলাই ইংল্যান্ড থেকে আসেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ। ভারতের প্রায় ৩৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা-পাঞ্জাব মিলিয়ে আনুমানিক ৮ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাঁর কলমের আঁচড়ে। বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণের জন্য দুটি আলাদা আলাদা বাউন্ডারি কমিশন তৈরি হয়। র‍্যাডক্লিফ পদাধিকারবলে দুটি কমিশনেরই চেয়ারম্যান থাকলেন। বাংলা কমিশনের সদস্য ছিলেন বিজন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম. এ. রহমান এবং এম. এম. আকরম। পাঞ্জাবের জন্য ছিলেন মেহেরচাঁদ মহাজন, তেজা সিং, দীন মহম্মদ এবং মহম্মদ মুনীর। এঁরা সকলেই ছিলেন আইনজ্ঞ। পাঁচ সপ্তাহও পুরো লাগল না। বাংলার জন্য রোয়েদাদ ('অ্যাওয়ার্ড') তৈরি হয়ে গেল ৯ আগষ্ট। পাঞ্জাবেরটা ১১ আগষ্ট।

দুটো প্রদেশের ভাগ্য নির্ধারণ করল যে দলিলটি, ছাপা আকারে তার আয়তন হয়েছিল মাত্র ১৬ পৃষ্ঠা। বাংলার জন্য ৯ এবং পাঞ্জাবের জন্য ৭ পৃষ্ঠা। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকার দলিলটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করে।

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র অবয়বী হয়ে ওঠার সুবাদে, দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা বিভিন্ন পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল। দেশভাগের সময়ে টানা হয়েছিল র‍্যাডক্লিফ লাইন (১৯৪৭)। কিন্তু এর আগেই ডুরাণ্ড লাইন (১৮৯৩) এবং ম্যাকমোহন লাইন (১৯১৪)-এর মাধ্যমে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত স্থির করা

হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইয়ান্দাবুর (১৮২৬) সন্ধির সূত্রকে ভিত্তি করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্পাদিত বার্ণি-পেমবার্টন লাইনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৭ সালে ভারত-ব্রহ্মদেশ দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী নাগা, কুকি, মিজো, চাকমা ইত্যাদি অধ্যুষিত অঞ্চলের যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে ঐ স্থানের অধিবাসীরা অনেক ক্ষেত্রেই ভিটেমাটি হারিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে Sahana Basavpatna–র '*Chins in Mizoram The Case of Borders Making Brothers Illegal', in Journal of Borderlands Studies.* Vol. 27 (1), 2012 ।

ডুরান্ড লাইনের ফলে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটি দেশে বিভক্ত পাশতুনদের জীবন যন্ত্রণা যা ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রসঙ্গত দেখা যেতে পারে, *Badshah Khan, My Life and Struggle, 1969*।[৯]

পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দু প্রধান অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল খুলনা, যশোহর, উত্তর বরিশাল, দিনাজপুর, দক্ষিণ ফরিদপুর এবং ঢাকার কিয়দংশ। এই হিন্দুরা ছিলেন মূলত নমঃশূদ্র, জোলা, জেলে, কৈবর্ত। র‍্যাডক্লিফ রেখার টানে বিক্রমপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও বরিশালের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও উদ্বাসনের শিকার হয়। বাংলায় নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির মধ্যে পরিচিতিগত অবস্থান গড়ে তোলায় উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়, তাতে তিনটি জাতি অগ্রণীয় ভূমিকায় ছিল। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাজবংশী, পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী নমঃশূদ্র ও দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। এই তিনটি জাতি বাদে অন্যান্য নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির সদস্যরা ছড়ানো-

ছিটানো ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল থাকার কারণে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে তারা রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলায় যে অবদমিত জাতিদের আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার নেতৃত্ব আসে প্রধানত উত্তর ও পূর্ববঙ্গের রাজবংশী ও নমঃশূদ্রদের মধ্য থেকে। তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

একদিকে আম্বেদকরের Scheduled Castes Fedaration–এর সঙ্গে সংযোগ ও অন্যদিকে মুসলিম লিগের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে (যেখানে নমঃশূদ্ররা সংখ্যায় বেশি ছিল) আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে, বাংলার অবদমিত জাতি তথা নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক প্রভাব এতটাই জোরদার হয় যে, অবিভক্ত বাংলা থেকে সর্বপ্রথম আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠানো সম্ভব হয়।

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলা বাদ দিয়ে বাংলায় সর্বত্রই বর্ণহিন্দু ১০ শতাংশেরও কম ছিল অথচ শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল লক্ষ্যণীয়। ১৯২০-র খিলাফত আন্দোলনের বিস্তারের পর, তিরিশের দশক থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে বাংলায় মুসলমান কৃষকের উত্থান ঘটে, যা ক্রমেই বর্ণহিন্দুদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩০-এর দশকে দেখা যায় প্রধানত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির গ্রামীন মুসলমান নেতৃত্বে কৃষকদের কৃষক-প্রজা পার্টির ছত্রছায়ায় এনে জমির মালিক ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে। বলা বাহুল্য,

মুসলমান ও প্রান্তিক মানুষদের যৌথ চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলার বর্ণহিন্দু সমাজে এক বিপন্নতার সৃষ্টি হয়।

বাংলা ভাগের পর পরই পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথম পর্বের উদ্বাস্তুরা ১৯৪৭ সালেই ভারতের প্রবেশ করে। এদের সিংহভাগ ছিল বর্ণহিন্দু। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও রাজনৈতিক মহল তাদের আগমনকে কিছুটা হলেও সহানুভূতির সঙ্গে দেখে এবং তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। যারা কলকাতায় ও শহরতলিতে এসেছিলেন তারা কেউ তাদের যোগাযোগের সুবাদে সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করে নিতে পারল এবং অন্যরা শহরতলিতে উদ্বাস্তু কলোনিতে বাসস্থান খুঁজে নেয়।

১৯৫০-৬০-এর পি. পি. আই. নেতৃত্বাধীন উদ্বাস্তু আন্দোলন মূলত এদেরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এদের সংগঠিত লড়াই গড়ে তোলার মূল সংগঠন হিসাবে উঠে আসে UCRC বা ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কমিটি।

কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র নমঃশূদ্রদের বড় অংশই বাংলা ভাগের পর পাকিস্তানে থেকে যায়। নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলা বিভাজনের বিরোধী ছিলেন কিন্তু যখন সেই বিভাজন রোধ করতে পারলেন না, তিনি মনে করলেন, পূর্ব বাংলার নমঃশূদ্ররা তাদের নিজস্ব এলাকায় বাস করলে নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের সাহায্য পাবে। এই অবস্থান থেকে তিনি নিজে পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ হতে বেশি সময় লাগে নি। ১৯৪৯-৫০-এ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে মোড় নেয় তাতে ব্যাপক সংখ্যক নমঃশূদ্ররা ভয়াবহ হিংসার শিকার হয়। ভেঙে পড়ে দলিত-মুসলমান বোঝাপড়া। খুলনায়, বাগেরহাটে শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক

অশান্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জেলায় — রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল। বর্ণহিন্দুদের বড় অংশই পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ায় এইবার যারা আক্রান্ত হন, তারা অধিকাংশই নমঃশূদ্র। সন্ত্রাসের এই আবহাওয়া আরও ব্যাপক আকারে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে ১৯৫০-এর দাঙ্গাকে ডেকে আনে কুচক্রীরা। খবর পেয়ে করাচি থেকে তড়িঘড়ি ঢাকায় ফিরে এলেন যোগেন্দ্রনাথ। ছুটে গেলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহরের বিস্তীর্ণ এলাকায়। প্রশাসনের গোপন সমর্থন ছিল দাঙ্গাকারীদের দিকে। শত চেষ্টা করেও তাদের অসহযোগিতায় যোগেন্দ্রনাথ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তর হওয়া ছাড়া আর গতি রইল না।

১৯৫০-এর দাঙ্গাই পূর্ব পাকিস্তানের দলিত জনগোষ্ঠীকে সব থেকে বেশি নড়িয়ে দিয়েছিল। দেশত্যাগের কথা ইতিপূর্বে যাঁরা ভাবেননি, তাঁরাও এবার শরণার্থী স্রোতে গা ভাসান। এই প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে মুসলিমদের উপর আক্রমণ নেমে আসে। অনেক মুসলিম পরিবার আতঙ্কে দেশ ছাড়েন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন, 'মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান'-এ বসত করতে এসেছিলেন তার চেয়েও অনেক কম সংখ্যক উদ্বাস্তু। ফলে শরনার্থীদের নিয়ে পুনর্বাসন সংকটে পড়তে হয়নি সেই দেশের সরকারকে। দেশ ছেড়ে যাওয়া পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুরা অধিকাংশই ছিলেন সম্পদশালী। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মুসলিমদের অধিকাংশই পুনর্বাসিত হয়েছিলেন সেই সমস্ত হিন্দুদের জমি, বাড়ি, সম্পত্তিতে। তাই পুনর্বাসন সমস্যা পাকিস্তান সরকারের বিশেষ মাথাব্যাথার কারণ হয় নি। সহজে পুনর্বাসন মিটে যাওয়ায় সে দেশে দীর্ঘস্থায়ী কোন

রিফিউজি ক্যাম্পের নজির নেই। গড়ে উঠতে দেখা যায়নি কোনো জবরদখল কলোনি। ঢাকার উপরেও কলকাতা মহানগর সমতুল্য জনসংখ্যার কোনো চাপ ছিল না।

অধিকাংশ পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানের কাছে ১৯৪৭ ছিল একই সঙ্গে নব্যদেশের জন্মলগ্ন এবং হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্তির ক্ষণ। সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে হিন্দুদের এই আধিপত্য আর ঔদ্ধত্যে নিম্নবিত্ত মুসলিম প্রজাদের বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু আধিপত্য মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজকে বিদ্বেষভাবাপন্ন করেছিল। দেশভাগ তাঁদের অনেকের কাছেই তাই ছিল মুক্তির স্বাদ। মধ্যবিত্তের লালনপালনে থাকা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রটিও তাই দেশভাগের যন্ত্রণায় মুষড়ে না পড়ে নব্য পাকিস্তানের স্বপ্নকল্পে অধীর হয়েছিল। এই কথার সমর্থন মেলে ১৯৫১-র আদম শুমারিতে। গোটা পাকিস্তানে ভারত থেকে প্রায় সত্তর লক্ষ মোহাজের বা শরণার্থী গিয়েছিল, তার মধ্যে ৬৩ লক্ষই গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিল মাত্র ৭ লক্ষ — তার মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল অবাঙালি মুসলমান।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রিপোর্ট জানায় যে, এই সাত লক্ষের মধ্যে পাঁচ লক্ষই আবার ফিরে আসে। অন্যদিকে যে কথা বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভার পুনর্বাসন মন্ত্রী রেণুকা রায় *My Reminiscences* গ্রন্থের ‘And Still They Come’ অধ্যায়ে বলেন যে ‘The exodus was on one-way affair’ এবং এটা একটা ‘continuous process’। অমলেন্দু দে বাঙালি হিন্দুর পূর্ববঙ্গ ত্যাগের পর্বগুলি চিহ্নিত করেছেন।

লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি (১৯৫০) পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নিরাপত্তা দেয়, অনেক চলে যাওয়া মুসলিম বাঙালি ফিরেও আসে। রণবীর সমাদ্দার তাঁর 'Still They Come : Migrants in the Post-partition Bengal' নিবন্ধে জানিয়েছেন, ১৯৪৭ সালে যে মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল তাদের অনেকেই বা তাদের উত্তর পুরুষরা এই দেশে ফিরে এসেছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং যারা চলে এসেছে তাদের সম্পত্তি নিয়ে কঠোর আইন প্রবর্তিত হয়। ১৯৫২-৬০ কালপর্বে বাঙালি হিন্দুর দেশত্যাগ ঘটে পাসপোর্ট প্রবর্তনের ফলে, দাঙ্গার ফলে, সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের ফলে।

এক দেশের প্রান্তিকতা থেকে আরেক দেশের প্রান্তিকতার মধযে নিক্ষিপ্ত হওয়া এই নিম্নবর্ণের মানুষদের একটি বড় অংশ বিভিন্ন ক্যাম্প-কলোনিতে পরিষেবাহীন জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, ২৪ পরগণার বাগজোলা ক্যাম্প সর্বত্রই নমঃশূদ্রদের সংখ্যা ছিল ৭০ শতাংশের বেশি।[১০]

বাংলার দলিত নেতৃত্ব ততদিনে দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে কংগ্রেসের তফসিশি সেলের নেতা, গণপরিষদের সদস্য প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, অন্যদিকে তপশিলি ফেডারেশনের নেতা কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মনে করতেন, শ্রেণি বিচারে বাংলার কৃষিজীবী মুসলিম ও তপশিলিরা একই সারিতে। অপরদিকে ১৯৪৭-এর মার্চ মাস অবধি প্রমথরঞ্জন ঠাকুর দেশভাগ ও বাংলা ভাগের সমর্থক ছিলেন না। বরং বৃহত্তর ভারতের মধ্যে অখণ্ড বঙ্গ রাজ্যেরই সমর্থক ছিলেন। তবে, আবুল হাশিম, সোহরাবর্দী, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র বঙ্গদেশের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তা সমর্থন করতে পারলেন না

প্রমথরঞ্জন। কারণ, ১৯৪৬-এর নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গণহত্যার স্মৃতি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ওই ঘটনার পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি আর কখনই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। ফলে, অখণ্ড ও স্বতন্ত্র বাংলার প্রস্তাবে তাঁর সায় ছিল না। বরং প্রমথরঞ্জন তাঁর নির্বাচনক্ষেত্র গোপালগঞ্জের সফলডাঙায় ১৯৪৭-এর মার্চে স্থানীয় সফসিলি জনতার এক বিশাল সমাবেশ থেকে দাবি তোলেন যতক্ষণ না জন্মভূমির ভিতরেই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল থেকে দরিদ্র হিন্দু ও তপশিলি শ্রেণির মানুষকে সরিয়ে এনে হিন্দু গরিষ্ঠ অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে, ততক্ষণ বাংলা ভাগ কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে হবে (*অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২৭.০৩.১৯৪৭)। বাংলার দলিত নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাগের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হলেও উভয়পক্ষের মূল ভাবনাটিই ছিল দলিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা।

প্রথমত, দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষদের ছিল না শিক্ষার জোর; দ্বিতীয়ত, তাঁদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী অথবা দিনমজুর অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। খাল, বিল, নদী ও কৃষির উপযুক্ত জমির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই মানুষদের কাছে তাই দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত খুব একটা সহজ ছিল না। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর ১৯৪৭ সালে দেশ ছেড়ে এসে নিজেই পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। ঠাকুর ল্যান্ড অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামের একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। উত্তর ২৪ পরগণায় চাঁদপাড়া ও গোবরডাঙা স্টেশনের মাঝখানে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের একাংশ কিনে তৈরি করেন ঠাকুরনগর – পশ্চিমবঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু উপনিবেশ। পরবর্তীকালে ঠাকুরনগর হয়ে ওঠে গোটা ভারতবর্ষের বাঙালি দলিত উদ্বাস্তুদের একটি প্রধান মিলনকেন্দ্র।

কৃষিজীবী মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ জমি না থাকার যুক্তি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনর্বাসনের নামে বাংলার দলিত উদ্বাস্তুদের ভারতের অচেনা-অজানা দুর্গম পরিবেশে জোর করে পাঠাতে থাকে। ১৯৫৩ থেকে আন্দামানে যে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়, তারা শুধুই ছিল নমঃশূদ্র। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই তিনটি জেলা হল — ২৪ পরগণা, কলকাতা ও নদিয়া। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে মোট ২০ লক্ষ ৯৯ হাজার উদ্বাস্তু তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধযে ১৩ লাখ ৮৭ হাজার বা দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় এই জেলায়।

এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে ক্যাম্পে আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে পড়ে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, পশ্চিমবঙ্গে আসার পর কোনো দৈহিকভাবে সমর্থবান পুরুষ উদ্বাস্তু তার নিজের বা তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য সাতদিনের বেশি নির্দিষ্ট পরিমাণ দান গ্রহণ করতে পারবে না।

সরকারের পুনর্বাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। যেসব অঞ্চলে তারা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেখান থেকে তাদের দলবদ্ধ অবস্থানকে ভেঙে দেওয়া এবং যতটা সম্ভব কলকাতার বাইরে ও বিশেষভাবে বাংলার বাইরে 'খালি' জমিতে অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুকে পুনরায় বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। পঞ্চাশের দশক জুড়ে সরকারি উদ্যোগে যে ৩৮৯ টি রিফিউজি সেটল্‌মেন্ট বা ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছিল তার কোনটিই কলকাতার নাগালের মধ্যে ছিল না। অখণ্ড বাংলায় তপশিলিরা ছিল নির্ণায়ক

শক্তি। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ — এই কালপর্বে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যই উঠে আসবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠন নির্ভর করত তাদের সমর্থনের উপর। তাঁদের এমন গুরুত্ব ছিল বলেই মুসলিম লিগের সুপারিশে দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন্দ্রের অন্তর্বর্তীকালীণ সরকারে আইন মন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের পর বাংলার তফশিলিরাও দুটো দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ভাঙা বাংলায় তাঁরা শক্তি হারিয়ে কোথাও মুসলিম শাসক, কোথাও উচ্চবর্ণের হিন্দু শাসকের করুণাপ্রার্থী হয়ে পড়ে। এইভাবেই স্বাধীনতার আগে যাঁরা ছিলেন বাংলার তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি, স্বাধীনতার পরে উভয় বঙ্গেই তাঁরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। বাংলার বাইরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেখানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয় সেখানেও এই ভাবনাটা বিবেচনায় রাখা হয় যে, তাঁরা যেন কিছুতেই রাজনৈতিক ভাবে দলবদ্ধ হতে না পারে। তাঁদের নির্বাচনি এলাকাগুলি এমনভাবে বিভাজিত করা হল, যাতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধির ঊর্ধ্বে বিধায়ক বা সাংসদ হওয়ার ক্ষমতা তাঁদের না থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের টানাপোড়েনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায় তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র বিনিময়কে পর্যালোচনা করলে।

জবদস্তির পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ (বর্তমান ছত্তিশগড়-সহ) অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ইত্যাদি রাজ্যের যে স্থানগুলিতে দলিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় তা ছিল সেচহীন, পাথুরে, কাঁকুড়ে — কৃষিকাজের অনুপযোগী শ্বাপদসঙ্কুল গভীর

অরণ্য। বেঁচে থাকার নূণ্যতম সুযোগ সেখানে ছিল না — ছিল না শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ কোনরূপ নাগরিক পরিষেবা। আর এই করতে গিয়ে পুলিশ ও সরকারি কর্তারা ঘন ঘন প্রতিরোধের মুখে পড়তে থাকেন। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের এক বিকেলে সেই প্রতিরোধেই গুলি চালায় পুলিশ। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে জেরবার অসহিষ্ণু সরকার কলকাতার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পুলিশকে সহায়তা করতে সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হন।

একেবারে প্রথম দিকে মৎস্যজীবীদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, তাঁদের পরিবারকে কল্যাণীর কাছে ভাগীরথীর পূর্বতীরে মাঝের চরে পুনর্বাসিত করা হয়। ১৯৫০-এর প্রবল শরণার্থীদের আগমনের পর মৎস্যজীবীদের বৃত্তির উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে পেরে সরকার একপ্রকার হাত গুটিয়ে নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নিম্নবর্গীয় বাঙালিদের ১৯৪৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় প্রায় সাড়ে একচল্লিশ হাজার মানুষকে পুনর্বাসনের জন্য আন্দামানে পাঠানো হয়। এই দ্বীপপুঞ্জে যাঁরা পুনর্বাসিত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী।

এইভাবে সমস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পুনর্বাসনের জন্য বিহারের বেতিয়া, মহারাষ্ট্রের চান্দা, উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল, অন্ধ্রপ্রদেশের কাগজনগর, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপ আন্দামান ইত্যাদি অঞ্চলে পরিবারগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও পুনর্বাসন সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি, কারণ উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা ছিল অনেক গুণ বেশি।

তখন এই সমস্ত কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার বন কেটে বসতি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পুনর্বাসন দপ্তরের অধীনে একটি প্রকল্প তৈরি করে। তৎকালীন

মধ্যপ্রদেশ, বর্তমান ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলা এবং ওড়িশার কোরাপুট – বর্তমান নবরঙপুর ও মালকানগিরি জেলার অসংখ্য পাহাড়-পর্বতযুক্ত বনাঞ্চলের আনুমানিক ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নির্মিত হয় 'দণ্ডকারণ্য' প্রকল্প। ১৯৫৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর Dandakaranya Development Authority (DDA) গঠিত হয়। এর সদর কার্যালয় ছিল পার্বত্য শহর ওড়িশার কোরাপুট।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে এসেছেন, পশ্চিম বাংলার শরণার্থী শিবির থেকে ওই সব উদ্বাস্তু মানুষদের ১৯৫৯ সালে প্রথম দণ্ডকারণ্যের গ্রামে নিয়ে যাওয়া শুরু হয় এবং ১৯৬১-তে প্রথম পর্যায় নিয়ে যাওয়া শেষ হয়। কিছু উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে যেতে আপত্তি জানালে সরকার ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। তখন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের আয়তন কম ছিল।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গা মাঝে মাঝে স্তিমিত থাকলেও মাঝে মাঝেই তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠত সাধারণ কোনো আছিলায়। ১৯৬১-৬২ সালেও এমন দাঙ্গা বাধে। ১৯৬৩-৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে হযরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি যাওয়ার গুজবে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ দাঙ্গা বাঁধে। ফলে ভারতে উদ্বাস্তুর ঢল নেমে আসে। নতুন করে আসা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোণ সহায়তা করতে রাজি না হওয়ায় উদ্বাস্তুদের সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে বিশেষ করে মানা ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হয়। সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন গ্রামে এদের পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়। উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেওয়া মানুষেরা অধিকাংশই সহায়সম্বলহীন

নিম্নবর্গীয় নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুরমি ইত্যাদি তপশিলি জাতি-উপজাতি কৃষক সম্প্রদায়।

আলোচ্য সময়কালে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের কেন্দ্র ও সমস্ত রাজ্যেই ছিল কংগ্রেস সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বিরোধী দলগুলি তখন উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনে নামে। পূর্বপাকিস্তান থেকে আসা সমস্ত উদ্বাস্তুরাই বাঙালি, সুতরাং তাঁদের বাংলার মধযেই অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গেই সুষ্ঠু পুনর্বাসন দিতে হবে, উদ্বাস্তুদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর সরকারি নীতি পরিবর্তনের দাবিতে সত্যাগ্রহ ও কারাবরণও চলে। উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষায় এই আন্দোলন যখন নির্ধারিত গতিপথে অগ্রসর হয়, তখহন প্রয়োজন হয়েছিল একটি মজবুত সংগঠনের। মানা ক্যাম্পে ১৯৭৩ সালে সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত হয় 'সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'। এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলা থেকে আগত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শতীশচন্দ্র মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক হলেন রাইচরণ বাৈরে।

পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কত পতিত জমি উদ্ধার করে চাষি পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব, তারও হিসেব দাখিল করে বিরোধী দলগুলি। সেই সময় সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা উত্থাপিত হয়। বামপন্থী নেতারাই ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে, সভা-সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তৃতা মঞ্চে লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার হতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে তথা বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে, যাঁরা দণ্ডকারণ্যে গিয়েছেন, সকলকেই ফেরত নিয়ে এসে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

অবশেষে ১৯৭৭ সালে সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসে। শুরু হয় সব ছেড়েছুড়ে দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের আবার পশ্চিমবঙ্গমুখী যাত্রা। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু নেতারা আশার আলো দেখতে পান। তৎকালীন অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী রাম চট্টোপাধ্যায় দণ্ডকারণ্যে একটি জনসভায় বলেন, সর্বহারার জনদরদি বামফ্রণ্ট এখন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায়। চাষি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক এদের ভাগ্য ফিরবে। দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন প্রাপ্তি বাঙালিদের সুন্দরবনে স্থান হবে, জমিদার-জোতদারদের কাছ থেকে জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

সর্বমোট ১,৫০,০০০ উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসেন। বাস, লরি, ট্রেন— যাঁরা যেভাবে পেরেছেন, বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবাংলায় পৌঁছেছেন। কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে এই আগমনপর্ব। পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তুরা সরাসরি সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে যাননি। উদ্বাস্তু নেতাদের নির্দেশ পাওয়ার আগে অবধি তাঁরা দীর্ঘদিন হাসনাবাদ অঞ্চলে রেললাইনের ধারে, বড় রাস্তার পাশে, কোথাও খোলা মাঠে পলিথিনের চাদর খাটিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে তৈরি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেছেন।

অবশেষে ১৯৭৮ সালের মে মাসে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র প্রেসিডেন্ট সতীশচন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে (যিনি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তু প্রোগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন) উদ্বাস্তুরা দলে দলে মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসান। এইভাবে ক্রমান্বয়ে প্রায় ৩০,০০০ লোক মরিচঝাঁপিতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় সেখানে বসতি স্থাপন করেন। এঁরা সবাই ছিলেন নিম্নবর্গের তপশিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়। এঁদের যৌথ চেষ্টায় মরিচঝাঁপি একটি উন্নত দ্বীপে পরিণত হয়। গায়েগতরে খেটে নিম্নবর্ণের এই মানুষরা

প্রতিষ্ঠা করেন নেতাজিনগর। 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র উদ্যোগে সমবায় পদ্ধতিতে তাঁরা তৈরি করেন চলাচলের জন্য রাস্তা, বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য স্কুল, বাজার, দোকান প্রভৃতি। পানীয় জলের জন্য বহু নলকূপ বসানো হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তিমূলক কাজের ব্যবস্থাও তাঁরা করেন। বিড়ি তৈরির কারখানা, পাউরুটি তৈরির কারখানা, কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানা ইত্যাদি। লবণ ক্ষেত্র তৈরি করে লবণ উৎপাদনও শুরু করেছিলেন, মাছ চাষের জন্য প্রচুর ভেড়িও তৈরি করেছিলেন যাতে মাছ চাষের এক বিরাট অর্থকরী সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য একাধিক ডিসপেনসারির ব্যবস্থাও করেছিল তাঁরা।

এমত পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী শুনে অত্যন্ত ভীত ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। একজায়গায় একসঙ্গে এত নিম্নবর্গীয় মানুষ থাকলে তা যে রাজনীতির ময়দানের হিসেব নিকেশ ওলট পালট করার ক্ষমতা রাখে এই ভাবনা থেকে বৎসরকালের ব্যবধানে ১৯৭৮ সালের ১৯শে আগষ্ট বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যাধিক পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথে অবরোধ করে। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে, অনাহারে, তৃষ্ণায় উদ্বাস্তু বসতির অসংখ্য শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯৭৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ ও ১৪৪ ধারা জারি করে তাদের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অনাহারে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। ৩১শে জানুয়ারি লঞ্চের ধাক্কায় পুলিশ উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও পানীয় জলের নৌকা মাঝ নদীতে ডুবিয়ে দিলে তারা নদীতে সাঁতার কেটে

কুমিরমারির পাড়ে গিয়ে ওঠে। সেখানেও পুলিশ টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে। উদ্বাস্তুরা তবু অগ্রসর হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করলে ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ৭০ জন আহত হয়। অন্যান্যদের পুলিশ ক্যাম্পে আটক রাখা হয়।

১৩ মে মরিচঝাঁপির ঘাটে লঞ্চে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত পুলিশ মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি ছাড়তে হবে, অন্যথায় পরিণতি হবে ভয়াবহ। সর্বহারা, বাস্তুহারা, সম্ভ্রমহারা মৃতপ্রায় মানুষেরা প্রতিজ্ঞা করে — মরিচঝাঁপি ছাড়ছি না, ছাড়ব না।

১৪ মে এক অসতর্ক মুহূর্তে ২৫টি লঞ্চভর্তি পুলিশ, সংগঠিত বেসরকারী যুবকর্মীদের নিয়ে মরিচঝাঁপিতে নামে। স্কুলঘরে আগুন, ঝুপড়িতে আগুন, শ্লীলতাহানি, বন্দুকের গুলিতে নিমেষের মধযে অসংখ্য মানুষ আক্রান্ত হয়। চারিদিকে মৃত্যুর হাহাকারের মধ্য দিয়ে ১৯৭৯ সালের ১৫ মে মরিচঝাঁপি সভ্যতার মর্মান্তিক অবলুপ্তি ঘটে। এর পরেও বেঁচে থাকা কিছু মানুষ দণ্ডকারণ্যে ফিরে গিয়ে দুঃসহ শারীরিক পরিশ্রমে নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো সরকারি কর্মাচারী কিংবা কোনো পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় নি। কারণ দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা ছিলেন সমাজের নিম্নশ্রেণির – নিম্নবর্গের মানুষ। জাতপাতের দেশ ভারতবর্ষে তাঁর নীচু জাতের মানুষ। দণ্ডকারণ্যের বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাংলা লিখতে পড়তে জানে না। মায়ের মুখের ভাষা তাই কিছুজন বাংলা বলতে পারে। তাঁরা বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা রাখে না। ধারণা নেই বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি সম্পর্কেও। আর দু-এক প্রজন্ম পরে

তাঁর হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে তাঁদের বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলবেন। শিয়ালদহ-ক্যানিং লাইনের ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশন থেকে হাঁটাপথে পনেরো মিনিট দূরত্বে 'পথের শেষ' নামে একটি গ্রাম তৈরি হয়েছে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত মানুষদের উদ্যোগে। মরিচঝাঁপি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত প্রতিবন্ধী যুবক সন্তোষ সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজসেবামূলক সংগঠন 'অথের শেষ সবুজ পৃথিবী উন্নয়ন সমিতি'। এই সংগঠনের বহুমুখী প্রকল্পে চতুর্পাশ্বের গ্রামের সাধারণ মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়।

মরিচঝাঁপি প্রত্যাগত অধিক সংখ্যক বাস্তুহারা মানুষের সংঘবদ্ধ বসবাস ঘটেছে শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লাইনে করোয়া কদম্বগাছি স্টেশনের কাছে হেমন্ত বসু নগরে। নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল ও রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে 'সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (মরিচঝাঁপি)'। এই সংগঠনের উদ্যোগে প্রতি বছর ৩১শে জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু মানুশের সমাবেশ ঘটে ওই সম্মেলনে।

এই উদ্বাস্তু মানুষেরা কঠোর জীবনসংগ্রামে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত ও সাবলম্বী হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যবধানে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা অন্যান্য সাধারণ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রায় মিলেমিশে কুমিরমারী, সাতজেলিয়া, গোসাবা, বসিরহাট, হাসনাবাদ, আলবেড়িয়ে, মালতীপুর, বনগাঁ, মছলন্দপুর, সংহতি, মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর, মেটিয়া, বাদু, সাজিরহাট, কামারগতি, দক্ষিণ কলকাতার পঞ্চান্নগ্রাম ও কালিকাপুরে বসবাস করছেন। এঁরা প্রায় সকলেই একটা সময়ের পর সর্বভারতীয় মতুয়া আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগর বাড়ি। ২০১০ সালে রাজনীতির

অনুপ্রবেশ সারা ভারতের মতুয়া ভক্তদের পরস্পরের ভিতর বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এই ক্ষোভ প্রকট হওয়ার ফলে বর্তমান ঠাকুর পরিবার বিধিসম্মত দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণির মতুয়া ভক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ধর্মচর্চা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত ২০০৩ সালের নাগরিক বিলের নির্দেশিকা আবার একবার নিম্নবর্গের এইসব মানুষদের অস্তিত্বের শিকড়ে আঘাত করেছে। ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের পর যাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের বাস্তুত্যাগের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে, অন্যথায় অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে, যেখান থেকে এসেছে। পরিকল্পিত ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া এই সংকট থেকেই জন্ম নেয় বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে একপ্রকার ভীতি, সেই ভীতি থেকে অনিশ্চয়তা ও সেখান থেকে অবিশ্বাস আর হিংসার হাত ধরে ক্রমান্বয়ে আছড়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা।

এই সমস্ত ব্যাথা ও যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা করে গড়ে ওঠে এক নতুন সাহিত্যের ধারা। দলিত সাহিত্যের মতন একটি স্বতন্ত্ররুপ না পেলেও এই উদ্বাস্তু জীবনের ধারা বয়ে চলে বাংলা দলিত সাহিত্যের ভেতরে উদ্বাস্তু কথন হয়ে। একদিকে যেমন স্মৃতির ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে গড়ে ওঠে আত্মজীবনীর মতন সাহিত্য, তার সাথেই পাল্লা দিয়ে ছলতে থাকে নানান প্রবন্ধ ও বিশ্লেষণীমূলক আলছনার ধারা। তেমনি কিছু আত্মজীবনী ও অন্যান্য লেখাতে এই উদ্বাস্তু মানুষের খোঁজ করা যেতে পারে।[১১]

উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনী

লেখক যতীন বালার 'আত্মস্মৃতি' *শিকড় ছেঁড়া জীবন*-কে তিনি উদ্বাস্তু দলিতের দলিল বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 'দলিত' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে শোষিত হওয়ার ইঙ্গিত। এই শোষণ কেবলমাত্র জাতপাতের ভিত্তিতে সামাজিক শোষণ নয়। দেশভাগের প্রেক্ষিতে যখন আমরা এই দলিত ইতিহাস অনুসন্ধান করি তখন বুঝতে পারি, দলিত কীভাবে আরও দলিত হয়ে ওঠে, কীভাবে বহুস্তরের শোষণ সেখানে চলতে থাকে। ওপার বাংলা থেকে উঠে আসা দলিত শ্রেণির ওপর এই শোষণ এক প্রকার নিয়তি হয়ে নেমে আসে। বাসযোগ্য জমি, জীবিকা ও শিক্ষার সুযোগ নিয়ে লড়াই চলতেই থাকে। এর পাশাপাশি থাকে দেশ হারানো ও সমাজ-সংস্কৃতি হারানোর যন্ত্রণা।

যতীনবালা ১৯৪৯ সালে ৫ মে, পূর্ববঙ্গের যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তির বয়ানে লেখা এই গোষ্ঠী কথনের শুরুর দিকে এক জায়গায় তিনি লেখেন—

> আমার শিকড় ছেঁড়া জীবন হচ্ছে সময় সত্যের বাস্তব ইতিহাস - ভারতবর্ষ ভাগে, বঙ্গদেশ ভাগে নমঃশূদ্র নৃগোষ্ঠী (Race) নয়, নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর (Nation) বৃহত্তম ট্র্যাজেডি। একটা দেশ ভাগ হয়ে যাওয়া, একটা জনগোষ্ঠী ভাগ হয়ে যাওয়া মানে নিছক রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিভাজন নয়, ভাগ হয়েছে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীড় সমাজ-সংস্কৃতি, বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছে — নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর তাঁদের ভাষা, আচার আচরণ আর জীবনচেতনাও। বিভাজনের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছেন গোটা ভারতবর্ষ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁদের সংকট, সংগ্রাম, বেদনা-বিপর্যয়ের ইতিহাস-কাহিনি এ। এ-কাহিনি আমার সময়ের, আমার জন্মভূমি মায়ের অঙ্গচ্ছেদের আর আমার জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনচিত্র এ-কাহিনি। এ জীবন-ইতিহাস আজও প্রাসঙ্গিক। কারণ দেশভাগের সর্বনাশা উত্তরদায় এখনও বহন করে চলেছে বঙ্গভঙ্গের বলি এই নয়, শূদ্র জনগোষ্ঠীর অগণন আশ্রয়চ্ছিন্ন মানুষ।[১২]

আলোচ্য আত্মজীবনীটি প্রকৃত অর্থে গোষ্ঠী জীবনী। কথক দেশভাগের প্রসঙ্গে আসার আগে তাঁর ছেলেবেলা ও গ্রাম জীবনের যে বর্ণনা করেন তাঁর মধ্যেই নিবিড় ভাবে মিশে থাকে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে গোষ্ঠী সংস্কৃতির সম্পর্ক। যে সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এই অংশটি পড়ে আমরা জানতে পারি যে, যশোহর জেলার মণিরামপুর থানার পাড়িয়ালী গ্রামটির ছিয়ানব্বই অঞ্চলে ছিল যতীন বালার পরিবারের সুদীর্ঘকালের বসবাস। ছিয়ানব্বই জনপদ গড়ে উঠেছে ছিয়ানব্বইটি ছোট-বড় গ্রাম নিয়ে। এই ছিয়ানব্বইটি গ্রামে তথাকথিত নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। তাদের বেশিরভাগই ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং লাঠিয়াল। একদা যশোহরের বিখ্যাত রাজা প্রতাপাদিত্য, এই জনগোষ্ঠীর বীর যোদ্ধা-লাঠিয়ালদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'বাহান্ন হাজার' ঢালী সৈন্যবাহিনী, যে সৈন্যবাহিনী দিল্লির সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সহ মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করেছিল।

সদ্যগঠিত পাকিস্তানে লেখকের পরিবার প্রথমেই আক্রান্ত হয় কারণ ছিয়ানব্বই অঞ্চলে যতীন বালার পরিবারের লোকজন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে তাঁর ঠাকুরদা সিদ্ধিরাম বালা মণিরামপুর থানায়, পুলিশ প্রশাসনের স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। দেশপ্রেমিক রজত বিশ্বাসের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তিনি সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। এই আত্মকথনের সূত্র ধরেই জানতে পারি লেখকের ঠাকুরদা ছিলেন বিপ্লবী বাঘাযতীনের বিশ্বস্ত সহকর্মী। পরবর্তীকালে যতীনবালার বড়দা বিজয়কৃষ্ণ বালা হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

তিনি ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা ডাঃ জীবনরতন ধর, অমূল্য কর, বিধুভূষণ রায় প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং পরিণামে নয়মাস যশোহর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকেন। পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ঠাকুরদাদার চাকরি যাওয়া, বড়দাদার জেল হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার শরিক তাঁরা হতে পারেন নি। কারণ দেশভাগের পর থেকে পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল মুসলমান রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোনো স্থান নেই।

সেই সময় মুসলিম লিগের সদস্যরা লেখকের পরিবারের উপর সরাসরি গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ আনেন। এই অভিযোগের কারণ হিসাবে তাঁরা দেখান যে দেশভাগের পরেও লেখকের পরিবার কংগ্রেসী এবং হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ভারত রাষ্ট্রে না গিয়ে পাকিস্তানে থেকেছেন। দেশভাগের পর পাকিস্তানের মুসলিম লিগ তাঁর বাবা চটকচন্দ্র বালাকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করে, সঙ্গে প্রতিনিয়ত চলতে থাকে খুনের হুমকি আর নানাবিধ হেনস্থা। এই সময়কালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> ...এই সকল ঘটনার যন্ত্রণা, প্রতিদিন কুরে কুরে খাচ্ছিল; আমাদের পরিবারের প্রতিটি মানুষকে। গভীর হতাশায় আর নিরাপত্তাহীনতায়; পরিবারের প্রতিটি মানুষের হৃদপিণ্ড যেন কুকড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল অনেক অশ্রু, অনেক রক্তপাতের বিনিময়ে পাওয়া খণ্ডিত-স্বাধীনতা প্রতিদিনই পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মানুষদের কাছে বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল। দেশভাগ হয়েছে, স্বাধীনতাও এসেছে অথচ দাঙ্গায় ভ্রাতৃহত্যার রক্তপাত, নারীধর্ষণ, ঘর পোড়ানো বিরাম নেই। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষজন রক্তপাতহীন, নারীহরণহীন, নারীধর্ষণহীন এবং সংখ্যালঘুর ঘরপোড়াহীন – একটা দিনও পায়নি।[১৩]

চোখের সামনে দেখেছেন একদল মানুষ বাপ-ঠাকুরদাদা-চৌদ্দপুরুষের জন্মভূমি-ভিটেমাটি, জমাজমি – সর্বস্ব ফেলে রেখে, উদ্বাস্তু ছিন্নমূল শরণার্থী হয়ে, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা থেকে গ্রাম উজাড় করে ভারতে চলে যাচ্ছেন। শূন্য হয়ে যাচ্ছে তথাকথিত হিন্দু নমঃশূদ্র গ্রামগুলি। এই অবস্থায় লেখকদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া বৌলপোতা গ্রামে উঠে আসেন, এই গ্রামটি ছিল যশোহর জেলার মধ্যেই। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাঁদের মাথায় এই চিন্তাভাবনাও কাজ করেছিল যে দেশভাগ ও দেশত্যাগের হুজুগ কেটে গেলে তাঁরা তাঁদের জন্মভূমি ছিয়ানব্বই অঞ্চলে ফিরে আসত পারবেন। আর যদি মুসলমানদের অত্যাচার অসহনীয় হয় তাহলে সীমান্ত পেরিয়ে খুব সহজে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। লেখকও তাঁর আত্মীয়স্বজনসহ মোট সাঁইত্রিশটি পরিবার বৌলপোতা গ্রামে উঠে গিয়ে ঘরবাড়ি বেঁধে বসবাস করতে লাগলেন।

> ...এই বৌলপোতা গ্রামে উঠে আসবার পর আমাদের বাবা দুটি বছরও বাঁচেননি। দেশভাগ, দাঙ্গা, বাসভূমি পরিবর্তন, নতুন পরিবেশ, নতুন বসতি গড়ে তুলতে এবং দেশের মহাসংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের বাবাকে এতই ছোটাছুটি করতে হয়েছিল যে, তার জন্য তাঁর জীবনীশক্তি তলানিতে এসে ঠেকেছিল। সময়ের হাতে তাই নিজেকে সমর্পণ করে, আমাদের বাবা চটকচন্দ বালা অকালে ঊনষাট বছর বয়সে, বৌলপোতা গ্রামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[১৪]

তাঁর বাবা মারা যাওয়ার একমাসের মধ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিহার প্রদেশের দাঙ্গায় তাড়া খেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া ভারতীয় মুসলমানগণ এবং দাঙ্গাবাজরা মিলিতভাবে বৌলপোতা গ্রাম আক্রমণ করে। দাঙ্গাবাজরা গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে

দিয়ে নির্বিচারে লুঠপাট চালায়। গ্রামের মানুষরা প্রাণভয়ে কোনোক্রমে নদী পেরিয়ে হিন্দুপ্রধান গ্রাম বড়মান্দায় আশ্রয় নেয়।

বৌলপোতা গ্রামের আঠারোটি পরিবার ছিয়ানব্বই অঞ্চলে ফিরে গেলেও যতীন বালার পরিবার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ এত কিছু পেরিয়ে আসার পর আর কেউই পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার মতো সাহস, নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারেনি।

এরপর সীমান্তের অনিশ্চিত পথে যাত্রা শুরু হয় তাঁদের। পিচঢালা যশোর রোডের রোদে ঝলসানো রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটতে থাকা শত শত উদ্বাস্তু শরণার্থীর ছুটে চলা কেমন ছিল আদতে—

> বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত চিহ্নের আধমাইল আগেই হয়তো হবে — আমরা অগণিত মানুষজনের ভিড়ে আটকে গেলাম, ছুটে চলার সুযোগ নেই। ছিন্নমূল শরণার্থী জনতা আস্তে আস্তে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও আমাদের বোঁচকা-বুঁচকির বোঝা মাথায় ঘাড়ে, কাখে আর হাতে আর শিকেবাঁকে নিয়েই হাঁটছি। বেনাপোল সীমান্ত চৌকির অদূরে বহুস্থান জুড়ে রাস্তার উপরে, রাস্থার দুধারে নয়ানজুলিতে এবং ধীরে চলা কাতারে কাতার উদ্বাস্তু শরণার্থী মানুষজন মাইগ্রেশন করে আসছেন, সীমান্তের পুলিশ প্রশাসন তাদের খানাতল্লাশির নামে নারী পুরুষ বাচ্চা বুড়ো বুড়িকে এত নিষ্ঠুর অমানবিক ভাবে হাতিয়ে দেখছে - যা পৃথিবীর কোন ভাষা দিয়েই স্পষ্ট করা যাবে না। দেশভাগে, দেশত্যাগে মানুষজনের কষ্টের, দুঃখের, ক্ষুধাকাতর ব্যাথাবেদনার আর দুশ্চিন্তার সীমা পরিসীমা নেই।। তার উপর পুলিশ প্রশাসনের লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার আর ভোগান্তিরও শেষ নেই।[১৫]

এই সংকট থেকেই জন্ম নেয়, বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এক প্রকারের ভীতি, সেই ভীতি থেকে অনিশ্চয়তা ও সেখান থেকেই অবিশ্বাস, হিংসা ইত্যাদি। স্বভূমি

থেকে উচ্ছেদের পরে প্রাথমিক আশ্রয় জুটেছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। লেখক স্টেশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন – গোটা স্টেশন চত্বরে গিজ গিজ করছে শরণার্থী। কেউ মরে পড়ে আছে, কোনো মা সন্তানের জন্ম দিতে ব্যস্ত। ময়লা আবর্জনা ঝেঁটিয়ে যেমন এক জায়গায় স্তুপ করে রাখা হয় ঠিক তেমন ভাবেই যেন উদ্বাস্তুদের ঝেঁটিয়ে এনে স্তুপ করে – গাদা করে রাখা হয়েছে।

এখান থেকে আর পাঁচটা পরিবারের সঙ্গে লেখকের পরিবারকে লরিতে করে হুগলি জেলার ত্রিবেণী থানার নসরাইল গ্রামের পাশে কুন্তিচণ্ডীর পাড়ে এনে তোলা হয়। বিস্তৃত ঝাটি বন পরিষ্কার করে শরণার্থীরা মোম লাগানো তাঁবু টাঙিয়ে ঘর করে নেয়। দুটি শালকাঠের খুঁটি, একটি আড়া, দশটি গোঁজ বা খোঁটা এবং একটি হলুদ রঙের তাঁবু বরাদ্দ ছিল প্রতিটি পরিবারের জন্য। উদ্বাস্তু শিবির এলাকায় কোনো গাছ নেই, কোনো ছায়া নেই, খোলা আকাশের নীচে দুপুরের সূর্যের তাপ মোম লাগানো তাঁবুর উপর পড়লে সেই তাপে উদ্বাস্তুরা আধ-পোড়া হতে থাকে, সেই সঙ্গে মাসান্তে সামান্য ক্যাশ ডোলের উপর নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকা, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য শৌচালয়, সামান্য নলকূপ, লেখকের দীর্ঘ দুই বছর কাটে এই কুন্তী উদ্বাস্তু শিবিরে।

যতীন বালা লিখেছেন তাঁদের কুন্তী ট্রানজিট ক্যাম্পের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ ছিল নিম্নবর্গীয়। জমি, জীবিকা, সংস্কৃতি পরিচয় যে জাতিগত শোষণের মোকাবিলা করতে পারে সেই জাতিগত শোষণের মোকাবিলা করতে পারে না উদ্বাস্তুর অবস্থান। এই অবস্থানে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর পরিচিতি নির্মাণের প্রক্রিয়া। কারণ

বারবার স্থানান্তরিত হতে হয় এই সব মানুষজনদের। উদ্বাস্তু ক্যাম্প, কলোনি, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান, উত্তর প্রদেশ ও শেষে এক অংশ মরিচঝাঁপি।

কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পের সুপারিনটেনডেন্ট বদলি হয়ে যাওয়ার সময় তাকে ধরে লেখকের পরিবার হুগলি জেলার 'ভাণ্ডারহাটি' ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে বদলি হয়ে যায়। কথা ছিল, ভাণ্ডারহাটি জমির উন্নয়ন ঘটিয়ে সেখানেই কর্মরত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু অন্যান্য ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পের মতো এখানকার উদ্বাস্তুদেরও উন্নয়ন ঘটানো জমিতে স্থান হয়নি। লেখকের কথায় ভাণ্ডারহাটি ক্যাম্পেও খাল কাটা শেষ হল। তারপরই বাতাসে খবর শোনা গেল ভাণ্ডারহাটি উদ্বাস্তু শিবির তুলে দেওয়া হবে এবং এখানকার লোকগুলিকে বিভিন্ন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এইখানে আর কাজ নেই।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেই একদিন রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় একদল মানুষ ক্যাম্পসুপার কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলে সমগ্র ক্যাম্প জুড়ে ব্যাপক অত্যাচার শুরু হয়। আবার স্থানান্তর। ইতিমধ্যে দু-দু'টি উদ্বাস্তু শিবির কাটিয়ে এসে এই তৃতীয় উদ্বাস্তু শিবির বলাগড়ে এসে লেখকের মনে হয়েছিল—

> ...জীবনের অন্তহীন অপচয়, অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুরতা আর ধারাবাহিক অনিশ্চয়তার আঁধারে তলিয়ে যাওয়াই আমাদের ভবিতব্য এদেশের মাটিতে কিছুতেই উদ্বাস্তুদের স্থায়ী শিকড় বসাতে দেবে না সরকার।[১৬]

অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে উদ্বাস্তুরা এই পর্যায়ে এসে ক্রমে সংগঠিত হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসন, পর্যাপ্ত ডোল চালু করা এবং সমস্তরকম সহানুভূতির দাবিতে উদ্বাস্তুরা সমাবেশ, মিছিল, মিটিং করে জমায়েত হতে শুরু করে। অবশেষে তারা আমরণ অনশনের ডাক দিয়ে মতুয়া নেতা ধীমান গোঁসাইয়ের নেতৃত্বে

একজোট হয়ে। অনশনে বাদল হালদারের মৃত্যু হয়। অনশনের আঠাশ দিনের মাথায় সরকার সাড়ে চারশো অনশনকারী উদ্বাস্তুকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেয়। এদের মধ্যে যারা সরকারের কাছে জবানবন্দি দেয় যে ‘তারা দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনে যাবে’, তারাই কেবল মুক্তি পায়। জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লরি তাদের তুলে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে পাড়ি দেয়। দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে স্বয়ং লেখকই অংশগ্রহণ করেছেন। একের পর এক উদ্বাস্তু ক্যাম্প বদলাতে হয়েছে তাঁকে; নানা রকম অত্যাচার আর অপমান সহ্য করে জীবনের উপান্তে এসে আজও তিনি ভুলতে পারেন না ক্যাম্প জীবনের বেদনাময় স্মৃতি।

‘যশোরের স্মৃতি ও উদ্বাস্তু ক্যাম্পের জীবন’ শীর্ষক সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটি আত্মকথনের শেষ অংশে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> ...হুগলি জেলার ত্রিবেণী থানার ‘কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্প’, ধনিয়াখালি থানার ‘ভাণ্ডারহাটি ওয়ার্ক সাইড ক্যাম্প’ এবং ‘বলাগড় রিফিউজি ক্যাম্প’ – এই তিনটি উদ্বাস্তু শরণার্থী শিবিরে প্রায় দশ বছর (১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩) একটানা জীবন্ত নরক ভোগ আমি করেছি।... আঁচড়ে-কামড়ে, আঘাত-অত্যাচারে, এমনকী রক্ত বের করে দিলেও সেই উদ্বাস্তু-ছিন্নমূল শরণার্থী জীবনের ছাপ আমার চোখ-মুখ থেকে কিছুতেই মুছে যাবে না, সারাজীবনই আমি তা রক্তে বহন করে বেড়াব।[১৭]

এইরকম অসংখ্য ক্যাম্প তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এই রকম একটি ক্যাম্পের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে উথে আসে *কুপার্স ক্যাম্পে ছেলেবেলা* নামে যোগেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিকথা। উদ্বাস্তু মানুষের ক্যাম্প জীবনের প্রতিদিনের বাঁচা-মরার লড়াইয়ের কথাই তিনি বলে যেতে পেরেছেন তার লেখাতে। তিনি জানিয়েছেন যে সেইসময় পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ১৫-টি উদ্বাস্তু শিবির খুলেছিল। কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া,

শালবনি, পানাগড়, বিষ্ণুপুর, রূপশ্রী, পল্লী, ঘুসুড়ি, অশোকনগর, নবাবনগর, গোপালপুর, সিউড়ি, সোনারপুর, ঘুটিয়ারি শরিফ ইত্যাদি। এদের মধ্যে নদীয়া জেলার রানাঘাট অঞ্চলের কুপার্স ক্যাম্প সবচেয়ে বড় ট্র্যানজিট ক্যাম্প বলে পরিচিত ছিল। ১৯৫২ সালে যখন লেখকের বয়স পাঁচ পূর্ণ হয়নি, তখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তিনি চলে আসেন কুপার্স ক্যাম্পের এইচ ব্লক ২৪৮ নং ঘরের চার ভাগের এক ভাগ অংশে। কেমন ছিল এই ক্যাম্পের পরিবেশ তা বোঝাতে গিয়ে তিনি স্মৃতিচারণ করেন,

> ...সবচেয়ে বড় সংকট ছিল জলের লাইনে। কলের গোড়ায় সাপের চলার গতির ন্যায় লম্বা আঁকাবাঁকা লাইন পড়ত। ফলে ঠেলাঠেলি, হাতাহাতি, মারামারি প্রায়ই লেগে থাকত। এই সময়ে যে যত পারত ওপার বাংলার জেলাওয়ারি, আঞ্চলিক কথ্য ভাষার দক্ষতা দেখিয়ে খিস্তিখামারি – গালাগালি করত। এমন সব ভাষা ব্যবহার করা হত যা শালীনতার সীমারেখা ছাড়িয়ে যেত। এ এক বর্বর যুগের খণ্ডচিত্র। ঝগড়া মারামারির সময় ওপার বাংলার আত্মীয়প্রীতি, জেলাপ্রীতি উথলে উঠত। নিরীহ, নির্বিবাদী, দুর্বল মানুষ একঘরে হয়ে পড়তেন। ব্যাঙের ছাতার মতো বহু ক্লাব, সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কখনও ক্লাবে-ক্লাবে খেলাধূলা নিয়ে মাঠে লড়াই হত। কখনও আবার উপভোগ্য খেলা দেখে দর্শক আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন পালা অভিনয় হত। গাজনের গান, কবিগান হত। বিভিন্ন পার্বণে নানা অনুষ্ঠান দেখে মনোবিকাশের মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের সৃষ্টি হত।[১৮]

একটি সমাজ জীবনে আসতে থাকে নতুন নতুন শব্দ, ক্যাশডোল ও ড্রাইডোল, যাতে দেওয়া হত বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাবার ও নগদ টাকা। দু' সপ্তাহ অন্তর মাথাপিছু ক্যাশ ডোল ২ টাকা এবং ড্রাই ডোল ২ সের চাল ও ২ সের গম। এর উপর রেশনের চালে কাঁকর, পোকা ধরা বা রেঙ্গুনের গন্ধওয়ালা চাল বা পোকা ধরা গম, ধুলোবালিসহ

গম মাপেও কমে যেত অনেকখানি। এই অত্যন্ত অল্প সাহায্যে একটা পরিবারের নিত্য প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব ছিল। ফলে অসহায়তা ও ক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়ত।

লেখক যোগেন্দ্রনাথ রায় এই স্মৃতিকথায় গোষ্ঠী জীবনকে অনেকখানি গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে দেশভাগের অশনি সংকেত বুঝতে পেরে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশভাগের পূর্বক্ষণে বা অব্যবহিত পরে ওপার বাংলা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এঁরা ছিলেন মূলত পূর্ববাংলার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। জমিদার, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, বিভিন্ন অফিস কর্মচারি ও রাজনৈতিক কর্মী। এই সম্প্রদায়ের দেশত্যাগীরা এপার বাংলায় নিজ নিজ শিক্ষা ও আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে যে যেমন পেরেছেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ব্যক্তিজীবনে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের বৃহত্তম অংশ অশিক্ষিত নিম্ন আয়ের কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী মানুষ এবং মনেপ্রাণে যাঁরা দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা সেই অশণি সংকেত বুঝতে পারেননি। ফলস্বরূপ, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববাংলায় ঘটে যায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা ছিল মূলত পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকারের পরিকল্পিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

> দাঙ্গাকারীরা হিন্দুদের চিহ্নিত করতে গিয়ে কে শূদ্র, আর কে ব্রাহ্মণ সেই বিচার করেনি। ধর্ম পরিচয়ই ছিল তাদের বিবেচ্য। এই ভয়াবহ দাঙ্গার পর হিন্দুদের দেশত্যাগ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। এদের মধ্যে সিংহভাগই ছিল দলিত শ্রেণির মানুষ। যারা কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্রটুকু সম্বল করেই দেশ ছেড়েছিল।[১৯]

তিনি জানিয়েছেন পূর্ব বাংলা থেকে যাঁরা কুপার্স ক্যাম্পে এসেছিলেন তাদের বেশিরভাগ ছিলেন বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর জেলার। ওপার বাংলায় যে সব মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত ছিলেন, এপার বাংলায় তাঁরা জমি হারিয়ে হয়ে যান কৃষি মজআবন;

যাঁরা মৎস্যজীবী ছিলেন, এপারে নদীনালার অভাবে মাছের ফেরিওয়ালা ভেন্ডোর হিসাবে কাজ নেন এবং যার ব্যবসা ছিল তিনি কর্মচারীতে পরিণত হয়েছেন।

দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার যেমন পরিবর্তন হয় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের, সেই সঙ্গে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই উদ্বাস্তু মানুষদের পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। নতুন প্রজন্মের যুবকেরা পৈতৃক পেশা হারিয়ে হ্যাণ্ডলুম, পাওয়ার লুমে শ্রমিকের কাজে, গৃহনির্মাণ কর্মী হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকদের জোগান অনেক বেশি হয়ে পরে। সস্তার মজুরদের দিয়ে কাজ করিয়ে বহু মালিক তাদের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নেয় এই সঙ্কটের সময়ে। যুবক প্রজন্মের একটা অংশ কর্মহীনতা থেকে সর্বনাশের পথে চলে যায়।

> ...বাঙালি উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন Transit Camp-এ ডোল নামক খয়রাতি সাহায্য উদ্বাস্তুদের শারিরীক মানসিক কর্মক্ষমতা নষ্ট করেছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যত সময় নষ্ট হয়েছে, পরিকাঠামো ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মন্ত্রী, আমলা, ঠিকাদার, সাপ্লায়ার প্রভৃতি মিডলম্যানদের পকেট ভারী হয়েছে। কথায় বলে নেপোয় মারে দই।[২০]

ইতিমধ্যেই ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা ক্যাম্পভুক্ত উচ্চবর্ণের তথা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে 'Small Trade' লোন বা ব্যবসায়ী লোন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শহরতলী অঞ্চলে যেমন চন্দননগর, উত্তরপাড়া, ভদ্রেশ্বর, কানাইপুর, কোন্নগর, রিষড়া, কল্যাণী, চাকদহ, গয়েশপুর, সোদপুর, গোবরডাঙ্গা, যাদবপুর, ঘুটিয়ারি শরীফ, বারাসাত ও আরও বহুস্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয় এবং কুপার্স ক্যাম্প থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রাণশক্তি যতীন সাহা ও রতীশ মল্লিক চলে যান চন্দননগরে বিজনেস লোন নিয়ে। পেছনে পড়ে থেকে যায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের বৃহত্তম অংশ, দলিত শ্রেণির উদ্বাস্তুরা,

যাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। সরকারী ভাবে কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের প্রথমে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের ডাক দেওয়া হলে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু আন্দামানে চলে যায়। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল বামপন্থীদের বিরোধিতার ফলে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে যাওয়া স্থগিত হয়ে যায়।

এই ক্ষেত্রে লেখকের মনে হয়েছে আন্দামানে পুনর্বাসন না হওয়ার কারণে নদী-নালার দেশের উদ্বাস্তু কৃষিজীবীরা একটা সুযোগ হারায়। বাঙালিরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তারা সরকারি সুযোগ লাভ করতে পারত। এর বদলে উদ্বাস্তুদের পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশার অনুন্নত অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এই অঞ্চলগুলির সরকারি ভাষা হিন্দি। এর ফলে বাঙালিরা মাতৃভাষায় শিক্ষা বা চাকুরির সুযোগ হারায়। তার উপর বাঙালি উদ্বাস্তুদের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ ছিলেন ওপার বাংলার হিন্দু তপসিলীভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা বাংলার তপসিলিভুক্ত স্বীকৃতি সার্টিফিকেট পেয়ে শিক্ষায় ও চাকরিতে যে সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ পায়, তা বাংলার বাইরে তাদের কোনো কাজে লাগে না। কারণ সেখানে বাঙালিদের সকলকে একশ্রেণিতে ‘জেনারেল’ বলে মানে। ফলে দলিত শ্রেণির উদ্বাস্তুরা সবদিক থেকেই বঞ্চিত হয়। এরপর যখন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ডাক আসে তখন যোগেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পরিবার সেখানে যেতে অস্বীকার করে। পরিণতিতে শাস্তিস্বরূপ সরকারি ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি একটা সময় পানীয় জলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্যাম্পগুলিতে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অংশ হয়ে থাকল মূলত দলিত শ্রেণির মানুষ আর সেই সুত্র ধরেই বাংলায় গজিয়ে উঠতে থাকে দলিত আন্দোলনের ছত্রাক। বাংলার দলিত আন্দোলনের নেতা মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী ক্যাম্পের নেতাদের উদ্যোগে, কুপার্স ক্যাম্পে উদ্বাস্তু পরিবারদের ডোল চালু এবং সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে নয়জন অনশনকারী আমরণ অনশন আন্দোলন শুরু করেন। প্রশাসন যাতে আন্দোলনকারীদের সহজে তুলে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য শিবিরের চারপাশে পরিখা কাটা হয়। আন্দোলনের বাইশ দিনের মাথায়, কুপার্স ক্যাম্পের কুখ্যাত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ক্যাপ্টেন ফনী গুহ আধাসামরিক পুলিশ বাহিনী দিয়ে শিবির ভেঙে অনশনকারিদের অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে রানাঘাটের দিকে রওনা হয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে সরকার ‘পোড়ামাটি নীতি’ গ্রহন করে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় যাতে বহু মানুষ আহত হন, অনেকে বন্দী হন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন তীব্রতা হারায়। কুপার্স ক্যাম্পের এই ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত সময়পর্বে ১৯৬৩ সালে লেখক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইখানে এসেই শেষ হয় এই মৃতিকথা। এই স্মৃতিকথাতেই তিনি জানিয়েছেন এই কুপার্স ক্যাম্পেরই রমেশচন্দ্র হাওলাদার, গোঁসাইলাল ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণপদ হালদার, সুভাষ মণ্ডল, ননী সাহা, সুবোধ দাস, গোলোক মণ্ডলরা পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করে ক্যাম্পের নাম উজ্জ্বল করেছেন। খুব অল্প সংখ্যায় হলেও ক্যাম্পের মধ্যেকার কিছু মানুষ তাঁদের নিজেদের সত্ত্বা, এক বিকল্প পরিচয় নির্মাণ করতে শুরু করেন।

এই সমস্ত ক্যাম্প কলোনির মধ্যেই ঘুরে ঘুরে নারী জাগরণের কাজ করেছিলেন মণিকুন্তলা সেন সহ আরও অনেকে। তিনি তাঁর *সেদিনের কথা*-র স্মৃতিচারণায় লিখেছেন নেহেরু কলোনি, গান্ধী কলোনি, নেতাজি নগর, আজাদগড় কলোনির কথা, এই সমস্ত কলোনিগুলিতে তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা। সরকারি ক্যাম্পগুলির বিভীষিকাময় অবস্থা, মানুষের জীবিকার পরিবর্তনের কথা নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর আত্মজীবনী। কঠোর জীবনযুদ্ধে প্রতিদিন যুঝতে থাকা ক্যাম্পের মেয়েরা জীবিকার জন্য পথে নামে। মণিকুন্তলা সেন এগিয়ে রেখেছিলেন ওপার বাংলা থেকে আসা এই সমস্ত কলোনির মেয়েদের, তিনি লিখেছেন—

> ...পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরাণি কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কী উপকার করেছে তা হয়তো কেউই টের পায়নি। ওই মেয়েদের নির্ভিক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে সমস্ত বদ্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপ ছাড়া সহজে হত না।[২১]

একই প্রসঙ্গে *কুপার্স ক্যাম্পে ছেলেবেলা*-তেও যোগেন্দ্রনাথ রায় বলেন—

> মফস্বল বলতে কায়িক শ্রম। যেসব মা বোনেরা ওপার বাংলায় কালেভদ্রে মাঠে যেতেন, এপারে এসে মাঠে মাঠে গোবর কুড়ানো, কয়লা খোটা কাঠ কুড়ানোর কাজে নিয়মিত যেতে হয় পেটের তাগিদে। আবার অনেকে ঘরে বসে খেজুর পাতা, হোগলা পাতা দিয়ে মাদুর বোনা, বিড়ি বাঁধা, সুতো কাটা, সেলাই করা কাজে যুক্ত হতে থাকলেন।[২২]

কলোনির দুর্দশার চিত্র ফুটে ওঠে কানন বড়ালের লেখাতেও। তার *আত্মাকথা* তে কলোনির অন্নাভাব, কষ্টের সাথে সামিল হয় শিক্ষার ওপর ভরসার মন্ত্র। তিনি তুলে ধরেন উদ্বাস্তু

মানুষের সেই মন্ত্র যা বুকে নিয়ে লড়ে তারা গেছে নতুন প্রজন্মকে মানুষ করে তোলার অদম্য বাসনায়। তার স্মৃতির পাতা থেক উঠে আসে এই কথাগুলি,

> পঞ্চান্ন থেকে ষাট-এর দশকে এই কলোনীগুলির অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চারিদিকে শুধু অভাবই অভাব। কাল কী খাবে, ছেলে মেয়েদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারব কিনা তা তাদের জানা ছিল না। তাদের একটা অদম্য জেদ ছিল যে করে হোক সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে।[২৩]

আত্মজীবনীর পাশাপাশি, মননকুমার মণ্ডল সম্পাদিত, *বাংলার পার্টিশন কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজে* বইটিতে উঠে এসেছে একাধিক নিম্নবর্গের নারীর গল্প। এই সংকলন আমাদের বিশেষ ভাবে দেখায় যে, শিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতা গৃহবধূর তুলনায় ঘরের বাইরে জীবিকায় নিযুক্ত নারীরা নিজেদের কথা বলতে বেশি দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী।

সম্পাদিত এই বইয়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলির কথা উথে আসে তার মধ্যে মৃণালিনী বিশ্বাস একজন। তিনি ছিলেন দলিত মতুয়া উদ্বাস্তু আন্দোলনের একজন নেত্রী। নারীজাগরণ, শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন। বাগদা-হেলেঞ্চা অঞ্চলে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও আন্দোলন করেন। পেশায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৃণালিনী বিশ্বাসের গল্পে উঠে আসে ঘর-গেরস্থালির সামান্য কথার সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের কথা। বহু উদ্বস্তু দিনের পর দিন তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে তারা চলেও যায়, অনেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃণালিনী হয়ে ওঠেন তাঁদের অনেকের ‘মা’। উদ্বাস্তু জনতার ‘মা’, অনেক মতুয়া নমঃশূদ্রদের ‘মা’। দেশভাগ উদ্বাস্তুজীবন তাঁকে এই একটি পরিচয়ও দেয়। তিনি তাঁর অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে সমাজ নির্মাণের কাজ শুরু করেন, স্বামীর স্বপ্নকে সফল করার জন্য তিনি শেষদিন অবধি

সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি যেন তাঁর স্বামীর পরবর্তী প্রজন্ম হয়ে স্বামীর স্বপ্ন সফল করার দিকে এগিয়ে যান। দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবন শিক্ষিতা নারীকে সমাজকর্মীও করে তুলেছিল।

অর্চিত বসু গুহ রায়চৌধুরী *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* জার্নালে একটি প্রবন্ধে দেখান যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু নিম্নবর্ণের মহিলারা গৃহস্থালী থেকে বাইরের জনপরিসরে প্রবেশের পথে অগ্রসর হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের পরিবাররে দায়িত্বের চেয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্বে অংশগ্রহণে বেশি মননিবেশ করেছিল। পূর্বেও আমাদের কাছে নজির আছে যে আর্থ-সামাজিক কারণে তারা সমাজের উচ্চবর্ণের নারীদের তুলনায় পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা কম অবদমিত ও আবদ্ধ ছিল।

ভারতবর্ষের আর একটি বৃহৎ বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনক্ষেত্র হল আন্দামান। সেখানেও নারীদের জীবনধারা বিপুলভাবে বদলে যায় ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের পরে, যেদিন প্রথম উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দামানের উদ্দেশ্যে জাহাজ ছাড়ে। এরপর ধাপে ধাপে সেখানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেড়েছে। দণ্ডকারণ্যের মতো এখানকার উদ্বাস্তু নারীদেরও কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন সংগ্রামে রত হতে হয়েছিল। ক্রমে গৃহ নির্মাণ, চাষবাসের কাজে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। উদ্বাস্তুদের জন্য আন্দামানে নতুন করে গ্রাম পত্তন হচ্ছে। নির্মাণ হচ্ছে রাস্তাঘাট। বন কেটে ভারী ভারী গাছের গুঁড়ি সরাবার কাজ করছে রাঁচি শ্রমিকের দল। রাস্তার কাজে আরও লোক চাই। পুনর্বাসনের দায়িত্বে থাকা পদস্থ কর্মকর্তারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আবেদন জানাচ্ছে এ কাজে

নাম লেখাতে। পুরুষরা খেতের কাজে ব্যস্ত, তাই এই ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসে। এভাবেই আন্দামানে নারীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা।

সরকার উদ্বাস্তুদের শিক্ষার প্রসারের জন্য গ্রামগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করে। সেখানে শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি বিদ্যালয় সহকারীর পদে নিযুক্ত হন উদ্বাস্তু নারীরা। শিল্প-সংস্কৃতিতে, বিশেষ করে যাত্রা-নাটকে নারীর অংশগ্রহণ সে সময়ের প্রেক্ষিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্ববঙ্গে যাত্রা-নাটকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ একেবারেই চোখে পড়েনি। পুরুষেরাই মহিলা সেজে অভিনয় করত। আন্দামানে এসে সেই রীতি ভেঙে যায়। নারীদের বাইরের কাজে যোগদান তাদের আত্মবিশ্বাসকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি অফিসে, স্কুলে-কলেজে যেমন তাদের অবাধ পদচারণা, তেমনি পুলিশ বিভাগ এমনকী বনরক্ষীর কাজেও তাঁরা যোগ দিয়েছেন – যা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। আন্দামান বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র। এই পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু নারী। দেশভাগ এই ক্ষেত্রে নারীকে দিয়েছে পুরুষের সমকক্ষতা।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর প্রবন্ধ 'মরিচঝাপির ভুলে যাওয়া দিনগুলি'তে দেখি নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীজীবনের স্বাতন্ত্র্যনির্মাণ ও স্বাধিকারের দাবিতে আন্দামান যাওয়ার ও সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য তীব্র ইচ্ছা ও রাজনৈতিক কারণে তা পূরণ না হওয়ার তীব্র আক্ষেপ। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বৃহত্তর বাঙালি পরিচয়ের কথাই বলেন। বাঙালির একাধিপত্য তৈরি হতে পারত আন্দামানে, একথাও বলেন। তাঁর এই আক্ষেপ থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল, এক খণ্ড জমির মালিকানা মানুষকে তাঁর নিজ (self)-কে

অনুসন্ধান করতে সাহস যোগায়। সংস্কৃতি নির্মাণের অনুকূল বাতাবরণ তৈরি করে জমি কেবল বাঁচার জন্যও নয়, জমি পরিচিতি তৈরি করার পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই তারা জমি চেয়েছিলেন, সে জমি আন্দামানে হলেও।

১৯৫০ সালে *যুগান্তর* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামে কয়েকটি রচনা। পূর্ববাংলা ছেড়ে আসা মানুষেরা এইসব রচনাগুলিতে লিখেছিলেন তাঁদের ছেড়ে আসা গ্রামের স্মৃতি। কথকেরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মানুষ, কিন্তু আশ্চর্য তাদের অনুভূতির ঐক্য! প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় নিজের গ্রামের কথা বলায় হয়েছে মায়ের উপমায় – 'গ্রাম নয়। জননী।' গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণা, জলবিন্দু, লতাগুল্মের সঙ্গে তাঁদের প্রাণের যোগ ছিল। উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুরনগর ফুল বাজারে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ফুলবিপণন কেন্দ্র। অঞ্চলটি বাংলাদেশ সীমান্ত-ঘেঁষা। এই ব্যবসায় যুক্ত শতকরা ৮০ শতাংশেরই বেশি মানুষ দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে আসা নিম্নবর্ণের নারী। ক্ষেত্রসমীক্ষা দেখা গেছে এই ফুল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বেশির ভাগ পরিবারেই পুরুষেরা 'ঘরের কাজ' সামলায়। পাশাপাশি নারীরা রোজগারের তাগিদে 'বাইরের কাজ' সামলাচ্ছে।

'মাগুরার স্মৃতি' শীর্ষক স্মৃতিকথার শুরুতে অধীর বিশ্বাস তাঁর যশোর জেলার মগুরা গ্রামের ভূগোল আঁকতে গিয়ে লিখেছেন বাঁশবনের ঘন জঙ্গল আর দোয়া-দিঘির মাঝখানের হিন্দু অধ্যুষিত সা' পাড়ার মাঝে ছিল নাপিতবাড়ি। ওটাই ছিল লেখকদের পারিবারিক পরিচিতি – দীনহীন পরিবার এবং বংশপরিচয় ছোট বলে গ্রামে আমরা 'একঘরে'।

আলোচ্য কথকের দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে আছে একাধিক স্মৃতিকথা। এমনি একটি লেখা *আমরা তো এখন ইণ্ডিয়ায়* নামের রচয়াটিতে সেই সময়ের দিনগুলির কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ...এভাবেই একটা একটা পরিবার পূর্ববাংলা থেকে খালি হতে থাকে। তখন পাসপোর্টের তেমন চল ছিল না। যে পরিবার যেতে চাইবে, তাদের বাধা দেওয়া হত না। যাদের জমিজমা ছিল না, দোকানপাট ছিল না, তারাই এ দেশে পাড়ি দিয়েছিল অনটনের জন্যই মূলত ভিটেমাটি ত্যাগ। প্রথম পরিবারের এক খণ্ড, অর্থাৎ দু-একজনের আগে গিয়ে জায়গার সন্ধান করা, চাকরির সন্ধান করা। নিদেনপক্ষে একটা বাসাবাড়ি ভাড়া করে চিঠি দিয়ে বলা — অমুক জায়গার অমুক ঠিকানায় বাসা পাওয়া গেছে। তার পরে এক-এক করে পরিবার নিয়ে চলে আসা। এমনভাবেই যশোর জেলার মাগুরা গ্রামের এক যুবকের বাবাকে লেখা চিঠিতে গেঞ্জির কারখানায় চাকরির সংবাদ ছিল। বেতন ১২৫ টাকা। পড়শিদের জানিয়ে দিতেই দরিদ্র পিতার সম্মান রাতারাতি বেড়ে যায়। পাড়া থেকে অন্যরা এসে জানিয়ে যাচ্ছিলেন, ও-দেশে গিয়ে তাদের কথাটা যেন না ভোলেন। তাদের ছেলের কথাটা অন্তত মনে থাকে যেন। শুধু একটা পোস্টকার্ড।[২৪]

অবশেষে সেই মুহূর্তটি আসে যখন আর কোনো দিন ফেরা হবে না জেনেও মনকে প্রবোধ দিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে হাঁটা দিতে হয় — অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। পিছনে পড়ে থাকে উঠোন, টিনের চালা, মায়ের নিজের হাতে লাগানো লেবুগাছ। পড়ে থাকে পুকুরের কালো জলের ঢেউ, দিগন্ত বিস্তৃত খেলার মাঠ।

নিম্নবর্গের উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতিতে এইভাবে দেশ বারবার ভাগ হয়েছে অথবা দেশ থেকে গেছে স্মৃতিতে। ঐতিহাসিক দেশভাগের পর হয়তো তারা বারবার দেশ অনুসন্ধান নয়, দেশ কল্পনা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু একটা কল্পনা থিতু হতে না হতেই আবার

বাস্তুহারা হতে হয়েছে তাদের। রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস তাঁর *দণ্ডকারণে যা দেখেছি, যা পেয়েছি* শীর্ষক স্মৃতিকথনে লিখছেন—

> ...এভাবেই ১৯৭৫ সালে কোনও একদিন, তারিখটা এখন মনে করতে পারছি না আমাদের প্রায় দুই তিন শত পরিবারকে কুরুদ উদ্বাস্তু শিবির থেকে মালকানগিরি নিয়ে যাওয়া হল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কুরুদ উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসের সুবাদে বহু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে পরিচয় পরিণত হয়েছিল বন্ধুত্বে, আত্মীয়তায়। সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গে মিশে ছিলাম কয়েকটা বছর। শিবির ছেড়ে যাওয়ার সময় – সেই সব মানুষের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল অনেক স্মৃতি। পূর্ববাংলার জন্মমাটি ছেড়ে আসার সময় যে ব্যথা হৃদয়ে অনুভব করেছিলাম, কয়েক বছরের এই দ্বিতীয় বাসস্থান ছেড়ে যাওয়ার আগে যেন আবার তেমনই ব্যথায় হৃদয় টনটন করে উঠল।[২৫]

তেমনি একখাতে বয়ে চলে সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে সাহিত্যিক আলোচনা। 'সীমান্তের দুই অবতার' শিরোনামে একটি অতি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথনে সীমান্ত ঘিরে তাঁর 'বিচিত্র অনুভূতি'র কথা তিনি বলেছেন। ১৯৫৬ সালের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, প্রবন্ধে নানা ভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে 'সীমান্ত' প্রসঙ্গ। সীমান্তের কাঁটাতার মানতে না চাওয়ায় লিখেছিলেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ – *বিচ্ছিন্ন বাংলার বিরুদ্ধে*।

তিনি লিখছেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বেশ কয়েক বছর অবধি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত ছিল খুবই শিথিল। তাঁর এই স্মৃতিকথন থেকেই জানতে পারি যে প্রথম দিকে সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াত ছিল অবাধ, পরের দিকে এপারে ওপারে প্রহরীদের দশ-বিশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে নিশ্চিন্তে যাওয়া-আসা চলত। বাংলাদেশের অনেক

দরিদ্র পরিবার তখন প্রবল আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ফলে সেই দেশের অনেকেই বাড়তি কিছু উপার্জনের খোঁজে এপার বাংলায় চলে আসত। একটি জায়গায় উনি একজন মানুষের কথা বলছেন, যার নাম বনমালী।

> ...আমাদের আত্মীয় বনমালী ছিল এরকমই একজন দিনমজুর। মুজিব হত্যার পর সীমান্তে আবার যখন বেশ কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। তখন এক দালালের হাত ধরে এপারে এসে কৃষিমজুর হিসাবে কাজ করতে থাকে। বছর পেরোতে না পেরোতেই তার শরীর যেমন ভেঙে পড়ে, মন ভাগে বোধহয় তারও চেয়ে বেশি। দেশে ফেরার জন্য সে অস্থির হয়ে ওঠে।[২৬]

বনমালী আসলে হাজার-হাজার বছর ধরে সেইসব মানুষদের প্রতিনিধি, যারা বাসভূমির খোঁজে মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে নিজেদের মাথার ভিতরে 'দেশ'-কে সঙ্গে নিয়ে। পৃথিবীর যে দেশেই সে জায়গা পাক, পৃথিবীর যে দেশেই তার ভাত-কাপড়ের সংস্থান হোক, সে হয়তো তার বাসভূমি পাবে কিন্তু সম্ভবত হাজার চেষ্টাতেও নতুন সেই বাসভূমি কখনও তার দেশ হয়ে উঠবে না।

ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন শীর্ষক শিরোনামে লেখা বহুল আলোচিত আত্মজীবনীটির একদম শুরুতে 'লেখকের দু'কথা' অংশে মনোরঞ্জন ব্যাপারীর লিখছেন—

> ...নব নামের সেই যে রিক্সাওয়ালা, লাথখোর নামের সেই যে ট্রাক খালাসি, জীবন নামের ক্রোধী চণ্ডাল, গুড়জল নামের মদখোর, ভগবান নামের সেই চোর, শ্রীপদ নামের মুটে, আগন্তুক পরিচয়ের সেই যে ডাকাত, বাঙাল নামের লেখক — সব আমি। এরা সবাই আমার খণ্ডিত সত্ত্বা। আমি লিখতে বসলেই কলমের ডগায় এসে পড়েছে শুধু আমারই বহুধা বিভাজিত জীবন গাথা। বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবন গাথা। এই সব কথা-কাহিনি কতখানি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ তা আমার পক্ষে বলা একটু কঠিন। সে বিচারের ভার বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকদের উপর ন্যস্ত। শুধু এই টুকুই আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি – ওতে সত্য আছে। নিটোল নির্মম অপ্রিয় সত্য। সে সত্যের শরীরে পোষাক নেই।[২৭]

সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন* প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। পূর্ববঙ্গের বরিশালের উরুকখালির অশিক্ষিত নমঃশূদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁরা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে অস্পৃশ্য চণ্ডাল নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন—

> আমার বাবা তার জাতি পরিচয় দিতে গিয়ে বড়ই গর্ব আর অহংকারের সঙ্গে বলতেন "মোরা নোমোশুদ্দুর, কাশ্যপ গোত্র। যদিও উচ্চবর্ণের লোকেরা আমাদের অচ্ছুত অস্পৃশ্য ভাবতো, চরম ঘৃণাভরে চাঁড়াল, চণ্ডাল এইসব বলত। বাবা বা আমাদের সমাজের কোনও মানুষ কিন্তু নিজেদের চণ্ডাল বলে স্বীকার করতে চাইত না। তাদের দাবি ছিল, আমরা উঁচু জাত। ব্রাহ্মণের রক্ত আছে আমাদের শরীরে। এবং এটা শুধু নমশূদ্র মানুষেরাই নয়, বর্ণবাদী ব্যবস্থায় সব নিম্নধাপে অবস্থানরত প্রতিটি জনগোষ্ঠীই দাবি করে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের হীনমন্যতা আড়াল করে আত্মগর্বে স্ফীত হওয়ার মত একটা লোক গাথা প্রচলিত আছে। নমঃশূদ্র সমাজেও এই রকম একটা গল্প প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহমান।[২৮]

মাত্র তিন বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটির মায়া ছেড়ে তাঁদের পাড়ি দিতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। প্রথমে ঠাঁই হয় শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, সেখান থেকে বাঁকুড়ার শিরোমণিপুর ক্যাম্পের উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে অবশেষে তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল দণ্ডকারণ্যের ঊষর ভূমিতে। আত্মকথনে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তৎকালীন সরকারের দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনার আড়ালে দুরভিসন্ধিকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে দণ্ডকারণ্যের মতো অনুর্বর চাষের অযোগ্য জমিতে রিফিউজিদের নিয়ে গিয়ে ফেলার পিছনে সরকারের মূলত এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বিপুল সংখ্যক রিফিউজিদের পুনর্বাসনের 'বিচ্ছিরি ঝামেলাটার' এটি একটি সহজ সমাধান হতে পারে, আর দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডকারণ্যের বিশাল বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, বীজা, মহুয়া, করব্যা গাছ আর বাঁশের অপার সম্ভার। পাশাপাশি রয়েছে

কেন্দুপাতার অফুরন্ত সম্ভার। একই সঙ্গে মাটির নীচে রয়েছে লোহা, তামা, সীসা, ডলোমাইট, বক্সাইট, আরও নানা মূল্যবান খনিজ সম্পদ। মেহনতী মজুরের অভাবে এইসকল খনিজ যথাযথ উত্তোলন করে সংগ্রহ সম্ভব হয় না। ওখানকার আদিবাসীরা ঠিক এই সমস্ত কাজে পারদর্শী নয়। তৎকালীন প্রশাসনের মনে হয়েছিল উদ্বাস্তুদের এইখানে নিয়ে এলে তাঁরা মজুরের বিকল্প হয়ে উঠবে।

আলোচ্য আত্মকথনটি শুধুমাত্র কোনো একক ব্যক্তির স্মৃতিচারণ হয়ে থাকে নি। এই খানেই *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন* উদ্বাস্তু দলিতের আত্মজীবনীতে স্বতন্ত্র মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। এটি দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের উদ্বাস্তু বাঙালিদের যাপন ইতিহাসের দলিল বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ষাটের দশকের খাদ্য সংকট থেকে মন্বন্তর, ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ তাঁর আত্মকথনে বিস্তারিত ভাবে উঠে এসেছে।

> ...সেই কুখ্যাত ছয়-এর দশকের শুরুর দিক। যখন গ্রামবাংলা ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ খাদ্য সংকটের দিকে হাটি হাটি পা করে এগিয়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে এক অঘোষিত মন্বন্তরের পদধ্বনি। তখন খোলা দোতালার বাজারে সবচেয়ে মোটা চালের পালি (আড়াই সের) একটাকা বারো আনায় পৌঁছে গেছে। এক পালি চাল না হলে আমাদের সংসার চলে না। এর সঙ্গে আছে নুন লংকা আর জ্বালানি। তাই চাল কেনার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। সে সময় কোথা থেকে কে জানে বাজারে বস্তা বস্তা খুদ আসত। যার অর্ধেক ছিল ধুলো কাঁকড়। খুদ যে কোথায় সে বহু কষ্টে খুঁজে পাওয়া যায়। ছয় আনা সের সেই ধুলো কাঁকড় আমরা দুসের বারো আনা দিয়ে কিনে আনতাম। মা তাকে পুকুরে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টা খানেক ধরে চেলে চেলে ধুয়ে আনতেন। তারপর তা জ্বাল দিয়ে পাতলা জাউ বানিয়ে, না চিবিয়ে আমরা নুন লংকা দিয়ে গিলে খেতাম। এর চেয়ে আর একটু সস্তায় পাওয়া যেত মাইলোর আটা, আধভাঙা ভুটতা। এসব খুদ, ভুট্টা, মাইলো সবই মুরগীর খাদ্য। পোলট্রির জন্য তৈরি করা 'সুষম আহার'। কী মানুষের ভাগ্য, মানুষ হয়ে আমরা তখন তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছি।[২৯]

পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে কখনো কারো বাড়ির কাজ, চায়ের দোকানে ধোয়া-মোছা, রাজমিস্ত্রিগিরি, মুটে-মজুরের কাজ, রিক্সা চালানো ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। একটা সময়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পরিণতিতে ঢুকে পড়েন অপরাধ জগতে। ছুরি চালানো, বোমা বাঁধা, পিস্তল চালানো, চুরি ছিনতাই রাহাজানির মত অনেক অসামাজিক পথ ঘুরে অবশেষে তাঁর ঠাঁই হয় জেলে। জেলের কুঠুরিতে বসে শুরু হয় তাঁর বর্ণমালা শিক্ষা। দু'বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি রিকশা চালানো শুরু করেন। এই রিকশাতেই একদিন সওয়ারি হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, তারপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মুকুন্দপুরের মূক ও বধিরদের আবাসে রান্নাঘরের কর্মী মনোরঞ্জন ব্যাপারীর গল্প, উপন্যাস, গবেষণাধর্মী লেখা সারস্বত সমাজে বহুল আলোচিত, প্রশংসিত ও পুরস্কৃত। একাধিক ভাষায় তাঁর গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা ধর্মী লেখাপত্র অনূদিত হয়েছে। আত্মকথনের একদম শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভাগৃহে আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে আসা লেখকের মনে হয়—

> ...সেই রিক্সা লাইনটা আজও চলছে। শুধু আমি আর নেই। এখান থেকেই আমার যে রিকশার চাকা গড়াতে শুরু করেছিল তা আজ গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছে গেছে ইন্দুমতী সভাগৃহে। আরো অনেক পথ যেতে হবে।[৩০]

তথ্যসূত্র:

---

১. মণ্ডল, মননকুমার, 'উদ্বাসনের ইতিহাস, স্থানান্তরণের আখ্যান', *পত্রিকা,* শরণার্থী সংখ্যা, গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০১৭, পৃ. ২৫

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, *উদ্বাস্তু,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ৪৩৯

৩. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানব,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৮

৪. চ্যাটার্জী, জয়া, *দেশভাগের অর্জন: বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৫২

৫. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানব,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ১০৮

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৮. হীরা, আশিস, *উদ্বাস্তু: ইতিহাস ও আখ্যানে,* গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১, পৃ. ২৭

৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবী, 'নিম্ন জাতির মানুষ ও দেশভাগ', *দেশভাগে নিম্নবর্ণ,* আশিস হীরা সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৮

১০. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, 'দেশভাগ ও বাংলার দলিত সমাজ', *দেশভাগে নিম্নবর্ণ,* আশিস হীরা সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ২৬-৩০

১১. হালদার, সুধীররঞ্জন, 'পুনর্বাসনক্ষেত্র: দণ্ডকারণ্য', *দেশভাগে নিম্নবর্ণ,* আশিস হীরা সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৩০-৩২

১২. বালা, যতীন, *শিকড় ছেঁড়া জীবন: উদবাস্তু-দলিতের দলিল,* গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩১

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

১৮. পাল, মধুময়, ভুমিকা, *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫৫

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

২১. সেন, মণিকুন্তলা, *মণিকুন্তলা সেন: জনজাগরণে নারীজাগরণে*, প্রথম সংস্করণ, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৬৮

২২. পাল, মধুময়, ভুমিকা, *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৬২

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

২৪. বিশ্বাস, অধীর, 'আমরা তো এখন ইন্ডিয়ায়', *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, মধুময় পাল সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯১

২৫. বিশ্বাস, রাধিকারঞ্জন, 'দন্ডকারণ্যে যা দেখেছি, যা পেয়েছি', *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, মধুময় পাল সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬

২৬. ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ, 'সীমান্তের দুই অবতার', *বর্ডার: বাংলা ভাগের দেওয়াল*, অধীর বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১২০

২৭. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন, *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন*, প্রথম খন্ড, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪, পৃ. ১৩

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি-সত্তা-স্বর: 'আত্মজীবনী'র নির্মাণ ও ইতিহাস চর্চার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃতি-সত্তা-স্বর: ‘আত্মজীবনী’র নির্মাণ ও ইতিহাস চর্চার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক

আমরা যাকে এখন ‘ইতিহাস’ বলে জানি, পড়ি, বুঝি ও লিখি, জ্ঞানচর্চার সেই আধুনিক ধারার জন্ম পশ্চিম ইউরোপে আজ থেকে মাত্র আড়াই শত বছর আগে। সতেরো শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও আঠারো শতকে জ্ঞানদীপ্তির হাত ধরে পশ্চিম ইউরোপে যে বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, সেখানে নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে এবং যুক্তিসম্মত উপায়ে অতীতকে জানার বিষয়ে একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। অতেব অতীত সম্পর্কে যে কোনো আখ্যানই ইতিহাস নয়। এই সময়ের কিছু চিন্তাবিদ অতীতের সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন। তাঁদের মতটা অনেকটা এইরকম ছিল — অতীতের যে কোনো ঘটনার বিষয়ে জানতে গেলে আগে তার সমসাময়িক নানা সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। অতীতের বিষয়ে এই সূত্রগুলি কী বলছে সেটা একে অপরের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং লেখার সময় পাদটীকা ব্যবহার করতে হবে যাতে এক ইতিহাসবিদ যা বলেছেন তা পরবর্তীকালে আরেকজন মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এইভাবে নানা পদ্ধতিগত দিক সুনির্দিষ্ট করে অতীত সম্পর্কে জানা ও লেখার মাধ্যমে আঠারো-উনিশ শতকের পশ্চিম ইউরোপে ‘ইতিহাস’ জ্ঞানচর্চার একটি আলাদা শাখা (ডিসিপ্লিন) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে রাজদরবার ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে ইতিহাস

গণপরিসরের একটি অংশ হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪), জার্মানির লিওপোল্ড ফন রাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬), ফ্রান্সের জুল মিশেলে (১৭৯৮-১৮৭৪) ও সুইৎজারল্যান্ডের ইয়াকুব বুকহার্ট (১৮১৮-১৮৯৭)।[১]

বিশ শতকে এসে ইতিহাসচর্চার একটা নতুন দিক তাত্ত্বিকদের নজর পড়ে সেটি হল – ইতিহাসবিদ যে আখ্যানের মাধ্যমে অতীতের বিষয়ে নিজের ব্যাখ্যার কথা বলেন, সেই আখ্যান কীভাবে তৈরি হল এই আলোচনার মধ্য থেকেই উঠে আসে একজন ইতিহাসবিদের নিজস্ব রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা কীভাবে তাঁর লেখনীতে প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ। অতীত ও আমাদের মধ্যে একরকমের মধ্যস্থতার কাজ করে ইতিহাস লেখক ও তাঁর লেখনী। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাস লেখার প্রক্রিয়া ও রাজনীতির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কটি সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন করে তোলেন লুই মিঙ্ক (১৯২১-১৯৮৩) ও হেডেন হোয়াইট (১৯২৮-২০১৮ এর মতো তাত্ত্বিকরা।

এইবার যদি পশ্চিমী ইতিহাসচর্চার এই ধারা ভারতবর্ষে কীভাবে এসে পৌঁছেছিল তার দিকে নজর দিই, তাহলে দেখব এই ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল উপনিবেশ। আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে প্রাচ্যবাদীদের হাত ধরে এবং প্রশাসনিক দরকারে ভারতের অতীত, সংস্কৃতি, ভূগোল, আইন, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ শাসকমহলে। এই চিন্তাভাবনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল ১৮৭৪ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল স্থাপনের মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানকে

কেন্দ্র করে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের নানা পুথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, শিলালিপি ইত্যাদি সংগ্রহ, সম্পাদনা ও অনুবাদ শুরু হয়েছিল। কালক্রমে এই সব নথিপত্র ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের ভারতের অতীতকে জানার এবং সেই বিষয়ে লেখালেখি করার প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮১৭ সালে ইংল্যাণ্ড কোম্পানির এক কর্মচারী জেমস মিল তিন খণ্ডে তাঁর লেখা *দ্য হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া* প্রকাশ করেন। এই বইটিতে তিনি প্রথমে ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ নামে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতীতকে তিন ভাগে ভাগ করার যে ধারণা ইউরোপে গড়ে উঠেছিল পনেরো থেকে সতেরো শতকের মধ্যে, মিলের উনিশ শতকের বই ভারতের অতীতকে বোঝার ক্ষেত্রেও সেই ধারণাকে জ্ঞানচর্চার জগতে প্রোথিত করে দিয়েছিল। তবে এইক্ষেত্রে মিল ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ধারণা থেকে সরে এসে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে হিন্দু-মুসলিম-ব্রিটিশ নামকরণ পালটে আদি-মধ্য-আধুনিক নামকরণ হলেও এই ধর্মীয় অনুষঙ্গ ভারতের ইতিহাসচর্চায় কিছুটা রয়ে যায়। আর অনেকটা এই পথ ধরেই ইউরোপীয় ধাঁচে ইতিহাস লেখার মাধ্যমে ভারতের ভূখণ্ডের পাশাপাশি ভারতের অতীতকেও ঔপনিবেশিক ক্ষমতার আওতায় আনার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।

জেমস মিলের পথ অনুসরণ করে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ায় উইলিয়াম আরভিন, উইলিয়াম মোরল্যাণ্ড আর ভিনসেন্ট স্মিথের মতো বেশ কিছু প্রশাসক-গবেষক ভারতের অতীত অধ্যায় নিয়ে বই লেখেন।

এই লেখকদের একটা বড়ো ঝোঁক ছিল ভারতের নানা সময়ের সম্রাট, রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের বিশ্লেষণ করার প্রতি। সেই বিশ্লেষণের একটা মূল প্রবণতা চরম কেন্দ্রীভূত এক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার ছবি আঁকা, যেখানে রাজা সমগ্র সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি এবং সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এঁদের লেখায় সনাতনী ভারতের স্বৈরাচারী এই রাজতন্ত্র যেন দাঁড়িয়ে ছিল তৎকালীন 'উদার', 'আধুনিক' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপরীতে। জ্ঞানদীপ্তি-পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের এই ধারণা উপনিবেশবাদ বজায় রাখার পিছনে বড়ো যুক্তি হিসাবে সবসময় কাজ করেছে, উপনিবেশের মানুষরা আসলে পিছিয়ে আছে এবং তাদের উন্নতির জন্যই ঔপনিবেশিক শাসন জরুরি এই নবনির্মিত যুক্তিটি তারা উপনিবেশিত প্রজাদের মস্তিষ্কের ভিতর গেঁথে ফেলতে দীর্ঘদিন সফল হয়েছিল, যার একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল ইতিহাস লেখা। মনে রাখা দরকার, এই পর্বের ইতিহাসবিদরা অনেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা প্রশাসনিক পদে চাকরি করতেন।

এর পাশাপাশি আরও একটি ধারাও ছিল। ১৮৩০-এর দশকে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সাঁচি, সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি জায়গায় বৌদ্ধস্থানের হদিশ মেলে এই সময় নাগাদ। ১৮৩৭ সালে জর্জ টার্নার পালি ভাষায় রচিত *মহাবংশ*-র ইংরেজি অনুবাদ করেন। ঐ একই বছরে জেমস প্রিন্সেপ মৌর্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নথি অশোকের শিলালেখ শনাক্তকরণে বিশেষ সাহায্য করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সকল আবিষ্কারের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় ১৮৪১ সালে লেখা মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের *The History of India* বইটিতে। জেমস মিলের বিপরীতে হেঁটে এলফিনস্টোন ভারতীয় সভ্যতার নানা ভাল দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর লেখনীতে

অশোক হয়ে ওঠেন একজন উচ্চ-সংস্কৃতিসম্পন্ন উপমাদেশীয় সাম্রাজ্যের শাসক। প্রসঙ্গত, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত ভিনসেন্ট স্মিথের *The Early History of India* বইটিতে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে সহানুভূতি ও বিদ্বেষের এক মিশ্র অবস্থান লক্ষ করা যায়। স্মিথের মৌর্য সাম্রাজ্যের বর্ণনায় চন্দ্রগুপ্ত একাধারে উল্লেখযোগ্য এবং সফলতম ব্যক্তি কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের রাজসভাকে তিনি বর্বরতা ও ভোগবিলাসের প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছেন। লক্ষণীয়, গবেষণা করতে গিয়ে স্মিথ গুরুত্ব দেন গ্রিক-রোমান নথিকে, তুলনায় ভারতীয় তথ্যসূত্র মূলত স্থান পায় পাদটীকায়, একমাত্র ব্যতিক্রম ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত মৌর্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল *অর্থশাস্ত্র* সংক্রান্ত আলোচনাটি।[২]

এইদিকে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এরই অংশ হিসাবে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নিজেদের দেশের অতীত সম্পর্কে জানার আগ্রহ দানা বাঁধে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের একাংশ খোঁজ শুরু করেন এমন কোনো রাজার, যিনি প্রাচীন যুগে গোটা উপমহাদেশকে এক সুতোয় বেঁধেছিলেন। এই অন্বেষণের মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেন সম্রাট অশোক, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত জীবন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার গবেষণায় মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস এক মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী গবেষণার একটা মিল হল কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতি অবহেলা। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত মিলের বইতে ১২০০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত 'হিন্দু যুগে' কুষাণদের জায়গা মেলেনি। এর পিছনে সম্ভবত একটা কারণ কুষাণদের অ-'ভারতীয়' বা অ-'হিন্দু' পরিচয়। অপর একটি কারণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে যে বেশিরভাগ

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদের কাছে কেন্দ্রীভূত শাসন ছিল সুশাসন, সুস্থিতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রসরতার প্রতীক, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ছিল অরাজকতার শামিল। ফলে মৌর্য ও গুপ্ত এই দুই দেশীয় কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের মাঝখানের সময়টাকে জাতীয়তাবাদী ঘরাণার গবেষকরা দেখেন একটি অন্ধকার যুগ হিসাবে। তাঁদের ভাবনায় এই সময়ে কেন্দ্রীভূত ভারতীয় সাম্রাজ্যের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাইরে থেকে এসে এলাকা দখল করেছিল কুষাণ ও মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু যাযাবর গোষ্ঠী। এই ধারণায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস হয়ে ওঠে স্বদেশী শক্তির দ্বারা ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাহিনি। এই পর্বের একাধিক ইতিহাস গ্রন্থপ্রণেতাদের মধ্যে একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব; ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের বই *A History of Indian Political Ideas*। এতদিনকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসের ঘেরাটোপ পেরিয়ে অশোকের লেখ, মেগাস্থিনিসের বিবরণ এবং অর্থশাস্ত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌর্য রাষ্ট্রের নানা দিককে আলোচনায় তুলে আনেন আলোচ্য ইতিহাসবিদ। কোন কোন এলাকা মৌর্য শাসনের অধীনস্থ ছিল, কোন এলাকা ছিল স্বাধীন, অশোকের লেখ-এর ভিত্তিতে তিনি তা নির্ণয় করেন। শাসনাধীন এলাকাগুলি কীভাবে ‘জনপদ’ ও ‘অপরান্ত’ নামের দুই রকম ভাগে বিভক্ত ছিল, তাও ব্যাখ্যা করেন তিনি। জঙ্গলে বসবাসকারী *অটবী*-দের কথা উঠে আসে শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে। তাঁর মতে, সুদক্ষ মৌর্য প্রশাসন রাতারাতি তৈরি হয়নি। বরং প্রাক্-মৌর্য শাসনব্যবস্থার প্রভাব এই প্রশাসনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বধর্মের প্রতি অশোকের সহনশীল মনোভাব, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রাকৃত ও ব্রাহ্মীলিপির প্রচলনের পাশাপাশি আঞ্চলিকতাকে সম্মান জানিয়ে মৌর্যরা উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করত কিছু জায়গায়, এই সবকিছুই সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সুবিস্তৃত মৌর্য সাম্রাজ্যের পরিচালনায় অর্থনৈতিক দিকের প্রসঙ্গ আসে এই বইটিতে। রাষ্ট্রের বিপুল ব্যয়ভার প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় দেখা যায় কৃষিকাজ, গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংগঠন, কৃষকদের পদমর্যাদা, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, প্রচলিত মুদ্রা ও মুদ্রাব্যবস্থা, রাস্তা ও সংযোগব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভূমিকার কথা ইতিহাসের ধারায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ধরনকে সরিয়ে রেখে এই যে প্রথম রাষ্ট্রযন্ত্র বা প্রশাসনের চরিত্র নিয়ে আলোচনা এবং সেই সূত্রেই জনজীবনের প্রসঙ্গকে ইতিহাসে স্থান দেওয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাঁক বদলের ইঙ্গিতবাহী।

এরই পাশাপাশি দাদাভাই নওরোজি প্রথম ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী আখ্যান লেখেন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে। তিনি বিশেষ করে জোর দেন সম্পদের নিষ্ক্রমণ তত্ত্বের উপর তাঁর *Poverty and Un-British Rule in India* (১৯০১) বইটিতে। এর কিছু পরে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *Famines and Land Assessment of India* (১৯০০) এবং *The Economic History of India in the Victorious Age* (১৮৯৩)– এই দুটি বইতে বিস্তারিতভাবে রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্র এবং উৎপাদনের হার বিশ্লেষণ করে দেখান কীভাবে ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। এই পর্যায়ে এসে বিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বেশ কিছু ভারতীয় ইতিহাসবিদ ব্রিটিশ প্রশাসক-গবেষকদের লেখা ভারতের ইতিহাসকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধাকুমুদ মুখার্জি, কাশীপ্রসাদ

জয়সোয়াল, যদুনাথ সরকার, পট্টভি সীতারামাইয়া। এইক্ষেত্রে কংগ্রেসি আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সীতারামাইয়া ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তাবাদের উৎস হিসাবে দেখেন জাতীয় কংগ্রেসকে। ক্রমে এই ধারার ইতিহাসবিদরা প্রাক্-ব্রিটিশ অতীতের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন। বিশ শতকের গোড়ায় মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাবলী দিয়ে কোম্পানির হাত ধরে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিকাশ এবং নতুন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের করুণ অবস্থা সবিস্তারে আলোচনা করে আলোচ্য ইতিহাসবিদ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বিশ শতকের আগেই বিদেশি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতা গড়ে উঠেছিল। এই বিরোধিতার অংশ হিসাবে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের লড়াই, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মারাঠাদের সংঘমৈত্রী, বেনারসের চৈত সিংহের বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে এইক্ষেত্রে চিহ্নিত করেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই প্রসঙ্গে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হল আঠারো-উনিশ শতকের নানা কৃষক ও আদিবাসী আন্দোলনকেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁর মতে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে। এর প্রভাবে সমাজ সংস্কারের ধারণার পাশাপাশি জাতি ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনাও গড়ে উঠেছিল। এই ঘটনাপ্রবাহের পুরোভাগে তিনি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে বসান। তাঁর মতে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার পিছনে সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার মতো গণমাধ্যমের একটা

বড়ো ভূমিকা ছিল। এই ভাবে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের ঘরানার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের আখ্যানকে কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের পরিসরের বাইরে নিয়ে যান।

অপরদিকে তারা চাঁদ তাঁর *History of Freedom Movement in India* বইতে বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলন আসলে ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা এক নতুন পরিস্থিতির ফসল। তাঁর মতে উনিশ শতকের আগে ভারতের সমাজের ভিত্তি ছিল বর্ণ ও গোষ্ঠী। তাই প্রথম দিকের ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহগুলির চরিত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এর মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। উনিশ শতকের এই পরিবর্তন এসেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমশ প্রসারের ফলে। এই পরিবর্তনের অগ্রভাগে ছিলেন উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত মানুষেরা। আস্তে আস্তে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে উঠেছিল সারা দেশে, যার মাধ্যমে একীভূত একটি জাতির চেতনা ও সামাজিক মৈত্রী তৈরি হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে তারা চাঁদের লেখার মূল ফারাক আঠারো শতকে বিদ্রোহগুলির ব্যাখ্যায়, তবে উভয় ঐতিহাসিকের চিন্তায় গতিবিধিতে বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও রমেশচন্দ্র মজুমদার ও তারা চাঁদ দু’জনেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দলনের ইতিহাসকে আপামর ভারতবাসীর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের ঐক্যবদ্ধ এক যৌথ সংগ্রাম হিসাবে দেখেছেন।

এইভাবে জাতীয়তাবাদী ঘরানায় আধুনিক ভারতের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর একত্রিত লড়াইয়ের আখ্যান। বেশির ভাগ লেখাতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই ইতিহাসের মুখ্য চরিত্র গ্রহণ করে। ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের নিরিখে বিচার করার প্রবণতা দেখা যায় এই ইতিহাসচর্চায়। ফলে আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে সেই ইতিহাস গোটা ভারতের ইতিহাসেরই একটি সংস্করণ হয়ে দাঁড়ায়; যেন একটা বড়ো আখ্যানের নানা টুকরো টুকরো অংশ। আর এই একমুখী চিত্রকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় বিকল্প ইতিহাসের নির্মাণ। এই বিকল্প ইতিহাস সন্ধানী ইতিহাসবিদরা প্রশ্ন করেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, গোষ্ঠী, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার ভিন্নতার নিরিখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র ব্যাখ্যা না করলে বড়ো আখ্যানের আড়ালে বহু অন্য স্বর, মত, ক্ষোভ ও অসন্তোষ চাপা পড়ে যায়।[৩]

যে জাতীয়তাবাদী ঐক্যের কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি বা মারাঠির ইতিহাস রচনা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল একসময়, উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়ায় গত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের গান্ধীবাদী, সাম্প্রদায়িক, আম্বেদকরবাদীরা সাম্যবাদী গণ-আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে তা গভীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখ হয়। নিম্নবর্গীয় মানুষের উত্থান, হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতি ধার্মিক তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ইতিহাসবোধ জনজীবনে যে চেহারা নিচ্ছিল, তা আর যাই হোক জাতীয় ঐক্যের নয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসি আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন, আদিবাসী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক গণ রাজনীতি, সর্বোপরি ভোটাভুটির রাজনীতি (বিশেষত ১৯৩৭-এ ও ১৯৪৬-এ) তাদের নিজস্ব চেহারায় বর্তমান।

এই সময় থেকেই নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস নয়, বরং কে কার কথা বলবার অধিকারী, এই প্রশ্নই সোচ্চারে জিজ্ঞাসিত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে ত্রিশের দশকে শিবাজীকে ঘিরে যে বিতর্ক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জীবৎকালেই তৈরি হয়েছিল তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষে যখন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে *Rise of the Maratha Power* (১৯০০) লেখেন, তখন 'শিবাজী'কে তিনি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল মারাঠাভাষী মানুষের তথা ভারতের জাতীয় ঐক্যের এক প্রতীক বলে ভেবেছিলেন। শিবাজীর (আরোপিত) গুরু রামদাসকে 'মহারাষ্ট্র-ধর্মের' প্রতিষ্ঠাতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। বালগঙ্গাধার তিলক, স্বদেশি আন্দোলনের একাধিক নেতৃবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – এই শিবাজীকেই বাঙালির জাতীয় জীবনে বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং শিবাজীর অবস্থানও বদলে যায়। যদুনাথ ও তাঁর 'ব্রাহ্মণ বন্ধু' গোবিন্দরাও সখারাম সরদেশাই আদৌ 'শিবাজী' বা মারাঠা গৌরবের ইতিহাস লেখার অধিকারী কিনা, সেই প্রশ্ন ওঠে। বলা বাহুল্য, যাঁরা তোলেন, তাঁরা পাণ্ডিত্যে যদুনাথ সরকারের থেকে বড়ো ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

মুম্বইয়ের উইলসন হাইস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণরাও অর্জুনরাও কেলুসকর ১৯০৭ সালে মারাঠি ভাষায় শিবাজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন। বইটির নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ – *ক্ষত্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি শিবাজী মহারাজইয়াঠ্যে চরিত্র*। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটি বেরোনোর দু'বছর আগেই কোলাপুরের শাহু মহারাজ শঙ্করাচার্যের সাহায্যে ও ব্রাহ্মণ বিরোধিতাকে পর্যুদস্ত করে 'ক্ষত্রিয়' মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কেলুসকরের আলোচ্য বইটির কোলাপুরের রাজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনের এটি একটি অন্যতম দলিল।

শিবাজী নিয়ে দলীয় ইতিহাসের কাজিয়া প্রকট হয়ে ওঠে ১৯২০-র দশকের শেষের দিকে ও ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায়। ১৯২৫-এ Indian Historical Records Commission-এর (যদুনাথ যার অন্যতম সদস্য ছিলেন) পুনা অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত হয় পুনার পেশোয়া দফতরের কাগজপত্রের ‘scientific investigation’ ও একটি হ্যান্ডলিস্ট তৈরি করার জন্য বোম্বাই সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। বোম্বাই সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং যদুনাথ সরকারের পরামর্শেই এই হ্যান্ডলিস্ট করার দায়িত্ব পড়ে খ্যাতনামা মারাঠি ঐতিহাসিক ও যদুনাথ-সুহৃদ গোবিন্দরাও সখারাম সরদেশাইয়ের ওপর। কিন্তু ততদিনে বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে ও অব্রাহ্মণ নেতারা কিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতাও পেয়েছেন। খ্যাতনামা অব্রাহ্মণ নেতা বি.ভি. যাদব ১৯২৪-২৬ সালে বোম্বাই সরকারের প্রথম অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক আইনসভায় অ-ব্রাহ্মণ সদস্যরা সরদেশাইয়ের এই নতুন পদে নিযুক্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলেন।

খেয়াল করে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণের ইতিহাস রচনার অধিকারী কিনা, হিন্দু-মুসলমানের কথা লিখতে পারবে কি না, কেবল অব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণের কথা বলতে পারে – এই ধরনের দাবি আজ আমরা যাকে সত্ত্বার রাজনীতি বা Identity Politics বলি – ১৯৩০-এর দশকেই তা উঠতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। যা তৎকালীন স্বদেশী আমলের ঐক্যবদ্ধ জাতি কল্পনা ভেঙে দিয়ে ভারতীয় সমাজের নানান দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছিল।[৪]

ইতিমধ্যেই ১৯২০-র দশকে ভারতের রাজনৈতিক আঙিনায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ও মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটে। এর কিছু পর থেকেই মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা অর্থনীতি আর শ্রেণিগত প্রশ্ন সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। ১৯৬০-এর দশকে গোটা পৃথিবীতে মার্কসবাদের যে প্রসার ঘটে তার একটা প্রতিফলন দেখা যায় এই সময়ে ভারতীয় মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের লেখায়। যাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেন রামশরণ শর্মা ও ইরফান হাবিব, দামোদর ধর্মানন্দ, কোসাম্বি ও পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝাঁ। উপনিবেশবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরা যেখানে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যকে দেখেছিলেন মূলত সম্রাটদের ব্যক্তিত্বের নিরিখে, মার্কসীয় ইতিহাস সেখানে সাম্রাজ্যের চালকের আসনে বসায় রাষ্ট্রের কাঠামো, অর্থনীতি ও প্রশাসনকে।

এর পাশাপাশি রজনী পাম দত্ত মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ব্যবহার করে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর *India Today* বইটিতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির আন্দোলন হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এই বইটিতে তিনি ভারতের অর্থনীতি ও সমাজে একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ও গঠনমূলক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা তাই তাঁর মতে একভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘটানো বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, আবার এই চেতনাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনেরও কারণ। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত *সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম* বইটিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায় মার্কসীয় তত্ত্ব নতুনভাবে ব্যবহার করেন এ. আর. দেশাই। জাতীয়তাবাদের উৎস সন্ধানে তিনি ঔপনিবেশিক ভারতের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দেন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত বিপানচন্দ্রের *দ্য রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অফ ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়াল ইণ্ডিয়া* বইটিতে তিনি দেখান যে ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রথম ফুটে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের একদিকে যেমন একটা অর্থনীতি-বিষয়ক বস্তুগত দিক ছিল, অন্যদিকে তেমনই ছিল একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদী ধারা। বিপান চন্দ্রের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতায় গোটা দেশ একাত্ম হয়ে উঠেছিল। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী নিজেদের সমাজের জাতি-বর্ণ বিভেদ বিষয়ক নানা বৈষম্য ও সমস্যাকে পাশে সরিয়ে রেখে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল একসঙ্গে।

১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে সুমিত সরকার মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যবহার করে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নানাদিক বিশ্লেষণ করেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত *দ্য স্বদেশি মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল* বইতে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃবর্গের পাশাপাশি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার জনসাধারণের ভূমিকাও গুরুত্ব সহকারে তুলে আনেন। মার্কসবাদী তত্ত্বের এই ব্যবহার স্বদেশী আন্দোলনের পরিধি পেরিয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বৃহত্তর প্রসঙ্গে সুমিত সরকার প্রয়োগ করেন ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর *মডার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৮৫-১৯৪৭* বইতে। সামাজিক ইতিহাসচর্চায় তৎকালীন ব্রিটিশ মার্কসবাদী গবেষকরা 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো' নামে যে ধারার প্রবর্তন করেন, তাতে অনুপ্রাণীত হয়ে আলোচ্য ইতিহাসবিদ সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ ও রাজনীতির নিরিখে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমীক্ষা করেন। এর আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলনের ইতিহাস হয়ে উঠত

ব্রিটিশরাজের সঙ্গে উচ্চবর্গীয় নেতা-নেত্রী ও বুর্জোয়া শ্রেণির দর কষাকষির গল্প। কিন্তু তাঁর লেখায় গুরুত্বসহকারে উঠে এল খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের ইতিহাস।

এই পর্বের আলোচনায় একজন চিন্তাবিদের নাম অনস্বীকার্য। তিনি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), যদিও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পথে ইতিহাসচর্চা করেননি, কিন্তু তাঁর বীক্ষণ ছিল একজন প্রকৃত ইতিহাসবিদের সমতুল্য। তরুণ বয়সে সমাজ পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করেন। শুধু স্বদেশেই নয়, দেশের বাইরেও বিপ্লবী কার্যকলাপে তিনি সক্রিয়রূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাসচেতনা কখনোই ইতিহাস চর্চার চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ করেনি। তিনি ইতিহাসচর্চায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁর *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি* বইতে বলেছেন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভবই সমাজে দ্বন্দ্বের কারণ। মানব সমাজের ইতিহাস তাঁর কাছে শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস রূপেই প্রতীত হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সমাজের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক শ্রেণির স্বার্থের দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে ভূপেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন এবং এইরূপ স্বার্থের দ্বন্দ্বের নেপথ্যে উপস্থিত কার্যকারণ পরম্পরাটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক শ্রেণিগুলির মধ্যে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বটি তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় সমাজ নিছক স্থির ও অচঞ্চল ছিল না বরং সকল যুগেই কোনো না কোনো শ্রেণিচালিকা শক্তির উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীতমুখী একাধিক শক্তি একত্রে

অবস্থান করেছে এবং এই শক্তিগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তির্যক পথে সামাজিক গতিশীলতা বজায় থেকেছে। শ্রেণি সহযোগিতার তত্ত্বে ভূপেন্দ্রনাথের কখনোই আস্থা ছিল না। শ্রেণি সহযোগিতার মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্বার্থগুলির সংঘাতের অবসান ঘটানো বা স্বার্থগুলির সম্যক সমন্বয়সাধন কোনোটিই সম্ভব নয় বলেই তিনি বিবেচনা করেছেন।

সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চার ধারা ভূপেন্দ্রনাথের ইতিহাস দর্শনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইতিমধ্যে ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে সমাজবিজ্ঞানের নতুন কিছু ভাবধারা ইতিহাস রচনায় ছাপ ফেলতে শুরু করে। এযাবৎ কালের ভাবনার গতিপথ ছিল অনেকটা এইরকম, সেখানে ভাবা হত মানবসভ্যতার ইতিহাস আসলে প্রাগৈতিহাসিক থেকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ক্রমাগত ধাবিত হওয়ার পদ্ধতি এবং এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক পশ্চিম ইউরোপ। যাবতীয় তর্কবিতর্ক মূলত এই পথকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল।[৫]

এই ধারণায় আঘাত হেনে একদল ইতিহাসবিদ একটা গোটা মানবসমাজের ইতিহাস লিখতে না চেয়ে, একেক সমাজের একেক অংশের অভিজ্ঞতা ও জীবনচর্যার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া নানান ছোট ছোট আখ্যান বিশ্লেষণে মন দেন। তাঁরা মূলত জোর দেন এটা বলে যে, বিভিন্ন জায়গার ছোট-বড়ো নানান গোষ্ঠীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ইতিহাস গড়ে ওঠে, যা শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার নিরিখে বিচার করা সম্ভব নয়। ১৯৮০-র দশকে ইতালীয় মার্কসবাদী দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির ‘হেজিমনি তত্ত্ব’-কে আশ্রয় করে এই ঘরানান নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। এই দশকেই

একদল ইতিহাসবিদ নতুন আঙ্গিকে জাতি, বর্ণ, উপজাতি, শ্রমিক, কৃষক ও লিঙ্গের ইতিহাস লেখা শুরু করেন। একটা বৃহত্তর জাতীয় সমাজের অংশ হিসাবে এইসব বিভিন্ন সামাজিক বর্গকে না দেখে এই সমস্ত ইতিহাসবিদরা এই সমস্ত মানুষের ইতিহাস লেখেন তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে। এরই সঙ্গে নির্মিত হয় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'। এই ইতিহাসচর্চায় জোর দেওয়া হয় নিম্নবর্গের মানুষদের নিজসও চিন্তাভাবনা, ধর্মীয় মনোভাব, সাংস্কৃতিক বোধ ইত্যাদির ওপর। এই ইতিহাসবিদদের মতে এইসব মানুষদের বিচার-বিবেচনার মধ্যে নিজস্ব যুক্তি থাকে, যা অনেক সময়ই উচ্চবর্গের মানুষদের প্রথাগত ধ্যান-ধারণার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এই ইতিহাসচর্চায় ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আর একটি একমাত্রিক ও সামগ্রিক কাহিনি না থেকে নানান গোষ্ঠীর নিজস্ব সংগ্রামের আখ্যানের এক জটিল সমাবেশে পরিণত হয়।

১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ সম্পাদিত *সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ* গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে একদল তরুণ গবেষক ঔপনিবেশিক শাসন ও ভারতের জাতীয়তাবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের এতদিনকার ইতিহাসচর্চাকে আক্রমণ করে তাঁরা বলেন যে, এই ইতিহাস শুধুই উচ্চবর্গের কীর্তিকলাপের আখ্যান। সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, কেমব্রিজ এমনকি মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার ধারার লেখকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এঁদের সবার মতেই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের চালিকাশক্তি ছিল উচ্চবর্গের নেতা-নেত্রীর হাতে। এইসব ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ ছিল নিছক উচ্চবর্গের হাতের পুতুল। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে মূলত উচ্চবর্গের রাজনীতির নিরিখেই বিচার করা হয়েছে এতদিন। কৃষক, আদিবাসী, শ্রমিক এবং নানা প্রান্তিক

গোষ্ঠীর ইতিহাস তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে পড়ার চেষ্টা প্রায় কোনো গবেষকই করেননি। ব্রিটিশ সামাজিক ইতিহাসের 'হিস্ট্রি ফ্রম বিলো' ধারাকেও সমালোচনা করেন গুহ। এর আগে এই ধারার ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম বলেন যে আঠারো-উনিশ শতকের শিল্পায়নের ফলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আধুনিক রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম হয়েছিল। শিল্পায়ন-পূর্ববর্তী কৃষক বিদ্রোহকে তিনি তাই প্রাক্-রাজনৈতিক বলে চিহ্নিত করেন। হবসবমের বিরোধিতা করে গুহ বলেন যে, কারখানা-কেন্দ্রিক শিল্পব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগেই ভারতীয় কৃষকদের নিজস্ব রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল, যা তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে দেশি ও বিদেশি শোষকের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৮৩ সালে এই নিয়ে তাঁর বিস্তারিত গবেষণা *Elementary Aspects of Peasant Insurgencies in Colonial India* (১৯৮৩) বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি বলেন যে ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় জমিদার ও সাহুকারদের শায়েস্তা করা। এই আন্দোলনের পরিকল্পনাও ও পরিচালনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গুহ দেখান যে কৃষক ও আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড আর্নল্ড, ডেভিড হার্ডিম্যান, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ইতিহাসবিদদের একাধিক গবেষণায় উঠে আসে নিম্নবর্গের মানুষদের চিন্তাভাবনার জগৎ যা ছিল উচ্চবর্ণের মানুষদের চিন্তাভাবনা থেকে স্বতন্ত্র। নিম্নবর্গের মানুষদের এই নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা সবসময় উচ্চবর্গের রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আগে স্পষ্ট হয়ে নেওয়া দরকার – নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা ও মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার ধারার মধ্যে কিছু মিল থাকলেও বেশ কিছু পার্থক্যও

আছে। এই দুই ধারার ইতিহাসই সমাজের নীচুতলার মানুষের শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে। তবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শোষণের ধরন মূলত অর্থনৈতিক – সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের যে ভূমিকা, তার মাধ্যমে উৎপাদনের সম্পর্ক, শ্রেণি ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের চেহারা চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় মানুষের অর্থনৈতিক ভূমিকার বদলে শোষণ ও ক্ষমতার অবস্থান খুঁজে নেওয়া হয় বিভিন্ন মানুষের মধ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কে। মার্কসীয় ইতিহাসচর্চায় তাই গুরুত্ব পায় শোষণ ও তার বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা। এই লেখার বিষয়বস্তু তাই অনেক ক্ষেত্রেই দাস-প্রভুর অত্যাচার ও দাসের বিদ্রোহ, জমিদারের উৎপীড়ন ও কৃষকের সংগ্রাম, কলকারখানার মালিকের বঞ্চনা ও শ্রমিকের বিপ্লব। অন্যদিকে, নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা মার্কসের দর্শনের পাশাপাশি ইতালীয় চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামশির সামাজিক কর্তৃত্ব (হেজিমনি) ও ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর ক্ষমতার (পাওয়ার) ধারণা নিয়ে আসেন ইতিহাসের ব্যাখ্যায়। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শোষক ও শোষিতকে চিহ্নিত না করে তাঁরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক নির্ণয় করেন। যেমন ভারতীয় জমিদার ও মহাজন শ্রেণি একদিকে ব্রিটিশ সরকারের নিরিখে নিজের অধীনতা মেনে নিলেও দেশের কৃষকের উপর নিজেদের সনাতনী কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলত। তেমনই, ভারতীয় উচ্চবর্গের পুরুষ বহির্জগতের কর্মক্ষেত্রে ব্রিটিশরাজের অধীনতা মেনে নিলেও বাড়ির অন্দরমহলে মহিলাদের উপর নিজের কর্তৃত্ব জাহির করত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই উপনিবেশিত ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্দর ও বাহিরের দ্বৈততা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন ইউরোপের দেখানো পথে নয়, ভারতে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা ভারতের

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বোঝা দরকার। জাতির কল্পনায় একরঙা কোনো ছবি এখানে পাওয়া যায় না। বরং ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও বর্ণের নিজস্ব ইতিহাসের নিরিখে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলন বোঝা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। বিভিন্ন শ্রেণি, জাতি-বর্ণ ও লিঙ্গের মানুষ একেকভাবে ভারতের কল্পনা করে। সেই খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়েই 'নেশন' অর্থে জাতির ধারণা গড়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে যে রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সেখানে ব্রাত্য মানুষও রাজনীতির শরিক হলেন। বিভিন্নভাবে যারা সমাজজীবনে কোনঠাসা বা নিপীড়িত হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ইতিহাসবোধকে, অতীতবোধকে – তা জাতের হোক, ধর্মের হোক, লিঙ্গের হোক – রাজনৈতিক ক্ষমতার আধারে বিচার – বিশ্লেষণ করলেন। এই সময় থেকে যে প্রশ্নটা ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল সেটা হল, যাদের নিপীড়নের বা দলিত হওয়ার অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা কি দলিতের বা নিপীড়িতের ইতিহাস লিখতে পারেন, পারলে তার শর্ত কী? আর সেই শর্ত আরোপই বা করবেন কে? বোম্বাই প্রাদেশিক আইনসভায় এই সব প্রকারান্তরে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে দলিত-বহুজন বুদ্ধিজীবী শ্রী কাঞ্চা ইলাইয়া সাব-অলটার্ন স্টাডিজে লিখিতে আহুত হয়ে স্পষ্টতই লিখেছিলেন যে সহস্র বৎসরের অবমাননার পর নিপীড়িতের জন্য এমন গালিগালাজের সময় –

> The Dalit–bahujan experience... experience of 3,000 years at that tells us that no abuser stops abusing unless there is retaliation. An atmosphere of calm, an atmosphere of respect for one another in which contradictions may be democratically resolved is never possible unless the abuser is abused as a matter of shock treatment.[৬]

১৯৮০-৯০এর দশকে ভারতের ইতিহাসচর্চায় বড়ো প্রভাব ফেলে *সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ* গ্রন্থমালা ও এডওয়ার্ড সাইদের *ওরিয়েন্টালিজম* বইটি। সাইদ ইতিহাসের সূত্রকে নতুনভাবে পড়ার কথা বলেন, যেখানে তিনি দেখান কীভাবে লেখনীর মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজকে গড়ে তুলেছিল রাষ্ট্র। 'অপর'-এর ধারণা তৈরি করাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য, নিজেদের ক্ষমতার মান্যতা বজায় রাখার জন্য। আর এই ধারণা গড়ে ওঠে সরকারি, বেসরকারি নানা লেখালেখি, দলিল-দস্তাবেজ, সাহিত্য, চিত্রকলার বিবিধ সমাহারে।

সাব অল্টার্ন স্টাডিজ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এই ধারার ইতিহাসবিদদের চিন্তার একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি বেছে নিয়েছি।

শাহিদ আমিনের লেখা 'Gandhi As Mahatma : Gorakhpur District, Eastern UP, 1921-22' প্রবন্ধে উঠে এসেছে কীভাবে সাধারণ মানুষের কল্পনায় গান্ধী একজন রাজনৈতিক নেতা থেকে আধা-সন্ত এক মহাত্মা হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২১ সালে গোরক্ষপুরে গান্ধীর আগমনকে কেন্দ্র করে সেখানকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে গুজব ও ছাপাখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শাহিদ আমিন স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা খুঁটিয়ে পড়ে দেখান যে গান্ধী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস, আস্থা মিলেমিশে এক দৈব ব্যক্তিত্বের ধারণা গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই ধারণার সঙ্গে

স্থানীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তর ফারাক ছিল। গান্ধীর স্বরাজের ডাক সাধারণ মানুষের মনে যেভাবে প্রোথিত হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গান্ধীর মহাত্মা হয়ে ওঠার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে শাহিদ আমিন জনসাধারণের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের পর্যালোচনা করেন। তাঁর মতে প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় অনেকসময়ই গুজব বা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের মতো যেসব সূত্র পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়, তার মধ্যেই লুখিয়ে থাকে জনগণের স্বর। আমরা খেয়াল করে দেখব ইতিহাসচর্চার বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক কাঠামোর পাশাপাশি আবার একটা বিকল্প কাঠামো তৈরি হয়েছে এই পরিসরে। যেখানে মৌখিক বয়ান, লৌকিক ঐতিহ্য, স্মৃতি, আধ্যাত্মিক বয়ান ইতিহাসের বিকল্প হয়ে উঠেছে কখনো কখনো। দলিত মানুষদের আত্মকথনেই এই ইতিহাসের প্রচলিত কাঠামোকে অস্বীকার করার তাৎপর্যপূর্ণ প্রবণতা।

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর ‘Peasant Revolt and Indian Nationalism : The Peasant Movement in Awadh, 1919-22’ প্রবন্ধে উত্তরপ্রদেশের আইন অমান্য আন্দোলনে সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নানা বিরোধের সম্পর্ককে বিস্তারে বিশ্লেষণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রথাগত কংগ্রেসি রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে জনসাধারণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বিহার অঞ্চলে গোরক্ষিণী বাহিনীর আন্দোলনের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় ভূমিকা এবং আন্দোলনের উপর তার ফলাফল আলোচনা করে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে বলেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন স্তর ছিল। সামাজিক নানা শ্রেণির মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের মতো করে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই যোগদানের প্রক্রিয়া অনেক সময়ই মূলধারার রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে খাপ খেত না। বড়ো দলগুলির রাজনৈতিক পথনির্দেশিকা না মেনে তারা তাদের মতো করে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ গড়ে তুলত।

গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে 'The Conditions and Nature of Subaltern Militancy : Bengal from Swadeshi to Non-Co-Operation 1905-22' প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কোনো বিক্ষোভ, বিদ্রোহ বা গণ অভ্যুত্থানের মুহূর্তের উত্তেজনার পরিসরটুকু ছাড়া সাধারণ নিস্তরঙ্গ সময়েও কীভাবে নিম্নবর্গীয় চেতনার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, তার একটা খোঁজ করেন। তাই স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণের পাশাপাশি এর মাঝের এক দশকের ইতিহাসও গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তাঁর মতে নিম্নবর্গীয় চেতনার এক অন্তর্লীন কাঠামো থাকে যা উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে। কিন্তু তিনি এও মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না যে এই কাঠামোগত ব্যাখ্যার অর্থ এই নয় যে তা অপরিবর্তনীয় স্থবির মানসিকতার পরিচায়ক। নিম্নবর্গের ধারণার মধ্যে নানা স্তর রয়েছে। তিনি কৃষক, ভাগচাষি, জোতদার, সাধারণ শ্রমিক, সাধারণ দিনমজুরের মতো বিভিন্ন বর্গের কথা বলেন যারা ক্ষেত্রবিশেষে এক অপরের বিরুদ্ধেও সামিল হত। অনেক সময়ই ধর্মীয় পরিচিতির নিরিখে দুই নিম্নবর্গ গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার ঘটনা ঘটত। আবার অন্যদিকে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে সাধারণ জনগণের অংশ হয়ে এই বিভিন্ন বর্গের মানুষ একসঙ্গে ব্রিটিশ-

বিরোধী কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল। তবে সেখানে গান্ধী বা কংগ্রেসের ঠিক করে দেওয়া কর্মপন্থা থেকে তারা অনেক সময়ই সরে এসে নিজেদের মতো করে আন্দোলনের পথ তৈরি করে নিয়েছিল। গান্ধীর স্বরাজের ডাক তাদের কাছে খাজনা মকুবের আশ্বাস নিয়ে এসেছিল, যদিও তা কখনই কংগ্রেসের অভিপ্রায় ছিল না।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তাই নতুন রূপে ধরা পড়ল নিম্নবর্গ নিয়ে এই ইতিহাসচর্চায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দেখিয়ে দেওয়া পথ বা দলীয় কর্মসূচির বাইরেও যে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের নিজস্ব নানা পন্থা ছিল, তা এই গবেষণায় উঠে এল ইতিহাসের সূত্র হিসাবে প্রথাগত সরকারি নথিপত্র খুঁটিয়ে পড়ে দেখার সুবাদে, যাতে ইতিহাসবিদরা পেলেন নিম্নবর্গের লুকিয়ে থাকা স্বর। প্রাতিষ্ঠানিক বয়ানকে আখ্যানের যুক্তির বিপরীতে পাঠ করে লিখিত সূত্রের নীরবতা ও ফাঁকফোকরগুলি সামনে নিয়ে আসেন তারা। বলেন যে এইভাবে সূত্রের বয়ানের অসংগতিগুলি চিহ্নিত করতে পারলে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা সম্ভব।[৭]

ইতিহাস রচনার এই ঝোঁক দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্তীকালে ১৯৯০-এর দশক থেকে দেশভাগ ইতিহাসচর্চার একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই ধারায় ইতিহাস চর্চায় উঠে আসে দলিত প্রশ্ন, লিঙ্গ প্রশ্ন। নিম্নবর্গের স্বরকে তুলে আনতে গিয়ে মৌখিক ইতিহাসকে আজ যেভাবে আমরা দেখি তা আসলে ১৮৯০ ও ৯০-এর দশকে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অ্যাকাডেমিক আন্দোলনের সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল। মৌখিক ইতিহাসের কিছু সীমাবদ্ধতা ও পক্ষপাতদুষ্টতা সত্ত্বেও এই ধারার গুরুত্ব আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছিল না। ভারতে সবচেয়ে পুরোনো মৌখিক ইতিহাস হল, তেলেঙ্গানা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে

লেখা *We Were Making History* (১৯৮৯) by K Lalita, Vasantha Kannabiran, Rana Melkote, Uma Maheswari, Sasi Tharu and Veena Shatrugna। বইটির শিরোনামে 'History' শব্দটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, পরবর্তীকালে শর্মিলা রেগের সম্পাদিত *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonios* (২০০৬) বইটি দলিত মহিলাদের লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে এবং জাত প্রথার বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে দলিত মহিলাদের আত্মজীবনী পড়ার পক্ষে সাওয়াল করে। মিনাক্ষী মুন এবং ঊর্মিলা পাওয়ারের *We also Made History* (২০০৮) আম্বেদকরবাদী আন্দোলনের নারীদের জীবন বর্ণনাকে নথিভুক্ত করেছে। এরপর মৌখিক ইতিহাসের উপর বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ভারতে নারী আন্দোলনের সঙ্গে শুরু হয় নারীর মৌখিক ইতিহাসকে লেখ্যাগারে সংরক্ষণের প্রক্রিয়া। ১৯৮৮ সালে সি. এম. লক্ষ্মী The Sound and Picture Archives for Research on Women (SPARROW) নামে প্রথম লেখ্যাগার গড়ে তোলেন, যা নারীর মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণে তৎপর ছিল। পরবর্তীকালে কবিতা পাঞ্জাবী তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন, 'Otiter Jed or Time of Revolution : Ila Mitra The Santals and Tebhaga Movement'। প্রবন্ধটি ২০১০ সালে *Economic and Political Weekly*-তে প্রকাশিত হয়। বহুবছর ধরে *Frontiers : A Journal of Women Studies* চারটি বিশেষ খণ্ড প্রকাশ করেছে যা নারীর মৌখিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সমায়নুক্রমিকভাবে নারীর মৌখিক ইতিহাসের গঠন সুনিশ্চিত করেছে।

এইভাবে বিদ্যাচর্চা মহলে *মৌখিক জ্ঞান গুরুত্ব* পেতে শুরু করে। লাতিন আমেরিকায় সত্তরের দশকে *Testimonio* নামে এক ধরনের ঐতিহাসিক রচনার চল হয় যেটা মূলত সাক্ষাৎকার নির্ভর, এই ক্ষেত্রে অন্য সংস্কৃতির গবেষকরা সেই সময়ে এসে, লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। এই সংরূপ তৈরি হওয়ার মূল ভিত্তিই ছিল তৎকালীন লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক বিপ্লব যে বিপ্লবে বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেছিল। এই *Testimonio*-গুলির মধ্যে বিখ্যাত নোবেলজয়ী Rigoberta Menchu–র লেখা *I, Rigoberta Menchu: An Indian Woman in Guatemala* (১৯৯২) বইটি। এছাড়াও Domitila Barrios–এর লেখা *Let the Speak!: Testimony of Domitila, a Woman of the Bolivian Mines* (১৯৭৮) বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত যার বাংলা করা যেতে পারে 'সাক্ষ্য সাহিত্য' যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌখিক আখ্যানের মধ্য দিয়েই নির্মিত হয়েছে। *Testimonio* বা সাক্ষ্য সাহিত্য হচ্ছে মূলত কোণ রাজনৈতিক ঘটনা যা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের জবানবন্দি। সমাজের নীচুস্তরের পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা এক ধরনের জবানবন্দি। সমাজের প্রান্ত থেকে উঠে আসা collective struggle বা সম্মিলিত সংগ্রামের সাক্ষ্য, যে মৌখিক আখ্যান তা ইতিহাস, প্রথাগত মহাফেজখানার ঐতিহাসিকদের কাছে ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত হয়নি, বরং সমালোচিত হয়েছে যে কীভাবে এটি ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রে নিজেকে অধিষ্ঠিত করছে। এই বিষয়টি লক্ষণীয়।[৮]

মৌখিক ইতিহাসের বিভিন্ন সংরূপের মধ্যে সাক্ষ্য-সাহিত্য হল একটি। এক্ষেত্রে একদিকে হয়তো মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের মৌখিকভাবে বর্ণিত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে

সাক্ষ্য-সাহিত্য একটি সংরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে প্রান্তীয় মানুষের প্রশ্ন এবং অবশ্যই সমস্ত স্তরের মেয়েদের প্রেক্ষিতকে আলোচনাভুক্ত করার মধ্য দিয়ে আধিপত্যশীল ইতিহাস ভেঙে দেওয়ার মতন ব্যাপ্তি মৌখিক ইতিহাস বহন করে চলে। স্বভাবতই, মৌখিক ইতিহাস অনেকখানি ব্যাপ্ত।

ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য অনেক ক্ষেত্রেই মৌখিক ইতিহাস নির্মাণে 'কাব্যিক' সত্য আকারে ধরা দেয়। এই সত্যের ক্ষেত্রে চারটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ : (১) কোনো সমাজ বা সংস্কৃতি কীভাবে একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করছে, (২) কীভাবে গ্রহণ করছে, (৩) বছরের পর বছর নিজের মধ্যে লালন করছে, এবং (৪) সেই গৃহীত লালিত ঘটনার প্রতি সেই সমাজ-সমষ্টির নান্দনিক প্রতিক্রিয়াটি ঠিক কেমন হচ্ছে এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকে কীভাবে একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। এইগুলিই প্রধাণত মৌখিক ইতিহাসে কাব্যিক ইতিহাসকে নির্মাণ করে। যেমন, বুন্দেলখণ্ডের হরবোলাদের কণ্ঠে উঠে আসা ঝাঁশির রাণির বীরত্বকে ঘিরে রচিত 'ঝাঁসি কি রাণি' নামক বিখ্যাত কবিতায় ঝাঁসির রাণির মর্দানি বুন্দেলখণ্ডের হরকরাদের মনে কেমনতর ছাপ রেখেছিল, প্রকারান্তরে যা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের লড়াইয়ে বিপুল উৎসাহ জুগিয়েছিল মৌখিক ইতিহাসের চরিত্র বিশ্লেষণে তাই মূলত বিবেচ্য, আর এইখান থেকেই ঝাঁসির রাণির সেই বীরত্বগাথা কীভাবে কিংবদন্তি হিসবে ১৯৪০-এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে, সেই ইতিহাসও একই মৌখিক আখ্যানের থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেকখানি বুঝে নেওয়া সম্ভবপর। ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য নয়, বরং ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যিক নির্মাণ পরবর্তীকালে একটা গোষ্ঠীকে কী কী ভাবে প্রভাবিত করে এবং পাশাপাশি একটা সমষ্টির

সত্যকে নির্মাণ করে কিংবা বদলে দেয় – এইসবের বিশ্লেষণ মৌখিক ইতিহাসের অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকে। অথচ অপরিহার্য কিছু অভিজ্ঞতার কথা প্রথাগত মহাফেজখানার ইতিহাসে না থাকলেও মৌখিক ইতিহাস এই ধরনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন-এর *সেদিনের কথা* গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত একটি ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর এই স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থে লুতসুই নামক আরেকজন কর্মীর কথা বলেছিলেন, যিনি গ্রামীণ মহিলা চাষীদের কাছে গিয়ে হঠাৎ গোধূলির লাল আকাশের সৌন্দর্যের কথা বলাতে মহিলারা তার থেকে দূরে সরে যায়, এবং পরে লুতসুই জানতে পারেন যে, ওই মহিলারা আসলে সেই আকাশ দেখে দুঃখ পেয়েছিল, কারণ সেই আকাশে বৃষ্টি না হওয়ার, ফসল না ফলার সংকেত ছিল। এইভাবে মৌখিক ইতিহাসে অনেকক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের সঙ্গে বক্তার সম্পর্কের সূত্রে কখনো কাজ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যষ্টিগত চেতনা, আবার কখনো আত্মচেতনা, অন্তরের অনুভব-মহল। বক্তার এই বিষয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে, আন্তঃবিষয়িতার প্রশ্ন।

যতদিন মৌখিক ইতিহাস মূলস্রোতের ইতিহাসের তথ্যসূত্র, পরিশিষ্ট বা গ্রন্থতালিকায় স্থান পেয়েছিল ততদিন একে প্রান্তি করে রাখা হয়েছিল অনেকখানি। কিন্তু পরবর্তীকালে স্থানীয় সমাজের বা গোষ্ঠীর ইতিহাস জানার জন্য মৌখিক ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসাবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করেছে। যেমন, আদিবাসী সংস্কৃতি যেহেতু নিজেই বাচনিক সংস্কৃতি, সেহেতু আদিবাসী ইতিহাসকে জানার জন্য মৌখিক ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা গল্পই

ইতিহাস নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা নেয়। মৌখিক ইতিহাস এভাবে নিপীড়িত মানুষকে তাদের নিজেদের কাহিনি বলতে উৎসাহিত করে যাকে কর্তৃত্বকারী সাংস্কৃতিক স্মৃতির সঙ্গে না মিলিয়ে নির্বাক করে দেওয়া হয়েছিল।

এরই পাশাপাশি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মৌখিক ইতিহাসের আবির্ভাবের ফলে লিঙ্গ একটি সংজ্ঞা প্রণয়ণকারী বৈশিষ্ট্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কারণ মেয়েরা সব সময়ই পুরুষের তুলনায় ভিন্নভাবে অতীতকে স্মরণ করে থাকে। Qwen Etter Lewis-এর গবেষণায় বলা হয়েছে – Women's narratives-কে অনেক সময়ই understatements, avoidance of the first-person point of view, rare mention of personal accomplishments and disguised state mantle of personal power হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।[২০] একইভাবে, মৌখিক ঐতিহাসিকরাও বলেছেন, যে সব মেয়েদের সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছেন তারা পুরুষদের মত নিজেদের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে বসায় না, তারা তাদের দক্ষতাকে অনেক সময়েই খুব খাটো করে দেখতে চায় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকাকে নিজের স্মৃতিতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে থাকে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ লা রোয়া লাদ্যুরি *মতাঁইউ* বলে একটি বই লিখেছিলেন, যার তথ্যসূত্র মহাফেজখানার দলিল বা দস্তাবেজ নয়, একটু অন্যধরনের। পিরেনীজ পাহাড়ের নীচে একটি ছোট্ট গ্রাম, সেই গ্রামে একধরনের 'হোরসী' বা প্রচলিত ধর্মবিরোধী এক প্রতিবাদী গোষ্ঠী ('আলবিজেনসীয়ান' যার নাম) আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাকে দমন করার জন্য রোমান ক্যাথলিক ধর্মের যাঁরা নিয়ন্তা, তাঁরা নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার মধ্যে

একটি হল একজন বিশপকে পাঠানো, যে বিশপের নাম ফুরনিয়ে। তিনি সেই গ্রামে গিয়ে 'হোরসী' দমন করার পর প্রত্যেকের জবানবন্দি নিয়েছিলেন – 'ইনকুয়্যইজিশন'। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া এই জবানবন্দিগুলি জমা পড়েছিল কোথাও। সেগুলিকে খুঁজে বার করা গেল। তন্ন তন্ন করে তা অনুসন্ধানের পরে লাদ্যুরি যে ইতিহাস রচনা করলেন তা ধর্মের ইতিহাস নয়, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের নিয়ন্তাদের নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস নয়। ফুটে উঠল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার ছোটো ছোটো ইতিহাস। একটা রাখালের গ্রাম বাঙ্ময় হয়ে উঠল এই ভিন্নধর্মী ইতিহাসের নির্মাণে।[৯]

প্রাচীন 'কথা'র মধ্যে আমরা পাই আখ্যান, খোঁজ, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক দ্বিরালাপের সন্ধান। মনে পড়বে *বৃহৎকথামঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর*-এর কাহিনি পরম্পরার নিয়ত চলিষ্ণু বুনন। চরিতেতিহাস অথবা আখ্যানের এমনই এক আদল হল 'কথা', যেখানে নিরন্তর বৃত্তান্ত, কথোপকথন, সংবাদ বয়ে চলে তোটিনীর মত। প্রাচীন সংস্কৃতি কাব্যকথা থেকে মধ্যযুগের দীর্ঘ-কাব্য আখ্যানের মধ্যে আমরা 'কথা'-র বিস্তার দেখেছি। বাংলার নিজস্ব আখ্যানের সেই খোঁজ উপনিবেশোত্তর পর্বে গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে। লোকমুখে প্রচলিত কথনশৈলীর অভিনব বিস্তার ধরা আছে লোকায়ত জীবনশিল্পের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যেও।

নব্বই পরবর্তী পার্টিশন বিষয়ক গবেষণায় নারীর লৈঙ্গিক প্রশ্ন যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই মৌখিক বা ভাষ্য সংগ্রহের কাজ, মনে পড়বে, Eviator Zerubavel সমষ্টি মানসের স্মৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে *Time Maps : Collective Memory*

and the Social Shape of the Past বইতে লিখেছেন— I am primarily interested not in what actually happened in history, but how we remember it.

এই প্রসঙ্গে দেশভাগের পরবর্তীকালে আক্রান্তদের নিয়ে নয়ের দশকের শেষে আশিষ নন্দী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিচালনা করেছিলেন, যেখানে ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় দুই হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর *Time Warps : Silent and Evasive Past in Indian Politics and Religion* (2002) বইতে একরৈখিক ইতিহাস নির্মাণের প্রবণতার বিপ্রতীপে আরও ‘ইনক্লুসিভ’ ধারণার কথা বলেন, যেখানে মিথ/ সাবজেক্টিভিটিরও জায়গা আছে। উপনিবেশোত্তর মনস্তাত্ত্বিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আশিস নন্দী ভারতীয় পার্টিশনের চর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর এই প্রকল্পটির গবেষণার ফল ছিল মীণাক্ষি ভার্মার *Aftermath : An Oral History of Violence* (2008) গ্রন্থটি। আশিস নন্দীর প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলার পার্টিশন আক্রান্তদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে গবেষণা করেছেন জয়ন্তী বসু। সামাজিক পরিসরে সামূহিক স্মৃতির বিন্যাস ও স্মৃতিলোপের আখ্যান চর্চাই তাঁর *Reconstructing the Bengal Partition: The Psyche under a different Violence* (2013) বইটিকে বাংলার পার্টিশন প্রতর্কের অন্তর্বর্তী মনস্তাত্ত্বিকতার আলোচনার পরিসরে একটি পথপ্রদর্শনের কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও ‘পার্টিশন রিডল’ সেই জট যা উত্তর প্রজন্মের কাছে সমাজতত্ত্বের বহুকৌণিক পাঠ পরিসর তৈরি করে; আখ্যানের গতি প্রকৃতি বদলে দেয় –

বিশেষত বাংলা আখ্যানের। নিরবচ্ছিন্ন উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক তর্ক-প্রতর্কে বাংলার আখ্যান যেন বৃহত্তর আখ্যান কথার অংশ হয়ে ওঠে।

এই মৌখিক ইতিহাসই কখনো বিকল্প ইতিহাস হয়ে, কখনো আত্মকথন, আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির আঙ্গিকে ঘুরে ফিরে আসে দলিত সাহিত্যের বলয়ে। পেশাদারি ইতিহাসচর্চা যাদের কথাকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়নি, বারবার ঠেলে দিয়েছে বৃত্তের বাইরে, ইতিহাস চর্চার সুদীর্ঘ ধারার এই পর্যায়ে এসে তারা তাদের কলম নিজেরাই তুলে নেয়। প্রত্যক্ষতা থেকে সরে এসে বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে প্রান্তিক ও পরিধির স্বরক্ষেপগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বোঝার প্রয়োজনে দলিত মানুষদের আত্মজীবনীগুলি বর্তমান বিদ্যায়তনিক চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে চিহ্নিত।

'আত্মপরিয়ে ভাঙন ও উন্মোচন' শীর্ষক প্রবন্ধে সাহিত্যিক দেবেশ রায় জানাচ্ছেন—

> ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে দলিত লেখকদের রচনাই অনুবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছেও অনেক বেশি, বিদেশী অনেক গবেষক দলিত সাহিত্য নিয়ে তথ্যসংগ্রহ ও তত্ত্ব নির্মাণ শুরু করেছেন এমনকি সত্তরের দশক শেষ হওয়ারও আগে, যখন দলিত সাহিত্যের বিশিষ্টতা সবেমাত্র চিনে নেওয়া যাচ্ছে।[১০]

একসময় যা ছিল বিচ্ছিন্ন পথিকৃতের পথভাঙা, তার ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে নির্মাণের কল্পনা ও কুশলতা। প্রাথমিক ভাবে মারাঠি দলিত সাহিত্যই একটা ছক হয়ে উঠেছে অন্য ভাষার দলিত সাহিত্যের সামনে।

মহাত্মা গান্ধী যখন 'হরিজন' শব্দবন্ধটি দিয়ে চতুর্বর্ণবিভক্ত অপরিবর্তনীয় হিন্দুধর্মের কাঠামোর মধ্যে অস্পৃশ্যদের জন্য একটি সামাজিক সম্মানের জায়গা তৈরি

করতে চেয়েছিলেন সেই রাজনীতি ছিল প্রকারান্তরে হিন্দু সমাজের ভিতরেই অস্পৃশ্যদের মিশিয়ে দেওয়ার রাজনীতি। সে রাজনীতি অস্পৃশ্যদের নিজেদের ভিতর থেকে তৈরি হয়নি, সেও তো তৈরি হয়েছে হিন্দু উচ্চবর্ণ থেকে। আবার অন্যদিকে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনে মহারাষ্ট্রে ব্যাপক সমাবেশে ও বম্বের সুতাকলে ও অন্য শিল্পে রাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী, চৈতন্য ও কমিউনিস্ট সংগঠন ছড়িয়ে পড়ছিল তাতে হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণকে ও সেই বর্ণপ্রথায় অস্পৃশ্যদের বিশেষ স্থান নির্দেশকে ব্যাখ্যা করা হত অর্থনৈতিক শ্রেণিভাগের ধারণা দিয়ে। কমিউনিস্টরা মনে করতেন মাহাররা ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অস্পৃশ্যরা বা ভারতের সব অস্পৃশ্যরাই একটি শ্রেণি ব্যবস্থার ভিতর বিন্যস্ত। এই শ্রেণিব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করতে হবে। তার বাইরে মাহার বা অস্পৃশ্যদের কোনো বিশেষ সমস্যা কল্পনা করা বস্তুত শ্রেণিসংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর। একজন হিন্দু অস্পৃশ্য যদি নিজেকে হিন্দু অস্পৃশ্য বলে আলাদা করে ভাবেন, তাহলে তিনি নিজেকে আর প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা হিসাবে ভাবতে পারেন না। আম্বেদকরের নেতৃত্বে অস্পৃশ্যদের আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষমতা। কমিউনিস্টরা তখন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে এই চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ধরতেন। সুতরাং তাদের ব্যবহৃত 'প্রলেতারিয়েত' শব্দে বা ধারণায় আম্বেদকরের অভীষ্ট আত্মপরিচয়ের বিশিষ্টতা ছিল না। বরং 'প্রলেতারিয়েত' ধারণার সমগ্রতা আম্বেদকরের সেই অন্বিষ্ট আত্মসন্ধানের পক্ষে বড়ো বেশি ব্যাপক ছিল ও সেখানে হিন্দু অস্পৃশ্যরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক দাবি দিয়ে কোনো বিশিষ্টতা খুঁজে পেতেননা, 'সর্বহারা'-র বৃহৎ পরিচয়ের মধ্যে তার বর্ণগত অস্পৃশ্য (মাহার) পরিচয় হারিয়ে যেত।

১৯৭২-এর ৯ জুলাই নামদেও ধাসাল, অর্জুন ডাঙলে, জে.ভি. পাওয়ার, দয়া পাওয়ার, উমাকান্ত রণধীর, রামদাস সোরতে মিলিতভাবে দলিত প্যান্থার আন্দোলনের ঘোষণা করলেন তখন তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন আমেরিকার ব্ল্যাক প্যান্থার আন্দোলনের ছাঁচটিকে। ঘোষণাপত্র বের করে তাঁরা সে বছরের স্বাধীনতা দিবসকে 'কালাদিবস' হিসাবে পালন করার আহ্বান জানালেন জনসমাজের প্রতি।

এই সময়ই দলিত সাহিত্য যেন আরো নির্দিষ্ট হতে পারল আত্মপরিচয়ে – যারা দলিত, তাদের জন্য লেখা, তাদের নিয়ে লেখা, তাদের লেখাই দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্যের এই তুঙ্গ বিন্দুতে দলিত সাহিত্যিকরা তাদের নন্দনতত্ত্ব স্থির করতে, যত বেশি গ্রহণে তৎপর হলেন, তার চাইতেও বেশি তৎপর হলেন বর্জনে।

এই 'দলিত' পরিচয় নির্মাণে সঙ্গতভাবেই 'আত্মকথন' সবচাইতে জোরালো মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। যা অনেকখানি ব্যক্তির এবং একইসঙ্গে অনেকখানি গোষ্ঠীরও ইতিহাস। পেশাদারি ইতিহাসচর্চার থেকে যেমন অনেকখানি ভিন্ন, তেমনই তা সাহিত্যের এযাবৎ কাল অবধি রচিত আত্মজীবনী নামক বর্গটি থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থান নিল। আমাদের মনে পড়বে ঠিক একইভাবে মার্কিন দেশে কালো লেখকরা আত্মজীবনীর ধরনকে একসময় প্রধান ধরন হিসাবে অবলম্বন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গত দশ বছরে আপার্থিডের কাল শেষ হয়ে গণতন্ত্রের কাল শুরু হওয়ার পর কালো শ্রমিকদের আত্মজীবনী সাহিত্যের একটি প্রধান ধরন হয়ে উঠেছে।

দলিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, সর্বার্থেই প্রান্তিক মানুষজন যখন আত্মকথা লেখেন, তখন এমনটা ভাবাই যেতে পারে যে এই লেখার মধ্য দিয়ে তার এক ধরনের মুক্তি ঘটে। এই মুক্তি যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা কোনো রাজনৈতিক নেতার নির্দেশেই সবসময় ঘটে এমনটা নয়। এই মুক্তি একজন ব্যক্তি মানুষের চৈতনের স্বীকৃতি থেকেও আসতে পারে।

এখানেই প্রত্যেকটি দলিত আত্মকথা একজন দলিতেরই আত্মকথা, একই ধর্মীয় অনুশাসন প্রত্যেক দলিত লেখককে প্রায় প্রত্যেক দলিত লেখককেই নিয়ন্ত্রণ করছে, প্রতিটি আত্মকথাই হিন্দু বর্ণভেদ প্রথার সঙ্গে শূদ্রাতিশূদ্র সম্পর্কের কাহিনি, অথচ প্রত্যেকটি আত্মকথাই পৃথক, মৌলিক, একান্ত ও ব্যক্তিগত। এই বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্য দিয়েই দলিত লেখকরা তাঁদের আত্মজীবনীতে, এমনকি তাঁদের কবিতাতেও, আত্মকাহিনির এক নতুন প্রকরণ ভারতীয় সাহিত্যে নির্মাণ করলেন।

দলিত সাহিত্যিকরা তাঁদের আত্মকথনে ‘দলিত’ পরিচয়টির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে থাকেন, ফলে অনেক সময়ই যা কিছু ঐ সত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত নয়, তা বাধ্যত বাদ পড়ে যায় আত্মকথার সীমার বাইরে। কিন্তু তাঁর দলিত আত্মপরিচিতিকে সে কোনো ভাবেই আর আজকে আড়াল করতে চায় না।

প্রসঙ্গত মনে পড়বে *আংকেল টমস কেবিন* (১৮৫২) থেকে ব্ল্যাক প্যান্থার সংগঠনের নির্মাণ (১৯৬৬) পর্যন্ত কালপর্বে নিগ্রোদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছিল। সে আজ ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’। তাঁর স্লোগান – ‘I am a black,

black is beautiful’ – এই আজ তার দৃঢ় বিশ্বাস। ‘আমি শ্বেত নই’, এই ভাবনা আজ আর তার দুশ্চিন্তার কারণ নয়। সে নিজের একটা ‘পরিচয়’ নির্মাণ করেছে ইতিমধ্যেই।

বাংলা দলিত সাহিত্যের পত্রিকা ‘চতুর্থ দুনিয়া’-তে একাধিক মুসলিম সাহিত্যিকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি দলিত সাহিত্যিকদের কাছে চুনি কোটাল নামটাই একটা বড়ো লড়াইয়ের শপথ। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে আদিবাসী লক্ষ্মণ গায়কোয়ার, যিনি *উচলা* নামের আত্মজীবনীর লেখক, তিনি নিজের রচনাকে দলিত সাহিত্য বলেছেন এবং দলিত সাহিত্যিক, সমালোচক ও পাঠক তাঁকে দলিত সাহিত্যিক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।

ফলে আদিবাসী বা মুসলিমকে নিশ্চিত ভাবে দলিত সাহিত্যে বা দলিত কাঠামোর মধ্যে চিহ্নিত করা যাবে কিনা, তা কোনো তাত্ত্বিক বলতে পারে না, ‘দলিত’-এর এই নির্মাণ আসলে সমাজ থেকেই উঠে আসবে, পারস্পরিক সংলাপ ও গ্রহণ বা প্রত্যাখানের নিদর্শনের মধ্য দিয়ে। আদতে বাংলা দলিত সাহিত্য, দলিত আত্মকথনের মধ্যে চুনি কোটাল বা অন্যান্য আদিবাসী চরিত্র বা সাহিত্যিকের পরিগ্রহণ বৃহত্তর দলিতের ইতিহাস নির্মাণের প্রয়াস।

এরই পাশাপাশি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কাঞ্চা ইলাইয়ার ‘দলিত বহুজন’ পরিভাষা দলিত সাহিত্যের তাত্ত্বিক পরিসরে নতুন প্রতর্ক সংযোজন করে ও দলিত সাহিত্যকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে।

এইবার যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীর সুদীর্ঘ ধারার দিকে দেখি এবং তার পাশে দলিত আত্মজীবনীর সূচনাপর্বের দিকে দেখি তাহলে উভয় সংরূপের নিজস্ব তত্ত্ব দর্শন, পাঠ পদ্ধতি ও ইতিহাসের এই বিপুল ফারাক সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর অনতিদীর্ঘ পরম্পরার দিকে তাকালে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি রেনেসাঁস উদ্ভূত হলেও আত্মজীবনীর মূল সাহিত্যরূপটি একেবারেই আমাদের দেশ-কালের আত্মজ। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, 'আত্মজীবনী' নামক এই বিশেষ সাহিত্য সংরূপটির কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড স্থির হওয়ার আগেই কোনো রকমের পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০) তাঁর আত্মজীবনী *আমার জীবন* (১৯০০) লিখেছিলেন। যা কেবল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীই নয়, বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীর রচয়ীতাও বিস্ময়করভাবে একজন নারীই ছিলেন। সদ্যশিক্ষিতা এক প্রৌঢ়া, পাশ্চাত্য সাহিত্য যার সামান্যও অধিগত নয়, প্রবল পুরুষতন্ত্রের বিপ্রতীপে দাঁড়ানো এক গৃহবধূর হাত দিয়েই আত্মজীবনীর মত স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপের জন্ম হয়েছিল। যদিও শুরুরও একটা শুরু ছিল, সাহিত্যে যার ইতিহাস বেশ প্রাচীন।

নরেশচন্দ্র জানা ও শ্রীমতী মানু জানা সম্পাদিত *আত্মকথা* (১৯৮১) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রাক-ভূমিকা অংশে 'আত্মকথার মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য সুকুমার সেন দেখিয়েছেন *ঋক্‌বেদ সংহিতা*-র মধ্যে কীভাবে লুকিয়ে ছিল আত্মকথার বীজ। প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের কোনো রচনার সন্ধান না পাওয়া গেলেও মধ্য বাংলায় এর উদাহরণ আছে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর *অভয়ামঙ্গল* কাব্যের

সূচনায় যে আত্মপরিচয় দিয়েহেন, সুকুমার সেন আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মকথা বলতে চেয়েছেন। মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রমুখ কবির কাব্যে আমরা এই ধরনের আত্মবিবরণীর অংশ পাই। বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের প্রথম আলাপন হিসাবে এই আত্মবিবরণীগুলিই ভবিষ্যতের আত্মজীবনী নামক সংরূপটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পরবর্তীকালে বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রবলয়ের আত্মজীবনীকাররা। বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের অন্যতম তিনটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি* (১৯১২), অবনীন্দ্রনাথের *আপনকথা* (১৯৫৩)। এভাবেই বাঙালি নারীর আত্মজীবনের সূচনা পর্বের অনেকটাই এসেছে ঠাকুরবাড়ি এবং রবি পরিমণ্ডলের মধ্যেকার মানবীদের হাত দিয়ে। এই পর্বে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় সৌদামিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, মোহিতকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, উমা দেবী, প্রতিমা দেবী, শান্তা দেবী, মীরা দেবী, হেমন্তবালা দেবী, সীতা দেবী, পূর্ণিমা দেবী, সাহানা দেবী, রাণী চন্দ-র আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা বিষয়ক রচনাগুলি। এঁদের কেউ বা ঠাকুরবাড়ির গৃহবধূ, কেউ বা মেয়ে, আবার কেউ বা নিকট-দূর আত্মীয়তাসূত্রে ঠাকুরবাড়ি বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আলোচ্য আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথাগুলির সাহিত্যমূল্যকে অস্বীকার না করেই যদি আমরা আত্মজীবনীকারদের দিকে দেখি তাহলে দেখব ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিকরের মধ্যে তাঁরা লালিত পালিত হয়েছেন, বাংলাদেশে সেইরকম আভিজাত্যপূর্ণ পরিবার

সমকালে কমই ছিল। তাই নারীর সমস্যা বা তৎকালীন সমাজ বা সামাজিক সংস্কার ও সেই যুগের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বর্ণনাই হোক – যাই তাঁরা বলুন না কেন, বলেছেন কলকাতার উচ্চবিত্ত আভিজাত্যের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, বিনোদিনী দাসী, কৃষ্ণভামিনী দাসী, মানোদা দেবীর আত্মজীবনী, স্মৃতিকথাতে আমরা ঠাকুরবাড়ির দালানের বাইরের একটি ছবি পাই, যে ছবিতে তাঁদের জীবনে পিতৃতন্ত্রের দাপট স্পষ্ট, কিন্তু তখনও দলিতের জীবন, দলিতের লাঞ্ছনা, দলন ও দ্রোহ, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও সেই তন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় নীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, অস্পৃশ্যতা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কলম ধরার দিন বেশি কিছুটা দূরে।

তথ্যমতে, ১৯১৫ সালে হরিদাস পালের *একজন পতিত জাতির কর্মী* দিয়ে বাংলা দলিত আত্মজীবনী যাত্রা শুরু করলেও প্রথম দলিত আত্মজীবনী আকারে প্রকাশিত পৌণ্ড্র সমাজের সমাজের রাইচরণ সরদারের *দীনের আত্মকাহিনী* বা *সত্য পরীক্ষা* (১৯৫৯)-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এই ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে প্রাথমিক পর্বের দলিত আত্মজীবনীগুলির মূল প্রবণতাই ছিল ভারতের নিম্নবর্গীয় আতিগুলির সম্মানজনক আত্মপরিচিতি নির্মাণের ইতিহাস বর্ণন। সমাজের নিম্নবর্ণের জাতিগুলি উচ্চবর্গের রীতিনীতি অনুসরণ করে জাতিগত সামাজিক ঊর্ধ্বায়নের এই প্রচেষ্টাকে এম.এন. শ্রীনিবাস ‘সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া’ বলে অভিহিত করেছেন। এই একই প্রক্রিয়া আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির মধ্যেও খুঁজে পাই। সর্বভারতীয় প্রেক্ষপটে ই.ভি. রামস্বামীর (১৮৭৯-১৯৭৪) নেতৃত্বে তামিলনাড়ুতে

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণীয়দের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন 'Self Respect Movement' বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই বাংলাতেও রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র, মাহিষ্য, চাঁইদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে একের পর এক।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই যে এযাবৎকাল আত্মনিপীড়িতের আত্মমর্যাদা ও জাতিগুলির আত্মপরিচিতি নির্মাণের এই লড়াইয়ে দলিত মানুষেরা পেশাদারি ইতিহাসের বয়ানকে অস্বীকার করল। নতুন ইতিহাস নির্মাণে স্ব-স্ব সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় শিক্ষিত মানুষেরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। একদিকে আত্মজীবনী অন্যদিকে জাতির ইতিহাস নির্মিত হল, যারা প্রায় একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাইচরণ সরদার ছিলেন পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তি। তাঁর আত্মজীবনী লেখার অনুপ্রেরণা ছিল পৌন্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রবর্তী নায়ক বেণীমাধব হালদারের *জাতি বিবেক* (১৮৯৩) নামক গ্রন্থ। এই ধরনের আরও একাধিক বই প্রায় আগে-পরে লেখা হয়েছে, তৎকালীন সময়ের ইতিহাসের রূপরেখা নির্মাণ ও নির্ধারণে যাদের ভূমিকা আজও প্রাসঙ্গিক।

বর্তমানে দলিত আত্মজীবনী একটি পরিচিত বর্গ। দলিত যে একটি পাঠ পদ্ধতি, সেই পাঠ-পদ্ধতিও আজ বিদ্যায়তনিক পরিসরে স্বীকৃত।

দলিত সাহিত্যের লেখক দলিত হলেও বেশিরভাগ দলিত সাহিত্যের অনুবাদক অদলিত, ফলে ইংরেজি ভাষায় যে দলিত সাহিত্যের পরিসর তৈরি হচ্ছে, যাকে আমরা

ভারতীয় দলিত সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করছি সেই দলিত সাহিত্য নির্মাণে অদলিতের অর্ধেক অবদান। বিগত কয়েক দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা, আম্বেদকরের নতুন প্রাসঙ্গিকতা, দলিত রাজনীতির উত্থান, ইত্যাদি দলিত চেতনাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে ও ক্রমশ প্রসারিত করেছে। সাহিত্যচর্চায় বিগত দুই দশকে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানে নতুন নতুন অনেক ভাবনার পরিগ্রহণ দেখা দিয়েছে ও সেগুলি ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। সাহিত্যচর্চায় বিগত দুই দশকে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের নতুন নতুন অনেক ভাবনার পরিগ্রহণ দেখা গেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসতত্ত্ব, মাইনরিটি ডিসকোর্স, লিঙ্গবিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যায়তনিক সাহিত্য চর্চায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠায় নতুন কাঠামোয় আরও গভীরভাবে 'প্রান্তিকের আখ্যান' বিশ্লেষিত হচ্ছে। তাত্ত্বিক চর্চার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাহিত্য পাঠের চাহিদাও বেড়েছে। একের পর এক ইংরেজি প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের, এগিয়ে আসছে প্রান্তিক সাহিত্য প্রকাশ করতে। নারীদের লেখালেখি ও দলিত লেখালেখি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এর ফলে। বর্তমানে বিদ্যায়তনিক চর্চায় দলিতের অবস্থান প্রান্তিক হলেও আজ আর দলিত সাহিত্য প্রান্তিক নয়। বিদ্যায়তনিক চর্চার পরিসরে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে এই সাহিত্যের চাহিদা বা বাজার তৈরি হয়েছে। নিয়মিত তৈরি হচ্ছে নতুন, স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দলিত সাহিত্য। এই পর্যায়ে এসে দলিত সাহিত্যের মধ্যেও বিভাজন তৈরি হয়েছে, যা সঙ্গত কারণেই প্রাসঙ্গিক। নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র, বাগদি, বাউরিদের বাইরে একটা বড়ো অংশের দলিত মানুষের জীবনে আজও পূর্ববর্তী অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন ঘটেনি। এই সমস্ত প্রান্তিক দলিতদের মধ্যে পুঁজির মালিকরা খুঁজে নিচ্ছে সস্তার শ্রমের লোভনীয় ভাণ্ডার।

দলিত সাহিত্য সৃষ্টির সূচনাপর্বেই দলিত তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে রামায়ণ, মহাভারত তাঁদের মহাকাব্য নয় কারণ এই বৃহৎ ক্যানভাসে তাঁরা তাঁদের অবস্থানে সন্তুষ্ট নয়। তাই দলিত সমাজকেও নিজেদের মতো করে মুখে মুখে রচনা করে নিতে হয়েছে তাঁদের নিজস্ব সৃষ্টি-পুরাণ, সাধকচরিত, কখনো বা নিজেদের বংশধারাকে তারা যুক্ত করে দিয়েছেন কোনো পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক রাজকাহিনির সঙ্গে। ডোমেরা নিজেদের রাজা হরিশচন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করেন, হাঁড়িরা বলেন 'এক হারা' রাজবংশের কথা, মুচিদের মুখে মুখে রচিত হয় সাধক রবিদাসের জীবনচরিত। এরই পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যসমাজের সংক্রমণে তাঁদের নিজেদের ভিতরেও সৃষ্টি হয়েছে স্তরভেদ। বাল্মিকীরা মনে করেন, ডোমরা তাঁদের থেকে 'নীচুতে' আছে, হেলাদের দাবি, তাঁদের অবস্থান হাঁড়ি বা ভাঙ্গিদের উপরে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেখা যায় এই সকল দলিত অবমানিত মানুষদের মনের গহনে এক বিশেষ গর্ববোধ আছে। বাল্মিকী সমাজের যে ব্যক্তি 'ঝাঁটা ধরে সুইপারের কাজ' করেন, তিনিও মনে করেন যে তাঁদের সমাজে 'কেউ কেউ ঋষি আছে'। কোনো গোষ্ঠী দাবি করেছেন, তাঁরা শিবগোত্র, কেউ বা শুনিয়েছেন কালুপীরের বৃত্তান্ত। রাঢ় বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের অন্ত্যজ সমাজে কালুবীরের পুজো প্রচলিত আছে। তিনি ধর্মমঙ্গলের কালু ডোম, নাকি হরিশচন্দ্রের উপাখ্যানের সেই ভীষণদর্শন কালু চণ্ডাল, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

মৎস্যজীবী তিয়র রাজবংশীদের নিজস্ব দেবতা যেমন মাকালঠাকুর, তাঁর পুজোর নৈবদ্যে জ্যান্ত শোলমাছ উৎসর্গ করতে হয়, কৈবর্তরা মনসাপুজোয় নিবেদন করে পোড়া

চিংড়ি। অন্ত্যজ দলিত সমাজের লোকবৃত্তে এইরকম নানা দেবদেবী, পুরাণ আর সৃষ্টিকথার বৃত্তান যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেইগুলিকে সংযুক্ত করে নিতে পারলে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের এক স্বতন্ত্র আখ্যান পাওয়া যতে পারে, রচিত হতে পারে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের এক প্রতিভাষ্য।[১১]

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চায় 'পুরাণ' আর 'ইতিহাস'-এর মধ্যে ছিল অবাধ যাতায়াত। বহু পথ পেরিয়ে যখন একবিংশ শতাব্দীতে এসে 'আধুনিকতা' বা আলোকদীপ্তির ধারণাটাই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত এবং লোকশ্রুতি-প্রবাদ-প্রবচন, বাচন সাহিত্য গুরুত্ব সহকারে উঠে আসছে বৃহত্তর জ্ঞানচর্চার পরিসরে তখন দলিতের ইতিহা দলিতের পুরাণের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়গুলি নির্মোহভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে হয়তো ইতিহাসচর্চার সাম্প্রতিকতম একটি ধারার জন্ম হতে পারে, যার শিকড় একান্ত ভাবেই দেশ-কালের মাটিতে প্রোথিত।

তথ্যসূত্র:

---

১. নাথ, প্রত্যয়, ও সেনগুপ্ত, কৌস্তভমনি (সম্পাদিত), *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতহাস: অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ৩৬

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৩. পণ্ডিত, মিমাষা, 'জাতিয়তাবাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি', *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতহাস: অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ২৯১

৪. চক্রবর্তী, দীপেশ, *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১১, পৃ. ৩২

৫. ঝাঁজ, দেব কুমার, ‘রাজা, রাষ্ট্র, রাজনীতি: প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষিতে’, *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতহাস: অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ. ৫৭

৬. চক্রবর্তী, দীপেশ, *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১১, পৃ. ৪৭

৭. ভদ্র, গৌতম, ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ২

৮. মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা (সম্পাদিত), *নহি সামান্যা নারী,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৩০

৯. পাত্র, সমীর কুমার, ভৌমিক, শেখর ও চক্রবর্তী, অরিন্দম, *ইতিহাস চর্চা: সাম্প্রতিক গবেষণা,* আশাদীপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫১

১০. রায়, দেবেশ, *উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ২০২

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দলিতের পুরানকথা,* অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.

উপসংহার

উপসংহার

‘দলিত’ কে? ‘দলিত সাহিত্য’ কী? দলিত সাহিত্যের আদৌ কোনো উপযোগিতা আছে কি-না? দলিত আত্মজীবনী কি কোনও স্বতন্ত্র বর্গের দাবীদার আদৌ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজতে চেয়েছি সমগ্র অভিসন্দর্ভটি জুড়ে। বলা ভালো, হাতের সামনে থাকা উত্তরগুলোকেই আমরা বার প্রশ্ন করেছি।

এই প্রসঙ্গে, ১৯৭৩ সালে দলিত প্যান্থার গোষ্ঠীর যে ম্যানিফেস্টোটি প্রকাশিত হয়েছে, তার কিছু অংশকে আরেকবার যদি ঘুরে দেখা যায়, তাহলে সেখানে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এই ম্যানিফেস্টোটিতে বলা আছে -

➢ ‘কে দলিত?

তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত, নয়া-বৌদ্ধ, শ্রমিকশ্রেণি, ভূমিহীন, কৃষকশ্রেণি এবং বাকি যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মের নামে শোষিত হচ্ছে, তারা দলিত।

➢ আমাদের বন্ধু কারা?

- বৈপ্লবিক পার্টি, যারা জাতিভেদ প্রথা এবং শ্রেণি বিভাজন ভেঙে ফেলতে চায়। বামপন্থী দল, যারা সত্যয় বামপন্থায় বিশ্বাসী।
- সমাজের সেই সমস্ত অংশ যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের ভুক্তভোগী।

➢ কারা আমাদের শত্রু?

- ক্ষমতা, সম্পদ, মূল্য।
- জমিদার, পুঁজিবাদি, সুদখোর মহাজন ও তাদের ভৃত্য।

➢ আজকের দলিতের সামনে জ্বলন্ত প্রশ্ন

- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান।
- চাকরি, জমি, অস্পৃশ্যতা (ঘোচানো)।
- সামাজিক ও শারীরিক অন্যায়।’

আলোচ্য অংশটিতে সমগ্র দলিত প্যান্থার্স ম্যানিফেস্টোর খুব অল্প অংশই উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু সেই অংশটুকুতেই দলিত আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দলিত আন্দোলনের জন্য দলিত দর্শন-সমূহের বৃত্ত, সাহিত্যের ইতিহাস ও আন্দোলনের ঐতিহ্য বোঝা খুবই জরুরি।

এর পাশাপাশি আজকের দলিত আত্মজীবনীর রচয়িতারাও বেশ কয়েকটি প্রজন্ম পেরিয়ে এসেছেন। সঙ্গত কারণেই তাঁদের যাপিত জীবনের নিপীড়ন, বঞ্চনা ও যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা বর্তমান প্রজন্মে এসে অনেকখানি দূর হয়েছে। সমাজের মূল স্তরে তাঁদের একটা অংশ আজকে প্রতিষ্ঠিত। আজকে কি তাহলে দলিত আত্মজীবনীকে ‘দলিত’ শব্দটি দিয়ে আলাদা করে বিশেষায়িত করার প্রয়োজনীয়তা আছে? এই প্রশ্নটা স্বভাবতই তৈরি হয় আমাদের মনে।

যদি আজকের নয়া উদারনীতিবাদী ব্যবস্থার দিকে তাকাই যার কেন্দ্রে রয়েছে এক চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক, ভোগবাদী দর্শনের ভাবনা যেখানে সামাজিক স্বার্থ বা সমাজভাবনা কথাগুলি অর্থহীন। নয়া উদারনীতিবাদী পৃথিবীতে মানুষ তাই নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। যার মন ও মস্তিষ্কের দখল নিয়েছে পুঁজি, বদলে যাচ্ছে নৈতিকতা-অনৈতিকতার ধারণা। সংস্কৃতি রূপান্তরিত হচ্ছে বিনোদনে, আর গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াচ্ছে কর্পোরেট পুঁজি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের চেহারাটা এতটাই সূক্ষ্ম যে সমাজের এক বড়ো অংশের মানুষ এই বিপদ সম্পর্কে অবহিত নন। পুঁজির এই অবাধ ও অর্গলমুক্ত বিচরণকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, যার নিয়ন্ত্রকও কর্পোরেট পুঁজি। এর ঠিক অপরদিকে সমাজের খেটে খাওয়া

মানুষ, প্রান্তিক মানুষ পুঁজির লালসার শিকার হয়ে প্রবল নিরাপত্তাহীনতার ধাক্কায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। পুঁজির অপ্রতিহত মুনাফা লোটার তাগিদের বলি হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত। বর্তমান এই বিপদে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে দক্ষিণপন্থার উত্থান। দক্ষিণপন্থীর যেহেতু লিখিত কোনও মতাদর্শ নেই, তাই সে খুব সহজেই দলিত আন্দোলনকে গিলে নিতে পারে।

দলিতের আত্মকথনকে আজকে তাই আর 'অল্প পাওয়া'তেই কৃতজ্ঞ থাকলে হবে না। দলিতের মুক্তির জন্য বৃহত্তর রাষ্ট্র কাঠামো, আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদি ব্যবস্থা ইত্যাদির গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। আজকের দলিত আত্মজীবনীকারকে জানতে হবে যে তাঁর সমস্যা সামাজিক হলেও কেবলমাত্র সামাজিক সমস্যা নয়। সেই সমস্যা বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সমস্যাও বটে।

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি আগে একজন মানুষের সমগ্র জীবনের অনুসন্ধানের প্রায় কেন্দ্রে ছিল একটাই জিজ্ঞাসা : মানুষের পূর্ণতর মানুষ হয়ে ওঠা।কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) তাঁর ডক্টরাল থিসিসে লিখেছিলেন -

> অভিশাপগ্রস্ত সেই মানুষ, যে নিজের শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা হওয়ার আনন্দ না পেয়ে, চিরকাল ঘুরতে থাকেন নিজেরই গাত্রচর্মের নীচে।

স্রষ্টার আনন্দ পেতে গেলে তাকে তো প্রথমে মুক্ত মানুষ হতে হবে, সেটা কেমন মুক্তি? এই বোধ হয়তো সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে এসেছে ১৮৭৫-এ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গোথা শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের জন্য গোথা কর্মসূচির উপর ('গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' নামে বিখ্যাত) তাঁর সমালোচনাটিতে—

> সাম্যবাদী সমাজের উচ্চস্তরে, যখন ব্যক্তিমানুষ আর শ্রমবিভাজনের আজ্ঞানুবর্তী থাকবে না, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রম ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে বৈপরীত্যের ধারণাটা অবলুপ্ত হয়ে যাবে; যখন শ্রম হয়ে উঠবে জীবনের একটি উপকরণ মাত্র, কিন্তু তা-ই হবে জীবনের প্রধান চাহিদা; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎপাদিকা শক্তিগুলোও বেড়ে উঠবে; এবং সমবায় সম্পদের সমস্ত ধারাগুলো উজ্জ্ব হয়ে বইতে থাকবে; কেবলমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তটাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে এবং তখনই সমাজ নিজের পতাকায় লিখে নেবে : প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমতা অনুযায়ী (নেওয়া), প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া।

পূর্বতন দার্শনিকদের সঙ্গে মার্কসের পার্থক্যটা ছিল এইখানেই। মার্কস পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, যে সম্পর্ক বিরাট সংখ্যক একদল মানুষকে কতিপয় মানুষের দ্বারা পদানত করে রেখেছে দীর্ঘকাল ধরে, তাঁকে ক্রমাগত প্রশ্ন করেহচেন, নির্মভাবে কাঁটা-ছেড়া করেছেন আজীবন কাল। ভাবী প্রজন্মের দলিত আত্মকথনের স্রষ্টারা কি এর থেকে কোনও ভিন্নতর ভাষা খুঁজে নেবে? ভিন্নভাবে চিন্তা করার ভাষা, এবং চিন্তাকে মুক্ত করার ভাষা।

আমরা শেষাবধি দেখলাম যে, আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে বাংলা সাহিত্যের বিপুল পরিসরের মধ্যে থেকে 'আত্মজীবনী' নামক সংরূপটিকে বেছে নেওয়া হয়ে ছিল। সমাজের সর্বস্তরের প্রান্তিক মানুষদের দৈনন্দিন যাপনের মধ্যে থেকে উঠে আসা অনুচ্চারিত কথাগুলি এই 'আত্মজীবনী' নামক আপাত নিরীহ সংরূপটিকে যে কতখানি বৈচিত্রপূর্ণ ও বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম করে তুলতে পারে তাঁর বিশ্লেষণই অভিসন্দর্ভটির কেন্দ্রীয় বিষয়। কাজটি করতে গিয়ে সর্বভারতীয় ও বাঙালি লেখকদের একাধিক আত্মজীবনী পড়ার সুবাদে দলিত মানুষদের আত্মজীবনীর নিজস্ব স্বর খুজে

পাওয়া ছিল অন্যতম প্রাপ্তি। একাধিক অধ্যায়ে, নানা বর্গীকরনের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর নিপীড়নের ভিন্ন-ভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সুচারু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গভীরে অধ্যয়ন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আত্মজীবনী নামক সংরূপটিকে ঘিরে এযাবৎকাল অবধি থাকা ধারণাগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তার অভিঘাত বহুবার ব্যক্তি আমিকে বিপর্যস্ত করেছে। কাজটি করতে করতে তাদের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে যত পরিচয় এগিয়েছে কখনো চোখে জল এসেছে, কখনো বা নিজের অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়েছে।

আসলে ইতিহাসচর্চার মূল কাঠামোটা এখনও রয়ে গেছে পুরুষকেন্দ্রিক, পরিবর্তনটা হয়েছে বাহ্যিক, প্রসাধনস্তরে। মূল কাঠামোটি অপরিবর্তিত রেখে যৎসামান্য নারীবিষয়ক জ্ঞান কাঠামোটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। পুরুষকেন্দ্রিক কাঠামোটিকে ঢেলে সাজানোর কোনও জোরালো প্রয়াস মূলস্রোত ইতিহাসচর্চায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। ইতিহাসচর্চার অন্তর্লীন অসাম্য এবং পুরুষ-পক্ষপাতের বিশেষ হেরফের হয়নি। তবে নারীবাদী ঐতিহাসিকেরা তৎপর হয়ে উঠেছে বেশ কয়েক দশক ধরে। তাঁরা বলছেন, ইতিহাসের মূল কাঠামোটাকেই খোলনলচে পালটে ফেলতে হবে, জন/গণপরিসর, যে পরিসরে নারী এযাবৎ অনুপস্থিত, থেকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে সংসারে, পরিবারে অর্থাৎ নিভৃত/ব্যক্তিগত পরিসরে। গণপরিসরে রাজনৈতিক/রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ঘটনা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে রোজকার আপাতনিস্তরঙ্গ জীবনকে চর্চার আওতার মধ্যে আনতে হবে। পাশাপাশি বহির্জগতে নারীর উপেক্ষিত ভূমিকাকেও দৃষ্টিগোচর করতে হবে। একই সঙ্গে জনপরিসর এবং ব্যক্তিগত পরিসরের মাঝের

দেওয়ালটাও ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ এই দেওয়ালটা আসলে তো পিতৃতন্ত্রেরই সৃষ্টি। এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দলিত নারীর আত্মজীবনীর খুঁটিনাটি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকটি বিষয় তাদের গুরুত্বের কারনেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে, যেমন- চুনি কোটালের আত্মহননের ঘটনাটি। বলা বাহুল্য, এই আত্মহননটির পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এ বাঙালি দলিত লেখকের আত্মজীবনীগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপরেই মূলত আমরা জোর দিয়েছিলাম। বস্তুত, আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটি অনালোচিতই রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, সেটি একটি স্বতন্ত্র গবেষণা। ভবিষ্যতে কোনো গবেষক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, সে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করবেন— এই আশাবাদী প্রত্যয় রেখে আমরা আমাদের আলোচনার ইতি টানলাম।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা আকর গ্রন্থ:

- কোটাল, চুনী; 'আমার জীবন', *দলিত সাহিত্য,* ড. চিত্ত মণ্ডল এবং ড. প্রথমা রায়মন্ডল সম্পাদিত, একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩

- করাতি, তৃষ্ণা; *দলিত নারীর আত্মকথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১

- গোস্বামী, বনমালী; *অবর বেলায় পাড়ি,* বানী আর্ট প্রেস, কলকাতা, ২০১০

- গোস্বামী, সুধামুখী; *আত্মজীবনীর মতো,* বানী আর্ট প্রেস, কলকাতা, ২০১০

- গায়কয়াড়, লক্ষণ; *উচল্যা,* (অনুবাদ মাধুরী সিংহ), সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ২০০৭

- গায়েন, নির্মল; *লাঙল কলম,* পালক পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১

- চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর; *আমি কেন চাঁড়াল লিখি,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৬

- জলদাস, হরিশংকর; *নোনাজলে ডুবসাঁতার,* প্রথমা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮

- জানু, সি কে; *বসত,* (অনুবাদ জয়া মিত্র), লোকনদী প্রকাশনা, আসানসোল, ২০১৬

- ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ; 'সীমান্তের দুই অবতার', *বর্ডার: বাংলা ভাগের দেওয়াল,* অধীর বিশ্বাস সম্পাদিত, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৬

- দময়ন্তী; *সিজনস অব বিট্রেয়াল,* গুরুচন্ডা৯ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯

- দাস, রাজু; *একজন রিক্সাওয়ালার আত্মকথা,* জনমন প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫

- প্রামাণিক, মৃন্ময় (সম্পাদিত), *দলিত চেতনা দলিত দর্শন: কথায় কথায় শরণকুমার লিম্বালে,* ছোঁয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২

- প্রামাণিক, শ্যামল; *প্রান্তজনের আত্মকথা,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২

- পাল, মধুময় (সম্পাদিত); *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১১

- ফেমিনিজম ডট কম (সম্পাদিত); *তাহাদের কথা,* গুরুচন্ডা৯ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯
- ব্যাপারী, মনোরঞ্জন; *ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন,* প্রথম খন্ড, কলকাতা প্রকাশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪
- ব্যাপারী, মনোরঞ্জন; *যে কথা ইতিবৃত্তে নেই,* বৈভাষিক প্রকাশন, হুগলী, ২০১৮
- বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; *উত্তর বাংলা সেকালে ও আমার জীবনস্মৃতি,* জলপাইগুড়ি, বিজয়চন্দ্র বর্মন, ১৯৮৫
- বাল্মিকী, ওমপ্রকাশ; *উচ্ছিষ্ট,* (অনুবাদ তপনকুমার ঘোষ), প্যাপিরাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২
- বালা, যতীন; *শিকড় ছেঁড়া জীবন: উদবাস্তু-দলিতের দলিল,* গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- বিশ্বাস, অধীর; *দেশভাগের স্মৃতি ১*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০
- বিশ্বাস, অধীর; *দেশভাগের স্মৃতি ২*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০
- বিশ্বাস, কান্তি; *আমার জীবন: কিছু কথা,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১৪
- বিশ্বাস, জগবন্ধু; *স্মৃতির পাতা থেকে,* শিল্পনগরী, কলকাতা, ২০১৪
- বিশ্বাস, দেবব্রত; *ব্রত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ
- বিশ্বাস, বিভুতিভূষণ; *গেঁয়ো ভূতের আত্মকথা,* কল্পতরু প্রকাশনা, কলকাতা, ২০১৬
- বিশ্বাস, মনোহর মৌলী; *আমার ভুবনে আমি বেঁচে থাকি,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০১৩
- বিশ্বাস, মনোহর মৌলী, প্রামাণিক, শ্যামলকুমার ও বিশ্বাস, অসিত (সম্পাদিত); *শতবর্ষে বাঙলা দলিত সাহিত্য,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১
- বিশ্বাস, মহীতোষ; *দিল এল দিল গেল,* মাঙ্গলিক, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০

- বড়াল, কানন; *কানন বড়াল রচনা সমগ্র,* ফুলমালা ভবন প্রকাশন, কলকাতা, ২০২২

- বড়াল, মনোরঞ্জন; *আত্মকথা,* প্রবাহ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২

- মুর্ম্মু, মেরুনা; 'ভারত মাতার ইতর সন্তান', *নীড়,* কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল সম্পাদিত, অষ্টাদশ সংখ্যা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ ২০শে আগস্ট, ২০১৭

- রায় দেবেশ; *দলিত,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১১

- রায়, হরিপদ; *সংগ্রামের জীবন,* জয়ঢাক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩

- লিঙ্গাইয়া, সিদ্দা; *আমারও কিছু বলার আছে: একজন কন্নড় দলিত কবির আত্মজীবনী,* (সম্পাদিত মৃন্ময় প্রামানিক), মান্দাস, কলকাতা, নভেম্বর ২০২৩

- লিম্বালে, শরণকুমার; *বেজন্মা,* (অনুবাদ অনুরিমা চন্দ), দোসর পাবলিকেশন, কলকাতা, মার্চ ২০২২

- সত্যনারায়ন, ওয়াই. বি.; *আমার বাবা বালাইয়া: একটি তেলেগু দলিত পরিবারের আত্মকথা,* (অনুবাদ সৌভিক দে সরকার), হাওয়াকল, কলকাতা, অক্টোবর ২০২০

- সেন, মণিকুন্তলা; *মণিকুন্তলা সেন: জনজাগরণে নারীজাগরণে,* প্রথম সংস্করণ, থীমা, কলকাতা, ২০১০

- সরকার, বিজয়; *নদী চলে সাগর সন্ধানে,* মহসিন হোসাইন (সম্পাদিত), মনন প্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

- সরকার, রাজেন্দ্রনাথ; *জীবনকথা,* সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র-মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২

- সরদার, রাইচরণ; *দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য-পরীক্ষা,* রাধারানি প্রেস, ক্যানিং টাউন, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ সনৎ কুমার নাম নস্কর (সম্পাদিত), *পৌণ্ড্র মনীষা,* সোনারপুর, পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, ২০১২

- হীরা, আশিস ও প্রামানিক, মৃন্ময় (সম্পাদিত), *ব্রাত্যনারীর আত্মকথা,* গাঙচিল, জানুয়ারি ২০২৩

- হালদার, বেবি; *আলো আঁধারি*, রোশনাই, কাঁচরাপাড়া, ২০০৭

- হালদার, লিলি; *ভাঙা বেড়ার পাঁচালি*, পরম্পরা প্রকাশনী, ২০১৯

ইংরেজি আকর গ্রন্থ:

- Bama; *Karukku*, (Translated by Lakshmi Holmstrom), Oxford University Press, New Delhi, 2012

- Dangle, Arjun (Edited); *Poisoned Bread*, Orient BlackSwan, Hyderabad, 2009

- Dutt, Yashica; *Coming out as Dalit: A Memoir*, Aleph, New Delhi, 2019

- Gidla, Sujata; *Ants among Elephants: An Untouchable Family and the Making of Modern India*, Harper Collins, New Delhi, 2017

- Kamble, Baby; *The Prison We Broke*, (Translated by Maya Pandit), Orient BlackSwan, Hyderabad, 2008

- Kunhaman, M.; *Dissent*, (Translated by H. Poornima), D C Books, 2023

- Limbale, Sharankumar; *The Outcaste*, (Translated by Santosh Bhoomkar), Oxford University Press, New Delhi, 2003

- Malagatti, Aravind; *Government Brahmana*, (Translated by Dharani Devi Malagatti, Janet Vucinich and N. Subramanya), Orient BlackSwan, Hyderabad, 2007

- Meghwanshi, Bhanwar, *I Could not be Hindu: The Story of a Dalit in the RSS*, (Translated by Nivedita Menon) Navayana, New Delhi, 2020

- More, Ramchandra Babaji; *Memoirs of a Dalit Communist: The Many Worlds of R. B. More*, (Translated by Wandana Sonalkar), LeftWord, 2020

- Pawar, Urmila; *The Weave of My Life: A Dalit Woman's Memoirs*, (Translated by Maya Pandit), Stree, Kolkata, 2008

- Raj, Shilpa; *The Elephant Chaser's Draughter*, Rupa Publications, 2017
- Satyanarayana, Y. B.; *My Father Baliah*, Harper Collins, New Delhi, 2011
- Shaikh, Malika Amar; *I want to Destroy Myself*, (Translated by Jerry Pinto), Speaking Tiger, New Delhi, 2023
- Shepherd, Kancha Ilaiah; *Why I am not a Hindu*: *A Sudra Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy*, Sage, New Delhi, 2019
- Valmiki, Omprakash; *Joothan: A Dalit's Life*, (Translated by Arun Prabha Mukherjee), Samya, Kolkata, 2007
- Viramma; *Viramma: Life of an untouchable*, (Translated by Will Hobson), Verso, 1997
- Yengde, Suraj; *Caste Matters*, Penguin, Haryana, 2019

হিন্দি আকর গ্রন্থ:

- ফুলে, জ্যোতিবা; *গুলামগিরি*, সুধীর প্রকাশন, জানুয়ারি ২০২০
- যাদব, লক্ষ্মণ; *প্রফেসর কী ডায়েরী*, যুবান বুকস, নয়া দিল্লী, ২০২৪

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

- আচার্য, দেবীদাস; *মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২৪
- আচার্য, দেবীদাস; *মহাভারতে নিম্নবর্গ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২
- কাফি, আব্দুল; *দুরের মাদল*, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০

- করণ, মহেন্দ্র নাথ; *পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ*, ডা: ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ২৮-পরগণা, ২০০১
- গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত; *চার্বাক দর্শন*, অবভাস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২০
- ঘোষ, স্বাতী; *থেরীগাথা: প্রথম মানবীর স্বর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০২৪
- চক্রবর্তী, দীপেশ; *ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১১
- চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার; *প্রান্তিক মানব*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১
- চট্টোপাধ্যায়, দেবী; *দেশভাগে নিম্নবর্ণ*, (সম্পাদিত আশিস হীরা), গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ; *লোকায়াত দর্শন*, নিউ এজ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৮১৬
- চৌধুরী, ঋতু সেন (সম্পাদিত); *নারীবাদের নানা পাঠ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১
- চন্দ, পুলক (সম্পাদিত); *নারীবিশ্ব*, গাঙচিল, কলকাতা, জুলাই ২০০৮
- চ্যাটার্জী, জয়া; *দেশভাগের অর্জন: বাঙলা ও ভারত ১৯৪৭-১৯৬৭*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০২০
- চ্যাটার্জি, দেবী; *সমাজ রাষ্ট্র ও প্রান্তিকতা*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৫
- ঠাকুর, কপিলকৃষ্ণ (সম্পাদিত); *বাংলার নমঃশূদ্র ১*, কে এন টি এ এ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১
- দাশ, নির্মল; *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮

• নাথ, প্রত্যয়, ও সেনগুপ্ত, কৌস্তভমনি (সম্পাদিত); *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতহাস: অতীতের ভারত ও আজকের গবেষণা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২১

• নস্কর, সনৎকুমার; *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা,* দিয়া পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১২

• নস্কর, সনৎকুমার(সম্পাদিত); *এক অন্তহীন মহামানব: বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকর,* পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, বারুইপুর, জানুয়ারি ২০১৬

• প্রামাণিক, মৃন্ময়; *দলিত সাহিত্য চর্চা,* গাঙচিল, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২

• পাত্র, সমীর কুমার, ভৌমিক, শেখর ও চক্রবর্তী, অরিন্দম; *ইতিহাস চর্চা: সাম্প্রতিক গবেষণা,* আশাদীপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২

• পাল, মধুময় (সম্পাদিত); *মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস,* গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯

• বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদিত); *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* আই সি বি এস সিরিজ: ২৪, দিল্লী, জানুয়ারি ১৯৯৮

• বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দলিতের পুরানকথা,* অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫

• বন্দ্যোপাধ্যায়-গুহ, স্বপ্না (অনুবাদ); *ছন্দের অলিন্দে বিদ্রোহ: মহারাষ্ট্রের দলিত কবিতা,* থীমা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২

• বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র; *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০১৫

• বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়; *উদ্বাস্তু,* দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১

• বিবেকানন্দ, স্বামী; 'ভারতের ভবিষ্যৎ', *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন প্রকাশন, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

• বর্মন, সুশীল কুমার; *অব্রাহ্মন পুরোহিত,* মান্দাস, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৩

- বর্মা, যূথিকা; *জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি: উপেন্দ্রনাথ বর্মন (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ,* সোপান প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১

- বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদিত); *শরণার্থী-সন্তান,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০

- বিশ্বাস, মনোশান্ত; *বাংলার মতুয়া আন্দোলন: সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি,* সেতু প্রকাশনী, মে ২০১৬

- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি; *দলিত সাহিত্যের দিগবলয়,* একুশ শতক, কলকাতা, মার্চ ২০১৯

- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি; *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা,* পত্রলেখা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি; *দেশভাগ ও বিশ্বায়ন: পরাজিত মানুষের গল্প,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮

- বিশ্বাস, মনোহরমৌলি; *প্রবন্ধে প্রান্তজন অথবা অস্পৃশ্যের ডাইরি,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০

- বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত); *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* প্রকাশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২১

- বসু, সোমেন্দ্র নাথ; *বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী,* টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৯৯৩

- ভট্টাচার্য, সুকুমারী; *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৪

- ভদ্র, গৌতম, ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ; *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর ২০১২

- মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা (সম্পাদিত); *নহি সামান্যা নারী,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮

- মণ্ডল, চিত্ত ও রায়মন্ডল (সম্পাদিত); প্রথমা *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* একুশ শতক, বইমেলা ২০১৬

- মণ্ডল, মননকুমার (সম্পাদিত); *পার্টিশন সাহিত্য: দেশ-কাল-স্মৃতি,* গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯

- মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত); *বাংলাদেশ: নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ [১৭৬৩-১৯৫০],* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৬

- মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ; *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, জুলাই ২০১২

- রাণা, সন্তোষ ও রাণা, কুমার; *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮

- রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রতনাবলী (সম্পাদিত); *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০১২

- রায়, দেবেশ; *উপন্যাসে নতুন ধরনের খোঁজে,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪

- রায়, দেবেশ; *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ২০১৫

- রায়, দেবেশ; *বরিশালের যোগেন মণ্ডল,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০

- রায়, শিবনারায়ণ ও রেজা, শামিম (সম্পাদিত); *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), কাগজ প্রকাশন, ঢাকা, মার্চ ২০০৪

- লিম্বালে, শরণকুমার; *দলিত নন্দনতত্ত্ব,* (অনুবাদ মৃন্ময় প্রামাণিক), তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭

- শর্মা, রামশরণ; *প্রাচীন ভারতে শূদ্র,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯

- সিকদার, সুকুমার; *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০

- সিকদার, সুকুমার; *মনুসংহিতার শূদ্রভাষ্য,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০

- সুর, নিখিল; *বিশ শতকের প্রথম আলোয় বঙ্গনারী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০২৪

- সেন, অমর্ত্য; *তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ* পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭

- সেন, অমর্ত্য; *পরিচিতি ও হিংসা*, (অনুবাদ ভাস্বতী চক্রবর্তী), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১০

- সেন, দিনেশচন্দ্র; *মৈমনসিংহ গীতিকা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৯

- সেন, ক্ষিতিমোহন; *প্রাচীন ভারতে নারী*, বিশ্বভারতী প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

- সান্যাল, হিতেশরঞ্জন; *বাংলার সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪

- হীরা, আশিস; *উদ্বাস্তু: ইতিহাস ও আখ্যানে*, গাঙচিল, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

- Ambedkar, Babasaheb; *Annihilation of Caste*, Navayana, New Delhi, 2015

- Brueck, Laura; 'The Emerging Complexity of Dalit Consciousness', *Himal*, 2010

- Chakravarti, Uma; *Gendering Caste through a Feminist Lens*, Sage, New Delhi, 2018

- Clarke, Sathianathan, Manchala, Deenabandhu and Peacock, Philip Vinod; *Dalit Theology in the Twenty-first Century*, Oxford University Press, New Delhi, 2010

- Lahiri, Himadri; *Diaspora Theory and Trnasnationalism*, Orient BlackSwan, Hyderabad, 2019

- Lejeune, Philippe; *On Autobiography*, (Translated by Katherine Leary), University of Minnesota Press, 1989

- Mayaram, Sahil, Pandian, M. S. S. and Skaria, Ajay (Edited); *Subaltern Studies XII*, Permanent Black, Delhi, 2010

- Nandy, Ashis; *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*, Oxford University Press, New Delhi, 2022

- Nayar, Pramod K; *Writing Wrongs: The cultural construction of human rights in India*. Routledge, 2014

- Omvedt, Gail; *Seeking Begumpura: The Social Vision of Anticaste intellectuals*, Navayana, New Delhi, 2023

- Pawar, J. V.; *Dalit Panthers: An Authoritative History*, Forward Press, New Delhi, 2019

- Rai, Bina. 'Dalit Women in India: An Overview of their Status', *International Journal of Economic and Business Review*. Vol. 4, Issue. 1, 2016

- Rao, Anupama; *The caste question: Dalits and the politics of modern India*. University of California Press, 2009

- Rege, Sharmila; *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies*. Zubaan, 2014

- Sabharwal, Nidhi Sadana and Sonalkar, Wandana. 'Dalit Women in India: At the Crossroads of Gender, Caste and Class', *Researchgate*. 2015

- Satyanarayana, K. and Tharu, Susie (Edited); *The Exercise of Freedom*: *An Introduction to Dalit Writing*, Navayana, New Delhi, 2013

- Smith, Sidonie and Julia Watson; *Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives*, University of Minnesota Press, 2010

- Zelliot, Eleanor; *From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement*, Manohar, New Delhi, 2001

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

- আচার্য, অনিল (সম্পাদিত), *অনুষ্টুপ* (দলিত ভারত), ৫৮ বর্ষ ৮র্থ সংখ্যা, ২০২৪
- ইকবাল, শহীদ (সম্পাদিত), *চিহ্ন*, ১৮তম বর্ষ ৩৫তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৮
- চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর (সম্পাদিত), *নীড়* (মেয়েদের আম্বেদকর চর্চা ও ইন্দো-অস্ট্রেলিয় দলিত রচনা), ১৭তম বর্ষ ২২তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৬
- চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর (সম্পাদিত), *নীড়* (দলিত নারীর প্রবন্ধ), ২৪তম বর্ষ ২৯তম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৮
- চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর (সম্পাদিত), *নীড়* (দলিত নারীর রচনা), ১৯তম বর্ষ ১৪তম সংখ্যা, বইমেলা ২০১৩
- চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর (সম্পাদিত), *নীড়* (আত্মজীবনী সহ অন্যান্য রচনা), ২৩তম বর্ষ ১৮ সংখ্যা, আগস্ট ২০১৭
- বর্গী, রত্নাংশু (সম্পাদিত), *অন্তঃসার*, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৭
- বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদিত), *গাঙচিল* (শরণার্থী), সূচনা সংখ্যা, জুলাই ২০১৭
- বিশ্বাস, অধীর (সম্পাদিত), *গাঙচিল* (দলিত), ৮ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৯
- সর্দার, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদিত), *নিষ্পলক* (দলিতের ভারত নির্মাণ), ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০২৩
- বিশ্বাস, অমর (সম্পাদিত), *চতুর্থ দুনিয়া* (গল্পে-প্রবন্ধে-কাব্যে দলিত সাহিত্য), জুলাই ২০১৬
- বিশ্বাস, অমর (সম্পাদিত), *চতুর্থ দুনিয়া*, জানুয়ারি ২০১৩
- বিশ্বাস, অমর (সম্পাদিত), *চতুর্থ দুনিয়া* (দলিত নাটক), ডিসেম্বর ২০১৩
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), *কোরক* (বাংলা আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা), বইমেলা ২০১৪

- সর্দার, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদিত), *নিষ্পলক* (দলিত জীবন ও সংগ্রাম), ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, অক্তবর-ডিসেম্বর ২০২১
- সরকার, প্রণব (সম্পাদিত), *লোক* (প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি), শারদ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮
- Biswas, Manohar Mouli (Edited), *Dalit Mirror*, Vol. XVII/XX, Issue. IV-VI/I-V, July-December 2019

অভিধানপঞ্জি

- আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পাদিত), *আকাদেমি বানান অভিধান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫

- *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি (অন্তর্জাল সূত্র)

- https://www.epw.in/journal/2016/18/book-reviews/bengali-dalit-autobiography.html, Accessed on 15.06.2019 at 11:50 am

- https://www.jstor.org/stable/44004231, Accessed on 20.10.2018 at 03: 18 pm

- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/18125441.2024.2367511, Accessed on 11.12.2024 at 09:50 am

- https://womenstudiescentrejmc.wordpress.com/2022/08/15/partition-and-the-dalit-experience-writing-dalits-into-partition-history/, Accessed on 06.05.2023 at 06:50 pm

- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10357820903363736, Accessed on 13.02.2025 at 10:20 am